রবীন্দ্রসংগীত

রবীন্দ্রসংগীত

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

ষষ্ঠ সংস্করণ

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

উৎসর্গ

পিতৃদেবের শ্রীচরণে

ভূমিকা

পূজনীয় গুরুদেবের গানের বিষয়ে বই প্রকাশ করবার ইচ্ছা তিন বছর পূর্বেও আমার মনে একেবারেই জাগে নি। ছেলেবেলা থেকে আপন আনন্দে গানই গেয়েছি. কোনোদিন ভাবি নি এ ধরনের কাজ আমাকে একদিন করতে হবে। যখন প্রথম গুরুদেবের গানের বিষয়ে লিখবার জন্যে তাগিদ আসতে লাগল, তখন অত্যন্ত সংকোচে লেখা শুরু করেছিলাম। রবীন্দ্রসংগীত সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লিখে অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে পূজনীয় গুরুদেবের কাছে উপস্থিত করেছিলাম· তিনি আমার চেষ্টার পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হন এবং লেখাটি পড়ে তাঁর মতামত লিখে দেন। তাঁর সেই মতামতটিই লেখার পথে আমার মনে প্রেরণা জাগিয়েছে, তাই আজ এই বইখানি সম্পূর্ণ হল। কিন্তু যে কাজের আরম্ভ তিনি দেখে গিয়েছিলেন, সে কাজ শেষ করে তাঁর সামনে ধরতে পারলাম না, এই কথাই আমাকে আজ বিশেষ করে ব্যথা দিচ্ছে।

একটি একটি করে লেখা যখন বাড়তে লাগল, তখন নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম এই গানের বহু বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দেখে। কারণ এ সংগীতের গতি বহু দিকে. এই-সব বিভিন্ন পথের পরিচয় না জানা থাকলে গুরুদেবের গান সংগীতজ্ঞদের মতো জানা হবে না। এখনো আমরা তাঁর সংগীতকে কাব্যের দিক থেকেই বেশি আলোচনা করছি। তাই তাঁর গানরচনা ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে কী নূতনত্ব এনেছে, তা আমরা ভাবি নে। রাগ-রাগিণীর পরিবর্তন যুগে যুগে ভারতে ঘটে এসেছে, গুরুদেবের হাতেও তা ঘটেছে। ভাষা ও সুরের একত্ব বাংলা গানের একটি বৈশিষ্ট্য, গুরুদেবও স্বভাবতই সে পথ অবলম্বন করেছেন। কিন্তু এই গানের ভিতর দিয়ে গুরুদেব কথার সঙ্গে সুরে ও ছন্দে দেশকে যা দিয়ে গেছেন তার ব্যাপক আলোচনা এখনও হয় নি। সাধারণত এইটুকুই জানা আছে যে, গুরুদেবের গানে কথা ও সুরের মিলন অপূর্ব এবং তিনি ভারতীয় রাগ-রাগিণীকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা পরিষ্কার নয় বলে কথাটিকে আরো পরিষ্কার করে বলার চেষ্টা করেছি। এই প্রসঙ্গে তাঁর রচনার নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য কোন্ দিকে সেইটিই ধরবার চেষ্টা করেছি।

গুরুদেবের গানের আলোচনা-কালে সমগ্রভাবে ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে কিছু যে জ্ঞান থাকা দরকার সে-কথা অনুভব করেছি। ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ দুই অংশের সংগীতের সঙ্গে পরিচয় থাকা যেমন দরকার, আবার কীর্তন ও লোক-সংগীতের সঙ্গে তেমনি পরিচয় না থাকলে চলে না। এই সংগীত আলোচনা-কালে প্রথম জানতে পারলাম প্রাচীন ভারতীয় সংগীত কেবল কান্নার বা বেদনার গানই শোনায় নি, তেজবীর্যের সুরও শুনিয়েছে। তালের বিষয় আলোচনা-কালে জানতে পারলাম, উত্তর-ভারতীয় ও দক্ষিণ-ভারতীয় সংগীতের তালের জ্ঞান থাকা যেমন দরকার তেমনই কবিতার ছন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলেও বিপদ। আরো জানলাম, ভারতীয় সংগীতের তিনি বিদ্রোহী নন, তার একজন বড়ো ভক্ত।

বাংলাদেশের গান গাইবার ঢং কী বা কী হওয়া উচিত, এ নিয়ে আজকাল অনেক

রকমের কথা শোনা যায় আধুনিক বাংলা গান গাইয়ে-মহলে। তার মধ্যে যে কথাটি আমার কাছে অস্বাভাবিক ঠেকে সেটি হচ্ছে এই যে, গানে মাধুর্য বা মিষ্টত্ব ফুটিয়ে তুলতে হলে মৃদু কণ্ঠে গাওয়াই উচিত। মৃদু কণ্ঠে গান গায়কী-রীতির দিক থেকে যে একটা বড়ো দুর্বলতা, এ-কথা তাঁরা মনে করেন না। গুরুদেবের গানেও অনেক গাইয়ের মধ্যে সেই দুর্বলতা খুব প্রবল ভাবে দেখা দিয়েছে। এমন-কি, অনেকের ধারণা তাঁর গানই মৃদু কণ্ঠের বিশেষ প্রশ্রয় দেয়। এ-সব কথার মধ্যে অবিবেচনাই প্রকাশ পায় বলে মনে করি। স্বয়ং গুরুদেবের কণ্ঠের গান শিশুকাল থেকে শুনে এসেছি, আর দিনেন্দ্রনাথের কণ্ঠের গান শান্তিনিকেতনের পুরাতন ছাত্রছাত্রীরা কে না শুনেছে। তাঁদের দুজনের উচ্চ উদার কণ্ঠস্বরের কথা মনে পড়লে অবাক হই এই ভেবে যে, এইরকম পুরুষোচিত কণ্ঠস্বর কেন আজকাল আর শুনতে পাওয়া যায় না। অথচ উভয়ের কণ্ঠে গানের মাধুর্যের কিছুমাত্র হানি হয়েছে, এ-কথা কেউ বলতে পারবে না। গানে মেয়েলিপনা গুরুদেব কোনোদিনই পছন্দ করেন নি। মেয়েদের গলায় নিজের গান তিনি শুনতে ভালোবাসতেন কিন্তু পুরুষকণ্ঠে যখন পুরুষোচিত বীর্যের অভাব দেখেছেন তখন অস্থির হয়েছেন। তা ছাড়া তাঁর বহু জোরালো গান আছে, যা ভালো করে গাইতে গেলে উচ্চারণের স্পষ্টতায় ছন্দের ঝোঁকে ও গতির সাহায্যে তাকে ঠিকভাবে প্রকাশ করতে না পারলে সে গানের প্রকৃত রস ও রূপ প্রকাশিত হয় না।

এই লেখাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের চেষ্টায় যাঁদের সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছি, তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ভূমিকা শেষ করি।

বইয়ের প্রচ্ছদপট ও রবিবাউল চিত্রটি আমাদের পূজনীয় শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু এঁকে দিয়েছেন। শিশুকাল থেকে তাঁর স্নেহের আবেষ্টনে বর্ধিত হয়েছি; আমার এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হোক, এই ছবি-দুটির দ্বারা তিনি সেই আশীর্বাদ করেছেন। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর কাছ থেকে গুরুদেবের পুরাতন গান সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছি; বইটি যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয় তার জন্য অনেক পরিশ্রমে আমার লেখা তিনি সংশোধন করেছেন। শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছ থেকে এই লেখার বিষয় যেভাবে প্রথম থেকে উৎসাহ পেয়েছি তাও মামার সৌভাগ্য। আমাদের পুরাতন অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিতাইবিনোদ গোস্বামী লেখাগুলি ধৈর্যসহকারে পড়ে নানা দিক থেকে তাঁর মতামত দিয়ে আমার লেখাকে ত্রুটিহীন করবার চেষ্টা করেছেন। শান্তি-নিকেতন গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত কানাই সামন্ত, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী অমলাদেবী নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আমার ভ্রাতা শ্রীমান সাগরময় ঘোষের উৎসাহে ও উদ্যোগেই এই রচনাগুলি সত্বর লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের কর্তৃপক্ষ আমার এই পুস্তক প্রকাশের ভার গ্রহণ করেছেন, তাঁদের প্রতি আমার একান্ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

পৌষ ১৩৪৯ **শান্তিদেব ঘোষ**

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্রসংগীতের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রভূত পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধিত হল— অনেক অধ্যায় সম্পূর্ণ নূতন করে লিখিত হয়েছে। এই কাজে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ডাক্তার অমিয়নাথ সান্যাল, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নিতাইবিনোদ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দস্তিদার, শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র কর, শ্রীযুক্ত কানাই সামন্ত, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন প্রভৃতির নানা প্রস্তাব আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছে। এ ছাড়া শ্রীযুক্ত সুধীর রায়, শ্রীমতী ইলা ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুশীল রায় ও শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনারায়ণ সেনের কাছেও মুদ্রণব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের সকলকেই আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সুধী পাঠকদের কাছে আমার নিবেদন এই যে, এই গ্রন্থে আলোচিত কোনো বিষয়ে যদি কারো মনে কোনো সংশয় বা প্রশ্ন জাগে তা আমাকে জানালে উপকৃত হব।

আশ্বিন ১৩৫৬ — **শান্তিদেব ঘোষ**

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্রসংগীতের বর্তমান তৃতীয় সংস্করণে বাউল গান অধ্যায় বর্জিত ও ভারতীয় সংগীতে গুরুদেবের স্থান, দেশী সংগীতের প্রভাব, গানের বিষয়বৈচিত্র্য ও কালবিভাগ, ঋতুসংগীত, নেপথ্যের কথা এবং গীতিনাট্যের বৈচিত্র্য এই ছয়টি অধ্যায় সন্নিবেশিত হল— অনেকগুলি পুরাতন অধ্যায়েরও পরিবর্ধন করা হয়েছে। পরিশিষ্ট অংশেও ছয়টি লেখা সংযোজন করা হল, যথা, রবীন্দ্রসংগীতে তান, রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনা, চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীত, উচ্চাঙ্গ হিন্দী গানের প্রভাব, নৃত্যনাট্যের অভিনয় ও একটি গান।

"গানের বিষয়বৈচিত্র্য ও কালবিভাগ" অধ্যায়ে নানারূপ গানের উল্লেখ করে সেগুলি পঙ্‌ক্তিসংখ্যা বিষয়ে প্রথম প্রকাশিত (মাঘ ১৩৪৮) বইয়ের পঙ্‌ক্তিবিভাগকে গ্রহণ করে মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে। "নেপথ্যের কথা" অধ্যায়ে ব্যবহৃত অরূপরতন নাটিকার বিষয়ে গুরুদেবের একটি বক্তৃতা কয়েক বৎসর পূর্বে 'ঋতুপত্র' পত্রিকায় আমার ভ্রাতা শ্রীমান শুভময় ঘোষ প্রথম প্রকাশ করেন।

পৌষ ১৩৬৫ — **শান্তিদেব ঘোষ**

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্রসংগীতের বর্তমান চতুর্থ সংস্করণের পরিশিষ্টে এই দুটি প্রবন্ধ সংযুক্ত করা হল— রবীন্দ্রসংগীতে জাতিবিচার ও সংগীতের শিক্ষায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ।

২৫ বৈশাখ ১৩৬৯ — **শান্তিদেব ঘোষ**

পঞ্চম সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

'রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণে নূতন নূতন পরিচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বর্তমান সংস্করণে বিষয়বস্তুর পারম্পর্য অনুসারে পরিচ্ছেদগুলির পুনর্বিন্যাস করা হল, 'ছন্দ ॥ তাল' পরিচ্ছেদে কিছু নূতন তথ্য এবং পরিশিষ্টে একটি নূতন প্রবন্ধ যোগ করা হল। গ্রন্থের সূচনায় গুরুদেবের লেখা চিঠির যে ব্লক-চিত্র আছে, পাঠের সুবিধার্থে তা নিম্নে মুদ্রিত হল :

"তোর এই লেখাটি পড়ে মনে পড়ে গেল আমার অনেক দিনের কথা। তখন থাকতুম দেহলিপাড়ায় আমার কর্মভূমির নেপথ্যপ্রান্তে। গানসৃষ্টির নিরন্তর আনন্দে আমার দিনরাত্রি উদ্বেল হয়ে উঠত— ঝাপসা হয়ে যেত আমার অন্য কর্মের ধারা। তখন এত ছাত্রছাত্রী ও নৃত্যগীতের আয়োজন ছিল না। রাখাল যেমন একলা মনের আনন্দে কর্মহীন প্রহরগুলি ভাসিয়ে দেয় সুরে সুরে, না থাকে কেউ জুড়ি তার না থাকে কেউ শ্রোতা আমার সেই দশা ছিল। আমার গান তখন অবজ্ঞা এমন কি বিদ্রূপের বিষয় ছিল কিন্তু আমার জীবন ছিল রসে পূর্ণ সেই কথা মনে করিয়ে দিল তোর এই লেখা— দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পড়া শেষ করলুম। রবীন্দ্রনাথ ২১।৩।৪১"

পৌষ ১৩৮৬ — **শান্তিদেব ঘোষ**

ষষ্ঠ সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

'রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণে গুরুদেবের গানে উচ্চাঙ্গের হিন্দি ধ্রুপদ গানের প্রভাব সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ পরিশিষ্টে যুক্ত হল। প্রবন্ধটি ১৩৯১ বঙ্গাব্দে 'দেশ বিনোদন' সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

পৌষ ১৩৯৩ — **শান্তিদেব ঘোষ**

সূচীপত্র

সংগীতসাধনা

সংগীত চিরকালের। বেদ-উপনিষদের যুগের ঋষিরা গভীর ধ্যানের দ্বারা জানতে চাইলেন সংগীতের মূল কোথায়, কেনই বা তা মন আকর্ষণ করে, এবং কেন সংগীত একটা অনির্দেশ্য আবেগে প্রাণ পূর্ণ করে তোলে ও মন উদাস করে। চিন্তার গভীর স্তরে নেমে গিয়ে তাঁরা একদিন অনুভব করলেন যে "সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে যে একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণ-কম্পন চলেছে গান শুনে সেইটারই বেদনাবেগ যেন আমরা চিত্তে অনুভব করি।" তাঁরা আরো জানলেন যে, "সমস্ত মানবজীবনও অনন্তের রাগিণীতে বাঁধা একটি সংগীত ছাড়া কিছুই নয়," এবং "সূর্য চন্দ্র তারা ওষধি বনস্পতি, সকলেই এই বিশাল বিশ্বসংগীতে নিজের একটা না একটা বিশেষ সুর যোগ করে দিয়েছে।"

পৃথিবীর আর কোনো দেশ সংগীতকে এভাবে উপলব্ধি করে নি। অতি প্রাচীন কাল থেকে সাধনার এ ধারাটি আমাদের দেশে বয়ে এসেছে, কোথাও তার বাধা পড়তে দেখি না। এ যুগে এই সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধক হলেন গুরুদেব। তাঁর সাধনার পথ হল প্রাচীন ব্রহ্মবাদী সংগীত-সাধকের পথ, তিনি তাঁদের মতো সংগীতেই মুক্তি খুঁজেছেন। তাই গানে বলেছেন—

আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে,
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে।
দেহমনের সুদূর পারে হারিয়ে ফেলি আপনারে,
গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্ধ্বে ভাসে।

আমরা এ ধরনের কথায় আজকাল বিশ্বাস করতে চাই না। কিন্তু প্রাচীন যুগের এই প্রকার সংস্কারে বিশ্বাসীদের কথা ছেড়ে দিলেও এই যুগের বিজ্ঞানের প্রচণ্ড প্রভাবের মধ্যে বাস করে ও তার চিন্তাধারাকে সমগ্রভাবে আয়ত্ত করেও গুরুদেব এ কথা বিশ্বাস করতেন। আমাদের দেশে সংগীত হল মূলত বেদনার প্রকাশ। তার গণ্ডি ছোটোই হোক আর বড়োই হোক। ভারতের গ্রামে গ্রামে মৃত্যুর গভীর বেদনায় মানুষকে আমরা কথা বসিয়ে সুরে কাঁদতে দেখি। মানবীয় প্রেমের মধ্যেও যেখানে বিরহ-বেদনা, সেইখানেই আমাদের গান কি সব চেয়ে বেশি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে নি? গুরুদেবের সংগীত-জগৎটাও মূলত বিচিত্র ও গভীর বেদনার প্রকাশ। তিনি ছিলেন উচ্চস্তরের একজন মরমী কবি। তাই বেদনার প্রকাশই তাঁর গানের প্রধান বিষয়। সংগীতে এ পথে গুরুদেব সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়। ভারতীয় সংগীতের জগতে প্রকৃত সংগীতজ্ঞের এইটি হল মূল পরিচয়। এই পথের সন্ধান না পেয়ে কোনো ভারতীয়ের পক্ষে সংগীতে বড়ো স্রষ্টা হওয়া সম্ভব নয়। যাঁর যতখানি এ দিক থেকে বেদনা প্রবল, তাঁরই সাধনা ততখানি সার্থক হবে। সুতরাং ভারতীয় সংগীতকে যখন বুঝতে চেষ্টা করব তখন স্রষ্টা বা রচয়িতা গানের সাহায্যে মানুষের কোনো উপকার করতে চেয়েছেন কি না, কিম্বা গানের দ্বারা রচয়িতা কোনো বিশেষ সুরের ও ঢঙের পরীক্ষা করায় তাঁর পরবর্তী সংগীতজ্ঞদের কতটুকু উপকার বা অপকার করলেন, এ ভাবে দেখলে চলবে না। এগুলো হল

গৌণ। এই গৌণকে বড়ো করে দেখলে গুরুদেবকে সংগীতের ক্ষেত্রে ঠিক যাচাই করা যায় না। আবার সুরকার বা সংগীত-রচয়িতা বলে তাঁর পরিচয়কে যখন ধরতে চেষ্টা করি তখনও তাঁর প্রতি ঠিক বিচার করি না। যদিও তিনি প্রথম-জীবনে সংগীত চর্চা করেছিলেন বড়ো ওস্তাদের কাছে, তবুও অন্যান্যদের মতো সংগীতে বড়ো পণ্ডিত তিনি কোনোদিন হন নি। নূতন কিছু করতে হবে বলেই তিনি গান লিখতে বসেন নি। বাইরের তাগিদে নয়, আত্মপ্রচার বা সম্মানের আকাঙ্ক্ষায় নয়, কেবল সংগীতের অন্তর্নিহিত প্রেরণা ও অন্তরের গভীর আনন্দানুভূতি থেকে তাঁর এই সংগীতের প্রকাশ। এইজন্যেই তাঁকে সাধক বলি। তাই তাঁর সংগীতে আমরা পাই সৃষ্টির পরিচয়। তাঁর কাছে সুরের আবেগ যে কত গভীর ও তীব্র, তা সেই বুঝেছে যে তাঁর সঙ্গে এই দিক থেকে একটুকুও সংস্পর্শে এসেছিল। নিজেকে তিনি সুরের মধ্যে কী ভাবে হারিয়ে ফেলেন, তা তাঁর একটি লেখা থেকে এখানে তুলে দিচ্ছি—

"গুন্ গুন্ স্বরে ভৈরবী তোড়ী রামকেলী মিশিয়ে একটা প্রভাতী রাগিণী সৃজন করে আপন মনে আলাপ করছিলুম, তাতে অকস্মাৎ মনের ভিতরে এমন একটা সুতীব্র অথচ সুমধুর চাঞ্চল্য জেগে উঠল, এমন একটি অনির্বচনীয় ভাবের আবেগ উপস্থিত হল, এক মুহূর্তের মধ্যেই আমার এই বাস্তব জীবন এবং বাস্তব জগৎ আগাগোড়া এমন একটি মূর্তি-পরিবর্তন করে দেখা দিল, অস্তিত্বের সমস্ত দুরূহ সমস্যার একটা সংগীতময় ভাবময় অথচ ভাষাহীন অর্থহীন অনির্দেশ্য উত্তর কানে এসে বাজতে লাগল..."

একটি রচনায় আছে—

আমার আপন গান আমার অগোচরে
আমার মন হরণ করে,
নিয়ে সে যায় ভাসায়ে
সকল সীমারই পারে ॥

আর-একটি লেখায় বলেছেন—

"গান লিখতে যেমন আমার নিবিড় আনন্দ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। এমন নেশায় ধরে যে, তখন গুরুতর কাজের গুরুত্ব একেবারে চলে যায়, বড়ো দায়িত্বের ভারাকর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়, কর্তব্যের দাবিগুলোকে মন এক ধার থেকে নামঞ্জুর করে দেয়।" এতখানি গভীর অনুভূতি তাঁর অন্তরে যে তিনি সময় সময় নিজেকেই মনে করে বসেন একটি বহু-তার-বিশিষ্ট যন্ত্রবিশেষ, যেন বেজেই চলেছেন আপনা হতে নানাভাবে। যে সত্যদৃষ্টির জন্যে মানুষ যুগে যুগে সাধনা করেছে গুরুদেব সেই সত্যদৃষ্টি লাভ করেন গানের সাহায্যে। তিনি বলেন, "গানের সুরের আলোয় এতক্ষণে সত্যকে দেখলুম। অন্তরে সর্বদা এই গানের দৃষ্টি থাকে না বলেই সত্য তুচ্ছ হয়ে সরে যায়।...সুরের বাহন সেই পর্দার আড়ালে সত্যলোকে আমাদের নিয়ে যায়, সেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় না, সেখানে যাবার পথ কেউ চোখে দেখে নি।" এই সত্যে উপনীত হতে পেরেছেন বলেই আজ তিনি সংগীতে দেশে একটি নূতন যুগ প্রবর্তন করতে পেরেছেন।

রচনার বিচার করে ভারতীয় সংগীত-সাধকদের তিন দলে ভাগ করা চলতে পারে—এক দল আছেন, যাঁদের রচনায় সুরের চেয়ে কথার প্রাধান্য বেশি, সুর তার আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। দ্বিতীয় দলের মন কেবল সুরের আনন্দেই ভরপুর, তাঁরা বৈচিত্র্য এনেছেন কেবল ঐ দিক থেকেই, তাঁদের কাছে কথা বিশেষ স্থান পায় নি, কারণ তাঁরা সুরের ভিতর দিয়ে কথার অতীতকে অনুভব করেন। শেষ দলের সাধকরা সুর ও কথার মিলনে সংগীত রচনার পক্ষপাতী, এ'দের কাছে উভয়েরই তুল্য প্রয়োজন আছে। এই দলের প্রাধান্য বাংলাদেশেই বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায়। গুরুদেব হলেন এই শ্রেণীর।

কতবার দেখেছি গুরুদেবের অন্তরে যখন গানরচনার প্রেরণা জাগত তখন তার কী বেগ, একটার পর একটা গান তৈরি করে চলেছেন। কখনো এক দিনে অনেক-গুলি গান রচনা করেছেন। গানের সুর ঠিক রাখবার জন্যে কখনো তাঁর বাজনার প্রয়োজন হয় নি, বা রাগিণী ঠিক রাখবার জন্যে কখনো রাগরাগিণী ভাঁজেন নি। সুর যে কোথা থেকে ছাড়া পেয়ে যেমন খুশি ছুটে আসতে থাকে তা কে জানে। দেখা গেল, অল্প বয়সে শেখা রাগরাগিণী তার নির্ভর, কিন্তু সে সুর যখন গানের সঙ্গে বাইরে প্রকাশ পেল তখন দেখা যায় তার সম্পূর্ণ নূতন রূপ। কথা ও সুরের মিলনে যে রূপটি খাড়া হল তাতেই তিনি খুশি। অনেক সময় সুরগুলি যেমন অপ্রত্যাশিত ভাবে আসে তেমনি আবার কাজ শেষ হয়ে গেলেই তাঁর মন থেকে চলে যায়। গানরচনার সময় সুরগুলি যে হুবহু প্রচলিত শাস্ত্রানুযায়ী আসছে তাও নয়। তা নিয়ে তিনি কোনোদিন লজ্জিত নন, এবং শোধরাবার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। কত মধ্যরাত্রে, ঘুমের মধ্যে সহসা এক সুরের ধ্বনি তাঁর অন্তরে আঘাত করেছে—কোথায় ভেসে গেছে নিদ্রা। সেই হঠাৎ-পাওয়া সুরকে বাণীতে ছন্দেতে যতক্ষণ না ধরে রাখতে পেরেছেন, ততক্ষণ তাঁর আর সোয়াস্তি নেই। যদি কোনো কারণে সে সুর হারিয়ে গেল, তবে তার জন্যে কী তীব্র বেদনাই না মনে জেগেছে। বাদলা দিনে তাঁর মনের শিখরদেশে প্রায়ই সুরের মেঘ ঘনিয়ে আসত। তখন হৃদয়ের মধ্যে শুরু হ'ত তাঁর পেখম-তোলা ময়ূরের নাচ। সকালের কাঁচা রোদে কিসের বেদনায় তাঁর মন চঞ্চল হয়েছে এবং গানে তা ফুটে বেরিয়েছে। শরতের শুভ্র সৌন্দর্যে ভরপুর বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর প্রাণে যে বেদনা জাগিয়েছে, প্রকাশ পেল তা শরতের গানে। শীতের ভিতরে যে মৃত্যুর ছায়া আছে, সেও তাঁর চিত্তে গানের দোলা দিল। বসন্তের আনন্দে তিনি তো একেবারে পাগল, কত রূপে তার প্রকাশ আমরা আজ পাচ্ছি তাঁর বসন্তের গীতিগুচ্ছে। গ্রীষ্মের রুদ্র-কঠোরতা তাঁর কাছে বৈরাগীর গানের মতো মনে হয়। গভীর অন্ধকারে পূর্ণিমায় সন্ধ্যায় প্রত্যূষে ও অপরাহ্ণের ভিতর বিশ্বসংগীতের আনন্দ আহরণ করেছেন। গুরুদেবের প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার নিয়ম ছিল খুব বাঁধা। সেই মানুষই গানের প্রেরণায় নিয়মকে সম্পূর্ণ ভাসিয়ে দিয়েছেন।

তিনি মানুষের কোলাহলময় হাটে কোলাহলের মধ্যেই পূজার গীত শুনেছেন। তাঁর কাছে আকাশের তারায় সংগীত—বিরাট সুদূরের মধ্যেও তিনি কী-এক উদাস-করা সংগীত শুনেছেন। ঘনবর্ষার জলধারার আঘাতে পুলককম্পিত পাতাগুলির

শব্দে তিনি এক বীণকারের অঙ্গুলিঘাত লক্ষ করেন। বর্ষার প্রচণ্ড গর্জনে তাঁর মনে ভাসে বাঁশির সুর। তাঁকে মৃত্যুপথের পথিক গান গাইতে বলে—পূর্ণতার গান, আনন্দের গান। বনের মর্মরে, নদীর কল্লোলে, সকলের ভিতর থেকেই তিনি বিশ্বের বিরাট সংগীতের অনুভূতি লাভ করেছেন।

সংগীতে-গাঁথা এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বকে এত দিক থেকে এত সুন্দর ও নিবিড় ভাবে অনুভব করে প্রকাশ করতে আর-কোনো পূর্ববর্তী সাধককে দেখা যায় নি। তিনি শান্তিনিকেতনে তাঁর প্রিয় ছাত্রদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "যেখানে বীণা শুধু বীণা সে বস্তু মাত্র— কিন্তু যেখানে বীণায় সংগীত ওঠে, সেখানে বীণার পিছনে আমাদের ওস্তাদজি আছেন। সেই ওস্তাদজির আনন্দই গানের ভিতর দিয়ে আমাদের আনন্দ দেয়। সৃষ্টির বীণা তো ওস্তাদজি বাজিয়ে চলেছেন, কিন্তু আমাদের নিজের চিত্তের বীণাও যদি সুরে না বাজে তা হলে আমাদের হৃদয়-বীণার ওস্তাদজিকে চিনব কী করে? তাঁর আনন্দরূপ দেখব কী করে? না যদি দেখি তা হলে কেবল বেসুর কেবল ঝগড়া বিবাদ, কেবল ঈর্ষা বিদ্বেষ, কেবল কৃপণতা স্বার্থপরতা, কেবল লোভ এবং ভোগের লালসা। আমাদের জীবনের মধ্যে যখন সংগীত বাজে তখন নিজেকে ভুলে যাই। আমাদের জীবনযন্ত্রের ওস্তাদজিকেই দেখতে পাই। তখন দুঃখ আমাদের অভিভূত করে না, ক্ষতি আমাদের দরিদ্র করে দেয় না, তখন ওস্তাদজির আনন্দের মধ্যে আমাদের জীবনের শেষ অর্থটি দেখতে পাই। সেইটে দেখতে পাওয়াই মুক্তি।"

শিক্ষাব্যবস্থায় সংগীত

গুরুদেবের জীবনের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন, তিনি শৈশবে কলিকাতার এক বিদ্যালয়ে অল্প দিনের জন্যে যোগদান করে পরে আর সেখানে যেতে চান নি এবং কখনো যান নি। তার কারণ তিনি বলেছেন যে, ভারতে এ যুগের শিক্ষাপদ্ধতির ভিতর এমন একটি নিরানন্দ আবহাওয়া ও ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে যা তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারেন নি।

পরিণত বয়সে যখন তাঁর পুত্রের শিক্ষার কথা তাঁকে ভাবতে হল, তখন উপায় খুঁজতে গিয়ে তিনি দেখলেন প্রাচীন ভারতের তপোবনের শিক্ষার আদর্শই হল আমাদের দেশের বালকবালিকাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তপোবনের শিক্ষা-পদ্ধতিতে আছে, "এক দিকে গুরুগৃহবাসে দেশের শুদ্ধতম উচ্চতম সংস্কৃতি, এক দিকে অরণ্যবাসে দেশের উন্মুক্ত বিশ্বপ্রকৃতি।"

অরণ্যবাসে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল, "বিরাট ও বিচিত্র আনন্দের উৎস এই বিশ্ব-প্রকৃতি যেন প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের দেহমনে শিক্ষাবিস্তার করে, তাই আমরা দেখি জলে স্থলে আকাশে তাঁর ক্লাস খুলে আমাদের মনকে প্রবল শক্তিতে গড়ে তোলার চেষ্টা। এইভাবে যখনই আত্মার পূর্ণতা বিকাশ লাভ করেছে, তখনই কথায় সুরে রেখায় বর্ণে ছন্দে মানবসম্বন্ধের মাধুর্যে আপন আনন্দের সাক্ষ্যকে অমর বাণীতে স্বাক্ষরিত করতে চেয়েছে মানুষ।"

শিক্ষার এই মূল সত্যটিকে এ যুগে আমাদের দেশের শিক্ষাপদ্ধতি থেকে একেবারেই বাদ দেওয়া হয়েছে। তাই আনন্দের সঙ্গে শিক্ষার যোগ এত বিচ্ছিন্ন।

যখন শিলাইদহের জমিদারিতে তিনি নির্জনে নানাপ্রকার বিষয়কর্মে ও আপনার কাব্যচিন্তায় মগ্ন তখন তিনি পুত্রকন্যা সকলকেই নিয়ে রেখেছিলেন তাঁর কাছে। ইচ্ছা ছিল নির্জন পল্লীপ্রকৃতির আবেষ্টনে তাদের শিক্ষা পরিপূর্ণ হোক। শোনা যায় আত্মীয়স্বজন অনেকেই তাঁর এই উদ্দেশ্যকে খামখেয়ালী মনের পরিচয় বলে মনে করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁদের আপত্তিকে গ্রাহ্য করেন নি।

শিলাইদহে যখন তিনি এইভাবে শিক্ষাপদ্ধতির এক অভিনব পথের সন্ধানে মগ্ন, তখন তাঁর অন্তরে হঠাৎ এক ডাক এসেছিল, তিনি মনে করেছিলেন, এই মহৎ কাজের গণ্ডি কি কেবল তাঁর নিজের পরিবার নিয়েই? এই প্রেরণার ফল-স্বরূপ আমরা বোলপুরের নির্জন মাঠের মাঝে দেখলাম শান্তিনিকেতনের আশ্রমটিকে।

আত্মার পূর্ণতাকেই আমরা সংস্কৃতি বলি। সংস্কৃতির রূপ নানা বিচিত্রতার ভিতর দিয়ে ফুটে ওঠে। "তাতে মানবমনের সংস্কার সাধন করে, আদিম খনিজ অবস্থার অনুজ্জ্বলতা থেকে তার পূর্ণ মূল্য উদ্ভাবন করে নেয়। এই সংস্কৃতির নানা শাখা-প্রশাখা। মন যেখানে সুস্থ সবল, মন সেখানে সংস্কৃতির এই নানা প্রেরণাকে আপনিই চায়।" এই কারণে শান্তিনিকেতন আশ্রমে অন্যান্য বিদ্যালয়ের মতো শিক্ষার সংকীর্ণ সীমাকে তিনি তুলে দিয়ে সাধারণ পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষা

ছাড়াও সকলরকম কারুকার্য নৃত্য-গীত-বাদ্য নাট্যাভিনয় ও পল্লীহিত-সাধনের আয়োজন করলেন।

গুরুদেব নিজে এই সংস্কৃতির একটি পূর্ণ মূর্তি। বৈচিত্র্যময় বিশ্বের সুসংগত সৌন্দর্যময় প্রকাশের যিনি কারণ, তিনি যেন গুরুদেবের জীবনেও সেই পরীক্ষা চালিয়েছেন। গুরুদেব চেয়েছেন তাঁর দেশের সন্তানরা তাঁর মতোই পূর্ণতর মানুষ-রূপে গড়ে উঠুক।

প্রায় চল্লিশ বৎসরেরও আগে শান্তিনিকেতন যখন স্থাপিত হয় তখন ভারতে আর-কোথাও এ ধরনের বিদ্যায়তন স্থাপিত হয় নি যেখানে অভিনয় সংগীত ও নৃত্যকে প্রতিদিনের শিক্ষার একটি বিশেষ অংগ বলে ধরা হয়েছে। তখন কেউ ভাবতে পারে নি যে, শিক্ষার্থীর জন্য নৃত্য ও গীতের কোনো স্থান হতে পারে। তাদের চোখে ভেসেছিল তপোবনের সাধনার কঠোর শুষ্ক নিয়মের দিকটাই. আনন্দের ও সরসতার দিকটা নজরেই পড়ে নি।

এই কথা চিন্তা করেই বিশ্বভারতী স্থাপনের পূর্বে তিনি বলেছিলেন. "সংগীত এবং ললিতকলাই যে জাতীয় আত্মবিকাশের প্রকৃষ্ট উপায় এ কথার পুনরুল্লেখ করাই বাহুল্য। যে জাত এ দুটি বিদ্যা থেকে বঞ্চিত তারা চিরমৌন থেকে যায়।" আর বলেছেন, "শিক্ষার এইরূপ সংকীর্ণতার মধ্যে আমাদের জীবন ক্রমে বিকলাংগ হয়ে পড়েছে। অতঃপর একে প্রশ্রয় দেওয়া কোনো মতেই আর উচিত হবে না। আমরা এই যে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করছি সেখানে সংগীত এবং ললিতকলাকে সম্মানের আসন দিতে হবে।" এবং "এইরূপে আমাদের রসবোধ এবং রুচির আদর্শ যথার্থ রূপে গঠিত হয়ে উঠবে। তা হলেই আমাদের সংগীত এবং শিল্পকলা সৌন্দর্যে এবং সম্পদে বিকশিত হয়ে উঠবে। তখন আমরা বিদেশী কলাকে সত্য এবং সংযত ভাবে বিচার করবার ক্ষমতা লাভ করব এবং তখন তা থেকে ভাব এবং রূপ গ্রহণ করলেও আমরা পরস্বাপহরণের অপবাদভাজন হব না।"

শান্তিনিকেতনের কোনো অধ্যাপককে গুরুদেব লিখেছেন, "আমাদের বিদ্যালয়ে আজকাল গানের চর্চাটা বোধ হয় কমে এসেছে, সেটা ঠিক হবে না; ওটাকে জাগিয়ে রেখো। আমাদের বিদ্যালয়ের সাধনার নিঃসন্দেহ ওটা একটা প্রধান অংগ। শান্তি-নিকেতনের বাইরের প্রান্তরশ্রী যেমন অগোচরে ছেলেদের মনকে তৈরি করে তোলে তেমনি গানও জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলবার একটা প্রধান উপাদান।...ওরা যে সকলে গাইয়ে হয়ে উঠবে তা নয় কিন্তু ওদের আনন্দের একটি শক্তি বেড়ে যাবে, সেটাতে মানুষের কম লাভ নয়।"

শান্তিনিকেতনের অন্যান্য বিদ্যার সংগে গীতবাদ্য নৃত্যকলার সমাবেশের এই হল মূল কারণ।

বিশ্বপ্রকৃতির নব নব সৌন্দর্যের ভিতরে বর্ধিত হয়ে শান্তিনিকেতনের বালক-বালিকারা যে আনন্দ লাভ করছে, সেই নির্মল আনন্দকে জিইয়ে রাখবার বা ক্রমবর্ধিত করবার উদ্দেশ্যেই গুরুদেব এমন ধরনের গান রচনা করলেন, যা পূর্বে ভারতে কেউ ভাবে নি। নাটক গীতিনাট্য বা নৃত্যনাট্য রচনা করেছেন আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের প্রতি লক্ষ রেখে।

সাধারণত গান ও নাচ তৈরি করা হয় পরিণত বয়স্কদের মনোভাব অবলম্বন করে, অর্থাৎ যৌবন থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত মানুষের মনের নানাবিধ মতিগতির দিকে তাকিয়ে। গানে ও নাচে বয়স্কদের মনে যে রসের সঞ্চার করে, শিশুদের মনে নিশ্চয় তা হয় না। গুরুদেব এই শিশুদের মনের কথা ভেবেও গান রচনা করেছেন। চেয়েছেন বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দের কেন্দ্রে যেন তারা নাচ গান ও অভিনয়ের সাহায্যে পৌঁছুতে পারে। এগুলি হল আনন্দলোকে মনকে উত্তীর্ণ করার বড়ো অবলম্বন।

অতি প্রত্যুষে সূর্যোদয়ের পূর্বে পৃথিবী যখন শান্ত তখন প্রভাতের রাগিণীতে ছাত্রছাত্রীরা জাগরণের গানে আশ্রমের ঘুম ভাঙায়, সে জাগরণের আনন্দ যে কী তা কে বলে দেবে? দিনের কর্মারম্ভে গান, আবার সমস্ত দিনের কর্ম-কোলাহলের ক্লান্তিকে এক মুহূর্তে সরিয়ে দেয় নীরব রাত্রের বা পূর্ণিমা রাত্রের বৈতালিক গানে। উৎসবে, আনন্দ-অনুষ্ঠানে, ঋতুর নব নব পর্যায়ে সংগীতে ও নৃত্যে শান্তিনিকেতন মুখরিত ও সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। এই গীতবাদ্য-নৃত্যের মধ্য দিয়েই এখানকার বিশিষ্ট আবহাওয়া এত সহজে গড়ে উঠেছে।

পরিপূর্ণ শিক্ষায় নানা প্রকার কলার প্রয়োজনটিকে গুরুদেব খুবই বড়ো করে দেখতেন। তাই বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা যখন প্রথম দেশবাসীর কাছে প্রকাশ করেন তখন তার কার্যসূচীর কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন, "বিশ্বভারতী যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতীয় সংগীত ও চিত্রকলার শিক্ষা তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে এই আমাদের সঙ্কল্প হউক।"

যাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টা গুরুদেবের এই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করতে সহায়তা করেছে, এই প্রসঙ্গে তাঁদের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

গানে ও অভিনয়ে গুরুদেবের প্রধান সহায় ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ। তিনি গুরু-দেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এ দুটি কলাকে আশ্রমের এতখানি অন্তরলোকে পৌঁছে দিয়েছেন।

শিল্পাচার্য নন্দলালের প্রতিভা বিশ্বের চিত্ররসিক সমাজে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত, কিন্তু তাঁর সৃষ্টির প্রতিভা যে কত বিভিন্নমুখী সে কথা হয়তো সাধারণের অগোচর। তাঁর সৃজনশক্তি চিত্রপটেই নিঃশেষিত নয়। শান্তিনিকেতনের অভিনয় উৎসব ও নানা অনুষ্ঠানের সাজসজ্জা রূপ ও রঙ তাঁর হাতে যে অভিনবত্ব লাভ করেছে, তা আমাদের দেশের গৌরবের বস্তু। বাইরে থেকে এ বিষয়ে লোকে শিল্পাচার্যের কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় পায় না। লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি কাজ করে গেছেন। আজ এই রূপসজ্জার দিক থেকে যে একটি বিশেষ রুচির পরিচয় পাচ্ছি শান্তিনিকেতনের যাবতীয় আনন্দের আয়োজনে, এক কথায় এর প্রবর্তন করেছেন শিল্পাচার্য নন্দলাল। তারই ফলে কেবল শান্তিনিকেতনে নয়, সমগ্র বাঙলাদেশে ধীরে ধীরে এ দিক থেকে জনসাধারণের রুচি যে বদলাচ্ছে, তাও প্রত্যক্ষ করছি। সেই ধারাকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বহন করেছিলেন শিল্পী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-নাথ কর।

ছাত্রীদের মধ্যে নৃত্যকলার প্রসারে শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর চেষ্টা গুরুদেবকে

বিশেষ সাহায্য করেছিল।

এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, এখানে কালোয়াৎ তৈরির কারখানা স্থাপিত হয় নি। অংগকে দেহ থেকে ছিন্ন করলে যেমন তার জৈব ক্রিয়ার অবসান ঘটে তেমনি সংগীতকলাকে যদি সাংস্কৃতিক দেহ থেকে ভিন্ন করা হয়, তবে সেও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং সংস্কৃতির অঙ্গহানি ঘটে।

শিল্পী-মন ও বাস্তব-জীবন

গুরুদেবের কর্মবহুল জীবনের ধারা ছিল বিচিত্র। যাঁরা কেবল তাঁর এই বিচিত্র কর্মজীবনের বাইরের প্রকাশ—নানারূপ কাজ, সাহিত্য, চিত্র, সংগীত ইত্যাদির সাহায্যে তাঁকে জানতে চেয়েছেন, তাঁরা দেখেছেন কেবল তাঁর জ্ঞানের, রসের, অমৃতের দিকটা, কিন্তু এর আবির্ভাবের মূলে যে মন্থনের ইতিহাস আছে তার খোঁজ পেলে গুরুদেবের প্রকৃত স্বরূপটি ধরা পড়ে। তা ছাড়া তিনি যে কী অমানুষিক শক্তি নিয়ে জন্মেছিলেন তা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাঁর কাব্য সাহিত্য গান ইত্যাদির ভিতর দিয়ে তাঁকে জানবার চেষ্টা করতে গিয়ে অনেকের মনে স্বভাবতই এই কথাই বার বার জাগে যে, তিনি কেবল সুন্দরের উপাসক ছিলেন, যেন বাস্তব জগতের নীরস মলিন আবহাওয়া একেবারেই তাঁকে ছুঁতে পারে নি—পারলেও তিনি আপনাকে নিশ্চয়ই বাঁচিয়ে চলেছেন; তাই তাঁর জীবনে সুন্দরের আরাধনা এত সফল।

এই পৃথিবীতে ভালোভাবে বেঁচে থাকবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা থেকেই মানুষ যুগ যুগ ধরে নানাভাবে কঠোর পরিশ্রম করে আসছে এবং তার এই বিপুল কর্মশক্তির মূল প্রেরণা এইখানে। আবার ঠিক সেই সঙ্গে এই কর্মবহুল জীবনের ক্লান্তি থেকে মনকে কিছুক্ষণের জন্যে আর-এক রসের লোকে নিয়ে গিয়ে তাকে বিশ্রাম দেওয়া, তার ক্লান্তি দূর করবার আকাঙ্ক্ষাও মানুষের প্রবলভাবে দেখা গিয়েছে। সাঁওতালদের কর্মজীবনের নীরসতার কথা না বলাই ভালো। কিন্তু তাদের মতো সংগীতপ্রিয় জাত খুবই কম দেখা যায়। তাদের গানের ভাষা আলোচনা করে দেখেছি, তাদের দৈনন্দিন জীবনের কঠোরতার কোনো কথা তাতে পাই না। সেখানে তাদের অমার্জিত সহজ মন থেকে প্রকাশ পায় কর্মক্লান্ত নীরস মনকে সরসতায় পূর্ণ করে তোলবার উপযোগী গান। এই একই মনোবৃত্তি, গ্রাম্য-জীবনে চাষী মাঝি গাড়োয়ান ইত্যাদি গ্রামের লোকেরা যে গান রচনা করে বা গায় তাতে প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে তাদের দুঃখ দারিদ্র্যের কথা সাধারণত থাকে না। এদের দুঃখের জীবন নিয়ে গান লেখে সেই সব শিক্ষিত কবি বা গাইয়েরা যারা এদের জীবনের সত্য পরিচয় কিছুই পায় না।

মানবমনের এই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা গুরুদেবের কাব্য সাহিত্য সংগীত ইত্যাদিতেও প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি মানবজীবনের কর্মক্লান্ত চিত্তকে রসলোকে উত্তীর্ণ করে আরো উন্নততর মানবসমাজ রচনা করতে চেয়েছেন। মূলের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে যেমন কোনো গাছ বেঁচে থাকতে পারে না, যতই সে আলো-বাতাস পাক না কেন। গুরুদেব চারি দিকের নীরস বাস্তবতার মধ্যে বাস করেই তবে আলোবাতাসের সন্ধান দিতে চেষ্টা করেছেন। কেবল আলোবাতাসের চর্চা করলে, বিচিত্র পুষ্পে পল্লবে বর্ধিত এত বড়ো গাছের সুশীতল ছায়ায় শ্রান্তি দূর করবার সুবিধা আজ আমাদের ঘটত না।

তাঁর শান্তিনিকেতনের শিক্ষার আদর্শের মধ্যেও উক্ত মনোভাবের সমর্থন পাব। সাধারণ দেশপ্রচলিত শিক্ষানীতি গাছের সঙ্গে মাটির যোগটাকেই একমাত্র করে দেখেছিল। গুরুদেব বললেন এবং দেখাতে চাইলেন যে, শিক্ষাক্ষেত্রে মাটির রসের

যেমন প্রয়োজন, মুক্ত আকাশ বাতাস ও আলোর প্রয়োজন তেমনি। কোনোটাই জীবনের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় নয়। এই শিক্ষানীতিকে সামনে রেখে শান্তিনিকেতনে তিনি যেমন নাচ গান অভিনয় ও নানাপ্রকার ললিতকলার আয়োজন করলেন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে, তাকেই দেশের সামনে ধরবার ইচ্ছায় তাঁর ছাত্রছাত্রীদের নাচ-গানের নানা অনুষ্ঠান তিনি শান্তিনিকেতনের বাইরেও নানা স্থানে করালেন। যদিও প্রথমে আমাদের দেশের জনসাধারণ এই শিক্ষানীতিকে ভালো চোখে দেখে নি. কিন্তু পরে তা সয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের এই নিরুদ্ধ মনোভাবের প্রতিবাদ তিনি তাঁর একটি চিঠিতে পরিষ্কার ভাবে করে গেছেন। ১৯২৯ সালে, যখন শান্তিনিকেতনে নৃত্য-আন্দোলন অনেকখানি এগিয়ে গেছে তখন একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্ ও পণ্ডিতকে তিনি লিখছেন—

"প্রকাশই আমার স্বধর্ম—প্রকাশের প্রেরণাকে অবরুদ্ধ করা আমার পক্ষে ধর্ম-বিরুদ্ধ। আমার প্রকৃতিতে এই প্রকাশের নানা ধারার উৎস আছে—তাদের যেটাকেই আমি অগ্রাহ্য করব সেটাতেই আমার খর্বতা ঘটবে। প্রকাশ আর ভোগ এক জিনিস নয়—প্রকাশের অভিমুখিতা বাইরের দিকে, বস্তুত সেটাতেই অন্তঃপ্রকৃতির মুক্তি, ভোগের অভিমুখিতা ভিতরের দিকে, সেইটেতে তার অবরোধ। আমার নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে তোমার মনে আপত্তি উঠেচে। কিন্তু নাটকরচনার মধ্যে যে প্রকাশ-চেষ্টা, অভিনয়ের মধ্যেও তাই। রচনার মধ্যেই যদি কলুষ থাকে সেটা নিন্দনীয়, অভিনয়ের মধ্যে যদি থাকে সেও নিন্দনীয়—কিন্তু অভিনয়-ব্যাপারের মধ্যেই আত্মলাঘবতা আছে এ কথা আমি মানি নে। আমার মধ্যে সৃষ্টিমুখী যতগুলো উদ্যম আছে তার প্রত্যেকটাকেই স্বীকার করতে আমি বাধ্য। তোমাদের অভ্যাস ও সংস্কারের বাধায় তোমরা যে দোষ কল্পনা করচ তার দ্বারা আমার চেষ্টাকে প্রতিরুদ্ধ করলে নিজের প্রতি গুরুতর অন্যায় করা হবে।"

কবির কাব্য, গীতকারের গান, শিল্পীর ছবি, নর্তকের নাচ, নাট্যকারের নাটক প্রকাশ পায় অন্তরের প্রেরণায়। কিন্তু তাঁদের মন চায়, যে আনন্দে তাঁরা এগুলি প্রকাশ করলেন, আর সকলেও সেই আনন্দটি উপভোগ করুক। শিল্পীর এই হল ধর্ম। গায়ক ছাড়া যেমন গানের প্রকাশ সম্ভব নয়, নাটকের প্রকাশ অভিনয় ও অভিনেতা ব্যতীত তেমনি অসম্ভব। নৃত্যাভিনয়কে দশজনের কাছে ধরতে হলে দশজনকে নিয়েই তার আয়োজন করতে হবে। তবে দর্শক তার পূর্ণ রসটি গ্রহণ করতে পারে। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই কারণেই গুরুদেবকে এই-সব নৃত্যাভিনয়ের আয়োজন করতে হয়েছিল। এবং দেশে দেশে তাদের নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন. তা কেবলমাত্র এই শিল্পী-মনের তাগাদায়। সুতরাং তাঁর এই কাজকে যদি ঠিকভাবে দেখতে পারি, তবে বোধ হয় দৃষ্টিকটু নাও লাগতে পারে। তিনি যে আনন্দে নৃত্যাভিনয় রচনা করেছিলেন, তাকে দশ-জনের সামনে ধরার আকাঙ্ক্ষা থেকেই এত ঘুরে বেড়ানোর আয়োজন। যদি তাঁর ভিতরে প্রকৃত শিল্পী-মনের প্রেরণা না থাকত, তবে অনায়াসে তিনি এই ভ্রমণের নানা ভাবনা চিন্তা আর কত রকমের শারীরিক পরিশ্রম থেকে রেহাই পেতেন। বৃদ্ধ বয়সে তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বাঙলাদেশের বাইরে নৃত্যাভিনয়ের দলকে নিয়ে যাবার পর শিক্ষাক্ষেত্রে তার

সুফল আজ সুস্পষ্ট। বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় নৃত্যগীত আজ যেভাবে সমাজের উচ্চস্তরে স্থান গ্রহণ করেছে গুরুদেবের চেষ্টা তার অন্যতম কারণ।

এ বিষয়ে সিংহলভ্রমণের কথা আজ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সিংহলবাসীরা—বিশেষত যাঁরা শিক্ষিত বা অর্থশালী—নিজেদের দেশের সংস্কৃতির প্রতি অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন। তাঁরা নিজের দেশের গান ও নাচের প্রতি একটুও মনোযোগ দিতেন না। ১৯৩৪ সালে গুরুদেবের সে দেশে সদলে ভ্রমণের পর, সিংহলীদের নিজেদের শিল্প সংগীত ও নৃত্যের প্রতি আগ্রহ যে বেড়ে গিয়েছিল তা দীর্ঘকালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছি। ইদানীং নিজের দেশের গান ও নাচের চর্চা প্রায় প্রত্যেক শিক্ষায়তনে অবশ্যক বলে গ্রহণ করা হয়েছে। ধনী, নির্ধন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত কোনো বংশের ছেলেমেয়েরাই বাদ পড়ে না। সেখানে শান্তিনিকেতনের আদর্শে বড়ো বড়ো শিক্ষায়তন হয়েছে। গুরুদেবের গানের হুবহু অনুকরণে নিজভাষায় গান, আর নাচ রচনা করা আজকাল সে দেশে খুবই চলেছে।

তবুও এই ধরনের শিক্ষামূলক ভ্রমণের শুভ দিকটা আমাদের দেশে সকলে নির্বিচারে গ্রহণ করে নি, ভ্রমণের বিরুদ্ধে আপত্তি দেশে বরাবরই ছিল। তাঁকে এইরূপ ভ্রমণ থেকে বিরত থাকতে বলা হত। শেষবয়সে গুরুদেব বাধ্য হয়েছিলেন জনসাধারণের ইচ্ছাকে মেনে নিতে, কিন্তু জানি তাঁর অন্তর এ বিষয়ে একটুও সায় দেয় নি। অর্থের দিক থেকে এই ভ্রমণের সফলতা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়। অর্থের প্রয়োজন না থাকলেও তাঁর মতো প্রকৃত শিক্ষাবিদ্ শিল্পীর মন এ কাজ না করে থাকতে পারত না। এই-সব ভ্রমণের সময় তাঁর জীবন খুব আরামে কাটত না। রাত্রিদিন তাঁর মাথায় ঘুরত অভিনয়ের বিষয়ে নানা চিন্তা। প্রতিদিন তার অদল-বদল হত। গান রচনা করতেন। আবার প্রত্যেক শহরের জনসাধারণের কাছে বক্তৃতা দিতেন। তাঁকে উপলক্ষ করে কত রকমের আয়োজনে তাঁকে উপস্থিত থাকতে হত, কত লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ যে হত তার ইয়ত্তা নেই। কখনো দেখেছি নিয়মিত কোনো শহরে ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন। সত্তর বৎসরের উপর যখন তাঁর বয়স তখনও তাঁর কর্মজীবনে কী পরিশ্রম ও জটিলতা। অথচ এর মধ্যে থেকেও তিনি ছিলেন মুক্ত। অসংখ্য বন্ধন-মাঝে যে মুক্তির স্বাদ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা তিনি তাঁর মধ্যজীবনে প্রকাশ করে-ছিলেন, কর্মজীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে, সে কথা কেবল কবিকল্পনা যে নয় তা নিশ্চয় করে বলা চলে। অসংখ্য কর্মের বন্ধন তাঁর মুক্তির সাধনায় তাঁকে বাধা দিতে পারে নি। নিজের জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে তাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন, বোধ হয় কৃতকার্যও হয়েছিলেন।

ভারতীয় সংগীতের প্রকৃতি ও বাঙলা গান

মানুষ পেয়েছিল সুর একদিন—তখন তার রূপ ছিল অতি সাধারণ পাখির ডাকের মতো দুয়েকটি সুরের উপর গঠিত। তাতেই সে তার সাংগীতিক মনোভাব প্রকাশ করত। তার পর পেল অল্প দুয়েকটি সুরের গঠনপ্রণালীর সাহায্যে মন্ত্রপাঠের সুর থেকে শুরু করে নানা দেশে নানা রাগিণীর পর রাগিণী। পরে দেখলাম, সেই রাগিণীকে গাইবার কত রকমের ঢঙ, পদ্ধতি, তার ব্যাকরণ, শাস্ত্র, দর্শন ইত্যাদি।

চিন্তায় জ্ঞানে কর্মে সাহিত্যে শিল্পে ও ধনে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার যে গৌরবময় পরিচয় পাই সংগীতেও তার পরিচয় কম নয়। সংগীত যে সচল ও প্রাণবান ছিল তার একমাত্র উদাহরণ হল যুগে যুগে ভারতীয় সংগীতে যে-সব বিভিন্ন পদ্ধতির উদয় সেগুলি। নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করতে পারি—হিন্দুস্থানী সংগীতে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, গজল, তেলেনা ইত্যাদি এবং নানাপ্রকার প্রাদেশিক সংগীতের নানা ঢঙ। এর মধ্যে দক্ষিণভারতের কর্ণাটি সংগীত একটি বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছে।

জ্ঞানবিজ্ঞানে, নানারূপ কর্মে ও ধনে ইয়োরোপ অনেকখানি অগ্রসর জাতিরূপে স্বীকৃত। ঠিক সেই পরিমাণে তাদের সংগীতও যে অগ্রসর হয়েছে, এ কথা নিশ্চয় বলা চলে। কিন্তু দেখতে হবে যে, সংগীতে তারা অগ্রসর হল কোন্ পথে—আমাদের সঙ্গে তাদের মেলে কি? তারা হার্মনি-সংগীতে যতটা অগ্রসর হয়েছে, কণ্ঠ ও যন্ত্রের একক সংগীতে সেরকম দেখি না। তারা বহু যন্ত্র বা কণ্ঠের সম্মেলনে রচিত সংগীতে অভ্যস্ত—স্বরসংযোগ ছাড়া একক কণ্ঠ বা যন্ত্রসংগীতের কথা আজকাল ভাবতেই পারে না। আমরাও তেমনি যন্ত্র ও কণ্ঠে একলা গান গেয়ে বা বাজিয়ে এমনি অভ্যস্ত হয়েছি যে হার্মনিসংগীতে আমাদের দেশ সত্যিকার আনন্দ পায় না। যন্ত্রে ও কণ্ঠে আজ পর্যন্ত ভারতে ইয়োরোপের প্রভাবে যে-সব সমবেত যন্ত্রসংগীত ও কণ্ঠসংগীত রচনা করার চেষ্টা হয়েছে, তার রূপে প্রকাশ পেয়েছে মাত্র একক সংগীতের সশব্দ সংস্করণ। ওদের ঠিক অনুকরণ করাও সম্ভব হয় নি, বা এখন পর্যন্ত ঐ পথে নতুন কোনো আবিষ্কারও হয় নি। তবে ঐ পথে নতুন কিছু করবার একটা শখ দেখেছি; কিন্তু প্রবল আকাঙ্ক্ষার অভাবে যতটুকুই রচিত হয়েছে তা সৃষ্টির পর্যায়ে পড়বার যোগ্য হয় নি।

ইয়োরোপ সংগীতে যে পথ গ্রহণ করেছে আমাদেরও সেই পথে যাওয়া উচিত, এরকম মনোভাব এক দলের মধ্যে স্থান পেয়ে থাকলেও সংগীতজ্ঞ ওস্তাদমহলে আজও তা দেখা দেয় নি। সম্মেলক সংগীত বা হার্মনি-সংগীত আমাদের দেশে নেই বলে আমরা সংগীতে পিছিয়ে আছি এরকম কথা যদি কারো মনে আসে, তা হলে ঠিক বিচার হল না বলে আমি মনে করব। তারা যেমন হার্মনি-সংগীতে কুশল আমরাও তেমনি একক কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে রাগ-রাগিণীর আলাপে, বিস্তারে, তানে গানে দক্ষ। ঠিক এই জিনিসটি তারা একলা পারবে বলে মনে করি না।

ইয়োরোপে সংগীতকে বলা হয় সেখানকার মানবসমাজের গান। অর্থাৎ তারা নাকি সংগীতে মানুষের জগৎকেই রূপ দেবার চেষ্টা করেছে। ভারতবর্ষ মানুষের

কর্মময় জীবনকে ভালো করে জেনেই সেই জীবনেরই আর এক দিকের কথা ভেবে সংগীতকে সেই দিক থেকে কাজে লাগিয়েছে। 'নিরুদ্যম অবকাশ' ভারতের আদর্শ ছিল না—চেয়েছিল কর্মের মধ্যেই শান্তি পেতে। সেইজন্যেই বলেছে, নিজের সুখ-সুবিধার কথা না ভেবে কাজ করে যাবে কর্মই জীবনের আদর্শ ব'লে। এই আদর্শগত পার্থক্যের জন্যেই ভারতের সংগীতে পাই একটি নিরাসক্ত কর্মজীবনের সুর, তা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেইজন্যেই কি আমরা দেখি নি যে, আমাদের দেশে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যুর পরেও তাকে উদ্দেশ করে গান গাওয়া হয়? কাঁদে গানের সুরে কথা ক'য়ে। সামাজিক নানা উৎসবের গান ছিল অচেছদ্য অঙ্গ। গানের সুরে ছিল লোকশিক্ষার ব্যবস্থা। গানের ভিতর দিয়ে সাধারণ ধর্মশিক্ষা থেকে শুরু করে অতি উচ্চস্তরের জ্ঞানের বাণী আমাদের দেশে যে ভাবে প্রচারিত হয়ে এসেছে এমন আর কোনো দেশে দেখা যায় না। এ দেশের ধর্মপ্রচারকেরা অনেকেই তাঁদের ধর্মমত প্রচার করেছেন গানে। ভিক্ষালাভের পক্ষে গানই হল ভিক্ষুকের প্রধান সম্বল। চাষী গাইছে, মজুর গাইছে, মাঝি গাইছে—তাদের নিজেদের মনের মতো গান। এইভাবে জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে গান, তা ভারতীয় সমাজের জন্যে নয় এ কথা কি বলতে পারি? এই-সব গানে কি ভারতীয় সমাজের প্রত্যেক স্তরের মনের বিকাশ লক্ষ করি না? যেহেতু ইয়োরোপের চলতি ধারার বা আদর্শের সঙ্গে মিলছে না, সেই হেতু একে কি বলা চলে অবাস্তব, বানানো?

আমার মতে ভারতের পক্ষে গান গাওয়াই হল তার সমাজজীবনের প্রাণের লক্ষণ। উভয় দেশেরই মানুষের প্রাণ সংগীতে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু ভিন্ন ধারায়। তার কারণ হল—তাদের সমাজচিন্তা চারি দিকের বিশ্বপ্রকৃতি, আমাদের সমাজচিন্তা ও বিশ্বপ্রকৃতির মতো ঠিক এক নিয়মে মনের উপরে ক্রিয়া করে না। তাই তাদের উপলব্ধ সংগীত যে ভাবে রূপ পেয়েছে, আমাদের সঙ্গে তা মেলে নি।

একটা বিষয়ে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, সংগীতের আদর্শ ও পথ সাধারণত প্রত্যেক জাতির জ্ঞান বা ধর্মচিন্তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এক আদর্শে বিকাশ লাভ করে। ইয়োরোপে গেটে শিলারের যুগেই বিথোভেনের মতো সংগীতরচয়িতা সম্ভব। ইয়োরোপের ধর্মসাধনা একার সাধনা নয়, সকলের একত্র মিলনে ঐ সাধনা। ওদের সমাজে বিশেষ দিনে বিশেষ সময়ের মধ্যে ধর্মচিন্তা বা চর্চা নিবন্ধ। সেইরকম যন্ত্রে ও কণ্ঠে বহুজনসম্মেলনে সংগীতচর্চায় ওরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। বহুজন-সমন্বয়ে ছাড়া সে গান শোনানো অসম্ভব। বিশেষ স্থান তার জন্য দরকার।

আমাদের দেশে ধর্মচর্চাকে একলার সাধনা বলা হয়। খেতে বসতে, উঠতে শুতে, ভ্রমণে, বিশ্রামে, আনন্দে, প্রতি দিনের কর্মে, ধর্মচর্চাকে এমনভাবে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে প্রত্যেক মানুষ যে কোনো অবস্থায় একলাই তার সাধনার পথে অগ্রসর হতে পারে। আমাদের দেশের গানও ঠিক সেইরকম ব্যক্তিকেন্দ্রিক। একলাই এর চর্চা ও সাধনায় মানুষ আনন্দ পেয়েছে।

এই জগতে আমরা দেখি সংগীতের দুটি মূলধারা। একটি হল কথাহীন সুরের সংগীত, অন্যটি কথা ও সুরের সহযোগে গান। ভারতের প্রাণে এ দুটি ধারাই সমান স্থান পেয়েছে এবং একটি অন্যের পরিপূরকও বটে। ইয়োরোপেও এই দুটি

ধারার ক্রমবিকাশ দেখি। কখনো একটা আর একটাকে খর্ব করে নি। কোনো একটিতে প্রাণহীনতার লক্ষণ প্রকাশ পেলেই দেখা গেছে অপরটিও মৃতপ্রায়।

সংগীতের আদিপরিচয় দেওয়া আজ সম্ভব নয়। মাটির স্তর দেখে ভূতত্ত্ববিদ্‌রা পৃথিবীর বয়স কত বলতে পেরেছেন সাহসের সঙ্গে। কবে প্রাণীজগতের আবির্ভাব হল, মানুষের সৃষ্টি হল, সে বিষয়েও সঠিক বলতে পেরেছেন বলে তাঁরা দাবি করেন। এই দাবির কারণ হল কতকগুলি বাহ্যিক প্রমাণ। কিন্তু সংগীতের ক্ষেত্রে বাহ্যিক প্রমাণও অসম্ভব। সে যুগের সুরের বাহ্যিক প্রমাণ মাটিচাপা পড়ে নেই যে খুঁড়ে বের করে তার উপর নির্ভর করে কিছু বলতে পারা যায়। তবে বুদ্ধি বিচার ও নিছক অনুমানের দ্বারা অনেকে আদিম মানুষের সুরজগতের কথা নির্ণয় করতে চেষ্টা ক'রে বলেছেন যে মানুষ আগে পেয়েছে সুর, কথা এসেছে তার পরে। তাঁরা এও মনে করেন যে মানুষ যেদিন কথা বলতে শিখল সেদিন থেকেই সে গাইতে গুরু করেছে। কথার সঙ্গে মিশে সুর অন্যরূপ গ্রহণ করলেও নিজস্ব রূপটিকে সে হারায় নি। তার প্রধান নমুনা হল যন্ত্রসংগীত, হিন্দুস্থানী কণ্ঠ-সংগীতের আলাপ; তানবিস্তারেও এ কথার সার্থকতা প্রমাণিত হয়।

কেবল সুরের সাধনার আর-একটি বিশেষ ও উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হল ইয়োরোপের সম্মেলক যন্ত্রসংগীত। তারই সাহায্যে বা তারই আবেষ্টনে গাওয়া কণ্ঠসংগীত। কেবল সুরের জগৎকে কত বিচিত্ররূপে খেলানো যেতে পারে ইয়োরোপ সে বিষয়ে প্রচুর নতুন নতুন উদ্ভাবনশক্তির পরিচয় দিয়েছে।

আর অপর দিকে কথা ও সুরের মিলনের নমুনাস্বরূপ ধরা যেতে পারে নানা ভাষার উচ্চ ও লোক-সংগীত। সাধারণভাবে আমাদের বিশ্বাস ও ধারণা, হিন্দুস্থানী কণ্ঠসংগীত কোনোদিনই গানে কথাকে বড়ো স্থান দেয় নি। তাদের কাছে সুরই প্রধান, কথাটি উপলক্ষ মাত্র। রাগিণীকে বাঁধবার জন্যে কতকগুলি শব্দ মাত্র তারা ব্যবহার করে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ মতে আস্থা রাখি না। এর কারণ কী তা বলি।

ওস্তাদরা হিন্দুস্থানী গানে কথাকে বড়ো করে দেখে নি, কিন্তু কথার অন্ত-র্নিহিত ভাবটিকে তারা গানে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে। হিন্দুস্থানী কণ্ঠসংগীতের মধ্যে এক আলাপ ও তেলেনা সংগীত ছাড়া আর সব ঢঙেই আমরা পাব অর্থপূর্ণ ছোটো ছোটো চারপঙ্‌ক্তি বা আটপঙ্‌ক্তির কথা। লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে, ভারতীয় হিন্দুস্থানী সংগীতে প্রকৃত স্রষ্টারা সকলেই প্রায় নিজেই কথাযুক্ত সংগীত রচনা করে গেছেন এবং সেই-সব গানের শব্দচয়নে খুব উঁচুদরের সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় না থাকলেও ভাবরসে তা পূর্ণ। সাহিত্যিক বিচারে সে কবিতার মধ্যে যে অভাবটুকু দেখা গিয়েছে রাগিণীর সাহায্যে তার পূরণ হয়েছে। এই-সব স্রষ্টারা সুরের রাজা ছিলেন বলেই সাহিত্যিক-ত্রুটিকে বড়ো করে দেখেন নি।

আমির খসরু নিজে ছিলেন খ্যাতনামা কবি। তাঁর গানের ভাষা ও ভাব ছিল উঁচুদরের। ধ্রুপদীয়া তানসেনের রচিত গানও এইরূপ ভাবসম্পদে পূর্ণ। পরবর্তী যুগে খেয়াল গানের প্রবর্তক সদারঙ্গ ও অদারঙ্গের রচনায় বহু ভালো ভালো গান পাওয়া যায় যা কবিত্বরসে সমৃদ্ধ। টপ্পা ঠুংরি ও গজলে প্রেমের, বিরহের, যে মধুর

একটি রস ব্যক্ত হয়েছে তারও কি মূল্য কম?

কিছুদিন আগে উত্তরভারতের অন্যতম বিখ্যাত একজন গায়কের মুখে ভৈরবীতে একটি ঠুংরী গান শুনেছিলেম ছোটো একটি আসরে। সেদিন তিনি গাইতে গাইতে হঠাৎ বলে উঠলেন যে লোকে বলে গাইয়েরা কথার বিষয়ে লক্ষ্য রাখে না, কিন্তু তাঁর মতে সে কথা ঠিক নয়। যে গানটি তিনি গাইছেন এর কথাকে বাইরের দিক থেকে বিচারে অতি সামান্য মনে হবে, কিন্তু ঐ সামান্য কথাগুলির ভিতর দিয়ে নায়িকার মনের যে একটি বেদনা প্রকাশ পাচ্ছে সেটা কি আসল কথা নয়? তিনি বলেছেন যে, গাইয়েরা ভৈরবীর সুরের মধ্য দিয়ে যদি সেই বেদনাটিকে ভালো করে প্রকাশ না করতে পারেন তবে এ গান গাওয়াই বৃথা। তাঁদের কাছে গানের কথার ঐখানেই মূল্য। প্রকৃত স্রষ্টারা হিন্দুস্থানী গানের এই আদর্শেই গান রচনা করেছেন ও গান গেয়েছেন। কথাকে তাঁরা একেবারে অর্থহীন শব্দরূপে কোনোদিনই ব্যবহার করতে চান নি। এ কাজটা সম্ভব হয়েছে ওস্তাদদের হাতে পড়ে। তাঁরা কথাটাকে উপলক্ষ করে সুরের ও ছন্দের যুদ্ধ করেছেন গানের ক্ষেত্রে। সংগীতস্রষ্টা ও ওস্তাদের মধ্যে সব সময় এই পার্থক্যটুকু সকলকেই মনে রাখতে হবে, এক ক'রে ফেললে চলবে না।

আমাদের দেশে কথা ও সুরের মিশ্রণে যে গান তারই প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য যন্ত্র-সংগীতের চেয়ে অনেক বেশি। যন্ত্রসংগীত স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ কিছু উন্নতি করে নি। আমাদের দেশে গানের প্রাধান্য এত বেশি কেন? এর উত্তরে গুরুদেবের ভাষায় বলব—

"কথা জিনিসটা মানুষেরই, আর গানটা প্রকৃতির। কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত। সেইজন্যে কথায় মানুষ মনুষ্যলোকের এবং গানে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মেলে। এইজন্যে কথার সঙ্গে মানুষ যখন সুরকে জুড়ে দেয় তখন সেই কথা আপনার অর্থকে আপনি ছাড়িয়ে গিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যায়—সেই সুরে মানুষের সুখ-দুঃখকে সমস্ত আকাশের জিনিস করে তোলে, তার বেদনা প্রভাত-সন্ধ্যার দিগন্তে আপনার রঙ মিলিয়ে দেয়, জগতের বিরাট অব্যক্তের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি অপরূপতা লাভ করে। তাই নিজের প্রতিদিনের ভাষার সঙ্গে প্রকৃতির চিরদিনের ভাষাকে মিলিয়ে নেবার জন্যে মানুষের মন প্রথম থেকেই চেষ্টা করছে।"

সংগীতের সাহায্যে মানুষ আপনার আনন্দময় স্বরূপকে দেখতে পায় বলে ভগবানে বিশ্বাসী যাঁরা তাঁরা বলেছেন, এর দ্বারাই ভগবানের পূজা, সান্নিধ্য সম্ভব। এবং তাঁদের 'নাদব্রহ্ম'-রূপ তত্ত্বকথা আমাদের কাছে আজ অর্থহীন হলেও তাঁদের কাছে তা ছিল অতিগভীর একটি সত্য। পূর্বপুরুষদের এই কথার মধ্যে কি কোনো সত্যই ছিল না? তাঁদের এই চিন্তাধারাকে বিনা বিচারে উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। তাঁরা জীবন দিয়ে যা অনুভব করে গেছেন আমরা এ যুগে তাকে বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে বা জানতে চেষ্টা করি ব'লেই এ-সব কথার কোনো অর্থ খুঁজে পাই নে। তাঁদের চিন্তাকে আমরা তাঁদের জীবনচর্যার ভিতর দিয়ে যদি না দেখি তবে যতই নৈয়ায়িকের মতো যুক্তিতর্ক দিয়ে তাঁদের স্বরূপ খাড়া করতে চাইব ততই তাঁদের

কথার মর্মে পৌঁছনো অসম্ভব হবে।

প্রকৃত স্রষ্টা কবি বা শিল্পী রচনা করেন এমন একটি মানসিক অবস্থার মধ্যে যে তাঁর সেই অনুভূতির সঙ্গে পাঠক ও দর্শক যতটা পরিমাণে নিজের জীবনের সুরকে বেঁধে নিতে পারবে ততটাই সেই কবিতা বা শিল্প তার কাছে প্রাণবান হয়ে উঠবে। জগতে বড়ো কবি বা শিল্পীদের জীবনচর্যার সঙ্গে জীবনাদর্শের কোনোদিন ভেদ দেখা দেয় নি। নিজের সৌন্দর্যের অনুভূতিকে জীবনচর্যার সাহায্যে উদ্‌বোধিত করার উদাহরণও বহু আছে।

সংগীতের ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথা। যে কোনো সংগীতের রস উপলব্ধি করতে গেলে নিজের জীবনকেও সংগীতস্রষ্টার রসানুভূতির সুরে বাঁধবার চেষ্টা করতে হবে। তা না পারলে সবই মনে হবে অর্থহীন। মনে রাখতে হবে সংগীতের যাঁরা স্রষ্টা তাঁদের কথাই আমি বলছি, যাঁরা ওস্তাদ তাঁদের কথা আমি বলছি না। ওস্তাদরা যে পরিমাণে নিজেকে স্রষ্টাদের রসানুভূতির পর্যায়ে তুলতে পেরেছেন সেই পরিমাণেই তাঁরা বড়ো ওস্তাদ বলে গৃহীত হয়েছেন।

তাই বলছিলাম, ভারতীয় সাধনায় 'নাদব্রহ্ম' তত্ত্ব বা সুর হচ্ছে ঐশ্বরিক শক্তির লীলা এ কথা বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয় যতক্ষণ না আমরা ভারতীয় সংগীতের ঐরকম সাধনার সঙ্গে নিজের অনুভূতিকে মেলাতে পারছি। নিজের জীবনচর্যাকে সংগীতের ঐ সুরে বাঁধতে না পারলে ভারতীয় সংগীতের এই মর্মলোককে কাল্পনিক বিলাস বলে মনে হবে। কিন্তু সুখের বিষয় এ যুগেও আমরা দু'একজন ওস্তাদ পেয়েছি যাঁরা সংগীতের ঐ তত্ত্বে নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন।

একজন বিখ্যাত যন্ত্রসংগীতজ্ঞের কথা জানি যিনি এ জগৎ থেকে বহুদিন হল বিদায় নিয়েছেন। শেষজীবনে শ্রোতাদের নিজের বাজনা শোনাবার দিকে তাঁর উৎসাহ বিশেষ ছিল না। প্রতিদিন মাঝরাতে নিজের বাড়ির ছাদে বসে প্রকৃতির নির্জন আবেষ্টনে তাঁর যন্ত্রে তিনি রাগরাগিণীর আলাপ করতেন ভোর পর্যন্ত; কোনো শ্রোতা সেখানে গিয়ে জ্বালাতন করতে পারত না। যাদের শোনবার উৎসাহ ছিল তারা শুনত ওস্তাদের বাড়ির সামনে রাস্তায় বসে। ওস্তাদের বিশ্বাস ছিল যে রাগিণীলোকের লীলাকে বিশ্বপ্রকৃতির এইরূপ নির্জন আবেষ্টনের মধ্যেই অনুভব করতে হয়। তা না হলে এর ভিতরকার প্রকৃত রসটি উপলব্ধি করা যায় না। ওস্তাদের এ কথা তারাই বিশ্বাস করবে যারা ভারতীয় সংগীতের এই রসটির সন্ধান কিছু রাখেন। এরকম আরো ওস্তাদের নজির দেখানো যেত কিন্তু তাঁদের কথা আর না ব'লে সংগীতের এই লীলা গুরুদেবের কাছে কিভাবে ব্যক্ত হয়েছিল তারই কথা বলব।

একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—

"আমি এপর্যন্ত কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারলুম না, সংগীত শুনলে মনের ভিতরে যে অনির্বচনীয় ভাবের উদ্রেক করে তার ঠিক তাৎপর্যটা কী। অথচ প্রত্যেক বারেই মন আপনার এই ভাবটাকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করে। আমি দেখেছি গানের সুর ভালো করে বেজে উঠলেই নেশাটি ঠিক ব্রহ্মরন্ধ্রের কাছে ধরে ওঠবা মাত্রই

এই জন্মমৃত্যুর সংসার, এই আনাগোনার দেশ, এই কাজকর্মের আলো-আঁধারের পৃথিবীটি বহুদূরে, যেন একটি পদ্মানদীর পরপারে গিয়ে দাঁড়ায়—সেখান থেকে সমস্তই যেন ছবির মতো বোধ হতে থাকে। আমাদের কাছে আমাদের প্রতিদিনের সংসারটা ঠিক সামঞ্জস্যময় নয়—তার কোনো তুচ্ছ অংশ হয়তো অপরিমিত বড়ো, ক্ষুধাতৃষ্ণা ঝগড়াঝাঁটি আরামব্যারাম টুকিটাকি খুঁটিনাটি খিটিমিটি এইগুলিই প্রত্যেক বর্তমান মুহূর্তকে কণ্টকিত করে তুলছে—কিন্তু সংগীত তার নিজের ভিতরকার সুন্দর সামঞ্জস্যের দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে যেন কী এক মোহমন্ত্রে সমস্ত সংসারটিকে এমন একটি পার্স্পেক্টিভের মধ্যে দাঁড় করায় যেখানে ওর ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী অসামঞ্জস্যগুলো আর চোখে পড়ে না—একটা সমগ্র, একটা বৃহৎ, একটা নিত্য-সামঞ্জস্য দ্বারা সমস্ত পৃথিবী ছবির মতো হয়ে আছে, এবং মানুষের জন্মমৃত্যু হাসিকান্না ভূতভবিষ্যৎ, বর্তমানের পর্যায় একটি কবিতার সকরুণ ছন্দের মতো কানে বাজে—সেই সঙ্গে আমাদেরও নিজ নিজ ব্যক্তিগত প্রবলতা তীব্রতার হ্রাস হয়ে আমরা অনেকটা লঘু হয়ে যাই এবং একটি সংগীতময়ী বিস্তীর্ণতার মধ্যে অতি সহজে আত্মবিসর্জন করে দিই। ক্ষুদ্র ও কৃত্রিম সমাজবন্ধনগুলি সমাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী অথচ সংগীত এবং উচ্চাঙ্গের আর্ট মাত্রেই সেইগুলির অকিঞ্চিৎকরতা মুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করিয়ে দেয়—সেইজন্যে আর্ট মাত্রেরই ভিতর খানিকটা সমাজনাশকতা আছে—সেইজন্যে ভালো গান কিম্বা কবিতা শুনলে আমাদের মধ্যে একটা চিত্তচাঞ্চল্য জন্মে—সমাজের লৌকিকতার বন্ধন ছেদন করে নিত্যসৌন্দর্যের স্বাধীনতার জন্যে মনের ভিতরে একটা নিষ্ফল সংগ্রামের সৃষ্টি হতে থাকে—সৌন্দর্য মাত্রেই আমাদের মনে অনিত্যের সঙ্গে নিত্যের একটা বিরোধ বাধিয়ে দিয়ে অকারণ বেদনার সৃষ্টি করে।"

সংক্ষেপে এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে, "আমাদের সংগীত জিনিসটাই ভূমার সুর; তার বৈরাগ্য, তার শান্তি, তার গম্ভীরতা সমস্ত সংকীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট করে দেবার জন্যেই।"

সংগীতের এই অনুভূতিটিকেই আর-এক কথায় বলে অহৈতুক আনন্দ। গুরুদেব এই কথাটিকে আরো সুন্দর করে বলেছেন, 'বৈরাগ্যের আনন্দ'। এ-সব কথা তাঁরই জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ অনুভূতির কথা। সংগীতরস-অনভিজ্ঞ লোকর কথা এ নয় যে একে চট করে উড়িয়ে দিতে পারি।

ইয়োরোপের সংগীতের কথা চিন্তা করে হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তারা কি এ ধরনের কথা বিশ্বাস করে? সম্প্রতি প্রকাশিত কয়েকটি লেখা থেকে তাদের মতামত তুলে দিচ্ছি। আমেরিকার একদল চিন্তাশীল সংগীতশিক্ষক, গ্রামের সাধারণ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কী আদর্শে চালনা করতে হবে তার নির্দেশ দিতে গিয়ে বলেছেন—

"Educators to-day are pointing out the need for spirtual and cultural emphasis in education as opposed to the strictly material and utilitarian conception. They feel the truth of the Master's words that 'Man cannot live by bread alone', and that our

children, in rural as well as in urban communities, must be taught the fine art of living. Both educators and sociologists agree that music possesses outstanding values for child development and makes vital contribution to a richer, fuller life."

আর-একজন সংগীতজ্ঞ তাঁর এক লেখায় লিখছেন যে—

"Music is the only one of the arts which cannot corrupt the mind...It is this negative quality of Music, the ideal of all art, that makes it so well suited to serve as the first and foremost cultural art in the spirtitual education of the young."

এই কথাগুলির দ্বারা সেখানকার এক দলের মধ্যে যে সংগীত সম্বন্ধে ভিন্ন মত দেখা দিয়েছে তা বেশ বোঝা যায়। তারা 'নাদব্রহ্ম'র মতো তত্ত্বকথা বলে নি বটে, কিন্তু বৈরাগ্যের আনন্দে বা জাগতিক সুখদুঃখের জীবনকে ভুলিয়ে দেবার আনন্দে আস্থা রাখে বলে মনে হয়।

অহৈতুক বা বৈরাগ্যের আনন্দই সংগীতের মূল রস বলেই সমগ্র ভাবে ভারতীয় সংগীতে কী ভাবের কথা বসানো হয় তা নিয়ে আলোচনা করলে আমাদের বাঙলা-দেশের গানের গতি ও প্রকৃতিটি আমরা ঠিকভাবে বুঝতে পারব।

ভারতবর্ষের লোকসংগীত, উচ্চ শ্রেণীর প্রাদেশিক সংগীত ও হিন্দুস্থানী সংগীতের কথা নিয়ে যদি আমরা বিচার করি তা হলে দেখতে পাব যে, দুটি প্রধান বিষয় নিয়ে গানের কথাগুলি গঠিত তার একটি হল ভগবানের বন্দনা, অপরটি হল প্রেম। ভগবানের পূজাবন্দনার গানের চেয়ে প্রেমের গানের প্রাধান্য অধিক। এর মধ্যে ভগবৎপ্রেম মানবিক প্রেম উভয়ই আছে। এই দুটি বিষয়ই লোকসংগীত থেকে শুরু করে ভারতীয় সবরকম সংগীতের মূলকথা। গানে কেবল মাত্র এ দুটি বিষয়ই বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে কেন? তার কারণ হল দেবতার বন্দনায় ও প্রেমের মধ্যে, সে ঐশ্বরীয় বা মানবিক যাই হোক না কেন, আছে একটা আনন্দ। সেইটিই হল "বৈরাগ্যের আনন্দ"। এই আনন্দে নিজের সত্তাকে মানুষ দেবতার উদ্দেশে বা প্রেমাস্পদের কাছে সম্পূর্ণ লুপ্ত করে দিতে চায়। নিজেকে আলাদা করে দেখতে ইচ্ছা করে না। পূজার দ্বারা প্রেমের দ্বারা মানুষ অন্যের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। বিলিয়ে দেবার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতায় মনে জাগে একটা বিশেষ বেদনা। এই বেদনার গভীরতার মধ্যে আকাঙ্ক্ষাপূরণের সাক্ষ্য পাওয়া যায় বলেই মানুষ একটা আনন্দ বোধ করে। সেইজন্যেই কথায় বলে, গভীর বেদনা আনন্দেরই এক রূপ। এই বেদনার অপর প্রকাশ হল সংগীত। বাঁশির সুরে, বীণার ঝংকারে বা যে কোনো যন্ত্রের বাজনায় আমাদের মন কি ঐরকম একটি অকারণ বেদনায় ভরে ওঠে না? ঐ অকারণ বেদনাকেই বার বার অনুভব করতে চাই ব'লেই আমরা বাজনা শুনতে এত ভালোবাসি।

সুতরাং পূজা বা প্রেম-নিবেদনের সঙ্গে বিশুদ্ধ সংগীতের এইখানে মিল পাওয়া যায় বলেই উভয়কে এক করে নিতে মানুষ পেরেছে এত সহজে।

এটা হয়তো অনেকেই লক্ষ করে থাকবেন যে ভারতীয় সংগীতে সাধারণত অন্য

কোনো রসের গান প্রাধান্য পায় নি। সংগীতে যুগান্তকারী সাধক স্রষ্টারা কখনো হাস্যরস বা বীররসের গান রচনায় বিশেষ উৎসাহ পান নি। প্রাচীন ভারতীয় উচ্চ সংগীতের কোনো ধারায় এ নিয়ে গান রচনা হয় নি। কিন্তু তাই বলে এ কথা কেউ যেন মনে না করেন যে জোরালো গান ভারতে রচিত হয় নি। সে গানেরও পরিচয় আছে প্রাচীন ধ্রুপদ-সংগীতে। কিন্তু সে হল আনন্দের, উল্লাসের জোর। হাস্যরস লোকসংগীতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাকে গানের জগৎ খুব সম্মানের চোখে কোনো দিনই দেখে নি, অন্ত্যজের মতনই তাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে।

নির্মল প্রেমের গান যত পুরাতনই হোক আজও আমাদের মনে গভীর আনন্দ দান করে। বাঙলাদেশ কবির দেশ। অতি প্রাচীন কাল থেকে সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় যতটা না বিকাশ দেখি তার চেয়ে অনেক বেশি দেখি কাব্য-সাহিত্যে। এবং এই-সব কাব্য গানের সুরের দ্বারাই গীত হয়েছে। বৌদ্ধ যুগের চর্যাগীতি ছিল রাগরাগিণী-তালমান-লয়-যুক্ত উচ্চাঙ্গের ধর্ম-সংগীত। জয়দেবের গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাসের পদাবলী ও চৈতন্যদেবের সময় থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব গীতকবিতা তো ছিল বিশাল প্রেমসংগীতের জগৎ। উচ্চাঙ্গের সংগীত-রচনাকালে বাঙলাদেশ সুরে ও ঢঙে বহু ক্ষেত্রে হিন্দী গানের কাছে বিশেষ ঋণী। কিন্তু কিভাবে নিজেদের ভাষার সঙ্গে তার মিলন ঘটিয়ে তাকে অন্য রূপে খাড়া করে নিয়েছে তা আলোচনার বিষয়।

অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, হিন্দুস্থানী উচ্চসংগীতের ঢঙ ও তার রাগরাগিণীর প্রভাবে কীর্তন-গানের ঢঙ ও সুরে অনেক বৈচিত্র্য এসেছিল। পণ্ডিতরা বলছেন, হিন্দী গানের ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পার অনুকরণ করেই 'মনোহর সাই' 'গরানহাটি' ও 'রেনেটি' নামে তিনটি ঢঙের উৎপত্তি। এমন-কি এ-সব গানের তালও নাকি ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা গানের সঙ্গে মেলে। আজকের হিন্দী গানের সঙ্গে তার প্রভেদ দেখি অনেক জায়গায়। অতিসূক্ষ্ম বিচার ছাড়া মিল ধরা মুশকিল।

এই কীর্তন-গানের আরম্ভ করে গিয়েছিলেন বৃন্দাবনের বাঙালি বৈষ্ণবগুরু নরোত্তম গোস্বামী। তাঁর চেষ্টায় এ দেশে তা প্রচলিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ-ভাগে নরোত্তম রাজশাহীতে এসে বিরাট একটি কীর্তন-গানের জলসা করেন। সেই জলসায় যোগদানের জন্য বাঙলার তৎকালীন বহু গাইয়ে বাজিয়ে সেখানে সমবেত হন। ঐসময় বৃন্দাবন মথুরা দিল্লী আগ্রা গোয়ালিয়র প্রভৃতি অঞ্চল সংগীতের বড়ো বড়ো কেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল। এবং সেটা ছিল তানসেনের যুগ। বৃন্দাবন ও মথুরার দিকে থাকতেন বেশির ভাগ সংগীতসাধকরা। আর, দিল্লি-আগ্রা গোয়ালিয়রে থাকতেন বড়ো বড়ো ওস্তাদ ও গুণীরা। সেই সংগীতের ধারা রাজশাহীতে এল নরোত্তমের সঙ্গে। পশ্চিমের রাগরাগিণী ও ঢঙ নতুন করে ইনি প্রবর্তন করলেন।

এর পূর্বে জয়দেব-চণ্ডীদাসের গান বাঙালি সমাজে চালু ছিল। তা ছাড়া চৈতন্যদেবের সময়েও যে গান রচিত হয়েছিল তাও দেশের লোকে গাইত। ঐ-সব গানে রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে, কিন্তু গাইবার ঢঙটি যে ঠিক কী ছিল বলা বড়ো মুশকিল। এ গানও নরোত্তমের আগে পশ্চিমভারতের রাগিণীতে নিজেদের সম্বন্ধ করেছিল। নরোত্তম নতুন করে আর একবার নতুন প্রেরণায় কীর্তনকে উদ্বোধিত

করেন। সুরকে ঠিকভাবে ধরে রাখবার কোনো বৈজ্ঞানিক প্রথা পূর্বযুগে না থাকায় নানা জনের কণ্ঠে কণ্ঠে গানগুলি ফিরত। তাতে ক'রেই সুর এইরকম পরিবর্তিত অবস্থায় এসে আজ দাঁড়িয়েছে। কীর্তনে ভাবরস ও রাগিণীরসের মিলন আদর্শ-স্থানীয়।

বৈষ্ণবপদাবলীর বহুশতাব্দী পূর্বে 'চর্যাগীতি' রচিত। সেগুলি বাঙালি বৌদ্ধদের গান। তাতেও রাগরাগিণীর উল্লেখ দেখি। তবে এ কথা কেউ বলতে পারবে না যে আজকালকার রাগিণী আর ঐ নামের রাগিণীগুলি এক। রাগিণীর সঙ্গে বাঙলা ভাষাকে মিলিয়ে গান রচনার পরিচয় সেই প্রাচীন যুগ থেকেই আমরা পেয়েছি এবং ধরে নিতে পারি যে তাঁদেরও রাগিণী ও কথার মিলন সার্থক হয়েছিল। এই গানের মর্ম ও পংক্তিভাগ দেখে, তা ছাড়া যে সহজিয়া বৌদ্ধদের গান ব'লে সেগুলি পরিচিত তার কথা ভেবে, আমার মনে হয় বাঙলার বাউলদের মতনই বৌদ্ধ-যুগের কোনো-এক সম্প্রদায়ের গান এগুলো। এরাই বোধ হয় যুগোপযোগী পরি-বর্তনের মধ্য দিয়ে এসে এ যুগে বাউল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কথা ও রাগিণীর মিলনও বাউলের গানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যদিও ওরা রাগরাগিণীর কোনো উল্লেখ করে না, ওদের গানে বা ওদের দ্বারা লিখিত এমন কোনো পুস্তকও পাওয়া যায় নি যাতে রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে, কিন্তু নিজের কানে শোনার অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ করেছি যে বহু রকমের রাগিণীতে তারা অনেকেই ঐ-সব গান গেয়ে থাকে। তবে নিজেরাও খেয়াল করে না বা জানে না যে তারা কী সুর লাগাচ্ছে।

বাঙালির সংগীত-সাধনার আর একটি উল্লেখযোগ্য যুগ হল রামনিধি গুপ্তের যুগ, অর্থাৎ নিধুবাবুর টপ্পা-সংগীতের যুগ, যার প্রভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার সব রকমের সংগীতেই পড়েছিল। তিনি ১১৪৮ বাঙলা সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিহারের ছাপরা জেলায় নবপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানির আমলের সরকারী চাকুরিতে কিছুকাল নিযুক্ত ছিলেন, তখন একজন বিখ্যাত ওস্তাদের কাছে গান-বাজনার চর্চা করেন। শিক্ষাসমাপ্তির পর নিজেই গানরচনা শুরু করে দেন। তিনি ১২৩৫ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইংরাজি অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ ও ঊনবিংশ শতাব্দের প্রথমার্ধ পর্যন্ত তিনি তাঁর রচিত টপ্পাগানে কলিকাতার শিক্ষিত বাঙালি সমাজকে মুগ্ধ করেছিলেন। এঁরই সাহায্যে তখনকার আখড়াই গানের সুরও রচিত হত। তখনকার দিনের বাঙলার সংগীতানুরাগী জমিদাররা তাঁর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। পেশাদার বাইজিরা তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধা করত তাঁর গানের জন্য। জানা যায় নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার জন্য তিনি কিছু ব্রহ্মসংগীতও রচনা করেছিলেন। রামমোহন তা শুনেছিলেন। এইভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরে তাঁর সংগীতের প্রভাব দেখা গিয়েছিল। এবং ধীরে ধীরে তাঁর রচিত টপ্পার ঢঙ বাঙলার যাত্রায়, কথকতায়, কবিগানে, এমন-কি তখনকার দিনের কীর্তন-গানেও পড়েছিল। নিধুবাবুর রচনার বিষয় ছিল প্রেম। তাঁর টপ্পাকে শোরী মিঞার টপ্পার হুবহু অনুকরণ বললে ভুল হবে। গাইবার ঢঙে এবং অলংকারে অনেক পরিবর্তন তিনি করেছিলেন।

নিধুবাবুর পর থেকে গুরুদেবের সময় পর্যন্ত বাঙলাদেশে সেরকম প্রভাবশালী

বাঙালি সংগীতরচয়িতা আর পাওয়া যায় না।

রামমোহন থেকে আরম্ভ করে ব্রাহ্মসমাজের উৎসাহে বাঙালি অনেক ধ্রুপদ ও খেয়াল গান রচনা করেছিল। কিন্তু সে-সব গানে কথা বসিয়েছেন একজন, সুর যোজনা করেছেন ওস্তাদরা। অর্থাৎ হিন্দী গানের কথার ছন্দ মিলিয়ে উপাসনার উপযোগী কথা তাতে বসানো হত মাত্র। সুতরাং এই দলের রচনাকে প্রকৃত সৃষ্টি কোনো মতেই বলা চলে না।

এই যুগের ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা গানের আদর্শে রচিত বাঙলা গানের আলোচনাতে দেখা যায় যে বাঙালিরা কথায় হিন্দী গানের অনুকরণ করে নি বটে, কিন্তু সেই-সব গানের মূলভাবের প্রতি তাদের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। হিন্দী ধ্রুপদগানের মূল ভাব হল ভক্তিপূজার ভাব। বাঙলাদেশে ঐ ভাবটিকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করেই নতুনভাবে ভক্তি বা ধর্মের গান রচিত হয়। খেয়াল গানের ভিন্ন ঢঙ অনুসারে পূজা ও প্রেমের গান রচিত হয়েছে বাঙলাদেশে। শোরী মিঞার টপ্পা ছিল প্রেমের গান, নিধুবাবুর প্রেমের গানও সেই কারণে প্রসিদ্ধ।

গত পঞ্চাশ বৎসরের উপরে সাহিত্যে গুরুদেব যেমন বাঙলাকে বিশেষভাবে চালিত করেছেন, বাঙালির গানের ক্ষেত্রেও তাঁর প্রভাব ঠিক সেই রকমের। তাঁর ধর্মসংগীত ও প্রেমসংগীত উভয়ই সমানভাবে দেশকে প্রভাবান্বিত করেছে। এ ধরনের গানগুলিই তাঁর রচনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। অন্যান্য বিষয়ের গানও তার মধ্যে পাই, কিন্তু সেগুলি তুলনায় উক্ত গানের পরে স্থান পাবে। তিনি কেবল দু-একটি হিন্দুস্থানী ঢঙের প্রভাবেই গান রচনা করেছেন এমন নয়; তাঁর গানে ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ছাড়া প্রাদেশিক লোকসংগীতের নানা ঢঙও মিশেছে। তবে একটা জিনিস লক্ষ করা গেছে যে প্রচলিত ঢঙের অনুসরণে গান রচনা করতে গিয়ে তিনিও সেই-সব গানের মূলভাবকে তাঁর গানে বজায় রেখেছেন। ভক্তি ও পূজার বা গম্ভীর রসের গানগুলি প্রায়ই ধ্রুপদ ও সে যুগের খেয়ালের গায়কীতে রচিত। টপ্পার প্রভাব তাঁর গানে প্রচুর পাওয়া যায়, বিশেষ করে তাঁর নানারূপ প্রেমের গানে। বাউলদের প্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে তিনি যেসব গান রচনা ক'রেছেন, সেগুলিতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি বাউল-সুর সংযোজনা ক'রেছেন। মূলত গুরুদেবের গানে পূজা বা প্রেমই হল প্রধান বিষয়বস্তু; একেই নানা ভাবে, নানা রসে, নানা উপলক্ষে তিনি ব্যক্ত করেছেন বারে বারে।

পূর্বেই বলেছি যে হিন্দী গানের ভাষায় ঐশ্বর্যের অভাব সুরের সম্পদে পূরণ করা হয়েছিল। বাঙালির ভাষার ঐশ্বর্য প্রচুর। তাই সুরের জন্য তাকে বিশেষ ভাবতে হয় নি।

রাগরাগিণীর ব্যবহার যতটুকু দরকার ততটুকুই সে করেছে। অর্থাৎ গানে হিন্দীভাষা সুরের উপর বিশেষ করে নির্ভর করে, বাঙলায় এসে সেই সুর নির্ভর করেছে বিশেষ করে কথার উপরে। তা বলে এ ঠিক নয় যে কথা ইচ্ছামত সুরকে রসের ক্ষেত্রে চালিত করেছে। বাঙলা গানে কথার সঙ্গে মিলিয়ে রাগিণীকে বসানো হয়েছে। কারণ, রাগরাগিণী নিজেও কাব্যের মতো রসলোকসৃষ্টির ক্ষমতা রাখে। তাকে ঠিকমত বেছে নিয়ে কথার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া শিল্পীর কাজ।

গুরুদেবের সমসাময়িক ও অনুবর্তী রচয়িতাদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের নামই কেবলমাত্র করব। কারণ এঁরা প্রত্যেকেই নিজের গানের কথা ও সুর দুই-ই রচনা করেছেন। গুরুদেবের আদর্শে এঁরাও হিন্দী গানের ঢঙ ও সুরের প্রভাবেই বাঙলা খেয়াল ঠুংরী ও গজল গানে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কাব্যের ভাষা ও ভাবে এঁরা গুরুদেবের অনুগামী হলেও গানরচনায় কিছু পার্থক্য এঁদের মধ্যে ছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের মধ্যে বাঙলায় প্রচলিত টপ্-খ্যাল অর্থাৎ টপ্পা ও খেয়াল-মিশ্রিত একপ্রকার গানের প্রভাব পড়েছিল বেশি। এ বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কাছ থেকেই তিনি উৎসাহ পান। শোনা যায় টপ্-খ্যাল গানের তিনিই ছিলেন একজন বিশেষ উৎসাহী প্রবর্তক।

অতুলপ্রসাদ জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছিলেন লক্ষ্মৌ শহরে। এই নগরী হল ঠুংরীর জন্মস্থান। লক্ষ্মৌএর ঠুংরীতে তিনি বিশেষভাবে পরিচিতও ছিলেন। এই কারণে তাঁর ঠুংরি চালের বাঙলা গানগুলিতে নূতনত্ব পাওয়া যায়। ঠুংরীকে বাঙলাভাষায় গ্রহণ করলেও বাঙলা চালটি বেশ একটু অভিনবই ছিল।

নজরুলের গজল ও জাতীয়ভাব-উদ্দীপক সংগীত ছাড়া অন্যান্য গান বাঙালির কাছে বিশেষ আদর পায় নি। এঁরা প্রত্যেকেই হিন্দুস্থানী অনুরূপ পদ্ধতির গানের ভাবকে নিজেদের গানেও রাখবার বিশেষ চেষ্টা করেছেন। এঁদের ধর্মসংগীতের চেয়ে প্রেমের সংগীতগুলিই ভালো। এঁরা প্রত্যেকেই লোকসংগীতের সুরে ও কীর্তনের সুরে কিছু গান লিখেছেন। তার মধ্যে অতুলপ্রসাদের গানই তুলনায় অধিক রসোত্তীর্ণ বলা চলে। দেশপ্রেম-উদ্দীপক সংগীতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও নজরুল অতুলপ্রসাদের চেয়ে বাঙলায় বেশি খ্যাতি পেয়েছেন। কিন্তু এঁরা দেশের মনে খুব গভীর রেখাপাত করতে পারেন নি। তাই আজ দেশ এঁদের গান ভুলতে বসেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান একসময় বিশেষ বিখ্যাত ছিল, কিন্তু আজ সেই গান শুনতে পাওয়া দুরূহ হয়ে উঠেছে। তিনি বাঙলা গানে বিলিতি ঢঙ প্রবর্তন করেছিলেন বলে আজও তাঁর সম্বন্ধে লোকে আলোচনা করে, অথচ সে গানগুলি যে কী তা খুব কম লোকেই জানে। নজরুলের 'কে বিদেশী' গানটি একদিন বাঙলায় প্রায় পথে ঘাটে সবাই শুনেছে, কিন্তু কোথায় আজ তার পরিচয়। তাঁর জাতীয়সংগীতগুলিতে তিনি প্রথম উল্লাসের ভাব এনেছেন বলে একদল সাহিত্যিক তাঁকে সম্মান দেন, সেই গানও ধীরে ধীরে লোকে ভুলতে বসেছে।

বাঙলাদেশে কোনো গানের স্থায়িত্ববিষয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে স্থায়িত্বের কারণ হল শুধু সুরের চিত্তচমৎকারী উৎকর্ষ নয়, তাঁর সঙ্গে অনুরূপ বেদনামিশ্রিত গভীর ভাবসম্পদের একান্ত ও অবিচ্ছেদ্য মিলন। বৈষ্ণব পদাবলী আজও বেঁচে আছে এই কারণেই শুধু ভক্ত সমাজে নয়, গুণী সমাজেও। অথচ এক কালে নিধুবাবুর এত প্রভাব থাকা সত্ত্বেও আজ তাঁর গান লোকে প্রায় ভুলে গেছে।

গুরুদেবের বহু গান কাব্যরসের বিচারে চিরকালের স্থান গ্রহণ করেছে বলেই এর সঙ্গে জড়িত যে সুর বা রাগিণী আমরা পেলাম তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি। বিজ্ঞানের যুগের নানারূপ সম্পদে আজ আমরা সম্পদবান। আমরা সুরকে ধরে রাখবার নানা উপায় পেয়েছি। ভবিষ্যৎ যুগে যখনই গুরুদেবের

গানের কথা পাঠকের মন আকর্ষণ করবে তখনই তারা তাকে সুরের মধ্য দিয়ে শুনতে চাইবে এবং সে সুযোগও তাদের যথেষ্ট হবে। পুরাতন যুগের গানের মতো, রক্ষার অভাবে, সুর হারিয়ে কেবল কথার রসে মন ভরাতে হবে না।

সম্প্রতি আধুনিক নামে যে গান বাঙলাদেশে খুব চলেছে এ যে ঠিক কী বস্তু তা বলা কঠিন। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, বাঙলা গানের অবনতির একটি চরম যুগ এই বর্তমান সময়টি। চলচ্চিত্র ও রেকর্ডের চাহিদার দরুন এ গানগুলি রচিত হচ্ছে। কিসের অভাবে এই অবনতির কারণ ঘটেছে তার উল্লেখ করি।

প্রথমত এই-সব গানের কথা যাঁরা রচনা করেন তাঁরা সাধারণ ক্ষমতার কবি ও প্রায়শ ভারতীয় সংগীতের কোনো পদ্ধতির সঙ্গে তাঁদের কোনো পরিচয় নেই। এবং দেখা যায় তাঁরা কেউ গাইতেও পারেন না। অথচ এই তিনটি গুণ একত্র ছিল বলেই আগের যুগের যাঁদের নাম করেছি তাঁরা বাঙলা দেশকে গানের ক্ষেত্রে কিছু দিতে পেরেছিলেন। এঁদের ফরমাশী কবিতায় সুর দেন এমন সংগীতজ্ঞ-ওস্তাদ যাঁর কাব্য-রস-বোধ নেই বললেই হয়। তা ছাড়া আধুনিক বেশির ভাগ কবি ও বাঙালি সুরকারদের মধ্যে হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের প্রতি অবহেলা ও অশ্রদ্ধাও এর আর-একটি বড়ো কারণ। ভারতীয় রাগরাগিণীর জগৎ থেকে বাঙালি কোনো দিনই সুর ও ঢঙ সংগ্রহ করতে দ্বিধা করে নি, কিন্তু এ যুগের রচয়িতাদের মধ্যে সেরকম কোনো প্রেরণা নেই। এইরকম অশ্রদ্ধা ও প্রেরণার অভাবেই আজকের কোনো গানই দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারছে না। কেমন যেন একটা দুর্বল অনিশ্চয়তার উপরেই তাদের ভিত্তি। তাই গড়ে উঠতে না উঠতেই ভেঙে পড়ে যাচ্ছে। এই গানের সঙ্গে বিচার করলে জাতীয় জীবনেরও খানিক হদিস পাওয়া যায়। কিছুদিন থেকে জীবনের সব পথেই বাঙালির মনে নিজের প্রতি, নিজের দেশের প্রতি, নিজের সংস্কৃতির প্রতি খুব একটা অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। এই অভাবটা ঢাকবার জন্যে সাহিত্যে শিল্পে যেমন দেখছি অদ্ভুত কিছু করে চমক লাগাবার চেষ্টা, সংগীতের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটছে। বাইরের থেকে আহরণের বর্তমান হেতু কেবলমাত্র চমক লাগানোর মনোবৃত্তি। সম্প্রতি ঐ চমক লাগানোর শখ থেকেই ইয়োরোপের সংগীতের প্রতি কিছুটা দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এই যে অতিশয় নিকৃষ্ট অনুকরণেই তার সমাপ্তি। প্রকৃত সাধনার দ্বারা ইয়োরোপের সংগীতকে আয়ত্ত করে ঐ কাজে হাত দিলে হয়তো আমাদের সংগীত নতুন কোনো পথ পেত। কিন্তু সেখানেও ধৈর্যের অভাব এমন গভীর যে তা হবার কোনো লক্ষণই এখনো পর্যন্ত দেখা যায় নি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা ইয়োরোপকে জানতে ও বুঝতে যে পরিমাণ সাধনা করেছি, সে পরিমাণ তার সার্থকতাও আমরা দেখেছি বাঙলা সাহিত্যে। কিন্তু সংগীতের ক্ষেত্রে সেইরূপ একান্ত সাধনা আজও কোথাও জাগে নি। নিজের দেশের সংগীতকে ও সেই সঙ্গে বিদেশের সংগীতকে ভালো ক'রে জানতে পারলেই ভবিষ্যতে বাঙলাদেশ আবার সংগীতে নতুন কিছু দিতে পারবে। তা না হ'লে উপস্থিত যে-পথে তার গতি, তাতে আশার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

বাল্যজীবনে সংগীতের প্রভাব

গুরুদেবের জীবনে সংগীতের স্থান যে কতখানি, সে কথা তিনি লেখায় অনেক স্থানেই উল্লেখ ক'রে গেছেন, বলেছেন, "গান লিখতে যেমন আমার নিবিড় আনন্দ হয় এমন আর কিছুতেই হয় না।" সেই আনন্দে সংসারের নানাপ্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভার তাঁর মন থেকে একেবারে লোপ পেয়ে যায়, এবং এই সংগীতের ভিতর দিয়েই তাঁর বিচিত্র কর্মবহুল জীবনের বিশ্রাম ও শান্তি তিনি পেয়েছেন। তিনি অনুভব করেছেন, মুক্তি বলতে যা-কিছু তা এই গানের ভিতরেই। এদিক থেকে গুরুদেবকে জানতে হলে, তাঁর ছেলেবেলার জীবনটিকেও যথাসম্ভব জেনে রাখার প্রয়োজন আছে, এবং দেখতে হবে কী ক'রে ভারতীয় সংগীতের ধ্যানের রূপটি তাঁর অন্তরে ধরা দিল ও কী আবহাওয়ায় তিনি মানুষ হলেন। গুরুদেব যখন জন্মগ্রহণ করেন, কলকাতার ধনী-সমাজে উচ্চসংগীতের প্রভাব তখন কি রকম ছিল তার সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর বর্ণনা পাই তাঁরই একটি লেখাতে। তাতে আছে—

"বাঙলাদেশে আধুনিক যুগের যখন সবে আরম্ভকাল তখন আমি জন্মেছি।... দেখেছি তখনকার বিশিষ্ট পরিবারে সংগীতবিদ্যার অধিকার বৈদগ্ধ্যের প্রমাণ বলে গণ্য হত। বর্তমান সমাজে ইংরেজিরচনায় বানান বা ব্যাকরণের স্খলনকে যেমন আমরা অশিক্ষার লজ্জাকর পরিচয় বলে চমকে উঠি, তেমনি হত যদি দেখা যেত, সম্মানী পরিবারের কেউ গান শোনবার সময় সমে মাথা-নাড়ায় ভুল করেছে, কিংবা ওস্তাদকে রাগরাগিণী ফরমাশের বেলায় রীত রক্ষা করে নি।"

তাদের সেই বাল্যকালে ওস্তাদরা নিজে হাতে তানপুরা বেঁধে আলাপের ভূমিকা দিয়ে ধ্রুপদ গানে সভা মুখরিত করতেন :

"দূর প্রদেশ থেকে আমন্ত্রিত গুণীদের সমাদর ক'রে উচ্চ অঙ্গের সংগীতের আসর রচনা করা সেকালে সম্পন্ন অবস্থার লোকের আত্মসম্মান রক্ষার অঙ্গ ছিল।"

সংগীতকে তখনকার ধনী-সমাজে এইরূপ একটি সম্মানজনক বিদ্যা বলে গ্রহণ করার দরুন তার চর্চারও বিশেষ আয়োজন তাঁরা বাড়িতে রাখতেন। নিজ পরিবারের সংগীতচর্চার বর্ণনা করতে গিয়ে গুরুদেব বলেছেন—

"বাঙালির স্বাভাবিক গীতমুগ্ধতা ও গীতমুখরতা কোনো বাধা না পেয়ে আমাদের ঘরে যেন উৎসের মতো উৎসারিত হয়েছিল। বিষ্ণু ছিলেন ধ্রুপদীগানের বিখ্যাত গায়ক। প্রত্যহ শুনেছি সকালসন্ধ্যায় উৎসবে আমোদে উপাসনা মন্দিরে তাঁর গান, ঘরে ঘরে আমার আত্মীয়েরা তম্বুরা কাঁধে নিয়ে তাঁর কাছে গানচর্চা করেছেন, আমার দাদারা তানসেন প্রভৃতি গুণীর রচিত গানগুলিকে আমন্ত্রণ করেছেন বাঙলা ভাষায়।"

বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন আদি সমাজের গায়ক ও গুরুদেবের পরিবারের সংগীত-শিক্ষক। ইনি শিশুদেরও কাঁধের উপর তম্বুরা তুলে গান অভ্যাস করিয়েছেন। কর্তাদের নির্দেশমত বাঙলা ছড়ায় রাগরাগিণী বসিয়ে সহজ তালে গান শেখাতেন। এতে আরম্ভে সা রে গা মা ইত্যাদির নীরস অভ্যাসে গানের প্রতি শিশুদের মন বিমুখ হত না। এই বিষ্ণুই ছিলেন গুরুদেবের সংগীত-জীবনে প্রথম গুরু, এঁরই কাছে গুরুদেবের ভারতীয় সংগীতে প্রথম হাতে-খড়ি হল। প্রতি রবিবারে গানের

ক্লাস বসত। এই গায়কের গানে ছিল পাণ্ডিত্য, তিনি যে ধ্রুপদ ও খেয়াল গানে সত্যিকার একজন রসিক ছিলেন, সে কথা গুরুদেব বলেছেন এবং আরো পরিষ্কার করে বলেছেন সংগীতজ্ঞ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে। তাঁর মতে—

"অন্যান্য ওস্তাদের গানের চেয়ে বিষ্ণুর গানই সকলে বেশি পছন্দ করিত। বিষ্ণুর গানের একটা বিশেষত্ব ছিল। ওস্তাদরা যেমন তান-অলংকারে প্রাধান্য দেন, বিষ্ণু তেমনি কিছু করিতেন না। তিনি অল্পস্বল্প তান দিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে রাগিণীর মূল রূপটি বেশ ফুটিয়া উঠিত, গানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেন না। ইহা ছাড়া, কথার যে একটা মূল্য আছে, সেটিও বিষ্ণুর গানে পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইত। সকলেই গানের সুর এবং গৎ দুইই সহজে বুঝিতে পারিত। বিষ্ণু ধ্রুপদ-খেয়ালই বেশি গাহিতেন।"

গুরুদেব শৈশবে কী ভাবে তাঁর কাছে গান শিখতেন তার উদাহরণ ও বর্ণনা আমরা 'ছেলেবেলা' পুস্তকে পাই। তা পড়ে কেবল এই কথাই মনে হয়েছে যে, বড়ো ধ্রুপদ ও খেয়াল গাইয়ের পক্ষে কী করে এমন একটা সৃষ্টিছাড়া কাজ সম্ভব হল, সাধারণ চলতি গ্রাম্য ভাষার ছড়াকে মার্গসংগীতপন্থী বৃদ্ধ গায়ক কী ক'রে বিনা দ্বিধায় নিজে গেয়ে শিখিয়েছেন। হিন্দুস্থানী উচ্চসংগীতপন্থীদের মধ্যে এই মনোভাব তখনকার দিনে আশাতীত ছিল, এখনো তার খুব পরিবর্তন হয় নি। জীবনের আরম্ভেই গুরুদেব সংগীতে এমন-একটি উদারচেতা সংগীতগুরু পেয়েছিলেন যিনি তাঁর অন্তর সংগীতের রসে সিঞ্চিত করেছেন, কোনো সংকীর্ণতার দ্বারা মনকে সংকুচিত করেন নি। রামমোহন রায়ের সময় থেকে বিষ্ণু ক্রমান্বয়ে একটানা ১২৮৯ সাল পর্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়কের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তার পরে বার্ধক্য হেতু অবসর নেন। তিনি নিজেও অনেক প্রকারের হিন্দী ও বাঙলা গান রচনা করেছিলেন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে থিয়েটারি গানে সুর দিতেন, নিজেও অন্তরাল থেকে গাইতেন। তখনকার দিনের থিয়েটারের জন্য ঐকতান বাদনের গৎও তাঁকে রচনা করতে হত। তাঁর কণ্ঠের গানে ব্রাহ্মসমাজের শ্রোতারা বিশেষ মুগ্ধ হতেন, তাই তাঁর অবসরগ্রহণকালে আদি সমাজের একজন ভদ্র শ্রোতা লিখেছিলেন—

"অতঃপর ব্রাহ্মেরা এইরূপ মধুর কণ্ঠে ব্রহ্মসংগীত আর শুনিতে পাইবেন কি না সন্দেহ। যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উপাসনায় যোগ দিয়া আসিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রায় এমন কেহই নাই বিষ্ণুর সংগীতে যাঁহার অশ্রুপাত না হইয়াছে। বহুদিনের পর ব্রাহ্মসমাজে গায়কের একটি অভাব উপস্থিত হইল। পূরণ হইবে কি না কে জানে।"

উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ গান শিশুরাও গাইত, কারণ বাড়ির নানা উৎসবের জন্য রচিত বাঙলা ধ্রুপদ গানে তাদের যোগ দিতে হত। শিশু বয়সেই মাঘোৎসবে গুরুদেবও বাড়ির অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গান গাইতেন। এই ধ্রুপদাঙ্গের ব্রহ্মসংগীত তাঁদের সেই শিশুবয়সকে কতখানি প্রভাবান্বিত করেছিল একটি ঘটনার উল্লেখে তা ধরা পড়ে। তিনি লিখেছেন—

"কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না। মনে আছে, বাল্যকালে

গাঁদাফুল দিয়া ঘর সাজাইয়া মাঘোৎসবের অনুকরণে আমরা খেলা করিতাম। সে খেলায় অনুকরণের আর-আর সমস্ত অংগই একেবারেই অর্থহীন ছিল, কিন্তু গানটা ফাঁকি ছিল না। এই খেলায় ফুল দিয়া সাজানো একটা টেবিলের উপরে বসিয়া আমি উচ্চকণ্ঠে 'দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে' গান গাহিতেছি বেশ মনে পড়ে।"

গুরুদেবের দাদাদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও সোমেন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী উচ্চসংগীতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। এঁরা সকলেই হিন্দী-গানের বিশেষ চর্চা করেছেন। তবে এঁদের গানের গলা খুব উল্লেখযোগ্য ছিল বলে শোনা যায় না। গুরুদেব লিখেছেন—

"বড়দাদা-সেজদাদারা দরজা বন্ধ করে গান শিখতেন। ছেলেমানুষ, আমাদের তথায় প্রবেশ ছিল না।"

বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ বাঁশি ও অর্গান বাজনায় নিপুণ ছিলেন। এ ছাড়া আকারমাত্রিক স্বরলিপির প্রথম সূত্রপাত ইনি করেন ১২৭৬ সালে।

হেমেন্দ্রনাথ তানপুরা-কাঁধে কিরকম ধৈর্যের সংগে হিন্দী গান অভ্যাস করতেন তার বর্ণনা করে গুরুদেব বলেছেন—

"সেজদাদা শিখতেন বটে, তিনি সুর ভাঁজছেন তো ভাঁজছেনই, গলা সাধছেন তো সাধছেনই, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত।"

মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ভাইদের মধ্যে প্রথম হিন্দীভাঙা বাঙলা ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। এ ছাড়া তাঁর রচিত 'স্বদেশী মেলা'র জাতীয় সংগীত 'জয় ভারতের জয়' তখনকার দিনে সবচেয়ে পরিচিত ছিল ও প্রশংসা পেয়েছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজে বাড়িতে যেমন সংগীতচর্চা করেছেন, তেমনি বোম্বাই-বাসকালে সেখানকার এক মুসলমান সেতারীর কাছে 'দিল্লিবাজে'র সেতারের গৎ বাজাতে শিখেছিলেন ভালো করে। দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রথম প্রবর্তিত স্বরলিপিকে সহজ ও সরল করে ইনি আকারমাত্রিক নামে যে স্বরলিপির প্রচার করেছিলেন আজ সেই স্বরলিপি বাঙলাদেশে সবচেয়ে সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ।

দাদা সোমেন্দ্রনাথ, যিনি গুরুদেবের কাব্যচর্চার প্রধান উৎসাহী ছিলেন, তাঁর সংগীতজ্ঞান ও সংগীতের প্রতি আগ্রহ শেষজীবন পর্যন্ত ছিল। বৃদ্ধবয়সেও ঠাকুরবাড়ির নাতিনাতনি ও বৌদের তিনি গান শুনিয়ে আনন্দ দিয়েছেন। তিনি তাঁর বাড়ির আত্মীয়দের রচিত গান গাইতেন, তা ছাড়া নিধুবাবুর টপ্পাগানে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ছিল ও বহু গান জানতেন।

গুরুদেবের বড়োভগ্নীপতি সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় একজন পাকা সেতারী ছিলেন। তখনকার নামকরা সেতারী জ্বালাপ্রসাদ ছিলেন তাঁর সেতারের গুরু। এঁর বৈঠকে প্রায়ই বহু গায়ক ও বাদকের আসর বসত। তিনি নিজেও ধ্রুপদ গাইতেন।

গুরুদেবের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন বরাবরই উচ্চাঙ্গের হিন্দী-সংগীতের বিশেষ ভক্ত। শোনা যায় বিডন স্ট্রীটে একটা বাড়ি ভাড়া করে ওস্তাদ রেখে গানবাজনা করতেন। ছেলেবেলায় সাহেব মাস্টারের কাছে পিয়ানো শেখেন।

তিনি মোটামুটিভাবে গাইতে পারতেন। হিন্দীগানে ভালোমন্দ বোধ তাঁর বেশ পরিষ্কার ছিল। তাঁর রচিত প্রত্যেকটি বাঙলা উপাসনাসংগীত হিন্দী উচ্চাঙ্গ-সংগীতের চালে রচিত। উপাসনা ও উৎসবের গানে, উচ্চাঙ্গের হিন্দীসংগীতের ঢঙকেই উপযুক্ত মনে করতেন ব'লে তিনি তার বেশি প্রাধান্য দিতেন। তাঁরই ইচ্ছা ও প্রভাবে তাঁর পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গের হিন্দী-সংগীত ভেঙে বহু ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন; তার মধ্যে ধ্রুপদের সংখ্যাই অধিক। বিশুদ্ধ সংগীতের চর্চার জন্যে পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে তিনি এক হাজার টাকা যে পুরস্কার দিয়েছিলেন, সে খবরও আমরা জানি। ঐ যুগে কোনো-এক শ্রোতা ঐসব গান শুনে পত্রিকায় লিখেছিলেন, "দেবেন্দ্রবাবুরই যত্নে তাঁহার পুত্র-দিগের কর্তৃক সম্প্রতি বিরচিত হৃদয়দ্রবকারী ভক্তিরসাভিষিক্ত ব্রহ্মসংগীতশ্রবণকালে আমরা যেন ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করি।"

মহর্ষির সংগীতপ্রীতির পরিচয়স্বরূপ যে কয়টি ঘটনার বিষয় তাঁর জীবন-চরিতকার উল্লেখ করেছেন, সেগুলি এখানে আলোচনা করা যেতে পারে। তাতে লেখা আছে—ধর্মসংগীতের প্রেরণায় শ্রীকণ্ঠ সিংহ ও দেবেন্দ্রনাথ "গান গাহিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সভা ভুলিয়া, সমস্ত ভুলিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঐ একই গান গাহিয়া দুজনে নৃত্য করিলেন।" আর-একবার তিনি "অমৃতসহরে অবস্থিতি-কালে বসন্তকালে ঐ সহরের একটি ফলফুলে সুশোভিত বাগানে গিয়া তাহার সৌন্দর্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া একান্তে ফলভরে অবনত কতকগুলি বৃক্ষের সম্মুখে হাফেজের গজল গাহিয়া নৃত্য করিতেছিলেন।" তাঁর সেই আপনভোলা গান ও নাচ দেখে পথের একটি দরিদ্র মুসলমান অলক্ষ্যে তাঁর সঙ্গে নৃত্য করতে থাকে।

সংগীতে দেবেন্দ্রনাথের রুচিবোধও খুব মার্জিত ছিল—

"উৎসবের ৪।৫ দিন পূর্ব হইতে যে-সব সংগীত সংকীর্তন গীত হইবে, মহর্ষির সম্মুখে বসিয়া তাহার তালিম দেওয়া হইত, তাল মান সুরের ব্যতিক্রম হওয়ার যো নাই; একটু এদিক ওদিক হইলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন এবং যে পর্যন্ত না তাল মান লয় সমস্ত ঠিক হইত, ছাড়িতেন না। কোন গানের অভ্যাস পাকা না হইলে সে গানটি উৎসবের দিনে গাহিতে নিষেধ করিতেন।"

সম্ভ্রান্তশ্রেণীর মতো বিলাসের অঙ্গহিসাবে তিনি সংগীতের চর্চা বাড়িতে রাখেন নি, বা কেবলমাত্র বংশমর্যাদার পরিচয় হিসাবেও নয়। এ পরিবারে সংগীত ছিল প্রাণের নির্মল আনন্দের প্রবাহিণী। মৃতপ্রায় ভারতীয় সংগীতের মর্মলোকটিকে পুনর্জীবিত করাই ছিল মহর্ষির একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষা, সে ইচ্ছা তিনি সফল ক'রে তুলতে পেরেছিলেন তাঁর পুত্রকন্যাদের প্রতিভার ভিতর দিয়ে। এইজন্যেই তাঁর পরিবার বাঙলাদেশে যুগপ্রবর্তনকারী রূপে বিখ্যাত হল। তার মধ্যে গুরুদেব হলেন অনন্যসাধারণ।

হিসেব করে দেখা যায় যে, গুরুদেব নিজে উপাসনার গান রচনায় হাত দেবার আগে পর্যন্ত তাঁর পিতা ও তাঁর দাদারা মিলে সবশুদ্ধ প্রায় ষাটটি ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছিলেন। এই-সব গান রচনায় যে কয়জন বড়ো বড়ো ওস্তাদ তাঁদের সাহায্য করেছিলেন তার মধ্যে গৃহশিক্ষক বিষ্ণু চক্রবর্তী, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি-

পুরের রাজচন্দ্র রায় ও যদুভট্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া অন্যান্য নানা গাইয়ে সকলেই কোনো-না-কোনো সময়ে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির গায়ক হিসাবে আশ্রয় পেয়েছিলেন। বাঙলাদেশের বাইরের ওস্তাদদের মধ্যে বরোদার তৎকালীন বিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সও তাঁদের বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন। অযোধ্যা গোয়ালিয়র ও মোরাদাবাদ থেকেও ওস্তাদেরা তাঁদের বাড়িতে আশ্রয় নিতেন।

গুরুদেবের শিশুবয়সে যাঁরা বিশেষভাবে তাঁর মনের মধ্যে সংগীতের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে গায়ক বিষ্ণুর কথা পূর্বেই বলেছি। এর পরে শ্রীকণ্ঠ সিংহ, এক অজানা গাইয়ে ও যদুভট্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা চলে। এঁরা সকলেই ছিলেন হিন্দীগানের বিশেষ রসিক। গুরুদেব বলেছেন—

"আমাদের বাড়ির বন্ধু শ্রীকণ্ঠবাবু দিনরাত গানের মধ্যে তলিয়ে থাকতেন।... তিনি তো গান শেখাতেন না; গান তিনি দিতেন, কখন তুলে নিতুম জানতে পারতুম না। ফুর্তি যখন রাখতে পারতেন না, দাঁড়িয়ে উঠতেন, নেচে নেচে বাজাতে থাকতেন সেতার, হাসিতে বড়ো বড়ো চোখ জ্বল্‌জ্বল্ করত, গান ধরতেন—'ময়্ ছোড়োঁ ব্রজকি বাসরী'—সঙ্গে সঙ্গে আমিও না গাইলে ছাড়তেন না।"

অজানা গায়ককে স্মরণ করে গুরুদেব লিখেছেন—

"ভোরবেলা মশারি থেকে টেনে বের করে তাঁর গান শুনতেম। নিয়মের শেখা যাদের ধাতে নেই, তাদের শখ অনিয়মের শেখায়। সকালবেলার সুরে চলত,—'বঙশি হমারি রে'।"

যদুভট্টের প্রতি গুরুদেবের শ্রদ্ধাও ছিল গভীর। স্রষ্টা হিসাবে তাঁর প্রতিভায় তিনি ছিলেন মুগ্ধ। এই ওস্তাদের সম্বন্ধে গুরুদেব লিখেছেন—

"ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙালি গুণীকে দেখেছিলাম. গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজমর্যাদায় ছিল, কাষ্ঠের দেউড়িতে ভোজপুরী দারোয়ানের মতো তাল-ঠোকাঠুকি করত না। তাঁর নাম তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই। তিনিই বিখ্যাত যদুভট্ট। ...যখন আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকতেন নানাবিধ লোক আসত তাঁর কাছে শিখতে; কেউ শিখত মৃদঙ্গের বোল, কেউ শিখত রাগরাগিণীর আলাপ।...বাঙলা-দেশে এরকম ওস্তাদ জন্মায় নি। তাঁর প্রত্যেক গানে একটি originality ছিল, যাকে আমি বলি স্বকীয়তা।"

অন্যত্র বলেছেন—

"তিনি ওস্তাদ-জাতের চেয়ে ছিলেন অনেক বড়ো। তাঁকে গাইয়ে বলে বর্ণনা করলে খাটো করা হয়। তাঁর ছিল প্রতিভা, অর্থাৎ সংগীত তাঁর চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ করত। তাঁর রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা অন্য কোন হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না।...যদুভট্টের মতো সংগীতভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছেন কি না সন্দেহ।"

যদুভট্ট নিজে বহু সংগীত রচনা করেছিলেন। তিনি সাধারণত বিসমছন্দে গান রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। খাণ্ডরবাণী ধ্রুপদেও তিনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তাঁর রচিত বহু গানে কবিত্বশক্তির বিশেষ প্রকাশ ফুটে উঠেছে। গুরুদেব নিজে তাঁর কোনো কোনো হিন্দী গানের অনুকরণে বাঙলা গান রচনা করতে দ্বিধা করেন নি।

ব্রহ্মসংগীত থেকে তাঁর একটি গানের উল্লেখ করছি। গানটি হল, 'আজি বহিছে বসন্তপবন সুমন্দ তোমারি সুগন্ধ হে'। বাহার রাগিণীতে ও তেওড়া তালে যদুভট্ট রচিত গানটি হল 'আজু বহত সুগন্ধ পবন সুমন্দ'।

গান সম্পর্কে তখনকার দিনের ধনী-সমাজের সঙ্গে এ যুগের ধনী-সমাজের একটা বড়ো পার্থক্য এই যে, সে যুগের বড়োলোকেরা গানটাকে কেবলমাত্র শৌখিন আমোদের বিষয় বলে মনে করতেন না, বিশেষ করে উচ্চশ্রেণীর সংগীতকে। তাঁরা মনে করতেন, ভালো গান শোনার বা ভালো গায়ককে যোগ্য মর্যাদা দেওয়ার ক্ষমতা তখনি জন্মায় যখন সেই দিকে নিজেকে শিক্ষিত করে তোলা যায়। সেকালে বড়ো ওস্তাদও সেই কারণে সমজদার ধনীর কাছে থাকতে উৎসাহিত হতেন। এ যুগের বড়ো ধনী বা সাধারণ ধনী, কোনো সমাজেই, আগের দিনের মতো উচ্চশ্রেণীর সংগীতের চর্চায় উৎসাহ দেখা যায় না। ইংরেজি উচ্চশিক্ষার ও ধনবত্তার জোরেই সমজদার হবার সহজ পন্থায় এখনকার বেশির ভাগ ধনীর বিশেষ আগ্রহ।

সে যুগের ধনীরা অন্তত এভাবে সমজদার বলে গণ্য হতে লজ্জাবোধ করতেন। তাঁরা সাধনা বা চর্চা করে তবে উপযুক্ত সমজদার বলে সম্মান পেতেন। সেইভাবে গুরুদেবের পরিবারে সংগীতচর্চা হত। সেই সংগীতের আবহাওয়ার মধ্যে কোনো-প্রকার কৃত্রিমতা ছিল না। বাড়ির ছোটো বড়ো সকলেই সংগীতকে সমাদরের সঙ্গে চর্চা করেছেন, বুঝেছেন ও আনন্দ পেয়েছেন। তাই বড়ো বড়ো গুণী তাঁদের বাড়িতে এসে সমজদার শ্রোতা পেয়ে খুশি হতেন। এই বাড়িতে শিশুদের সংগীতশিক্ষাও যে বড়োলোকি শখের বিষয় ছিল না, তাও আমরা জানতে পারি ঐ যুগের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার বর্ণনা থেকে। দ্বিতীয় 'বিদ্বজ্জন সমাগম' উৎসবের বর্ণনায় পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছিল—

"হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিভা নামে অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা ও তদপেক্ষা অল্পবয়স্ক আর-একটি বালক উভয়ে মিলিয়া সেতার বাজাইলেন।...পরে এই দুটি শিশু ৩।৪টি হিন্দি গান গাইলেন। সে গান হারমোনিয়ম, বেহালা ও তবলার সঙ্গে সঙ্গত হইয়াছিল। তাহার পর প্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুবাবুর একটি গানে ঐ বালকটি তবলা-সঙ্গত করিল। পরে আর ৪।৫টি গানের সঙ্গে প্রতিভা তবলা-সঙ্গত করিলেন।"

প্রতিভাদেবী নিজেও ঐ-সব দিনের কথা স্মরণ করে লিখেছেন—

"যখন আমার বয়স ছয়-সাত বৎসর...সৌরীন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন উভয়েই আমাদের বাড়িতে আসিতেন। তখনকার কালে মেয়েদের গানবাজনা করিবার প্রথা ছিল না। আমার পিতাই কেবল তাহা মানেন নাই। আমাকে উৎসাহিত করিতেন, শিখাইতেন। রাজাবাহাদুররা আমার পিতাকে এ-দিকে উৎসাহ দিতেন। সে দিনে বিষ্ণু চক্রবর্তী বাড়ির গায়ক। তাঁহার নিকট ছোটো খেয়াল শিখিতাম। রামপ্রসাদ মিশ্র সেতার-শিক্ষক। বাড়িতে তখন বিদ্বজ্জন-সমাগম হইত। সৌরীন্দ্রমোহন ইত্যাদি আসিতেন। সে সময় আমি ও ভ্রাতা হিতেন্দ্র উভয়েই সকলের সামনে গাইতে বাধ্য হইতাম।

"জ্যোতিকাকার বাজনার সঙ্গে রবিকাকার গান, বড়ো পিসেমশায় সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বলা বাহুল্য বিষ্ণু চক্রবর্তী ইঁহাদের গান শুনিয়া সকলেই কী যে মোহিত হইতেন, তাহা বলিতে পারি না।"

হেমেন্দ্রনাথ গুরুদেবের সেজদাদা, বয়সে তাঁর থেকে সতেরো বৎসরের বড়ো ছিলেন। ইনিই বাড়ির ছোটোদের পড়াশুনার তদারক করতেন। প্রতিভাদেবী ছিলেন গুরুদেবের থেকে বয়সে পাঁচ বছরের ছোটো। ইনি 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় সরস্বতী-চরিত্র অভিনয় করে বিশেষ পরিচিত হয়েছিলেন।

সে যুগে অন্য কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবার চায় নি যে, বাড়ির মেয়েরা গানবাজনার চর্চা করুক; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের বাড়ির মেয়েরা গান গেয়ে নিজেরা যেমন আনন্দ পেয়েছেন তেমনি আনন্দ দিয়েছেন আর-সকলকে। এই পরিবারে স্বর্ণকুমারীদেবী প্রতিভাদেবী ইন্দিরাদেবী ও সরলাদেবীর নাম গায়িকা ও গীতরচয়িতা হিসাবে এখনও বাঙলাদেশের গুণী ও গায়ক মহলে সুপরিচিত। এ ছাড়া বাড়িতে ছেলে-মেয়েদের জন্য বিলাতি সংগীত, বেহালা, পিয়ানো ও অর্গান শেখাবারও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

মহর্ষির মৃত্যু (১৯০৫) পর্যন্ত জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ছেলেমেয়েদের সংগীত-শিক্ষার এই ব্যবস্থা অটুট ছিল। সব সময়েই কোনো-না-কোনো ভালো ওস্তাদ বা যন্ত্রী বাড়িতে শিক্ষকহিসাবে নিযুক্ত থাকতেন। শেষশিক্ষক ছিলেন রাধিকা গোস্বামী ও শ্যামসুন্দর মিশ্র। রাধিকা গোস্বামীর সংগীত-প্রতিভার প্রতি ঠাকুরবাড়ির সকলের কি রকম শ্রদ্ধা ছিল, গুরুদেবের প্রশস্তিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এক জায়গায় বলেছেন—

"রাধিকা গোস্বামীর কেবল যে গানের সংগ্রহ ও রাগরাগিণীর রূপজ্ঞান ছিল তা নয়, তিনি গানের মধ্যে বিশেষ একটি রসসঞ্চার করতে পারতেন। সেটা ছিল ওস্তাদির চেয়ে বেশি।"

মহর্ষির মৃত্যুর পর তাঁর পুত্ররা নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়লেন ও সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন প্রথাটিও বন্ধ হয়ে গেল। বাড়ির সংগীত-আবহাওয়া এত জমাট ছিল যে, সেই পরিবারে বাস করে গানবাজনা বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। তখনকার দিনে বাড়ির বধূরাও এই আবহাওয়ার মধ্যে আপনা থেকেই গানে পটুত্ব লাভ করতেন। অনেকেই ভালো গাইতে পারতেন।

বাড়ির অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মতো বিশেষ বিধিপূর্বক গুরুদেব গান শেখবার উদ্যম কখনও করেন নি। যদুভট্ট তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে জেদ ধরেছিলেন, তাঁকে ওস্তাদী রীতিতে গান শেখাবেনই। গুরুদেব কৌতুক ক'রে বলেছেন, সেইজন্যই তাঁর ভালো করে হিন্দীগান শেখাই হল না। তিনি গান শিখতেন লুকিয়ে-চুরিয়ে। বিষ্ণুর কাছে গান শেখার কথায় বলেছেন, আনমনে ব্রহ্মসংগীত আওড়িয়েছেন অনেক সময়, আবার যখন আপনা হতে মন লেগেছে তখন গান আদায় করেছেন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। সেই সময়ের কথা স্মরণ করে লিখেছেন—

"আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানচর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার অসুবিধাও ছিল। চেষ্টা করিয়া গান আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত অভ্যাস না হওয়াতে, শিক্ষা পাকা হয় নাই। সংগীতবিদ্যা বলিতে যাহা বোঝায় তাহার মধ্যে কোনো অধিকার লাভ করিতে পারি নাই।"

গুরুদেবের জীবনে গীতরচনার প্রথম প্রেরণা দিয়েছিলেন তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ হয়েও গুরুদেবের বাল্যকালেও তাঁকে কখনও বালক বলে অবজ্ঞা করেন নি, সমবয়সীর মতো ব্যবহার করেছেন প্রথম থেকেই। গুরুদেবের বয়স যখন চৌদ্দ তখন থেকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্ধুর মতো সঙ্গ দিয়ে নিজের রচিত সুরের খেলায় তাঁকে কথা বসাতে বলতেন। এইভাবেই গুরুদেবকে গানরচনার শিক্ষা তিনি দিতেন। এ সম্বন্ধে 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি বলেছেন—

"এক সময়ে পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নূতন নূতন সুর তৈরি করায় মাতিয়াছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার অঙ্গুলি নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরবর্ষণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সদ্যোজাত সুরগুলিকে কথা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিসি এইরূপে আমার আরম্ভ হইয়াছিল।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর আত্মচরিতে আরও পরিষ্কার ক'রে এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন—

"দুই পার্শ্বে অক্ষয়চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কাগজপেন্‌সিল লইয়া বসিতেন। আমি যেমনই একটি সুর রচনা করিলাম; অমনি ইঁহারা সুরের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ কথা বসাইয়া গান রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। একটি নূতন সুর তৈরী হইবামাত্র সেটি আরও কয়েকবার বাজাইয়া ইঁহাদিগকে শুনাইতাম। রবি কিন্তু বরাবর শান্তভাবেই ভাবাবেশে রচনা করিতেন। রবীন্দ্রনাথের চাঞ্চল্য ক্বচিৎ লক্ষিত হইত। অক্ষয়ের যত শীঘ্র হইত রবির রচনা তত শীঘ্র হইত না। সচরাচর গান বাঁধিয়া তাহাতে সুর সংযোগ করাই প্রচলিত রীতি। কিন্তু আমাদের পদ্ধতি ছিল উল্‌টা। সুরের অনুরূপ গান তৈরী হইত।"

অক্ষয়চন্দ্রের বয়স ছিল প্রায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমান। কাব্যজগতেও তাঁর কিছু প্রতিষ্ঠা ছিল। তবু সেই বয়সে গানরচনায় গুরুদেব অক্ষয়চন্দ্র অপেক্ষা কম কৃতিত্ব দেখান নি। এই প্রথায় রচিত কয়েকটি গান ছাড়া বাকি সবগুলিই গুরুদেব তাঁর আধুনিক সংগীতসংগ্রহের গ্রন্থ থেকে বাদ দিয়েছেন। প্রচলিত গানের বইয়ে আছে 'হায় রে সেই তো বসন্ত ফিরে এলো', ও 'হল না লো হল না সই'। এ পর্যন্ত যতদূর জানতে পারা গেছে, তাতে দেখা যায় গুরুদেব গানরচনা শুরু করেছিলেন তেরো-চোদ্দ বৎসর বয়স থেকেই। 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের জন্য লেখা এবং কিভাবে লেখা তার খবর রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগীদের সকলেরই জানা আছে। গানটি ১৮৭৫ সালের নভেম্বর মাসের পূর্বে রচিত। 'এক সূত্রে বাঁধা আছি সহস্রটি মন' ও 'তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ' এই গানদুটি সঞ্জীবনীসভার জন্য রচিত।

"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' সংগীতটি ১৮৭৭ থেকে ১৮৭৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে লিখিত। এই বোধ হয় তাঁর প্রথম রচিত ধর্মসংগীত। এই সবকটি গানের সুরযোজনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাত ছিল বলে মনে হয়। আনুমানিক ১৮৭৮ সালের এপ্রিল থেকে এই বৎসরের সেপ্টেম্বরের মধ্যে আহমদাবাদে বাস-কালে 'নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়', 'বলি ও আমার গোলাপবালা', 'শুন নলিনী

খোলো গো আঁখি', 'আঁধার শাখা উজল করি' গান ক'টিতে রবীন্দ্রনাথ নিজে স্বাধীন-ভাবে সুর দিয়েছিলেন। এই প্রথম স্বাধীন প্রচেষ্টা। এইভাবে গানরচনার শিক্ষা 'বাল্মীকিপ্রতিভা'-রচনা পর্যন্ত তিনি পেয়েছিলেন। অর্থাৎ, প্রায় ২১ বৎসর বয়স পর্যন্ত গানরচনায় তাঁর শিক্ষানবিসির যুগ। এই বয়স পর্যন্ত সুরযোজনায় নানা-প্রকার হিন্দী রাগরাগিণীই ছিল তাঁর একমাত্র অবলম্বন। তার কারণ জ্যোতিবাবুর মধ্যে হিন্দী রাগরাগিণীর প্রভাব ছিল অত্যন্ত অধিক, তবে সংস্কারবদ্ধ ওস্তাদের মতো তাঁর স্বভাব ছিল না। রাগসংগীতের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ থাকার দরুন সংগীতের ব্যাকরণেও তিনি ছিলেন পণ্ডিত।

লক্ষ্য করলে অনেকেই দেখবেন যে, বিলাতপ্রবাসের সময় থেকে 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র গান রচনার সময় পর্যন্ত গুরুদেবের গানে বাঙলাদেশের সর্বত্র প্রচলিত বাউল ভাটিয়ালি বা কীর্তনের প্রভাব কম। তখন পর্যন্ত তাঁর রচনায় হিন্দী রাগ-সংগীতের প্রভাব খুব বেশি। রামপ্রসাদী ও কয়েকটি মাত্র বিলেতি গানের সুর 'বাল্মীকিপ্রতিভা' নাটকে আমরা ব্যবহৃত হতে দেখি। 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে কীর্তনের ঢঙের গান ছাড়া, বাইশ-তেইশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাঁর রচিত ব্রহ্মসংগীতের একটিতেও বাঙলার কীর্তন বাউল প্রভৃতি সুর যোজিত হয় নি। এ থেকেই বোঝা যাবে যে তাঁর পরিবারে হিন্দুস্থানী রাগসংগীতের প্রভাব কতখানি ছিল। সেই কথা স্মরণ ক'রে তিনি বলেছেন—

"ছেলেবেলায় যে-সব গান সর্বদা আমার শোনা অভ্যাস ছিল, সে শখের দলের গান নয়; তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনা-আপনি জমে উঠেছিল।...কালোয়াতি সংগীতের রূপ ও রস সম্বন্ধে একটা সাধারণ সংস্কার ভিতরে ভিতরে আমার মনের মধ্যে পাকা হয়ে উঠেছিল।...ছেলেবেলা থেকে ভালো হিন্দু-স্থানী গান শুনে আসছি বলে তার মহত্ত্ব ও মাধুর্য সমস্ত মন দিয়েই স্বীকার করি। ভালো হিন্দুস্থানী গান আমাকে গভীর ভাবে মুগ্ধ করে।"

"অতি বাল্যকাল থেকে হিন্দুস্থানী সুরে আমার কান এবং প্রাণ ভর্তি হয়েছে।"

"বিষয়বস্তুহীন ছবির নিছক বিশুদ্ধ রূপ আমার ভালোই লাগে, যেমন ভালো লাগে বাক্যহারা সংগীতের আলাপ। বস্তুত আমার নিজের ঝোঁক ঐ দিকে।"

"আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করে। এই ধ্রুপদ গানে আমরা দুটো জিনিস পেয়েছি— এক দিকে তার বিপুলতা, গভীরতা, আর-এক দিকে তার আত্মদমন, সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা।"

"জনশ্রুতি আছে যে, আমি হিন্দুস্থানী গান জানি নে, বুঝি নে। আমার আদিযুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুবপদ্ধতির রাগরাগিণীর সাক্ষীদল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণ-সহ দূর ভাবী শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাদ-বিতণ্ডার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও সেই সংগীতকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি নে; সেই সংগীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি এ কথা যারা জানে না তারাই হিন্দুস্থানী সংগীত জানে না।"

হিন্দী উচ্চসংগীতের অনুসরণে ব্রহ্মসংগীতের সূত্রপাত করেন মহাত্মা রাম-

মোহন রায়। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রেরণায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির উৎসাহ এ বিষয়ে সকলের অগ্রণী হয়েছিল। ভাষা ভাব ও সুরের মিলনে গুরুদেবের রচনা শেষ পর্যন্ত সকলকে ছাড়িয়ে অনেক উপরে উঠে গেছে। অন্যদের রচনায় রসানুভূতি ও আত্মানুভূতির চেয়ে ধর্মের আবেগই বেশি প্রকাশ পেয়েছে। বাঙালির সংগীতের জগতে এই-সব গান যে কতখানি উপকার করেছিল, সেদিন হয়তো বাঙালি বুঝতে পারে নি কিন্তু আজ আমরা অনুভব করছি অন্তরে অন্তরে—গুরুদেবের গানের ভিতর দিয়ে। গুরুদেবের পিতা যে তাঁর সন্তানদের ভারতীয় সংগীতের ধ্যানের আদর্শের দিকে তুলে ধরতে পেরেছিলেন, এ তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও সত্যকার রসিক মনের গুণে। ভারতীয় সংগীতের ভিতর দিয়ে যে বৈরাগ্যের আনন্দ পাই, সেই বোধটি দেবেন্দ্রনাথের ছিল ও তাঁর প্রভাবে বা চেষ্টায় তাঁর পুত্রকন্যারাও সেটিকে উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু জীবনব্যাপী সাধনায় সে উপলব্ধিকে ফুটিয়ে তুলতে গুরুদেব যত দূর সমর্থ হয়েছিলেন, আর কেউ তত দূর পারেন নি। কুমোর নরম অবস্থায় যেভাবে মাটিকে গড়তে ইচ্ছা করে মাটি সেইভাবেই রূপ গ্রহণ করে। বাল্যকালে গুরুদেবের কাঁচা মনকে সংগীতের যে সুন্দর ও গম্ভীর আবহাওয়ার মধ্যে বড়ো করা হয়েছিল, সেইটিই চিরজীবনের মতো তাঁর প্রতিভার বৈশিষ্ট্য হয়ে রইল, যাতে শেষ জীবনে তিনি বলতে পেরেছিলেন—

"মুক্তি যে আমারে তাই সংগীতের মাঝে দেয় সাড়া।"

সুরধর্মী কবিতা ও গান

গানে গুরুদেবের দান নিয়ে যখন আলোচনা করব, তখন একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তিনি একজন উঁচুদরের কবি। তাঁর ভিতরকার কবি-প্রকৃতিও গানে তাঁকে বিশেষ প্রেরণা জুগিয়েছে। সুতরাং তাঁর কবি-মনকে বাদ দিয়ে তাঁকে কেবল সংগীতের সুরকার হিসাবে বিচার করা যুক্তিযুক্ত নয়। তাঁর রচিত গানে কথা ও সুরের মিলনের একটা সুন্দর রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। আধুনিক বাঙলা গানের গতি গুরুদেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত, এ কথা আজ সকলেই স্বীকার করেন। কথা ও সুরের মিলনে গুরুদেবের প্রেরণার মূল কী, সে বিষয়েও ভাবা দরকার। আমার মনে হয়, এ হল বাঙালির গানের চিরন্তন রীতি।

পূর্বে আমাদের দেশে কবিতামাত্রই ছিল সুরধর্মী, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমাদের কবিরা লক্ষ্য করলেন গীতিকবিতায় সুরের প্রয়োজন থাকে না, যদি ছন্দে ও ভাবে কবিতাটি নিখুঁত হয়ে ওঠে। সুতরাং গীতিকাব্য-রচনা কবিদের পক্ষে অনেক সহজ হয়ে উঠল। শোনা যায়, আগেকার দিনের কবিরা প্রায়ই সুরজ্ঞ গায়ক হতেন। কারণ, তখনকার সমাজে গান ছিল অত্যাবশ্যক। সুতরাং সুরজ্ঞান কিছুটা আপনা হতেই হত। পাশ্চাত্য প্রভাবে এ যুগে সুরের প্রভাব মানবজীবনে যদিও কমে গেল, কিন্তু আমাদের দেশের রক্তে যে আবেগ এত দিন ধরে বয়ে এসেছে তাকে দূর করা সম্ভব হল না। তাই বাঙলাদেশে গত একশো বছরে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় বর্ধিত হয়েও, যে কবিই গান জানতেন তিনি কেবল কবিতা লেখেন নি, গানও রচনা করেছেন ও গীতিকবিতাকেই গ্রহণ করেছেন গানরচনার অবলম্বনরূপে। এ পথে এ যুগে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন তাঁরা সকলে গীতিকাব্যের কবি। পাশ্চাত্য প্রভাব আমাদের অগায়ক কবিদের অনেক সুবিধা করে থাকলেও, সমগ্রভাবে কবিদের অন্তর্নিহিত ইচ্ছাটি কোন্ দিকে ধাবিত হচ্ছে তা ভালো করে বুঝতে পারি গুরুদেব ও এ যুগের অন্যান্য খ্যাতনামা গীতরচয়িতাদের লক্ষ্য করে। কবি জয়দেবের সময় থেকে আজ পর্যন্ত এই আট শত বৎসর ধরে এ ধারার কোনো ব্যতিক্রম দেখি না। গীতিকবিতায় সুরযোজনা ক'রে গাইতে গেলে আপনা-হতেই কবির অন্তর চাইবে, যে ভাব কবিতার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করা গেল না সে ভাব সুরের সাহায্যে পরিস্ফুট হোক; এ ক্ষেত্রে সুর যদি কথার ভাবকে অনুসরণ না করে তবে কখনো গানের মূল আদর্শটি বজায় থাকে না। তাই গীতিকাব্যের দেশ বাঙলায় আমরা বরাবরই দেখে এলাম সুরের সঙ্গে কথার একটি সুন্দর মিলনের রূপ। সংগীতপ্রিয় বাঙালির হাতে তা হতেই বাধ্য।

পশ্চিমের হিন্দী উচ্চাঙ্গসংগীতের রচয়িতারা যদি সব উঁচুদরের গীতিকবি হতেন, তা হলে হিন্দী সংগীতের রূপ কিরূপ দাঁড়াত তা বলতে পারি না।

প্রাচীন কালে অন্যান্য বাঙালি কবি যা করেছেন, বাঙলার কবি গুরুদেবও তাই করেছেন। প্রাচীন রাগসংগীতের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তিনি আপন মনে নানা ভাবের গান তৈরি করেছেন। তিনি রাগসংগীতের সঙ্গে রচনায় পাল্লা দিতে যান নি, বা তার প্রয়োজনও ছিল না। তাঁর কবিমন ভিতরের আবেগে কথা ও সুরের

উপর ভর ক'রে তাঁর প্রাণের নানা প্রকার আনন্দের অনুভূতিকে ব্যক্ত করেছে মাত্র। সুতরাং রাগসংগীত একমাত্র সংগীত, রবীন্দ্রসংগীত সংগীত নয়; বা আধুনিক কালের উপযোগী গুরুদেবের সংগীতই একমাত্র সংগীত, অন্যান্য প্রাচীন সংগীতের কোনো সার্থকতা নেই—এ ভাবের যে-কোনো মতবাদই ভ্রান্ত। নিজের গানের বিষয়ে গুরুদেবের মত হল এই যে "যারা খেটে খায়, অফিসে যায়, তাদের পক্ষে এ-সব গান [ওস্তাদি] হয়ে উঠে না; তাদের পক্ষে ওস্তাদের মতো গলা সাধা শক্ত। সেই-জন্যে এখনকার গান ব্যাবসাদারীর বাইরে থাকাই ভালো। গান হবে যাতে যারা আশেপাশে থাকে তারা খুশি হয়...বাইরে হাততালি পাবার জন্যে নয়। ওস্তাদ যাঁরা তাঁদের জন্যে ভাবনা নেই; ভাবনা হচ্ছে যারা গানকে সাদাসিধে রূপে মনের আনন্দের জন্য পেতে চায় তাদের জন্যে।...আমার গান যদি শিখতে চাও, নিরালায় স্বগত নাওয়ার ঘরে কিংবা এমনি সব জায়গায় গলা ছেড়ে গাবে। আমার আকাঙ্ক্ষার দৌড় এই পর্যন্ত, এর খুব বেশি ambition মনে নাই রাখলে।"

এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, গুরুদেবের পূর্বে গীতিকবিতা যে ছন্দে ও যেরূপ স্তবকবিভাগে রূপ গ্রহণ করত, গুরুদেবের আমলে তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমি বলছি, কবিতার দৈর্ঘ্য ও তার গঠনের দিক স্মরণ ক'রে। তাঁর গানে ধ্রুপদের মতো চারটি ভাগ থাকে, যেমন—স্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী ও আভোগ। এই ভাগ তিনি ধ্রুপদের অনুকরণ ক'রে পেয়েছিলেন। এই এক-একটি ভাগকে কখনো সাজিয়েছেন দুই তিন বা চার পংক্তিতে, কখনো দুই পংক্তির স্থায়ী ও তিন পংক্তির অন্তরাতে। তাঁর গানে এইরকম ভাগই বেশি দেখা যায়। গানগুলি কাব্যধর্মী হওয়াতে সুর ছাড়াও পাঠকের মন ভাবরসে বিভোর হয়ে ওঠে। বহু পাঠক কবিতার মতো ছন্দে সেগুলো পাঠ ক'রে তৃপ্ত হন। তাই 'গীতাঞ্জলি' 'গীতালি' 'গীতিমাল্য' প্রভৃতি গানের বইগুলি রবীন্দ্রকাব্যসমালোচনায় কবিতা হিসাবেই আলোচিত হয়ে থাকে। এই কারণেই দেশে অন্যান্য কবিদের মধ্যে ঐরূপ স্তবক বিভাগ ক'রে গীতিকবিতা-রচনার রীতি দাঁড়িয়ে গেল। আগেকার দিনে, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে, বাঙলাদেশে থিয়েটার বা যাত্রার জন্যে ছোটো গান রচিত হত। এর বেশির ভাগ গানই ছিল প্রেমসংগীত। এর ভাষা ও ভাব হত খুব সহজ ও সরল। এ ধরনের গানরচনার প্রধান আদর্শ হল—হিন্দী টপ্পাসংগীত। নিধুবাবু প্রথম যখন বাঙলা ভাষায় টপ্পাসংগীত রচনা করলেন তখন তিনি হিন্দী টপ্পার আদর্শ গ্রহণ করেন। কীর্তনের প্রেমসংগীতের পর বাঙালিসমাজ নূতন ধরনের এই প্রেমসংগীত পেয়ে খুবই মজে গিয়েছিল। তাই সমস্ত ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রেম-সংগীত মাত্রই নিধুবাবু-প্রবর্তিত আদর্শে রচিত হত। প্রথম বয়সে গুরুদেবের রচনায় ঐ রকমের ছোটো ছোটো অনেকগুলি প্রেমসংগীত পাব যার আদর্শ ছিল সেকালের টপ্পা-প্রভাবান্বিত বাঙলা প্রেমসংগীত। গুরুদেবের মধ্যজীবনের অনেক প্রেমসংগীত এইভাবে রচিত। পরবর্তী জীবনে এই প্রভাব অতিক্রম করে তিনি নিজের মৌলিক সৃজনশক্তির প্রকাশ দেখাতে পেরেছিলেন। প্রেমসংগীত লিখতে হলেই যে কীর্তনের কিংবা নিধুবাবু-রচিত গানের পংক্তিগঠনকে আদর্শ করে গান লিখতে হবে এইরকম মনোভাব থেকে বাঙলা গানকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

গুরুদেব প্রায়ই বলতেন, "প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি গানে, আশা করি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব-বাৎলাবার জন্যে নয়, রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন।" সুরের দিক থেকেও তাঁর প্রথম বয়সের সৃষ্টির সঙ্গে পরিণত বয়সের সৃষ্টির এই পার্থক্য। তাঁর প্রথম বয়সের সুরসৃষ্টিতে ভাবপ্রকাশে ব্যথিত হৃদয়ের প্রয়োজনটাই তাই এত বড়ো হয়ে উঠেছে। কল্পনার রূপলীলা তাতে বড়ো স্থান পায় নি।

১২৯৫ সালে প্রকাশিত 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যে 'আমি কারেও বুঝি নে শুধু বুঝেছি তোমারে' গানটি বেহাগরাগিণীতে রচিত। এই গানটির ভাব ও ভাষার প্রতি লক্ষ ক'রে ১৩৪৬ সালে আবার লিখলেন 'ওগো যে ছিল আমার স্বপনচারিণী তারে বুঝিতে পারি নি' গানটি। এই দুটি গানের ভাব ভাষা ও সুরের গঠনে যে পার্থক্য ঘটেছে, তার দ্বারা উপরের কথাগুলি আরও পরিষ্কারভাবে বুঝতে সুবিধা হবে। ঠিক এই কারণেই ১২৯৫ সালের 'মায়ার খেলা'কে ১৩৪৬ সালে যে ভাবে পরিবর্তন করছিলেন, তা যদি সম্পন্ন ক'রে যেতে পারতেন তা হ'লে নূতন 'মায়ার খেলা' আমরা দেখতে পেতাম। নাটকের চরিত্রগুলির দুর্বল ভাবালুতা তিনি পছন্দ করেন নি, তার আমূল পরিবর্তন করবার দিকে বিশেষ ঝোঁক দিয়েছিলেন। এই মনোবৃত্তি কেবল গানের ক্ষেত্রে নয়, কাব্যে নাটকে সর্বত্রই প্রকাশ পেয়েছে।

তবুও জনসাধারণের কাছে এই অল্প বয়সের গানগুলি ভালো লাগে কেন? বিশেষ ক'রে বলতে পারি যে, আমাদের জীবনে এই-সব গানের ভাব ও ভাষা, সুরে মিশে আমাদের মনে যত সহজে ধাক্কা দেয়, তেমন সহজে পরবর্তী জীবনের গান-গুলি মনে জায়গা পায় না। তার জন্যে নিজেকে তৈরি করার প্রয়োজন হয়, সেগুলি সংস্কৃতিমান মনের খোরাক। আগের দিনের ব্রহ্মসংগীত 'হৃদয়বেদনা বহিয়া প্রভু এসেছি তব দ্বারে' ও 'আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় ব'লে' বা 'অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে' গানের সঙ্গে ১৩৩৪ সালের মাঘোৎসবের গান—'তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে', 'নীরবে আছ কেন বাহির দুয়ারে', 'আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে' গানগুলি তুলনা করতে বলি। গুরুদেবের শেষ জীবনের গান এক দল পছন্দ করেন সুরের বৈচিত্র্যের জন্যে, আর-এক দল করেন কেবল ভাবের দিক বিচার ক'রে। কিন্তু উভয় দিক থেকেই যাঁরা গুরুদেবের গান ভালোবাসেন তাঁদের সংখ্যা বাঙলাদেশে এখনো অত্যন্ত কম। প্রথম বয়সের গানগুলি মানুষের জীবনের সাধারণ আবেষ্টন ও চিন্তার সঙ্গে এত সহজে খাপ খেয়ে যায় যে, তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে কোনো কষ্টই হয় না। কিন্তু পরবর্তী জীবনের রচনা সে রকমের নয়। মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ মিলন-বিরহের মধ্যেই সে পূর্ণতা খোঁজে নি, এ সময়ের গান ব্যক্তিকে ছাপিয়ে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে জায়গা নিয়েছে। কোনো কৃতী সমালোচকের ভাষায় বলতে পারি, "কবির ব্যক্তিগত অনুভূতিকে আশ্রয় করে বেশির ভাগ তা যায় নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বমানবের দিকে।" এবং এ সময়ের ধর্মসংগীতে প্রেম-সংগীতে পার্থক্য রাখাও সেই কারণে কঠিন। "ভগবৎভক্তি ও মানবিক প্রেমানুভূতি তাঁর গানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। বিশ্বজীবনের সঙ্গে মানবজীবনের যে ঐক্য আছে সেই অনুভূতির আনন্দ বা রসেই তাঁর গান ভরপুর।"

এ যুগের আরম্ভ কবির মধ্যজীবন থেকে। তখন থেকেই এই পরিবর্তন সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে। চিন্তা, কল্পনা, কবিত্ব, সুর, সব দিক দিয়েই এই মানসিক পরিবর্তন লক্ষণীয়।

রাগিণীর সহজ সরল স্বরগঠনই হল রাগিণীর মূল কাঠামো। তার একটা নিয়ম আছে। এর উপরে দাঁড়িয়েই গায়করা গানে সুরবিস্তার করে। তাকে বলা চলে রাগিণীর রূপকল্পনা।

ওস্তাদরা এই প্রকার রূপকল্পনায় রাগিণীর স্বরগঠনটি ঠিক রাখেন, তার বদল পছন্দ করেন না। গানে তাঁরা রাগিণীর ভাবরসটিকে প্রথমে স্থান দেন না, স্থান দেন রাগরূপকে। রসটি থাকে গৌণরূপে। রাগরূপের উপর বিশেষ জোর দেওয়ার অর্থ হয়তো এই যে প্রাচীন স্রষ্টারা ভেবেছিলেন, নিখুঁতভাবে কোনো রূপকল্পনাকে যদি গড়ে তোলা যায় তা হলে তার সাহায্যেই রসলোকে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব। নিখুঁত রূপকল্পনার ভিতর দিয়ে যে ইঙ্গিত আমরা পাই সে হল পরিপূর্ণতার ইঙ্গিত। সেই ইঙ্গিতেই আমাদের মনে আনন্দের বা রসের সঞ্চার করে। যে-কোনো রকমের নিখুঁত রূপকল্পনায় কোনো-না কোনো ভাবের বা রসের ইঙ্গিত মিলবেই। ভাবহীন রূপকল্পনাকে কোনো যুগেই মানুষ আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে নি। বরং অশ্রদ্ধাই করেছে। নৈর্ব্যক্তিক (abstract) রূপকল্পনার মধ্যেও কোন-না কোনো ভাব বা রসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যদি রূপ নিখুঁত হয়।

গুরুদেব রাগিণীর রূপসৃষ্টিতে ভাবকে করলেন মুখ্য আর রূপকে করলেন গৌণ। তাঁর চিন্তায় ভাব কিংবা রস আধারনিরপেক্ষ নয়। রূপের ভিতর দিয়েই রস। আবার রস নিখুঁত রূপেই পর্যবসিত।

তিনি নানা রাগরাগিণীর গান শিখেছিলেন হিন্দী ও বাঙলা ভাষায়। সেই-সব রাগিণীতে বাঁধা গান তাঁর মনে বিশেষ ভাবে গাঁথা ছিল। গানের কথার ভাবটি যে কেবল গুরুদেবের মন আকর্ষণ করত তা নয়, গানের রাগিণীও তাঁর মনকে গভীর ভাবে নাড়া দিত। অথচ এই-সব রাগিণীর মূল স্বরগঠন-প্রণালীর সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ অভিনিবেশ ছিল না। তিনি বিস্তারিত ভাবে জানতেন না এই-সব রাগিণীর ব্যাকরণগত নিয়ম। এই বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন—

"চেষ্টা করিয়া গান আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত অভ্যাস না হওয়াতে, শিক্ষা পাকা হয় নাই। সংগীতবিদ্যা বলিতে যাহা বোঝায় তাহার মধ্যে কোনো অধিকার লাভ করিতে পারি নাই।"

"দিনুকে যখন আমার গান শেখাতুম তিনি হঠাৎ হয়তো বলে উঠতেন, এইখানে কোমল নিখাদ লেগেছে। আমি অবাক হয়ে বলতুম, তাই নাকি? ছেলেবেলায় দেখেছি আমাদের বাড়িতে বড়ো বড়ো গাইয়েদের আনাগোনা, শুনেছি অনেক গান, কিন্তু গান শেখার মতো করে কখনো শিখি নি।"

"সুরের সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা থাকা সত্ত্বেও আমার মন তার অভ্যাসে বাঁধা পড়ে নি," কিন্তু রাগিণীতে বাঁধা নানা চালের ও ভাষার গানগুলি গেয়ে গেয়ে এমন একটা অভ্যাস তাঁর মনে গড়ে উঠেছিল যে রাগিণীর সমগ্র ভাব বা রসের আবেদনে তিনি রাগিণীকে চিনতে পারতেন। রাগিণীর সমগ্র ভাবরূপটিই

হল তাঁর গানের সুরের রূপকল্পনার আধার। আবার ভাব বা রস আধার-ছাড়া নয় ব'লেই রাগিণীর কাঠামোয় ও গানের কথায় তাকে রূপায়িত করে তুলেছেন। এই কারণেই ভাবরূপকে মুখ্য করেই গানের সুর বৈচিত্র্য পেয়েছে। এই বৈচিত্র্য জাগে খুশির সৃষ্টিলীলায়। গান গাইতে প্রাণ চাইছে, তাই গান প্রকাশ পাচ্ছে। এর জন্যেই গুরুদেব গানকে অহেতুক সৃষ্টিলীলা বলেছেন বারে বারে। যেমন পাপড়ি রঙ ও গন্ধ নিয়ে ফুল ফুটে ওঠে আপনা থেকে গাছে—আপনি ঝরে যায়। যেমন নূতন কচি পাতার উপর সকালের রৌদ্রের খেলা। এতে আনন্দ পাই কিন্তু সে আনন্দ পাবার জন্যে গাছটাকে, পাতাকে, পাপড়িকে, রঙকে আলাদা করে জানবার প্রয়োজন হয় না। তবে এটাও ঠিক যে এই গাছ পাতা আলো না হ'লে এই আনন্দরূপের প্রকাশও অসম্ভব।

গুরুদেবের গানে তাই কেবল রাগরাগিণীর বিচার, বা কেবল কথার বিচার ক'রে গানের আনন্দ উপভোগ করা ঠিক ঐ কারণেই অসম্ভব। তাঁর গানের সুর রূপ থেকে রূপান্তরে বিচরণ করছে রাগিণীর রসলোকের উপর দাঁড়িয়ে। তাই তাঁর গানে আমরা যতই মিশ্র রাগিণী দেখি না কেন, এ মিশ্রণ সচেষ্ট কোনো পরিকল্পনায় উদ্ভূত নয়। গাছে ফুল ফুটে ওঠার মতো আপনা থেকে এ ফুটে উঠেছে। ভিতরের কোনো গূঢ় কারণ হয়তো থাকতে পারে, কিন্তু রহস্যের ব্যাখ্যা কি কেউ দিতে পারে?

গানের এই রূপকল্পনা এমন একটা অবচেতন মনের প্রকাশ যে, যখন সময় আসে, এ ফুলের মতনই আপনা থেকেই ফুটে ওঠে, আবার আপনা থেকেই ঝরে পড়ে। গুরুদেবের গানগুলিও ঠিক তাই, আপনা থেকে তাঁর মনে জেগে উঠত এবং কিছুকাল পরে গুরুদেব ভুলতেও পারতেন। সেই কারণেই তাঁকে খুবই নির্ভর করতে হয়েছে পরের উপর, গান ধ'রে রাখবার জন্যে। এ বিষয়ে তাঁর নিজের একটি উক্তি উল্লেখ-যোগ্য। তিনি বলেছেন—

"গান লিখি, তাতে সুর বসিয়ে গান গাই—এইটুকুই আমার আশু দরকার। আমার আর কবিত্বের দিন নেই। পূর্বেই বলেছি, ফুল চিরদিন ফোটে না—যদি ফুটত তো ফুটতই, তাগিদের কোনো দরকার হত না। এখন যা গান লিখি তা ভালো কি মন্দ, সে কথা ভাববার সময় নেই। যদি বল তবে ছাপাই কেন তার কারণ হচ্ছে, ওগুলি আমার একান্তই অন্তরের কথা, অতএব কারও না কারও অন্তরের কোনো প্রয়োজন মিটতে পারে—ও গান যার গাওয়ার দরকার সে একদিন গেয়ে ফেলে দিলেও ক্ষতি নেই, কেননা আমার যা দরকার তা হয়েছে। যিনি গোপনে অপূর্ণ প্রয়াসের পূর্ণতা সাধন করে দেন তাঁরই পদপীঠের তলায় এগুলি যদি বিছিয়ে দিতে পারি, এ জন্মের মতো তা হলেই আমার বকশিশ মিলে গেল।"

আমার মনে হয় তাঁর গানের রাগরাগিণীর ব্যাখ্যায় সংগীতপণ্ডিতদের এই দিকটা সর্বদাই মনে রাখা উচিত। তা না হলে বিশেষ ভ্রমে পড়বার সম্ভাবনা আছে। ভারতীয় সংগীতের ব্যাকরণগত কোনো অচল অটল মতবাদকে সামনে রেখে কি গুরুদেবের গানের রাগিণীর বিচার সম্ভব? কোন্ পদ্ধতিকে প্রামাণিক বলে ধরে তবে তার বিচার করব? এ ক্ষেত্রে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের কিংবা অন্য কোনো মতকে

প্রামাণিক বলে মানলে দেখা যাবে যে, যে গান গুরুদেব কেবল হিন্দী রাগসংগীতের কথা বদলে রচনা করেছেন তাও মিশ্র রাগিণীর গান, এবং তা হলেই তাঁর ব্যবহৃত রাগরাগিণীর ভিন্ন নাম দিতেই হবে।

আজ পণ্ডিতরা বিচার করে কোনো একটা নাম দিলেন, পরবর্তী যুগে আবার যে তার বদল হবে না তা কি কেউ বলতে পারে? একই দেশে, একই আদর্শে উদ্ভূত ভারতীয় সংগীত বিভক্ত হয়ে গিয়ে হল কর্ণাটি ও হিন্দুস্থানী সংগীত। আরও মজার ব্যাপার হল এই যে, উত্তরভারতের হিন্দুস্থানী সংগীত বলল 'বেলাবল' রাগিণী শুদ্ধ ঠাট, এ দিকে দক্ষিণীরা বলছে 'ভৈরোঁ'রাগের ঠাট তাদের মতে শুদ্ধ ঠাট। তারা যাকে বলছে 'টোড়ী', আমরা তাকে বলছি 'ভৈরবী'। তা ছাড়া, এক উত্তরভারতীয় সংগীতেই মতবাদের কত উত্থান-পতন হয়েছে যুগে যুগে! কই, তাকে অচল অনড় হয়ে থাকতে তো দেখি নি। এর থেকেই বোঝা যায়, এ সংগীত প্রবাহ-হীন জলাশয় নয়, সচল জলপ্রবাহ। সচল প্রাণের গতিতে সর্বদাই জাগে সৃষ্টির প্রবণতা, তা সে যত সামান্যই হোক তাতে কিছু আসে যায় না।

গুরুদেবের গান সৃষ্টির প্রবাহ। তাই কোনো স্থিতিশীল নিয়মকে প্রামাণিক বলে তার বিচার করতে বসা মূর্খতা। এ ভাবে বিচার যত না হয় ততই ভালো। কেবলমাত্র এইটুকুই বলা চলে যে, আগে এই নিয়ম চালু ছিল, তারই সংস্পর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এই রাগিণীর সৃষ্টি করলেন। তা না হলে গুরুদেবের ভাষায় বলতে হয় "গানের কাগজে রাগরাগিণীর নামনির্দেশ না থাকাই ভালো। নামের মধ্যে তর্কের হেতু থাকে, রূপের মধ্যে না। কোন্ রাগিণী গাওয়া হচ্ছে বলবার কোনো দরকার নেই। কী গাওয়া হচ্ছে সেইটেই মুখ্য কথা, কেননা তার সত্যতা তার নিজের মধ্যেই চরম। নামের সত্যতা দশের মুখে, সেই দশের মধ্যে মতের মিল না থাকতে পারে।"

ভারতীয় সংগীতে গুরুদেবের স্থান

বাংলাদেশে গুরুদেবের গানের সঙ্গে উচ্চাঙ্গ হিন্দী গানের সম্বন্ধ নিয়ে নানারূপ আলোচনা হয়ে থাকে। একদল বলেন, উচ্চাঙ্গের হিন্দী গান গাওয়ার সময় গায়কদের যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়, গুরুদেবের গানে তা থাকবে না কেন। অপর দল মনে করেন, সুরবিহারের যে স্বাধীনতা উচ্চাঙ্গের হিন্দী গানে আছে গায়কেরা তার অপব্যবহার করে সংগীতের ক্ষতি করেছেন, তাঁরা সুরের অলংকারের প্রতি বেশি জোর দেন বলে গানের সময় কথার কোনো মূল্যই খুঁজে পাওয়া যায় না। এইরূপ ত্রুটি গুরুদেবের গানে ঘটে নি। এ ছাড়া রাগ-মিশ্রণেও গুরুদেব হিন্দী উচ্চাঙ্গ সংগীতের বাধ্যবাধকতার নীতি ভেঙে গানে সুরযোজনায় যে মুক্তির আলো দেখিয়েছেন তা উচ্চাঙ্গ হিন্দী সংগীতের কাছে আদর্শ হওয়া উচিত। এই দ্বিতীয় দল দেখছেন গুরুদেবের গানে কথা ও সুরের সমান প্রাধান্য ও মিশ্রণ বিষয়ে মুক্ত-মনের পরিচয়। অর্থাৎ সহজ কথায় এই দাঁড়াচ্ছে যে, যেখানে উচ্চাঙ্গের হিন্দী গান মুক্তির পরিচয় দেয় সেখানে গুরুদেবের মন মুক্ত নয়, আবার গুরুদেবের মন গানে যেখানে মুক্ত সেখানে উচ্চাঙ্গের হিন্দী গান মুক্তির বিরোধী। উচ্চাঙ্গসংগীত এবং গুরুদেবের গান, বাইরে থেকে দুটির প্রকৃতিতে এই পার্থক্য বা ত্রুটি দেখা গেলেও তারা কেউ ভ্রান্ত পথে চালিত নয়। দুটিরই পথ সুনির্দিষ্ট, সুনিয়ন্ত্রিত। লক্ষ্যস্থল উভয়েরই এক। কেবল চলেছে দুই পথ ধরে।

রাগিণী, কথা ও ছন্দে মেশানো যে কণ্ঠসংগীত শুনি, তাকে আমরা বলি গান। এভাবে দেখলে দেখা যাবে যে, উচ্চাঙ্গ হিন্দী গান থেকে শুরু করে যাকে আমরা বলি 'লোকসংগীত' তার, সবই এক আদর্শে রচিত। এদের মধ্যে আসল পার্থক্য দেখা দেয় গায়কী নিয়ে। গাইবার সময় কে কোন্‌টার উপর বেশি জোর দিল তাই নিয়েই বিভেদ। এই গীত-রীতির প্রভেদেই গুরুদেবের গানের সঙ্গে উচ্চাঙ্গ হিন্দী গানের পার্থক্য। অথচ এই স্বীকৃত পার্থক্যের কথা ভুলে গিয়ে আমরা উভয়কে এক ভেবে তুলনামূলক সমালোচনা করতে বসি। সমালোচনায় এইরূপ ভুল পথ ধরেছি বলেই দুই সংগীতের মধ্যে দেখেছি বিরোধ। এই বিরোধের যে কোনো ভিত্তি নেই তা বুঝতে হলে প্রথমেই সমগ্রভাবে ভারতীয় কণ্ঠসংগীতের স্বরূপ নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার।

আমাদের দেশের, যাবতীয় সংগীতকে মূল দুই-ভাগে ভাগ করেছিলেন প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা। তাঁরা একটিকে বলেছেন 'মার্গ', অপরটিকে বলেছেন 'দেশী'। বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন,—

আলাপাদিনিবদ্ধো যঃ স চ মার্গ প্রকীর্তিতঃ।
আলাপাদিবিহীনস্তু স চ দেশী প্রকীর্তিতঃ ॥

অর্থাৎ আলাপ ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত গানকে বলা হয় 'মার্গ', আর আলাপ ইত্যাদি বিহীন যে গান তাকেই বলে 'দেশী'।

আমাদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা যে, 'মার্গ' সংগীতের পরিচয় ভারতীয় সংগীত থেকে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ধীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, সে

ধারার মৃত্যু ঘটে নি, সে আজও উচ্চাঙ্গের হিন্দী ও উচ্চাঙ্গের কর্ণাটি সংগীতের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে।

ভারতে ধর্ম বা দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, উপনিষদ্ ও বেদের যুগের মানুষ বিশ্বসৃষ্টির কারণটির ব্যাখ্যা যেভাবে করেছিলেন, এ যুগেও তার প্রভাব কমে নি। বিচিত্র শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত সেই চিন্তা আজও ভারতবাসীর মনে প্রেরণা জোগাচ্ছে। সংগীতেও তাই ঘটেছে। প্রাচীনযুগের 'আলাপ্যাদিনিবদ্ধো' মার্গ সংগীত-ধারাই যে এ যুগের উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সংগীতে বহুপরিমাণে মিশে তাকে পরিস্ফুট ও শ্রেষ্ঠ সংগীতে পরিণত করেছে, এ যুগের আলাপসংগীত ভারতের সেই একই প্রাচীন সংগীতেরই প্রতীক, কথাকে সুর বা রাগিণীর বিচিত্র অলংকারে সাজিয়ে গান গাইবার প্রথাটির ভিতর দিয়ে প্রাচীন যুগের 'মার্গ' সংগীতপদ্ধতিই যে তার চিহ্ন বহন করে চলেছে, এ কথাই বারে বারে মনে করিয়ে দেয়। যদি মৃত্যু ঘটেই থাকে তবে ঘটেছে মার্গ যুগের গানের ভাষার, গীত-পদ্ধতির নয়।

কথাহীন সুরের সাধনাকে সংগীতের শ্রেষ্ঠ পথ বলে মনে করতেন এবং সেই সাধনার উপরেই বিশেষ জোর দিতেন প্রাচীন সংগীতসাধক ঋষিরা। তাই সংগীতে একমাত্র ভারতবর্ষেই 'নাদব্রহ্ম' রূপ শব্দ নিয়ে দার্শনিক চিন্তার উদয় ও নাদোপাসনার ধারা দেখা দেয়। আর তাঁরাই 'অনাহত' সংগীতের কথা বললেন এবং 'আহত' সব শব্দকেই এই নাদের অন্তর্গত করে দেখলেন। যে আলাপপদ্ধতি আজ আমরা ভারতীয় সংগীতে দেখি, অনুমান করি তার উদ্ভব হয়েছিল মার্গ সংগীতপন্থীদেরই সাধনায়। কথাহীন রাগরাগিণীর আলাপ ভারতীয় সংগীতেরই একটি অপূর্ব সম্পদ। আর গভীর সাধনা ছাড়া এ সংগীতের উদ্ভাবনা কল্পনাই করা যায় না। সংগীত পণ্ডিতেরা বলেন যে, খাঁটি পদ্ধতিতে আলাপসংগীত যাঁর আয়ত্ত হয়েছে তাঁর পক্ষে উচ্চাঙ্গের ভারতীয় সংগীতের যাবতীয় পদ্ধতি গ্রহণের আর কোনো বাধা থাকে না। এমনও শোনা যায় যে, এই আলাপসংগীতের বিভিন্ন দিক নিয়েই সংগীতের নানা রকমের 'বাজ' বা গায়কীর উদ্ভব হয়েছে মুসলমান যুগে। একথা বলা ঠিক হবে না যে, বৈদিক যুগের মানুষ কথাযুক্ত সুরের সাধনা করে নি। কিন্তু কথাহীন সুরের সাধনাকেই তাঁরা সবচেয়ে বড় স্থান দিয়েছিলেন বলে মনে করি। এবং সেই প্রাচীন যুগের কথাহীন সুরের আলাপসংগীতের উদ্ভব ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোনো দেশে সম্ভব হয় নি এ কথাও গর্বের সঙ্গে বলা চলে।

প্রাচীনেরা মার্গ সংগীতের আলোচনাকালে বলেছেন যে, পাঁচ স্বরের কম কোনো রাগিণী হতে পারে না; বা তাকে রাগ বা রাগিণী বলে স্বীকার করা হবে না। সেই কারণে এক থেকে চার সুরের গানকে তাঁরা সংগীত-শাস্ত্রের আলোচনার মধ্যে স্থান দেন নি। এর একটা বড় কারণ হল আলাপে সুরবিহারের বা সুরবিস্তারের যে আদর্শ গায়কেরা স্বীকার করেছেন, কেবল এক থেকে চারটি স্বরের কোনো সুর দ্বারা তা সম্ভব নয়। অনেক আদিবাসীদের মধ্যে তিন সুরের গান আছে। কথা ছাড়াও শুনতে মিষ্টি লাগে। কিন্তু সেই গানের তিনটি স্বরে যে একটি সহজ করুণ বেদনা প্রকাশ পায় তাকে বিস্তার করার উপায় থাকে না। পাঁচ থেকে সাত সুরের

রাগিণীর মধ্যে ওস্তাদেরা সুরবিস্তারের সেই সুবিধাটুকু পান বলেই বোধহয় এই নিয়মটি করে গেছেন।

আজ আমরা উচ্চাঙ্গের হিন্দুস্থানী গানকে যে-ভাবে পাই তাতে দেখি সুর বা রাগ-রাগিণীর অলংকৃত বিস্তারেরই প্রাধান্য। ওস্তাদেরা কথাকে রাগিণীতে বেঁধে আলাপের ঢঙে বিস্তারের প্রাধান্য দিয়েই গান করেন। কথার মূলভাবের সঙ্গে মিশিয়ে রাগ-রাগিণী বসানো হলেও গায়কেরা রাগিণীকেই বড় করে দেখেন। এবং প্রাচীন আলাপনিবন্ধ সংগীতকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করার দরুনই বোধহয় আলাপ-সংগীতে পটু গাইয়েদের আমরা ভারতীয় সংগীতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপে সম্মান করি।

'দেশী' সংগীতকে পরিষ্কার করে বোঝাতে গিয়ে প্রাচীন শাস্ত্রকার আরো লিখছেন যে,—

অবলাবালগোপালৈঃ ক্ষিতিপালৈর্নিজেচ্ছয়া।
গীয়তে সানুরাগেণ স্বদেশে দেশিরুচ্যতে ॥

অর্থাৎ স্ত্রীলোক, বালক, রাখাল ও রাজা নিজের ইচ্ছায় অনুরাগের সঙ্গে নিজ নিজ দেশে যে গান গেয়ে থাকে, সেই গানই হল 'দেশী'।

এই বর্ণনাটুকু থেকে বেশ অনুমান করা যায় যে, আজকাল আমরা যাকে 'আধুনিক' ও 'লোকসংগীত' বলি, 'দেশী' সংগীত বলতে তাঁরা সেইরূপ কোনো-একপ্রকার সংগীতকেই বুঝতেন। সুতরাং ধরে নিতে হয় যে, এ সংগীতে কথার বিশেষ স্থান ছিল। রাগিণী ও ছন্দ তার সঙ্গে সমান আসন গ্রহণ ক'রে কথার রসকে আরো প্রাণবান করে তুলত। আলাপনিবন্ধ 'মার্গ' সংগীতের মত রাগিণী কথাকে ছাপিয়ে যেত না। রাগিণী চলত কথার সঙ্গে মিশে এক হয়ে। এ ছাড়া দেশী গান বলতে যে কেবলমাত্র ভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের দু-তিন সুরের গান বোঝায় না, সে কথারও প্রমাণ হয় সংগীতশাস্ত্রকারদের আলোচনা থেকে। এক শাস্ত্রকার বলছেন—

দেশীরাগাশ্চ সকলাঃ ষড়্‌জগ্রাম সমুদ্ভবাঃ।
গ্রহাংশন্যাসমন্দ্রাদি ষাড়বৌড়ব পূর্ণকাঃ ॥

অর্থাৎ গ্রহ অংশ ন্যাস মন্দ্র ষাড়ব ঔড়ব সম্পূর্ণ ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত দেশী রাগ মাত্রই ষড়্‌জগ্রাম থেকে উদ্ভূত।

উপরোক্ত শ্লোক পড়ে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, দেশী সংগীতের সুর এ যুগের উচ্চাঙ্গ সংগীতের মতনই নানা নিয়মে বাঁধা। কিন্তু তা হলেও মনে রাখতে হবে, প্রথমটির নির্দেশ অনুসারে জানা যাচ্ছে যে, এ সংগীত আলাপনিবন্ধ নয়। অর্থাৎ খ্যালকে যদি সুরবিহারের রীতিতে না গেয়ে কেবল আস্থায়ী অন্তরা সঞ্চারী ও আভোগের সুরটি গাওয়া হয়, তা হলে যা দাঁড়ায়, তাই। রাগিণীর দিক থেকে নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম না করেও এই ধরনের গান গাওয়া যায়। কিন্তু এ নিয়ম উচ্চাঙ্গ সংগীতের বেলা চলে না।

তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, ভারতের প্রাদেশিক ভাষার গান মাত্রই হল 'দেশী' গান। এবং সেই গানকেই যখন প্রাচীন মার্গ সংগীতের আদর্শে গাওয়া হয় তখনই তা উচ্চাঙ্গের ভারতীয় সংগীতের সম্মান পায়। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য কি সাক্ষ্য দেয় তা দেখা যাক।

আমরা ধ্রুপদকে উচ্চাঙ্গের হিন্দী গানের দলে স্থান দিই। এ গান আলাপচারী ওস্তাদ গুণীরা ছাড়া আর কেউ গায় না। কিন্তু এর প্রকৃত উৎসটি কি তা জানলে দেখা যাবে যে, পূর্বে এ একরকমের দেশী গান নামেই পরিচিত ছিল।

আইন-ই-আকবরী পুস্তকে সংগীতের আলোচনা অংশে ধ্রুপদ বিষয়ে যা লিখিত আছে ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারকৃত তার ইংরিজি অনুবাদ এখানে তুলে দিচ্ছি। বইটির লেখক আবুল ফজল বলছেন—

'The second kind is called Desi or applicable to the special locality, like the singing of the Dhrupad in Agra, Gwalior, Bari and the adjacent country."

এই গান যাঁরা গাইতেন তাঁরা হলেন—

"Kalawant or Bards, are well-known, and sing Dhrupad."

"The Dhadi women chiefly play on Daf and the Duhul, and sing the Dhrupad."

পাখোয়াজকে আজকাল আমরা ধ্রপদের উপযোগী বাজনা বলেই জানি কিন্তু আবুল ফজলের যুগে তার সম্মান কতটা ছিল তা বোঝা যায় যখন পড়ি—

"The Natwas exhibit some graceful dancing, and introduce various styles to which they sing. They play upon the Pakhāwaj, the Rabab and the Tāla."

"The kanjari: The men of this class play Pakhāwaj, the Rabab and the Tāla, while the women sing and dance."

এই লোকপ্রচলিত ধ্রুপদগান ও পাখোয়াজ মধ্যযুগের বৈষ্ণবধর্মাচার্যদের সহায়তায় সর্বস্তরের গানরূপে ছড়িয়ে পড়ল এবং এঁদের কাছ থেকেই সম্রাট ও রাজামহারাজাদের দরবারে কিভাবে তা দরবারী সংগীত রূপে স্থান পেয়ে উচ্চবর্ণের গানরূপে পরিচিত হল তারও একটি ইতিহাস আছে।

ভারতের বৈষ্ণব সমাজ শ্রী রুদ্র নিম্বার্ক ও মাধ্য এই চারভাগে বিভক্ত। ক্রমানুসারে এর প্রতিষ্ঠাতারা হলেন রামানুজাচার্য, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্কাচার্য ও মাধবাচার্য। চতুর্দশ খ্রীস্টাব্দ থেকে ষোড়শ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এই চার সম্প্রদায় পাঁচভাবে বিভক্ত হয়ে নাম নিল হরিদাস (নিম্বার্ক), চৈতন্য, রাধাবল্লভ, পুষ্টিমার্গ ও রামানন্দ। প্রথম চার দলের মূল ঘাঁটি ছিল বৃন্দাবন বা ব্রজ-অঞ্চল। নিম্বার্ক সম্প্রদায় এর মধ্যে সর্বপ্রাচীন। এদের মধ্যে থেকেই শ্রীভট্ট ও হরিব্যাসদেব ইত্যাদি কয়েকজন খ্যাতনামা বৈষ্ণব কবি ও গীতকারের আবির্ভাব হয়। তার মধ্যে স্বামী হরিদাসজী ছিলেন শ্রেষ্ঠ। মন্দিরের উপাসনার উপযোগী গান রচনায় ললিতকিশোর ও ভগবৎ-রসিক নামে তাঁর দুজন শিষ্য সে যুগে যথেষ্ট নাম করেছিলেন। হরিদাসজীকে এ যুগে আমরা বিশেষ করে জানি বৈজু রামদাস ও তানসেনের মত গুণীদের গুরু হিসেবে। এঁরা বৈষ্ণব ভক্তদের দলে না গিয়ে তখনকার দিনের সম্রাটের বা রাজা-মহারাজাদের দরবারে আশ্রয় নিলেন। সম্রাট আকবর নিজে ব্রজ-অঞ্চলের গাইয়েদের গান পছন্দ করতেন বলেই বোধ হয় দরবারের জন্যে তাঁদেরই সংগ্রহ করতেন।

বল্লভসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হলেন হিত হরিবংশজী। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর একজন ভক্তগায়ক ও গীতকার। এঁর গান পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব ভক্তদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে।

১৪৭৯ খ্রীস্টাব্দে বল্লভাচার্যের জন্ম। ইনি পুষ্টিমার্গ দলের প্রতিষ্ঠাতা। এঁর মতাবলম্বীদের অষ্টছাপ বলে। এই দল তাঁদের গানকে নানা নিয়মের দ্বারা বেঁধে দিয়েছিলেন। বল্লভাচার্য তাঁর সুযোগ্য শিষ্য কুম্ভনদাস, অন্ধ সুরদাস, পরমানন্দ-দাস, কৃষ্ণদাস ইত্যাদির সাহায্যে বৃন্দাবনের গোবর্ধনের মন্দিরে ভক্তির গান গাইবার সময় নিয়মাবন্ধ করেন। পরে এই সম্প্রদায়ের বিঠলনাথের উৎসাহে গোবিন্দস্বামী, নন্দদাস, চিৎস্বামী ও চতুর্ভুজদাস এই চারজন ভক্ত কবি একই পথে আরো গান রচনা করেন। এই সম্প্রদায়ের মোট এই আটজন গীতকার ভক্ত কবি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংঘই 'অষ্টছাপ' নামে পরিচিত। এঁদের এই গানের ধারাই অন্য গুণীদের দ্বারা ধনীদের দরবারে স্থান পায়।

অষ্টছাপ সম্প্রদায়ের গানকে বলা হয় কীর্তন। এবং এর গায়কদলকে বলে কীর্তনমণ্ডলী। এই গীতসম্প্রদায় ছিল গানে উদারপন্থী। তাই অন্য সম্প্রদায়ের ভক্তির গানকেও তাঁরা তাঁদের মন্দিরের উপাসনার জন্যে সংগ্রহ করতেন ও গাইতেন। এই ভাবে ধীরে ধীরে অষ্টছাপদের গান বেশ উন্নতি ও বিস্তারলাভ করে।

কি নিয়মে প্রাচীন বৈষ্ণব কবি গায়করা তাঁদের গানকে বেঁধেছিলেন তা সংক্ষেপে বলি। তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, প্রত্যেক প্রহরের সঙ্গে মিল রেখে কথা ও রাগিণী বসানো গান গাইতে হবে। বৈষ্ণবদের বড় বড় ঋতু উৎসবের গানগুলিও যেন এ নিয়ম থেকে বাদ না যায়। বৈষ্ণব গীতকার ভক্তরা তখনকার দিনে প্রচলিত সব রাগিণী ও তালেই গান রচনা করতেন। আর তার ভাষা ছিল সেই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা অর্থাৎ ব্রজভাষা। তাঁরা প্রত্যূষে গাইতেন ভৈরোঁ, বিভাস, দেবগান্ধার, রামকেলী, ললিত ইত্যাদি রাগিণীতে; একটু বেলা হলে গাইতেন বিলাবল, আশাবরী, তোড়ী; এর পরের গান ছিল সারঙ্গ বা গৌড় সারঙ্গ রাগিণীর গান; বিকেল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত শ্রী, গৌড়ী, পূর্বী, ধানশ্রী, পুড়ীয়া, কল্যাণ, কানাড়া, মল্লার, কেদার, বসন্ত, কাফী, জয়জয়ন্তী, হিন্দোল, মালকোষ, পরজ ইত্যাদি রাগিণী। কোন্ প্রহরে কখন গাইতে হবে তারও ছিল বিধিবন্ধ নিয়ম। এই-সব গান যে তালে গাওয়া হত তার নাম ছিল চৌতাল, ধামার, চর্চরী, সুরফাঁকতাল, আড়াচৌতাল, ত্রিতাল, রূপক ও দীপচন্দী। সহজ তালের অন্য গানও ছিল। গানের সঙ্গে রচয়িতার নাম জুড়ে দেওয়ার পদ্ধতি এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরাই ষোড়শ শতাব্দীতে চালু করেন। গানগুলি প্রচলিত ধ্রুপদের মত আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ নামে চারভাগে বিভক্ত। এইরূপ প্রাচীন ধারার বৈষ্ণব ভক্তদের গান আজও আমরা শুনতে পাই উদয়পুরের নাথদ্বারা ও গুজরাতের কোনো কোনো মন্দিরে পাখোয়াজ, করতাল, তানপুরা ও সারেঙ্গী সহযোগে। তাঁরা সেইসব গানকে এখনো ইচ্ছামত বাড়াতে বা কমাতে পারেন না গাইবার সময়। এবং এই গানকে তাঁরা বলেন 'কীর্তন' ও দলকে বলেন কীর্তন-মণ্ডলী। আমি নিজে যখন এইরূপ একটি মণ্ডলীর গান শুনি তখন দেখেছি মূল গাইয়ে একজন, তার পিছনে আছে দশ-বারজন দোহার বা গানের দল। সঙ্গে আছে

পাখোয়াজী, একজন সারেঙ্গী ও তানপুরাবাদক। করতালটি আকারে অবিকল বাংলা-দেশের কীর্তনের করতালের মত। বাজাচ্ছিল দুই হাতে মূল গায়ক ও তার সঙ্গী কয়েকজন, পাখোয়াজের বোলের সঙ্গে মিলিয়ে নানা ছন্দে। প্রত্যেক রাগিণীতে আলাপও তারা করে, কিন্তু সে আলাপ এ যুগের ওস্তাদের মত বিস্তীর্ণভাবে নয়। খুবই সামান্য। ধ্রুপদের মত নানা ছন্দে বোলতান, দুগুণ, চৌগুণ তারা করে। দেখা গেল, মূল গায়ক এক লাইন গেয়ে যখন ছেড়ে দিল তখন দোহার দল একসঙ্গে তার পুনরুক্তি করছে। তারা যে ক'টি গান গাইল তা প্রাচীন প্রথানুসারেই এবং সেগুলির সবই ছিল মধ্যযুগের ভক্ত কবিদের রচনা।

প্রাচীনযুগের এই-সব বৈষ্ণব সংগীতসাধকেরা গ্রামপ্রচলিত সহজ ভাষায় ধ্রুপদ ও ধামারের ঢঙে রচনা করেছিলেন তাঁদের গান। তার সঙ্গে প্রাচীন মার্গ-পদ্ধতিকে তাঁরা মিশিয়েছিলেন মাত্র। তাঁদের সাহায্যেই মার্গ-ধারা মিশ্রিত ব্রজ-অঞ্চলের দেশী গান দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় দরবারী বা উচ্চাঙ্গের সংগীতে বিখ্যাত হয়ে উঠল।

অষ্টাদশ শতকে সদারঙ্গ ও অদারঙ্গের মত তানসেন-বংশীয় গুণী ধ্রুপদীয়ারা 'জিকির' বা 'কাওয়ালী' নামে এক রকমের লোকপ্রচলিত গানের সঙ্গে মার্গ-পদ্ধতির গায়কী মিশিয়ে খেয়ালের প্রবর্তন করেন। ক্রমে খেয়াল গান মার্গ-সংগীতের এত-খানি অনুরাগী হয়ে পড়ল যে, রাগিণী বা সুরের তানবিস্তার তখন হয়ে উঠল তার একমাত্র লক্ষ্য। এ যুগের বড় খেয়াল তার একটি ভাল নমুনা। হিন্দী টপ্পা গানের উদ্ভব পাঞ্জাব অঞ্চলের উটচালকদের দ্বারা গীত এক প্রকার দেশী গান থেকে। এ যুগের সুপরিচিত ঠুংরী গান যে এক সময়ে অযোধ্যা অঞ্চলের দেশী গান রূপে পরিচিত ছিল এ কথা সকলেই জানেন। ঐ কারণে গত শতাব্দীর ওস্তাদমহলে ঠুংরী গানের প্রতি বেশ একটু অবজ্ঞা প্রকাশ পেত। এখনো পর্যন্ত আর যে সব হিন্দী ভাষার দেশী গান মার্গ-পদ্ধতির সাহায্যে তাদের দেশীভাব এখনও ঘোচাতে পারে নি, তারা হল ভজন, দোঁহা, পদ, চৈতী, কাজরী ইত্যাদি গানগুলি। কিন্তু জাতে ওঠবার চেষ্টা যে তাদের মধ্যে নেই তা বলা যায় না। আজকাল একদল ওস্তাদ উচ্চাঙ্গ হিন্দী সংগীতের আসরে ভজন, চৈতী, কাজরী যে ভাবে তান ও সুরবিস্তার দ্বারা গাইছেন তাতে উচ্চাঙ্গ সংগীতে তার স্থান হতে বেশি দেরি হবে বলে মনে হয় না। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী গান যে প্রচলিত দেশী গান থেকেই জন্মেছে তার আর একটি বড় কারণ হল তাদের ভাষা। অর্থাৎ ঐ গানের ভাষা হল গ্রাম-অঞ্চলের মানুষের সহজ ভাষা। আজও ওস্তাদেরা সেই ভাষাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন সেই ভাষাতে গান গেয়ে। এবং এই ভাষার সঙ্গে অধুনাগীত পল্লীসমাজের ভজন, দোঁহা, চৈতী, কাজরী ইত্যাদি গানের ভাষার কোনো অমিল নেই। আজ আমরা উচ্চাঙ্গের হিন্দী গানকে যেভাবে দেখছি এর উৎপত্তি হল ঐ মার্গ ও দেশী গানকে এক-করে মিলিয়ে গাইবার যে চেষ্টা গায়কদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, তা থেকে। এই ভাবে এক করে নেবার চেষ্টা ভারতীয় সংগীতে বহুবার হয়েছে। যুগে যুগে কত রকম নতুন নতুন সুর মার্গ-সংগীত সংগ্রহ করেছে নানা রকমের দেশী গান থেকে। পরে তাকে নিয়মের দ্বারা সাজিয়ে রাগরাগিণীর দলে বসানো হয়েছে। এর থেকেই বেশ বোঝা যায় যে, উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রচারকদের মত খুবই উদার ছিল। সুতরাং

তাঁরা যে পরিবর্তনের পক্ষপাতী নন, এ কথা বলা তাঁদের প্রতি অবিচার করা। তবে তাঁরা যে নিয়মের কথা বলেছেন, সে নিয়মের বাঁধুনি না থাকলে রাগ-রাগিণীর এই যে বিরাট সাম্রাজ্য ভারতীয় সংগীতজ্ঞদের এত যুগের সাধনায় গড়ে উঠল তা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেত। ভারতীয় সংগীতের রাগ-রাগিণীর চিন্তার এই এত বড় সম্পদ ঐ নিয়মের বাঁধন ছাড়া কোনো মতেই টিকতে পারে না। অর্থাৎ রাগ-রাগিণীর স্বরূপ প্রকাশের জন্যে আরোহী অবরোহী, বাদী সম্বাদী, অনুবাদী, পকড় ইত্যাদি নামে যে নিয়মগুলো তাঁরা আবিষ্কার করে গেছেন, তা অস্বীকার করলে ভারতীয় উচ্চাঙ্গের বা মার্গ সংগীতের কোনো অস্তিত্বই থাকত না।

কোনো গানকে মার্গ সংগীতের আদর্শে বা উচ্চাঙ্গ হিন্দী গানের ঢঙে গাইতে গেলেই ওস্তাদেরা গানের সুর বা রাগিণী, তাল বা ছন্দকে মুখ্য করে কথাকে গৌণ রূপে খাড়া করতে বাধ্য হন। তখন গানের সুর বা রাগিণীকে নানারূপ ছন্দোবহুল বিস্তার ও তানে প্রকাশ করবার দিকে থাকে তাঁদের বিশেষ ঝোঁক। এখানে গায়কেরা কথাকে যে স্থান দেন তার সঙ্গে তুলনা করা চলে আমাদের বাংলাদেশের প্রতিমার ভিতরকার বাঁশ ও খড়ের তৈরি কাঠামোটিকে। তাকে একেবারে গোপন করে মূর্তিকেই সকলের সামনে সুন্দর ছন্দোময় গঠনে, গড়নে, রঙের ছোপ ও তুলির টান-টোন ইত্যাদির বিচিত্র অলংকারে সাজিয়ে তোলেন। হিন্দী উচ্চাঙ্গ সংগীতও তাই করে। উচ্চাঙ্গ হিন্দী গানের মূল উদ্দেশ্য হল সুর বা রাগিণীর সাহায্যে অহেতুক আনন্দের সাধনা। তাই গাইয়েদের কাছে কথা থাকা না থাকা সমান। যে কারণে কণ্ঠসংগীতে যাঁরা কথাহীন রাগ-রাগিণীর আলাপে পটু তাঁদের আমরা আমাদের সংগীতের সব চেয়ে বড় শিল্পী হিসেবে শ্রদ্ধা করি। এ রকম অনেক সংগীতশিল্পী আছেন যাঁরা কথা-নিরপেক্ষ সুরের বা রাগিণীর আলাপের দক্ষতাকে মনে করেন সংগীতসাধনার শেষ পরিণাম। যে সাধক সুরের সাধনায় এই পর্যায়ে উঠতে পারেন তাঁর কাছে সংগীতের আর-কোনো পথ পছন্দ হয় না। তাঁর কাছে কথা তখন অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়।

উচ্চাঙ্গের ভারতীয় সংগীতের সুর-জগৎকে রাগ-রাগিণীর জগৎ বলা হয়। এই জিনিসটি ভারতীয় সংগীতের অতি মূল্যবান সম্পদ, যা পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। আসলে রাগ-রাগিণী হল লিরিক কবিতার মত সুরের সাহায্যে মানুষের হৃদয়াবেগের প্রকাশ মাত্র। উচ্চাঙ্গ ভারতীয় সংগীতের এইটিই হল প্রধান বৈশিষ্ট্য। হৃদয়ের বিশেষ বিশেষ বেদনাকে একটি রাগিণীর কাঠামোতে ধরে রাখা বা প্রকাশ করাই হল এর চেষ্টা। যেমন নানা যুগের লিরিক কবিরা ছোট ছোট নানা হৃদয়াবেগকে ধরে রাখতে চেয়েছেন কবিতার ভাষায় ও ছন্দে। রাগিণী-সংগীতের সাহায্যে সংগীত-স্রষ্টারা মানুষের সূক্ষ্ম হৃদয়াবেগকে কতখানি রসোত্তীর্ণ করে তুলতে পারেন সেই-খানেই হল তাঁদের আসল পরীক্ষা। সূক্ষ্ম বিচারে মানুষের মনের বেদনায় যে কত বৈচিত্র্য থাকতে পারে আমাদের রাগ-রাগিণীগুলিকে গভীর ভাবে অনুভব করতে শিখলে সেকথা বোঝা সহজ হয়।

দেশী সংগীত হল কথা সুর ছন্দ বা তালের মিলনের যে পূর্ণ রূপটি আমরা দেখি, তাই। উচ্চাঙ্গ হিন্দী গানের রাগ-রাগিণীটিকে রেখে তার গীতকীর্তিকে বাদ দিলে

যা দাঁড়ায় এ হল গানের সেই আদি রূপ। গানের এই ত্রিধারার সম্মিলনে পূর্ণতার যে মূর্তিটি প্রকাশ পায়, তারই যে কোনো একটিকে অস্বাভাবিক ভাবে স্ফীত হতে দিলে গানের সেই ছন্দ-সাম্যটি নষ্ট হতে বাধ্য। এই দলের গানের কথাকে কাঠের মূর্তি বা পাথরের মূর্তির সঙ্গে তুলনা করা চলে। মূর্তি খোদাই করার সময় কাঠ বা পাথরের নিজস্ব স্বভাব বা সত্তাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করেই শিল্পী গড়ন, গঠন, ছন্দ ইত্যাদি দ্বারা রূপ ফুটিয়ে তোলেন। পাথরের বা কাঠের মূর্তিকে কাদামাটির আস্তর দিয়ে বা নানা প্রকার রং-এর লেখ ও তুলির রঙিন টানের অলংকার-ভারে ভারাক্রান্ত করে তাকে মূর্তির মধ্যে লুপ্ত হতে দেন না। সমজদার বলবে এইখানেই সেই শিল্পসৃষ্টি সার্থক।

আসলে এ ধরনের গানের কথাই হল তার মূল ভিত্তি। রাগিণী ও ছন্দ কথার সঙ্গে মিশে গিয়ে কথার ভাবকে আরো প্রাণবান করে তোলে। কবি বলেন, কথায় যখন মনের ভাবটি স্পষ্ট করে প্রকাশ করা যায় না, তখন সুরের সাহায্য ছাড়া আর কোনো গতি নেই। সুর ও ছন্দই তখন কথার সঙ্গে মিশে গিয়ে কথার মর্মকে টেনে বের করে এনে ধরে সকলের সামনে। কথা, সুর ও ছন্দের সুষ্ঠু মিলনে পূর্ণতার যে রস প্রকাশ পায়, সংগীত-সাধকের কাছে তারও মূল্য কম নয়। সাধনার পথে এরও শক্তি অসীম। যে কারণে মুসলমান যুগে উত্তর ভারতের প্রায় সব বড় বড় ধর্মসাধকেরা তাঁদের সাধনায় গানকে বড় স্থান দিয়েছিলেন; যে কারণে ভারতীয় সংগীতে কীর্তন, ভজন, দোঁহা, পদ ইত্যাদির এক বিশাল ও স্বতন্ত্র জগৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এর গীত-পদ্ধতি প্রথম দলের চেয়ে অনেক সহজ ও সবল।

তিন সুর থেকে শুরু করে সাত সুর দ্বারা গঠিত নানা প্রকার দেশী সংগীত (যাকে সাধারণভাবে 'লোকসংগীত' বলা হয়) আমরা যখন-তখন শুনি আমাদেরই চার পাশে। এ গানের যাঁরা রচয়িতা তাঁদের মধ্যে পুঁথিগত বিদ্যায় ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সম্পূর্ণ অশিক্ষিত, সব রকমের লোকই আছেন। দেশী সংগীতের যাঁরা রচয়িতা, সাধারণত দেখা যায় তাঁরা প্রায় কেউ ওস্তাদের কাছে শিষ্যের মত সংগীতের শিক্ষা গ্রহণ করেন না। তাঁরা আরম্ভ থেকে স্বরগ্রাম বা রাগিণীর পরিচয়ের দ্বারা গান শেখেন না। তাঁরা অল্প বয়স থেকে বড়দের গান শোনেন এবং সাধ্যমত তা গাইতে চেষ্টা করেন। এইভাবে গান গাইতে গাইতেই গাইয়ে হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ নিজেদের গানের সহজ পরিবেষ্টনই তাঁদের আপনা থেকে সংগীতে নিপুণ করে তোলে। পরে তাঁরা যখন নিজের আনন্দকে একদিন গানে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন তখন তাঁদের অন্তরে সেই একই সংগীতের ছাপ প্রকাশ পায়। যুগ যুগ ধরে যাবতীয় দেশী পদ্ধতির ভারতীয় সংগীত এই একই প্রথায় রচিত হয়েছে, আজও হচ্ছে। এই পদ্ধতির কোনো পরিবর্তন ঘটল না। এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, গান মানুষের অন্তর্নিহিত এক অতি বড় প্রয়োজনীয় সত্য। মানুষকে গাইতেই হবে, তা সে এক সুরেই হোক, দু সুরেই হোক, আর সাত সুরেই হোক। গানে নিজের মনের অহৈতুক আনন্দের বেদনাকে প্রকাশ না করে সে থাকতে পারবে না।

রাগ-সংগীতের দলে স্থান পায় নি এমন অনেক দেশী গানের সুর আজও

ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে পাওয়া যায়। বাংলাদেশেও যথেষ্ট আছে। এই সুরগুলি রাগিণী-সংগীতের মত হৃদয়াবেগের নানারূপ বৈচিত্র্য প্রকাশের চেষ্টা করে নি। এই সুরে আমরা পাই একটি হৃদয়াবেগের প্রকাশ। কিন্তু সে প্রকাশ হল মানুষের বেদনার প্রথম আদিরূপ। এর মধ্যে কোনো প্রকার বাইরের পরিবেশের প্রভাব নেই, এ একেবারে স্বতঃ উৎসারিত। বেদনাই হল সব দেশী সুরের মূল সুর। এই সুরগুলির সাহায্যে চিরকালের মানুষ যেন বারে বারে চেষ্টা করছে নিজেরই অন্তরের একটি গভীর বেদনার উৎস প্রকাশ করতে। এই গানে কথার প্রাধান্য থাকলেও সুরগুলিই গানের আসল প্রাণ। সহজ হলেও তার মন আকর্ষণ করার ক্ষমতা অসীম। একই সুরের পুনরাবৃত্তি থাকে গানের পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তিতে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সুর মানুষের হৃদয়ের এমন এক অকৃত্রিম সুর যা বারে বারে শুনেও ক্লান্তি আসে না। নানা রকম সাধারণ কথাও সেই সুরগুলির সাহায্যে অসাধারণ হয়ে ওঠে এবং এই গানের সুরের ও ছন্দের অলংকার বলতে প্রায় কিছুই থাকে না। এর সুরগুলি এমন এক রকমের জিনিস যে, তাকে বুদ্ধিবিচারে তৈরি করা যায় না। নানা দেশের বহু রকমের যে-সব সুর আজ পর্যন্ত আমরা পেয়েছি সেগুলি কালের বিচারে এমন ভাবে যাচাই হয়ে এসেছে যে, আজকের দিনে তাকে সম্পূর্ণ সরিয়ে দিয়ে নূতন করে ঐ আদর্শের সুর রচনা করা প্রায় অসম্ভব।

বাংলার সব রকমের গান সম্পূর্ণরূপে দেশী আদর্শের গান। এ গান যুগে যুগে মার্গ-পদ্ধতির রাগ-রাগিণী সংগীত থেকে সুর সংগ্রহ করে নিজের সুরের ঐশ্বর্য যেমন বাড়িয়েছে, তেমনি নিজ প্রদেশের আপন সুরও সে বহু সৃষ্টি করেছে যার সঙ্গে মার্গ-পদ্ধতির উচ্চাঙ্গ সংগীতের কোনো যোগ নেই। এবং বাংলার এই দেশী সুরও রাগ-সংগীতে স্থান পেয়েছে তাও দেখা যায়। 'বঙ্গালি' ও 'ভাটিয়ারি' নামে রাগিণী দুটি মনে করি তারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলা গান নিজেকে মার্গ-আদর্শে সাজাবার চেষ্টা যে না করেছে তা নয়, কিন্তু নিজের সম্পূর্ণ আত্মবিলুপ্তিও তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। মার্গ-সংগীতের সঙ্গে মিলনের পথেও নিজের একটি বৈশিষ্ট্য সে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে। বাংলা সংগীতে আলাপ গেয়ে তার পরে বাংলা গান গাইতে কখনো শোনা যায় না। পালা-কীর্তনে বড় তালের গানে সুর-বিস্তার করা হত এবং আজও যে হয় তা দেখেছি। কিন্তু তাকে উচ্চাঙ্গ সংগীতের মত আলাপ-পদ্ধতির সুরবিস্তার বলা চলে না। কীর্তনীয়ারা গানের কথাকে সুরের সাহায্যে টেনে লম্বা করে গান। উচ্চাঙ্গের হিন্দী গানের মত তান দেওয়ার রীতি কীর্তন গানে নেই। কিন্তু আখর নামে সুরযুক্ত কথার তান সেখানে যথেষ্ট আছে। আর আছে গানে একই পঙ্‌ক্তির পুনরুক্তিকালে সুরের ছোট ছোট নতুন অলংকার লাগানোর রীতি। বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ রচিত হয়েছে কিন্তু সে ঢঙও হুবহু হিন্দী গানের আদর্শে গাওয়া হয় নি। হিন্দী গানের তুলনায় তার গীতরীতিকে বহু পরিমাণে সহজ ও সরল করতে হয়েছে।

বাঙালী ওস্তাদেরা উচ্চাঙ্গের হিন্দী আদর্শে গাইবার জন্যে বাংলা গান রচনা করেছেন ও আজও করেন এবং সেভাবে সুরবিহারের স্বাধীনতা নিয়ে তাকে গেয়ে শোনাবার চেষ্টাও করা হয় কিন্তু বাঙালীর কাছে এই গান কতটুকু আদর পেয়েছে

সে কথা ভেবে দেখবার। ওস্তাদপন্থী রচয়িতাদের এই-সব রচনা গান বা কাব্য হিসেবে দেশে প্রতিষ্ঠা পায় নি এবং হিন্দী গানের আদর্শে সাজানো এই গানগুলি উত্তর ভারতীয় সংগীতের ওস্তাদ-মহলে স্থান পেল না। কিন্তু যে স্রষ্টারা রাগ-রাগিণীর সঙ্গে কথাকে সমান স্থান দিয়ে, তার সুরবিহার বা সুরালংকার-বাহুল্যকে বর্জন করে বাংলা গান রচনা করতে পারলেন, তাঁদের গানই বাঙালীর প্রাণে সাড়া জাগিয়েছে। এঁরা সকলেই উচ্চাঙ্গ হিন্দী সংগীত থেকে রাগ-রাগিণী ছন্দের প্রাচুর্য আমদানি করেছেন বাংলা গানে, কিন্তু তার গীতরীতিতে সুরবিহারকে বর্জন করতে চেষ্টা করেছেন সবাই।

গুরুদেবের গানও রচিত হয় সেই আদর্শ ধরে। অর্থাৎ গুরুদেব তাঁর গানে কথাকে ভিত্তি করে সুর ও ছন্দকে সমান আসন দিয়েছেন। এতে রাগিণী আছে। কিন্তু গানের সময় সুরবিস্তার, তান ইত্যাদির বৈচিত্র্যময় সুরজাল রচনার স্থান এতে নেই। দেশী সংগীতের আদর্শে এ গান রচিত বলেই আজ বাংলাদেশে ক্রমশই জনসাধারণের মধ্যে তা সহজে ছড়িয়ে পড়ছে।

প্রাচীনেরা ভারতীয় সংগীতকে মার্গ ও দেশী নামে দু ভাগে ভাগ করেছেন বলে এ কথা কেউ যেন মনে না করেন যে, এই একটির সঙ্গে অপরটির কোনো যোগ নেই। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, এই দুটি ধারা কোনো দিনই পরস্পরবিরোধী বা বিচ্ছিন্ন ছিল না। একটি ছিল আর-একটির পরিপূরক। যখনি দেশী কোনো ভাল সুর মার্গ-সংগীতপন্থীদের কানে এসেছে তখনি তাঁরা তাকে নিয়ে নিজেদের বিশ্লেষণপদ্ধতি অনুযায়ী বিচার ক'রে তার মূল স্বরগঠন-পদ্ধতিটিকে বের ক'রে, তাকে নিজেদের রুচি অনুসারে সাজিয়ে নিয়েছেন। মার্গ-সংগীতের নিয়ম অনুযায়ী তাঁরা তার আরোহী অবরোহীস্বর, বাদী-সম্বাদী, অনুবাদী ও বর্জিতস্বর, রাগ-রাগিণীর পকড় বলতে যা বোঝায় সেই-সব স্বরের নিয়মের নির্দেশ দিতেন। তখন নামগোত্রহীন এই দেশী সুরগুলিই নাম গ্রহণ করে রাগিণীর দলে স্থান পেত। এবং আলাপ-পদ্ধতিতে গেয়ে সেই রাগিণীটির একটি স্বতন্ত্র রূপ প্রকাশ করতেন ওস্তাদ গুণীরা। মালব, গুর্জরী, রামকিরী বা রামগিরী, কর্ণাটি, গান্ধার, গোড়ী, বৃন্দাবনী, সিন্ধু, বা সিন্ধুরা, ভূপালী, গোন্ডকরী, পাহাড়ী, বঙ্গাল, কোড়াদেশ প্রভৃতি সব প্রাচীন রাগ-রাগিণী যে দেশজ নানা সুর থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল তার পরিচয় তাদের নামেই প্রকাশ পেয়েছে। দেশী সংগীতের কাছ থেকে পাওয়া, ওস্তাদমহলে গীত এই রাগিণীই আবার আর এক যুগে যখন দেশী পদ্ধতির গান রচয়িতাদের অনুপ্রাণিত করেছে তখন তাঁরা আলাপ-পদ্ধতির তান বিস্তার ইত্যাদি সুরালংকার বাদ দিয়ে সেই সুরে গান রচনা করেছেন। অর্থাৎ একই সুর যখন যে দলের কাছে যে ভাবে রূপ নিয়েছে সেই অনুসারে তখন তাকে সংগীতে মার্গ ও দেশী বলা হয়েছে।

গুরুদেবের গান দেশী সংগীতের আদর্শে রচিত হলেও উচ্চাঙ্গের হিন্দী গান থেকে নিজের শক্তি সঞ্চয় করেছে।

সুর যোজনায় ও ছন্দের বৈচিত্র্যে গুরুদেব উচ্চাঙ্গ সংগীতের রাগ-রাগিণী ও ছন্দ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন। হিন্দী উচ্চাঙ্গ সংগীতের মিশ্র, অমিশ্র,

প্রচলিত, অপ্রচলিত প্রায় একশোর উপর রাগ-রাগিণীর সাহায্যে যেমন গান রচনা করেছেন, তেমনি তার নানা তালের ছন্দও তিনি গ্রহণ করেছেন। হিন্দী ধ্রুপদের অনুকরণে অনেক বাংলা গানও গুরুদেব রচনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি সেই হিন্দী ধ্রুপদকে দিলেন দেশী আদর্শের ধ্রুপদের রূপ। হিন্দী প্রচলিত ধ্রুপদের মত নানা রাগ-রাগিণী তাতে আছে, আছে চৌতাল, ধামার, সুরফাঁকতাল ইত্যাদি তাল, কিন্তু মূল ধ্রুপদের মত সুর ও ছন্দের বিচিত্র অলংকার তাতে ব্যবহার করা হল না। হিন্দী খেয়াল ও টপ্পা গানের অনুসরণে রচিত তাঁর বাংলা গানেরও সেই এক অবস্থা। সে গানও খেয়ালিদের মত তান বিস্তারে গাওয়া হয় না। গাইতে হবে দেশী আদর্শে। এই ভাবেই তাঁর গানের সুর ও তালের ভাণ্ডার উচ্চাঙ্গের হিন্দী গান থেকে পূর্ণ করা হয়েছিল প্রথম জীবনে। হিন্দী ধ্রুপদ খ্যাল টপ্পার অনুকরণে বাংলা গান তিনি রচনা করেছিলেন প্রথম জীবনেই সবচেয়ে বেশি।

উচ্চাঙ্গের হিন্দী সংগীতের এইরূপ একটি বড় রকমের প্রভাব তাঁর মধ্যে থাকলেও তিনি বাংলার নিজের খাঁটি দেশী সংগীতকেও (যাকে আমরা লোকসংগীত বলি) অবজ্ঞা করেন নি। তাকেও গ্রহণ করেছিলেন নিজের গানের সুর ও ছন্দের ঐশ্বর্য বাড়াবার কাজে। এই ধরনের দেশী গানের প্রভাবে রচিত তাঁর গানের সংখ্যা সামান্য নয়। এই কারণে তাঁর গান গেয়ে যেমন আমাদের পক্ষে উচ্চাঙ্গের সংগীতের রাগিণীরসের মাধুর্য উপভোগ ও তার নানা প্রকার তালের ছন্দ-রস গ্রহণের পথ সুগম হয়, তেমনি খাঁটি দেশী সংগীতের সুরমাধুর্য ও তার সহজ, অথচ প্রাণ মাতানো ছন্দে আমাদের মন আকৃষ্ট হয়। ওস্তাদের সাহায্যে উচ্চাংগ সংগীত শিখে তার রস গ্রহণ করা জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব হয় না। এর জন্য বহু পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করতে হয় বলে ভয়ে সাধারণত সংগীতরসপিপাসুরা তার কাছে ঘেঁষতে পারে না। দূর থেকেই তাকে সম্মানের চোখে দেখে। গুরুদেবের গান সংগীত-রসপিপাসু জনসাধারণের সেই অসুবিধাটুকু বহু পরিমাণে দূর করে। রাগ-রাগিণীর বিস্তারিত অলংকৃত রূপ এতে নেই বটে কিন্তু তার নিরাভরণ সহজ সরল রূপের ভিতর দিয়ে তার মূল কাঠামোটিকে তিনি ঠিক বজায় রেখেছেন। তাই তাঁর গানে উচ্চাঙ্গ সংগীতের রাগ-রাগিণীর রসটিকে সহজেই অনুভব করা যায়। নানা রসের কথার সঙ্গে এই-সব রাগ-রাগিণীকে গুরুদেব যেভাবে মিলিয়েছেন তাতে তাদের মধ্যে রসের যে বৈচিত্র্য রয়েছে তা অনুভব করা আরো সহজ হয়েছে, এবং এইখানেও তাঁর সংগীতরচনার দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে।

কথা সুর ও ছন্দের একত্র মিলনে যে গান প্রকাশ পায়, তাতে কবি চেষ্টা করেন কবিতার ভাবের সঙ্গে মেলে এমন সব রাগ-রাগিণীকে সাজিয়ে নিতে। লিরিক কবিতার যা উদ্দেশ্য রাগ-রাগিণীরও যে মূলগতভাবে সেই একই উদ্দেশ্য এ কথা আগেই বলেছি। সুতরাং কাব্য ও রাগিণী সংগীতের সমান বোধসম্পন্ন কবির গান যে ভাবের ও সুরের মিলনে অনির্বচনীয় এক রসের সৃষ্টি করবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে।

রাগ-রাগিণীর সাহায্যে গান রচনা করতে গিয়ে গুরুদেব বহুরকম মিশ্র-সুরের সৃষ্টি করেছেন। প্রতিভাবান শিল্পীর পক্ষে এই নতুন সৃষ্টি স্বাভাবিক। কিন্তু

বাংলাদেশে অনেকেই তুলনামূলক আলোচনার সময় গুরুদেবের এই সৃষ্টিপ্রতিভার উল্লেখ করতে গিয়ে উচ্চাঙ্গের হিন্দী সংগীতকে নিচু করবার চেষ্টা করেন, এই কথা গোড়াতেই উল্লেখ করেছি। রাগিণী মিশ্রণের ক্ষেত্রেও উচ্চাঙ্গের সংগীতকে নিন্দা করা যায় না। এ পথেও তার পরিবর্তনশীল মনের যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

ভারতীয় সংগীতের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করলে এ কথা স্পষ্ট ধরা পড়ে যে, রাগ-রাগিণীর এত যে বৈচিত্র্য ও বিকাশ আজ আমরা দেখছি তা ঘটেছে প্রাচীন সংগীতগুণীদের উদার মনে সব-কিছুকে গ্রহণ করবার আগ্রহ থেকে। রাগ শব্দের উৎপত্তির ইতিহাসে দেখি 'রাগ' শব্দটিকে আজ আমরা গানে যেভাবে ব্যবহার করছি নাট্যশাস্ত্রের যুগে তা হত না। বহু শতাব্দী পরে মতঙ্গ মুনির বৃহদ্দেশীতে প্রথম 'রাগ' শব্দের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে বলে ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন। মতঙ্গ বলেছেন, দেশ থেকে উৎপন্ন রাগগুলির সংখ্যার অন্ত নেই। উত্তম মধ্যম ও অধম তিনটি শ্রেণীতে রাগ বিভক্ত। আলাপ আলপ্তি শ্রেণীর রাগেরাই উত্তম। সংগীতমকরন্দকার নারদমুনি 'রাগ'-কে স্ত্রীপুরুষ ভেদে ভাগ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, ২০টি হল পুরুষ-রাগ, ২৪টি স্ত্রী-রাগ ও ১৩টি নপুংসক-রাগ। এ ছাড়া সকালে গাইবার, দ্বিপ্রহরে গাইবার ও সন্ধ্যায় গাইবার রাগের নাম এবং সময় অনুসারে গাইবার সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করেছেন। অনেকে মনে করেন নারদই প্রথম 'সংগীত' শব্দটি সংগীত-শাস্ত্রে ব্যবহার করেছেন। সংগীতরত্নাকর গ্রন্থে ২০টি প্রধান রাগ, ৮টি উপরাগ, এ ছাড়া মোট ২৬৪ রাগের নাম উল্লেখ আছে। কিন্তু সংগীতরত্নাকরে রাগ-রাগিণীর নামে আজ যে ভেদ দেখা যায়, সে রকমের ভেদের উল্লেখ নেই। বর্তমান কর্ণাটি সংগীতের 'মুখরী' বা 'কনকাঙ্গী' স্বরই নাকি রত্নাকরের মতে শুদ্ধ স্বর। এ অনেকটা উত্তর-ভারতের ভৈরোঁ রাগিণীর মত। লোচন পণ্ডিত রাগতরঙ্গিণী গ্রন্থে প্রথম বলছেন, ১২টি ঠাট থেকে ৭৫টি 'জন্য' রাগের উৎপত্তি। এঁর সময়ে শুদ্ধস্বর বলতে ভৈরবীকেই বোঝাত বলে অনুমান করা হয়। কর্ণাটি সংগীতের প্রথম ও বিস্তারিত আলোচনা ও রাগাদি বর্ণনা করেন রামামাত্য তাঁর 'স্বরমেলকলানিধি' পুস্তকে। রাগবিবোধকার সোমনাথ ভারতীয় সংগীতের ২২ শ্রুতিভাগের উল্লেখ করলেন। আর 'জনক' ও 'জন্য' রাগপদ্ধতির কথা বললেন। এঁরই সময় থেকে সংগীত-সাধকেরা বিভিন্ন রাগের রূপ ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ ক'রে তাদের ভাবমূর্তি রচনা করেছেন। দামোদর মিশ্র প্রণীত 'সংগীতদর্পণ'-এ দেখা যায় ৬ রাগ ও প্রত্যেকের ৬টি করে উপরাগ, মোট ছত্রিশ রাগিণীর কথা। ভারতীয় সংগীত যে নানা মতে বিভক্ত ছিল এ কথাও তিনি উল্লেখ করলেন—যেমন শিবমত, হনুমানমত, রাগার্ণবমত। বর্তমানে উত্তর-ভারতের উচ্চাঙ্গ সংগীতের শুদ্ধস্বর বা রাগ 'বিলাবেল' বলতে যা বোঝায়, এই স্বরগ্রামের কথা প্রথম উল্লেখ করা হল জয়পুর-মহারাজ সম্পাদিত 'সংগীতসার' গ্রন্থে। এইভাবে যুগে যুগে সংগীতের নানা নতুন চিন্তা গুণীদের মনে দেখা দিয়েছে। এই পরিবর্তনশীল মনের একটি বাস্তব নমুনা স্বরূপ নানাযুগে প্রতিষ্ঠিত ভিন্নমতের মূল রাগের নামগুলি তুলে দিচ্ছি।

১ সংগীতরত্নাকর — বসন্ত, বৃহন্নট, মল্লার, মালব, প্রদীপ, কৌশিক।

২ নারদসংহিতা — মালব, মল্লার, শ্রী, বসন্ত, হিন্দোল, কর্ণাটি।
৩ সংগীতদর্পণ — ভৈরব, মালকোষ, হিন্দোল, দীপক, শ্রী, মেঘ।
৪ রাগার্ণব — ভৈরব, পঞ্চম, নট্, মল্লার, গৌড়মল্লার, দেশ।
৫ হনুমন্ত — শ্রী, হিন্দোল, দীপক, ভৈরব, মেঘ, মালকোষ।
৬ ব্রহ্মা — শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ, নটনারায়ণ।
৭ ভাতখণ্ডে — বিলাবেল, কল্যাণ, খাম্বাজ, মারবা, ভৈরব, কাফি, পূরবী, আশাবরী, ভৈরবী, তোড়ী।

উপরোক্ত তালিকায় এক নামেরই কতগুলি রাগিণীর উল্লেখ আমরা পাচ্ছি। কিন্তু তার ফলে এ কথা যেন মনে না করি যে, ঐ-সব এক নামের রাগ-রাগিণীর স্বরগঠন-প্রণালীও এক নিয়মে বাঁধা। অনেক সময় দেখা গেছে এক যুগের এক রাগিণীর স্বরগঠন-প্রণালী সম্পূর্ণ বদলে গেছে আর এক যুগে।

সংগীতশাস্ত্রে রাগ-রাগিণীকে তিনটি ভাগে ভাগ করে তার নাম দেওয়া হয়েছে 'শুদ্ধ' 'ছায়ালগ' ও 'সংকীর্ণ'। অর্থাৎ শুদ্ধ হল মূল এমন কতকগুলি রাগ যার রূপে অন্য রাগিণীর ছায়া থাকে না। 'ছায়ালগ' হল যে রাগ অন্য রাগের সাহায্য নিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। 'সংকীর্ণ' রাগ বলতে বোঝায় শুদ্ধ ও ছায়ালগের সংমিশ্রণে যে রাগরূপ প্রকাশ পায়, তাই। এর থেকেও প্রমাণ হয় যে রাগমিশ্রণ উচ্চাঙ্গ সংগীতেরও একটা বিশেষত্ব। রাগরাগিণীর মিশ্রণে নতুন রাগের সৃষ্টি হত বলেই এই নামগুলি ও তার ব্যাখ্যা সংগীতজ্ঞদের করে যেতে হয়েছে। এ যুগেও যে রাগ-মিশ্রণে নতুন রাগের সৃষ্টি হয়, আমরা এখনকার খ্যাতনামা সংগীতগুণীদের গানে ও বাজনায় তা প্রায়ই শুনতে পাই।

'রাগনির্ণয়' গ্রন্থে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রলাল রায় এই বিষয়ে যা বলেছেন তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলছেন, "গানে আনন্দের মধ্য দিয়ে রাগের স্বরূপের যে উপলব্ধি ব্যাকরণে তা ধরা পড়ে না, নিয়ম ভেঙেও খাঁটি থাকে। এই রকম উপলব্ধির জোরে গত দুই শত বৎসর ধরে, ব্যাকরণের নিয়মকানুন ভেঙেচুরে একাকার হয়ে আবার নতুন সমৃদ্ধতর শৃঙ্খলাবদ্ধ সৃষ্টিকৌশল আপনি গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই নিয়মভাঙার পণ করে কেউ কোনো দিন গান করতে বসে নি, তার প্রমাণ এই যে আজও অতি অল্প গায়কই জানেন যে দু শ বছর আগে অন্য নিয়মও ছিল। তখনকার অধিকাংশ রাগের নাম এখনও আছে কিন্তু তারা খোল-নল্‌চে বদলে রূপান্তরিত হয়ে পড়েছে।"

দেশী সংগীত-পদ্ধতিতে রাগরাগিণীর মিশ্রণ অমিশ্রণের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। খুশিমত গাইতে গেলেই সে গানের সুর নানাভাবে পথ নেবেই। এই কারণেই গুরুদেবের পক্ষে মিশ্রিত সুর রচনা এত সহজ হয়েছিল। তাঁর গানে উচ্চাঙ্গ সংগীতের রাগিণী মিশ্রণের যেমন নমুনা পাওয়া যায় তেমনি বাংলার নিজস্ব সুরের সঙ্গে রাগ-রাগিণী মেশানো বাংলা গানেও তার সন্ধান মেলে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, যুগে যুগে দেশী সংগীত থেকে সংগ্রহ করে উচ্চাঙ্গের হিন্দী গান তার রাগ-রাগিণীর ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। সেইরূপ গুরুদেবের গানের অনেক সুর থেকেও উচ্চ শ্রেণীর সংগীতগুণীরা লাভবান হতে

পারেন। এই সুরের কতকগুলির সৃষ্টি হয়েছে উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সংগীতের নানাপ্রকার রাগিণীর মিশ্রণে। অনেক সুরে মিশেছে রাগ বা রাগিণীর সঙ্গে বাংলার নিজস্ব দেশী সুর। কতগুলি রচিত হল কেবলমাত্র বাউল ও কীর্তন নামে এক-ধরনের দেশী সুরকে মেশাতে গিয়ে। এই সুরগুলিকে নিয়ে ওস্তাদেরা যদি আগের দিনের গুণীদের মত স্বরের বিচার করে এর মূল গঠনপদ্ধতিটিকে আবিষ্কার করতে পারতেন তাহলে উচ্চাঙ্গের রাগসংগীতের ভান্ডার যে আরো নতুন নতুন রাগিণীতে ভরে উঠত, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে এবং ঐ রাগিণীগুলি মতঙ্গ মুনির মতে উত্তমশ্রেণীর দলে হয়তো স্থানও পেত। কারণ আলাপের ঢঙে গাইবার সুযোগ তাতে হবে বলেই মনে করি। তালের দিক থেকেও তিনি যে কয়েকটি নতুন দৃষ্টান্তের সৃষ্টি করেছেন, এখন উচ্চাঙ্গ সংগীতের গুণীরা তাকে ছন্দের অলংকারে সাজিয়ে কি করে দলে তুলে নিতে পারেন সে কথাই তাঁদের ভাবতে হবে।

গুরুদেবের মন সংস্কারমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও উচ্চাঙ্গের হিন্দী গানের মত সুর-বিহারের স্বাধীনতা কেন তিনি তাঁর গানে দেন নি এ নিয়ে আলোচনা করবার প্রয়োজন আছে। প্রত্যেকেরই প্রথমে মনে রাখা দরকার যে, দেশী গানের কথা, সুর ও ছন্দের সুষ্ঠু মিলনেই গানটির পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ যতটুকু যেখানে যেভাবে স্থান পাওয়া দরকার সেইটুকুকেই সেখানে রাখা হয়। প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং তার কোনো একটি অংশকে স্বতন্ত্র-ভাবে প্রাধান্য দিতে গেলেই সেই ছন্দ-সাম্যের ব্যাঘাত ঘটতে বাধ্য। গানের নিখুঁত পরিপূর্ণ রূপের ভিতর দিয়ে যে অনির্বচনীয় রসের ইঙ্গিত আমরা পাই তা পাওয়া যায় না এর অভাবে। গুরুদেবের গানের এই ছন্দ-সাম্য এতই নিখুঁত যে, যেখানে যতটুকু প্রয়োজন তাই বসেছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত তিনি কিছুই জুড়তে চান নি। প্রকৃত রসিক শিল্পীর মন নিয়ে তিনি এ কাজ করেছিলেন বলেই আজ সেই গানের দ্বারা আমরা গভীর আনন্দে অভিভূত হই। গানের কথা সুর ও ছন্দের এই অখন্ড রূপকে নতুন করে সাজাতে গেলেই ছন্দ-হানির দ্বারা গানের ক্ষতি হতে বাধ্য। গুরুদেব গভীর সংগীত-রসের অধিকারী হয়ে যে গানের সৃষ্টি করলেন তার সামান্য পরিবর্তনও অপর কারো পক্ষে ধৃষ্টতা। আজ যদি পৃথিবীবিখ্যাত নটরাজের মূর্তিটিকে দেখে কোনো ব্যক্তির মনে উৎসাহ জাগে যে, সেই মূর্তিটির সঙ্গে আরো কিছু যোগ করে তাকে আরো সুন্দর করে তুলবেন, তাহলে তাঁকে যেমন শিল্প-জগৎ বাতুল বলতে দ্বিধা করবে না, গুরুদেবের গানের বেলায়ও সেই একই কথা। সুতরাং সার্থক শিল্পসৃষ্টির সামান্য পরিবর্তনের দ্বারা তাকে আরো সুন্দর করার চেষ্টা না করে নতুন সৃষ্টির দিকে হাত দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। গুরুদেব যে তাঁর গানের সৌন্দর্য বাড়াবার জন্যে অন্যকে যথা ইচ্ছা সুরবিহারের স্বাধীনতা দেন নি এই হল তার একমাত্র কারণ। তিনি মনে করতেন যে, তিনি যেভাবে প্রত্যেকটি গানের দ্বারা নিখুঁত একটি শিল্প রচনা করেছেন তাতে আর কোনো আভরণ সহ্য হবে না। জোর করে তা করতে গেলে কথা সুর ও ছন্দের মিলনের পরিপূর্ণ রূপটির অঙ্গ-হানি হবে।

হিন্দী সংগীতের প্রভাব

রবীন্দ্রসংগীতে বহুবিচিত্র রাগ-রাগিণীর সমাবেশ দেখে এ কথা মনে আসে যে, যদিও তিনি মনোযোগ দিয়ে গান শিখলেন না তবুও এত রাগরাগিণীর রূপ কী ক'রে তাঁর গানে ফুটে উঠল! যদিও তিনি শাগরেদের মতো নিষ্ঠা নিয়ে গুরুর কাছে গান শেখেন নি, তবুও নানা প্রকার হিন্দী গানের সুর যখনি তাঁকে আনন্দ দিয়েছে তখনি তিনি সে সুরকে বাঙলা ভাষায় ধ'রে রাখবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ভিতরে ছিল গান ধরতে পারার বিশেষ ক্ষমতা। অনায়াসে কঠিন গান তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত ক'রে ফেলতেন। আগের জীবনে তিনি প্রচলিত ও অপ্রচলিত প্রায় আশিটি রাগরাগিণীর সাহায্যে গান রচনা করেছিলেন, কিন্তু ভুলে গিয়ে শেষ বয়সে কিছু-বেশি কুড়িটি রাগরাগিণীর রূপ তাঁর মনে ভাসত। বার্ধক্যে রচিত প্রায় সব গানই এই রাগিণীগুলিকে নির্ভর ক'রে গঠিত। কিন্তু মিশ্রই হত বেশি। রাগিণী-গুলি হল টোড়ী, ভৈরবী, আশাবরী, ভৈরোঁ, কালেংড়া, সারঙ্গ, ভূপালী, ইমনকল্যাণ, ছায়ানট, বেহাগ, খাম্বাজ, বাগেশ্রী, বাহার, পরজ, দেশ, পিলু, কাফী, কানাড়া, আড়ানা, পূরবী, মুলতান ও মল্লার। বাউল ও কীর্তন তো আছেই। উক্ত রাগিণীগুলির মধ্যে কয়েকটি ছাড়া বাকিগুলিতে মিশ্রই হ'ত বেশি। কোনো রাগিণীকে অবলম্বন ক'রে প্রাণের আবেগে সুর এদিক সেদিক ছুটলেও সমপ্রকৃতির রাগিণীর সঙ্গেই যোগ রেখে চলত। বিবাদী প্রকৃতির রাগিণীর সঙ্গে আপনা হতে কোনো গানের সুরকে কখনো মিশতে দেখা যায় না, স্বেচ্ছাকৃত না হলে। যেমন ভৈরব, রামকেলি, কালেংড়া রাগিণীর যে কোনো একটি দিয়ে গান বাঁধতে গেলেই অন্যগুলির রূপ এসে পড়ে সেই গানে। আশাবরীতে লেগেছে টোড়ী, ভৈরবী ইত্যাদি। ইমনে ভূপালী বা পূরবী। মুলতানে ভীমপলশ্রী, টোড়ী, পিলু মিশত। কেবল বেহাগ, ভৈরবী, খাম্বাজ, পিলু, ইমনকল্যাণ, কাফী ও বাহার-রাগিণীর রূপ মোটামুটি ঠিক রাখতেন।

সুরের রসকল্পনার আবেগে যে গানের সৃষ্টি তার উদাহরণ হল 'যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল' গানটি। এই গানটির রাগিণী, সুরের রসকল্পনার বহু উদাহরণের মধ্যে একটি বিশেষ উদাহরণ। ভীমপলশ্রীর ভাবরসটি মূলে এই গানে ঠিক আছে, কিন্তু মূল ভীমপলশ্রীর নিয়মের সঙ্গে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। এখানে রাগিণীর ভাবের উপরে নির্ভর ক'রেছেন এবং তাকেই করেছেন মুখ্য। রাগের কাঠামোকে করেছেন গৌণ। এই পথেই তাঁর সমস্ত মিশ্র সুরকল্পনাকে দেখতে হবে।

আমরা রবীন্দ্রসংগীতের রাগ-রাগিণী নিয়ে যখন আলোচনা করব তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে, উচ্চাঙ্গের হিন্দী গানে যে মত প্রাধান্য পেয়েছে সে মতে এর বিচার করা উচিত নয়। সে ভাবে বিচার করতে গেলে গুরুদেবের গান সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হবে। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাঙলাদেশে হিন্দী গানে যে নিয়ম চলতি ছিল তার সঙ্গে অধুনাপ্রচলিত হিন্দী গানের অনেক ক্ষেত্রে পার্থক্য ঘটেছে। গুরুদেবের প্রথম জীবনে বাঙলাদেশে প্রচলিত হিন্দী উচ্চাঙ্গের সংগীত কী ভাবে গড়ে উঠেছিল ও গুরুদেবের উপরে কী ভাবে তা প্রভাব বিস্তার করেছিল, বিষয়টির গুরুত্ববশতঃ বিস্তারিতভাবে এখানে আলোচনা করা দরকার।

মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শা-আলমের (১৭৫৯-১৮০৬) ধ্বংসোন্মুখ দিল্লীর দরবারের শ্রেষ্ঠ গায়কগুণীরা নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়লেন। তানসেন-বংশধরেরা এলেন পূর্বদিকে, তাঁদের নাম হল 'পূরবীয়া'। তানসেনের শিষ্য-বংশীয়েরা গেলেন রাজ-পুতনার দিকে, নাম হল 'পছাওয়ালা'। তানসেন-বংশধরদের কাশীর রাজা, অযোধ্যার নবাব, বেতিয়ার রাজা, রেওয়ার রাজা ও অন্যান্য অনেকে দরবারে আশ্রয় দিলেন। বাঙলাদেশেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে দিল্লীর ওস্তাদদের আসতে দেখি কৃষ্ণনগরে ও কলকাতায়। এই সময়েই আর-এক দলে আসেন বাহাদুর খাঁ ব'লে তানসেন-বংশীয় ধ্রপদীয়া, বিষ্ণুপুরে। তাঁকে তখনকার বিষ্ণুপুর-রাজ মাসিক পাঁচশো টাকা বেতন দিতেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পীরবক্স নামে একজন পাখোয়াজী। বাহাদুর খাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে গদাধর চক্রবর্তী, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, নিতাই নজির ও বৃন্দাবন নজিরের নামই বিখ্যাত। বাহাদুর খাঁর অবর্তমানে বিষ্ণু-পুরের এই বিদ্যালয়ে সংগীতের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন শিষ্য গদাধর, তার পর রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। জানা যায় রামশঙ্করের কাছে গান শেখার জন্যে বাইরে থেকেও লোক আসত। গদাধরের শিষ্য ও পুত্রপৌত্রাদির মধ্যে শ্যামচাঁদ গোস্বামী, অনন্তলাল চক্রবর্তী, দ্বারিকানাথ, কৃষ্ণনাথ, ব্রজমাধব সংগীতে পারদর্শী হন। এই গদাধরের বংশধর নীলমাধব চক্রবর্তী পরে কলকাতায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের দরবারে সংগীতাচার্যরূপে নিযুক্ত ছিলেন।

রামশঙ্করের ছাত্রদের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, যদুভট্ট, কেশবলাল চক্রবর্তী রামকেশব, দীনবন্ধু ও অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিখ্যাত ছিলেন।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলাদেশের সংগীত-জগতে বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন মহারাজ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দক্ষিণহস্তস্বরূপ। তাঁরই চেষ্টায় কলিকাতার রঙ্গালয়ে প্রথম দেশী রাগিণীতে ঐকতান-সংগীত শুরু হল। তিনি উচ্চাঙ্গের সংগীত-পুস্তক ও প্রথম দেশী স্বরলিপিপদ্ধতির সৃষ্টি করেন এবং উচ্চাঙ্গের সংগীতকে জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য করার জন্যে ১৮৭১ খৃস্টাব্দে কলিকাতায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। উক্ত বিদ্যালয়ের সাহায্যে পরবর্তী যুগে অনেক গাইয়ে-বাজিয়ে বাঙলাদেশে তৈরি হয়েছিলেন। তা ছাড়া ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে কলিকাতায় একটি খুব বড়ো সংগীতজলসার আয়োজন হয়; তাতে ভারতের বহু বড়ো বড়ো গাইয়ে উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মিলনীর উদ্দেশ্য ছিল সকলে মিলে বিভিন্ন মতবাদকে একটি নিয়মে বাঁধা। অবশ্য এই-সব কর্মে ক্ষেত্রমোহনকে উৎসাহিত করেন সব দিক থেকে সৌরীন্দ্রমোহন ও যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। এঁরা পিছনে না থাকলে এই-সব বৃহৎ কাজ তাঁর পক্ষে সম্ভব হত কি না বলা শক্ত।

যদুভট্ট কী ধরনের গুণী ছিলেন তা গুরুদেবের বাক্য উদ্ধৃত করে দেখানো হয়েছে। ইনি ধ্রুপদ, বিশেষত খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। ত্রিপুরার দরবারে বীরচন্দ্র মাণিক্যের সময় সেখানে থাকতেন ও তানসেনবংশীয় বীনকার কাশেমআলি খাঁর কাছে সেতারের তালিম নেন। গুরুদেবের পরিবারে ছিলেন অল্প-দিন। সুরবাহার এবং পাখোয়াজেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

রামশঙ্করের পুত্র রামকেশব কলকাতার বিখ্যাত ছাতুবাবু ও লাটুবাবুদের কাছে থাকতেন, তিনি অল্প বয়সে মারা যান। কেশবলাল কলকাতার ধনী তারকনাথ প্রামাণিকের গৃহে সংগীত চর্চা করতেন। দীনবন্ধু ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ঠুংরী সবরকম চালই ভালো গাইতে পারতেন। তাঁর পুত্র গঙ্গানারায়ণ গোস্বামী ময়মনসিংহের মহারাজের প্রাসাদে সংগীতাচার্যরূপে নিযুক্ত ছিলেন।

রামশঙ্করের পরে তাঁর শিষ্য অনন্তলাল বিষ্ণুপুরের সংগীতাচার্যের পদে নিযুক্ত হন। এঁর শিষ্যদের মধ্যে উদয়চাঁদ গোস্বামী, রাধিকা গোস্বামী, বিপিন চক্রবর্তী, অম্বিকা কাব্যতীর্থ, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও হারাধন চক্রবর্তী বিখ্যাত। রামপ্রসন্ন ও গোপেশ্বর অনন্তলালের পুত্র।

এই বিষ্ণুপুরীরা সূত্রপাতে বাহাদুর খাঁর কাছে পেয়েছিলেন তানসেনী বা সেনী ঘরানার ধ্রুপদ। পরে গায়কেরা গোয়ালিয়র রেওয়া বেতিয়া ইত্যাদি ঘুরে তখনকার কালের তানসেনবংশীয় সদারঙ্গ প্রবর্তিত ধ্রুপদী চালের খেয়াল সংগ্রহ করেন। শোনা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কানাই চক্রবর্তী ও মাধবলাল চক্রবর্তী নামে দুই ভাই উল্লিখিত সদারঙ্গের শিষ্যবংশীয় মহম্মদ খাঁর কাছে শিখে বিষ্ণুপুরে প্রথম খেয়ালের চলন করেন। বিষ্ণুপুরের তৎকালীন রাজা মদনমোহন সিং এঁদের এ কাজে উৎসাহিত করেন। কানাইলাল পরে বর্ধমানের তৎকালীন মহারাজার দরবারে গায়করূপে নিযুক্ত ছিলেন। বিষ্ণুপুরের গাইয়েদের একটা গুণ ছিল, এঁরা সব সময় নূতন কিছু শেখাবার চেষ্টা করতেন।

রাধিকা গোস্বামী বহু বৎসর অনন্তলালের কাছে গান শিখে পরে বেতিয়ার মহারাজ নন্দকিশোর-শিষ্য ঘরানা শিবনারায়ণ ও গুরুপ্রসাদ দুই ভাইয়ের কাছে অনেক দিন গানের চর্চা করেন। গুরুদেব বলেন, যদুভট্টের কাছেও তিনি ধ্রুপদের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। নন্দকিশোরের শিক্ষা ছিল তানসেনবংশীয় ধারায়। রাধিকাবাবুর পিতা জগৎচাঁদ গোস্বামীর মৃদঙ্গবাদক হিসাবে খ্যাতি ছিল। কলকাতায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের শিক্ষক ও আদি সমাজের গায়ক হিসাবে প্রায় দশ বৎসব নিযুক্ত ছিলেন। তারপর আঠারো বৎসর কাশিমবাজারের সংগীতবিদ্যালয়ে অধ্যাপক রূপে কাজ করেন। এইখানেই গিরিজা চক্রবর্তী তাঁর কাছে সংগীতের চর্চা শুরু করেন ও আট বৎসর ধ্রুপদ ধামার ও সে যুগের খেয়াল ভালো করে শেখেন। পরে দিল্লি, রামপুরে গিয়ে ধ্রুপদাঙ্গ খেয়ালের আরো চর্চা করেছিলেন। তিনি গণপৎ রাও ও মৈজুদ্দিনের কাছে উৎকৃষ্ট ঠুংরীর শিক্ষা পান।

রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুপুরের সংগীতবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, সেতার, সুরবাহার, এসরাজ, মৃদঙ্গ, তবলা ও বীণা জানতেন। তাঁর কাছে বহু ছাত্র গান শিখত। 'সঙ্গীতমঞ্জরী' নামে উচ্চাঙ্গের হিন্দী গানের একটি বিরাট স্বরলিপি গ্রন্থ প্রকাশ এঁর একটি বড়ো কীর্তি। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলাদেশে সংগীতপ্রচারের প্রায় সব আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন। বহু উৎকৃষ্ট হিন্দী ও বাঙলা গানের স্বরলিপি পুস্তকাকারে প্রকাশ ক'রে হিন্দী গানের চর্চার পথ আরো সুগম করেছেন। ইনি ধ্রুপদ-গাইয়ে হিসেবে বিখ্যাত এবং বাঙলাদেশে বাহাদুর খাঁ প্রবর্তিত ধ্রুপদের ধারার শেষ গাইয়ে। গোপেশ্বর বাবু অল্প

বয়সে কলকাতায় গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে খেয়ালের চর্চা করেছিলেন। ১৩০৬ সাল থেকে প্রায় আঠার বৎসর যাবৎ বর্ধমান-মহারাজের দরবারে সভাগায়করূপে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি ১৯৫৫ সালে কয়েক মাসের জন্য বিশ্বভারতী-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত-ভবনে রাগ-সংগীতের ভিজিটিং প্রফেসর রূপে নিযুক্ত ছিলেন। এ'রই আর-এক ভাই শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবৎসর বর্ধমান-দরবারে গায়করূপে কাজ করেন। কিছুদিন আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়কহিসেবে নিযুক্ত ছিলেন ও গুরুদেবের বহু গানের স্বরলিপি করে পুস্তকাকারে ছাপিয়েছিলেন।

এই হল বিষ্ণুপুরের সংগীতের মোটামুটি পরিচয়। এদিকে সৌরীন্দ্রমোহন ও যতীন্দ্রমোহন, ক্ষেত্রমোহনের সাহায্যে গত শতাব্দীর শেষার্ধে, যে সংগীতান্দোলন কলকাতায় চালু করেন সেই আন্দোলনে বিষ্ণুপুরী গায়ক-প্রভাবান্বিত সেনী ঘরানার মতবাদ ছিল প্রধান ভিত্তি। রাজভ্রাতারা সেনী বংশের গাইয়েবাজিয়েদেরই বিশেষ পছন্দ করতেন ও সমাদর করে রাখতেন বলে জানা যায়। তাছাড়া সে সময়ে তানসেন-বংশধরেরা বাঙলাদেশের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে গিয়েছিলেন। গয়া, গিধৌর, পশ্চিম বাংলা, কলকাতা, ঢাকা, ত্রিপুরা ইত্যাদি অঞ্চলে তানসেনবংশীয় গাইয়েরা স্থান পাওয়ায় বাঙালি গাইয়েবাজিয়েদের বিশেষ উপকার হয়েছিল। ক্ষেত্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন ছিলেন সেনী বংশজাত সংগীত ঘরানার প্রধান পৃষ্ঠপোষক, তাই যখন বিদ্যালয় ইত্যাদি নানা উপায়ে বাঙলাদেশে সংগীতকে এক নিয়মে চালাবার চেষ্টা করেন তখন স্বভাবতই সেনী ঘরানার সেই মতবাদকেই ও তাঁদের ঢঙকেই তাঁরা প্রাধান্য দিলেন। কিন্তু তানসেনের বংশধররা তাঁদের স্বাভাবিক ক্ষমতা বলে গান গাইতেন, এক জায়গায় থেমে থাকেন নি। বাঁধা পথ ভেঙে চলতে কখনও ভয় পান নি, শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘনের কথাও ভাবেন নি। কারণ তাঁদের কাছে সংগীত ছিল সজীব প্রাণের প্রবাহ। অথচ তাঁদের কাছে পাওয়া সেই সংগীত ছিল বাঙালিদের কাছে সযত্নে রক্ষণীয় মূল্যবান সম্পদের মতো। পাছে সে চলতে গিয়ে পড়ে যায় বা পা ভাঙে এই দুর্ভাবনা ছিল বাঙালির সব সময়। এই দিকেই সব চিন্তা নিযুক্ত থাকায় বাঙালি হিন্দী গানে কোনো দিনই উল্লেখযোগ্য নূতনত্ব ফোটাতে পারে নি। তবে হিন্দী গান পশ্চিমে যখনই নূতন কোনো রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে বাঙালি তাকে সমাদরের সঙ্গে চিরকালই গ্রহণ করেছে।

পশ্চিমে সেনী বংশের গাইয়েদের মধ্যে গানে ও ঢঙে পরে যখন পরিবর্তন ঘটল তখনও বাঙালি পূর্বাচার্যদের নিকটে প্রথম পাওয়া রাগসংগীতের উপরেই নিজেদের বৈশিষ্ট্য রচনা করে চলতে লাগল। এবং সেই বিশেষত্বই শেষ পর্যন্ত বিষ্ণুপুরী ঢঙ নামে এক সময় বাঙলাদেশে বিশেষ প্রচলিত হয়ে ওঠে।

বাঙলাদেশে পশ্চিমের গুণীরা এসেছিলেন, কিন্তু স্থায়ীভাবে বসবাস করেন অতি অল্পকয়জন। তার মধ্যে অনেকেই এসেছিলেন বৃদ্ধবয়সে। এদেশের রাগ-সংগীতের চর্চাকে বাঙালি নিজের চেষ্টাতেই জিইয়ে রেখেছিল। পশ্চিমের গুণীরা এসে মাঝে মাঝে এদের নাড়া দিয়ে যেতেন এবং এদের সংগীতচর্চাকে প্রাণবন্ত করে তুলতেন মাত্র।

গুরুদেবের গানে ও বাঙলার উচ্চাঙ্গ হিন্দী সংগীতে উল্লিখিত বিষ্ণুপুরী ঢঙ

নামে বাঙলায় প্রচলিত পদ্ধতিই প্রবল।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও বরাবরই এই ধারার বাঙালি গায়করাই শিক্ষকরূপে স্থান পেয়েছেন। গুরুদেব প্রধানত সেই আবহাওয়ার মধ্যেই মানুষ। ফলে তাঁর রচনার মধ্যে যে নিয়ম গড়ে উঠেছিল, তার কয়েকটিমাত্র নমুনা তুলে দিই।

তাঁর আশাবরীতে কেবল শুদ্ধ রে পেলাম না, অবরোহণে দেখলাম কোমল রে লেগেছে; 'মনোমোহন গহন যামিনী শেষে' অথবা 'তোমার সুর শুনায়ে যে ঘুম ভাঙাও' ও 'আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে' গানের প্রথম পঙ্‌ক্তিটি আলোচনা করলেই বোঝা যাবে। কড়িমধ্যমযুক্ত রামকেলি তাঁর গানে নেই, 'মোরে ডাকি লয়ে যাও' ও 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে' গান দুটি থেকে কড়িমধ্যম-বর্জিত রামকেলির আভাস পাব। সেই কারণেই তাঁর রামকেলি সাধারণত ভৈরব ও কালেংড়ায় সহজে মিশে যায়। বাঙলা চলতি মতে গুরুদেবের বিভাস হল—'আজি প্রণমি তোমারে চলিব নাথ সংসার কাজে।' খাঁটি বিভাস তাঁর পরবর্তী জীবনের গানে পাওয়া যায় না। পুরবীতে গুরুদেব তখনকার বাঙলার চলতি মতকেই গ্রহণ করেছেন। হিন্দী ভাঙা বাঙলা গান 'আজি এ আনন্দ সন্ধ্যা'য় কোমল ধৈবত নেই। আরো অনেক বৎসর পরে 'সন্ধ্যা হল গো মা' ও 'অশ্রুনদীর সুদূর পারে' গানে পাচ্ছি শুদ্ধ ধৈবতের সঙ্গে মাঝে মাঝে কোমল ধৈবতের ব্যবহার। তাঁর পুরবীর সব গানেই অন্তরায় সুর শুদ্ধ ধৈবত ছুঁয়ে তবে উপরের দিকে উঠেছে এবং নামবার সময়ও শুদ্ধ ধৈবত লাগছে। গুরুদেবের বেহাগ সুরের গান আমরা অনেক পেয়েছি, কারণ বেহাগ তাঁর একটি অতিপ্রিয় রাগিণী। কিন্তু তাঁর বেহাগে 'পক্ষ্মগমগা' বা 'পক্ষ্মমগা' এ দুটি স্বরবিন্যাস একেবারেই পাই না। মোটামুটি তাঁর গানে বেহাগ রাগিণীর স্বরবিন্যাস কিভাবে কাজ করেছে, কয়েকটি গানের সাহায্যে তা বোঝাবার চেষ্টা করব।

'স্বামী তুমি এসো আজ'—হিন্দী ভাঙা চৌতালের ধ্রুপদ গানটিতে কড়িমধ্যম সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে। 'ভয় হতে তব অভয় মাঝে'—চৌতাল, ও 'কেন জাগে না অবশ পরান'—ঝাঁপতালের গানে কড়িমধ্যম নেই, কিন্তু শুদ্ধ নিখাদের সঙ্গে কোমল নিখাদ কোথাও কোথাও ব্যবহৃত হয়েছে। শুদ্ধ নিখাদ ও মধ্যমসহ কোমল নিখাদ ও কড়িমধ্যম ব্যবহার করেছেন হিন্দী ভাঙা 'কে যায় অমৃতধাম যাত্রী' গানটিতে। 'বলি ও আমার গোলাপ বালা' ও 'ওগো শোনো কে বাজায়' গান দুটিতে কড়িমধ্যম নেই, কিন্তু শুদ্ধ নিখাদের সঙ্গে কোমল নিখাদ লাগানো হয়েছে এবং একেও বলা হয়েছে বেহাগ। একে 'বেহাগড়া'র দলে না ফেলবার কারণ কী থাকতে পারে জানি না। যাই হোক উপরোক্ত ধ্রুপদাঙ্গ চালের বেহাগই তাঁকে গানরচনায় সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে। এখানে ব'লে রাখা ভালো গুরুদেবের বাল্যকালে বাঙলাদেশে ধ্রুপদ কিংবা খেয়ালে 'পক্ষ্মগমগা' ও 'পক্ষ্মমগা' স্বরবিন্যাস দুটি চলিত ছিল না, খেয়ালে এর আমদানি হয়েছে অনেক পরে টপ্পা থেকে। দেখা যাবে আজকালকার মতের তুলনায় এই রকমের নিয়মের ব্যতিক্রম রবীন্দ্রসংগীতে বহু ঘটেছে, যা শুনে আজকালকার সংগীত-পণ্ডিতরা বলবেন যে তাঁর গানে কোনো একটি রাগিণীর রূপে প্রকাশ পেলেও তাকে সংগীতের ব্যাকরণের নিয়মে মেলানো যায় না।

এই উচ্চাঙ্গের রাগসংগীতের সঙ্গে আর একটি ঢঙ বাঙালি পেয়েছিল, সেটিরও উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। এই ঢঙটি বাঙলাভাষায় থিয়েটার, যাত্রা, পাঁচালী ইত্যাদি গানের বিশেষ সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আসলে এই নূতন ঢঙটি শোরী মিঞার টপ্পার প্রভাবে উদ্ভূত এবং নিধুবাবুর টপ্পা নামে বিখ্যাত। হাফআখড়াই গানও নিধুবাবু প্রবর্তন করেন। এই ঢঙের গান উচ্চ নীচ সব সমাজেই ছড়িয়ে পড়েছিল। কলকাতার শিক্ষিত অভিজাত সমাজের বৈঠকে, মজলিসে, বিবাহের আসরে ও অন্দরে এ গানের খুবই আদর ছিল। রামপ্রসাদী শ্যামাসংগীতও এই ঢঙে সজ্জিত হয়ে গীত হতে লাগল। এই-সব গানের সুর সব সময়েই রাগরাগিণীর সাহায্যে রচিত হত। কিন্তু পাকাপোক্ত কোনো নিয়মের বন্ধন এ গান মেনে চলত না। মিশ্র রাগিণীতে গানগুলির সুর বসত। গুরুদেবের বাল্যকালে বাঙলাদেশে তথা কলকাতা সমাজে টপ্পার আদর্শে রচিত এই প্রকার মিশ্র রাগিণীর প্রেমের গানের ছড়াছড়ি ছিল। তাঁর পরিবারও এর প্রভাবমুক্ত ছিল না। বাঙলাভাষায় মিশ্র রাগিণীতে গান রচনার এই পদ্ধতি গুরুদেবের সমগ্র সংগীতজীবনেও বিশেষ কাজ করেছিল। গুরুদেবের মুখেও শুনেছি যে, অল্প বয়সে তাঁদের বাড়িতে সংগীতের আবহাওয়ার মধ্যে বাঙলা টপ্পা সংগীতেরও প্রাধান্য ছিল। গুরুদেব বিখ্যাত সংগীতরচয়িতা নিধুবাবুর সংগীতপ্রতিভাকে খুবই প্রশংসা করতেন। বলতেন বাঙলাভাষার সঙ্গে হিন্দী রাগিণী-সংগীতের মিলনের একটি সুন্দর পরিচয় তিনি প্রথম ফুটিয়েছিলেন সে যুগে। বোধহয় এইরূপ কোনো বাঙলা গানের সুর ও ঢঙ দ্বারা প্রভাবিত হয়েই পরিণত বয়সে লিখেছিলেন 'রাজা' নাটকের গান 'আমি রূপে তোমায় ভোলাব না' বা 'অচলায়তনে'র 'যা হ'বার তা হবে' ইত্যাদি।

খেয়াল বা টপ্পার বিষয়ে বলতে গিয়ে এ কথা বলে রাখা ভালো যে, সে ঢঙের সাহায্যে রচিত বাঙলা গানে সুরবিহার অর্থাৎ তান বিস্তার করার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। এখানে শোরী মিঞা রচিত মূল তিনখানি গানের বাঙলা রূপান্তর নিয়ে আলোচনা করলে এ কথার সমর্থন পাওয়া যাবে। 'কে বসিলে আজি', 'হৃদয়-বাসনা পূর্ণ হল' ও 'বন্ধু রহো রহো সাথে' গান তিনটি শোরী মিঞারই তিনটি গানের সুরে রচিত। কিন্তু শোরী মিঞা-কৃত গানের এত গিটকারী বা মুরকীযুক্ত সুরবিস্তার এবং একই পঙ্‌ক্তিকে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির সময় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গেয়ে শোনানোর গান এগুলি নয়। সামান্য কিছু অলংকার রেখে মূল টপ্পার বহু প্রকার তান বিস্তারের অলংকার এই কটি বাঙলা গানে বর্জিত হয়েছে, ভাষা ও ভাবের কথা ভেবে।

এই দুটি আলাদা রূপের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তালগাছ ও বটগাছের মধ্যে তুলনা করে গুরুদেব নিজেই এক জায়গায় বলেছেন যে, "বটগাছের বিশেষত্ব তার ডাল-আবডালের বহুল বিস্তার, তালগাছের বিশেষত্ব তার সরলতায় ও শাখা পল্লবের বিরলতায়; বটগাছের আদর্শে তালগাছকে বিচার কোরো না। বস্তুত তাল-গাছ হঠাৎ বটগাছের মতো ব্যবহার করতে গেলে কুশ্রী হয়ে ওঠে। তার ঋজু অনাচ্ছন্ন রূপটিতেই তার সৌন্দর্য। সে সৌন্দর্য তোমার পছন্দ না হয় তুমি বটতলার আশ্রয় করো। আমার দুই ভালো লাগে, অতএব বটতলায় তালতলায় দুই জায়গাতেই

আমার রাস্তা রইল। কিন্তু তাই বলে বটগাছের ডাল-আবডালগুলোকে তালের গলায় বেঁধে দিয়ে যদি আনন্দ করতে চাও তাহলে তোমার উপর তালবনবিলাসীদেব অভিসম্পাৎ লাগবে।"

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে শোরী মিঞার টপ্পা বাঙালি উচচাঙ্গের হিন্দী গানের গায়কমহলে প্রচলিত থাকলেও নিধুবাবু প্রবর্তিত বাঙলা টপ্পার আদর্শে রচিত টপ্পা গানই বাঙলায় ছড়িয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কলকাতায় দুএকজন খ্যাতনামা টপ্পাবিশারদকে আনানো হয়, কিন্তু তার ফল বাঙলা গানে কিছুই ফলে নি।

ঠুংরী গানের প্রভাব গুরুদেবের গানে খুব কম। কারণ গুরুদেবের প্রথম বয়সে কালোয়াতদের মধ্যে আজকালকার মতো ঠুংরী গানের চলন ছিল না। গায়কদের মধ্যে এ ঢঙের চলন হয়েছে অনেক পরে, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে—গণপৎরাও (কদরপিয়া) ও মৈজুদ্দিনের চেষ্টায় এবং উৎসাহে। এই পর্যন্ত কলকাতা বা বাঙলাদেশে ওস্তাদদের মধ্যে ধ্রুপদ, ধ্রুপদীচালের খেয়াল ও টপ্পার প্রভাব ছিল খুব বেশি। বাঙলা গানে তখনো ঠুংরী ঢোকে নি।

গুরুদেব খেয়াল-টপ্পা বা বাঙলার প্রচলিত টপ্পার আদর্শে গান রচনা করেও ধ্রুপদের মতো চারিটি তুকের নিয়মেই তাকে ভাগ করেছেন। বহু প্রকার ভৈরবী খাম্বাজ বেহাগ পিলু ইত্যাদি রাগিণীতে রচিত তাঁর গানগুলি বিশ্লেষণ করলেই তা স্পষ্ট ধরা যাবে।

ভৈরবী গুরুদেবের অন্যতম একটি প্রিয় রাগিণী, তিনি বহু গান এই সুরে রচনা করেন। একজন শিল্পী বলেছিলেন যে, গুরুদেব ভৈরবীসিদ্ধ। কথাটা অসত্য নয়। কেবল ভৈরবীতে এত রকমের গান রচনা করতে বাঙলাদেশে আর কোনো রচয়িতাকে দেখি নি। ঠুংরীর মতো তাঁর ভৈরবীতে শুদ্ধ, কোমল ও তীব্রমধ্যম নিয়ে বারোটি পরদাই তিনি ব্যবহার করেছেন। তবে সবগুলি একই গানে একসঙ্গে ব্যবহার করেন নি, নানা গানে তা ছড়িয়ে আছে। ভৈরবীর বৈচিত্র্যের মূল কাঠামোটি যে কি তা "কেমনে ফিরিয়া যাও না দেখি তাঁহারে" "আনন্দ তুমি স্বামী, মঙ্গল তুমি" "কেন এলি রে ভালোবাসিলি" "বন্ধু রহো রহো সাথে" "হেলাফেলা সারা বেলা" ইত্যাদি গান ক'টির সাহায্যে অনেকটা অনুমান করা যায়। বেহাগ ও খাম্বাজ সুরের গানও তাঁর প্রচুর, তাতে মাধুর্য ও বৈচিত্র্যও বেশ আছে।

গুরুদেব প্রায়ই বলতেন যে, হিন্দী গানের ব্যাকরণ ভুলতে পেরেছিলেন ব'লে তাঁর পক্ষে সুর সৃষ্টি করা এত সহজ হয়েছিল। গানের ব্যাকরণ কী সেটাও ভালো করে বোঝা উচিত। আমরা রাগরাগিণীর আরোহী-অবরোহী বাদী-বিবাদী-সংবাদীর সংজ্ঞা কী তা জানি। রাগের পকড় কী তাও শুনেছি। রাগ-রাগিণীর এই-সব মূল পরিচয় সম্পূর্ণ ভুলতে পেরেছিলেন ব'লেই এক রাগিণী থেকে বহু রাগিণীতে যাতায়াত করতে তাঁর কোনো বাধা হয় নি। গানরচনার সময় বহুবার দেখেছি মূল রাগিণীর নিয়মের প্রতি খেয়াল হারিয়ে ফেলে স্বতঃ উৎসারিত সুরের প্রেরণা নানা-রূপ সমপ্রকৃতির রাগিণীর মিশ্রণের ভিতর দিয়ে চলেছে। ওস্তাদমহল সামান্য একটু-আধটু স্বরের পরিবর্তন ক'রে কত নাম তৈরি করেন এবং নূতন রাগিণী রচনার

গৌরবে গর্বিত হন। রবীন্দ্রসংগীতকে সেভাবে বিচার করে যদি ব্যাকরণগত নিয়মে বাঁধা যায় তা হলে অন্তত কুড়ি-পঁচিশটি সম্পূর্ণ নূতন ধরনের রাগিণীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ কাজ সুরকার কবির করণীয় ছিল না, এ কাজ গায়কদের।

রবীন্দ্রসংগীত ধ্রুপদের মতো চারিটি তুক দিয়ে গঠিত, সেকথা আগেই আলোচনা করেছি। সুরের গঠনেও ধ্রুপদের মতো স্থায়ী ও সঞ্চারী সুর থাকে, মুদারায় কিন্তু উভয়ে এক নয়। অন্তরা ও আভোগের সুর সাধারণত এক রকমের এবং উঁচু সুরেই তার গতিবিধি। এ নিয়মের ব্যতিক্রম পূর্বে তাঁর গানে কিছু কিছু হয়েছে। কিন্তু গত কুড়ি বছরের রচনায় এ নিয়মের পরিবর্তন ঘটেছিল খুব। অর্থাৎ পূর্বোক্ত নিয়মে সুর যোজনা করা তিনি প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। অন্তরার সঙ্গে আভোগের সুরের দিক থেকে মিল রাখবার চেষ্টা করেন নি। শেষজীবনের সুরের সাধনা তাঁর কাছে এমন পরিণতি লাভ করেছিল যে, সুরযোজনা কালে কোনো ভাবনা তাঁর হত না, মুক্ত ঝরনার মতো ছিল তার গতি, প্রকৃতি।

আমরা সাধারণত মনে করি, গুরুদেব প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে বিদ্রোহীর মতো দেখা দিয়ে তার নিয়মকে নির্মমভাবে আঘাত করেছিলেন। কিন্তু কথাটা সত্য নয়। বাইরে থেকে দেখলে তাঁকে এ যুগের ভারতীয় সংগীতের রাজ্যে বিদ্রোহী বলেই মনে হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি এই সংগীতের অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি যেখানেই ভেঙেছেন, আসল বস্তুর প্রতি মমত্ব রেখেই তার জড়ত্বকে ভেঙেছেন. নিছক ভাঙার উদ্দেশ্যে ভাঙেন নি। এইটি ভারতীয় সংগীতেরই চিরন্তন আদর্শ। ভারতীয় সংগীতের প্রাণলোক থেকে এতটুকু বিচ্যুত তিনি হন নি। সেইখানে তিনি ভারতীয় সংগীতের প্রধান ভক্ত।

প্রকৃতপক্ষে একটু স্থির দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় ভারতীয় সংগীতেও আছে এইরূপ একটি বিদ্রোহী স্বভাব। এই কথাটা বুঝতে হলে সমগ্রভাবে উত্তরভারতীয় সংগীতের বিচিত্র ধারার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে মনে করি। সত্যই কি ভারতীয় সংগীত অচল অনড় হয়েই শতাব্দীর পর শতাব্দী বিরাজ করছে? যদি তাই হত তা হলে কি তার থেকে প্রেরণা পাবার কোনো কারণ ঘটত এবং গুরু-দেবের মতো স্রষ্টা কি তার থেকে কোনো প্রেরণা পেতেন? আমি মনে করি উচ্চাঙ্গের ভারতীয় সংগীতের মধ্যে চিরকালের সংগীতপিপাসুকে তৃপ্তি দেবার মতো একটি বিশেষ গুণ আছে; তাই তাকে যুগে যুগে ভারতের সংগীতকে সমৃদ্ধ করবার সহায়ক রূপেই দেখলাম।

মুসলমান যুগের আগেকার ভারতবর্ষীয় সংগীত নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই এসে উত্তরভারতের হিন্দুস্থানী সংগীত ও দক্ষিণভারতের কর্ণাটি সংগীত রূপে আজকাল পরিচিত। মুসলমান-যুগে-প্রচলিত ধ্রুপদ গান আজ গায়কমহলে প্রায় পরিত্যক্ত। কিন্তু গত চারশো বৎসর ধরে সমগ্র উত্তরভারতের সংগীতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে তার আদর ছিল। এর প্রধান আদর্শ ছিল গানে বিপুলতা, গভীরতা; আর-এক দিকে তার আত্মদমন সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা। এই আদর্শ ঠিক রাখতে গিয়ে ধ্রুপদকে কতগুলি কঠোর নিয়ম মানতে হয়েছে। যেমন ধ্রুপদের রাগ বিস্তারের পদ্ধতি ছিল ধরাবাঁধা। ধ্রুপদীয়ারা প্রাণপণ চেষ্টা করতেন শিখে

নেওয়া গানগুলির চেহারা হুবহু বজায় রাখতে। ধ্রুপদে বিশুদ্ধ গমক ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার অলংকার ব্যবহার নিষিদ্ধ। এমন-কি শোনা যায় পূর্বে দুন চৌদুন বোল তান দেওয়ার রীতি ছিল না, কেবল মাত্র 'ধামার' নামে একটি ঢঙ ছাড়া। তা ছাড়া ধ্রুপদী গানের বড়ো ওস্তাদরা স্বীকার করেন যে, ধ্রুপদ গানের মর্যাদা কেবল শব্দেরই প্রাপ্য নয়, রাগিণীরও নয়, সুর ও কথা মিলে যে রস জন্মায়, কেবল তারই প্রাপ্য। এই ছিল ধ্রুপদ গানের মূল কতকগুলি লক্ষণ।

আলাপে রাগিণীর সমগ্র রূপকে এক সঙ্গে ধরা সম্ভব নয়। কারণ আলাপে গায়ক আপন শক্তি ও রুচি অনুসারে তাদের রূপ দিতে দিতে চলেন। কেবল মাত্র ব্যক্ত করাই আলাপের মূল কর্তব্য। তাকে কোনো সীমা দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে বাঁধা উচিত নয়। তা করতে গেলেই সে গান বা গৎ হয়ে পড়ে। আলাপে থামা বলে কোনো কথা নেই, সে কেবল রাগিণীর চলমান প্রকাশ। এ হল রাগিণীর একটি দিক। আর-একটি দিকের প্রকাশ গীতরূপে—যেখানে ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায়। উচ্চাঙ্গের ভারতীয় সংগীত এই দুটো দিককে আলাদা ক'রে নেওয়ার দরুনই আগের দিনের ধ্রুপদ-গায়করা ধ্রুপদকে এরকম নিরলংকার করে সাজিয়েছিলেন। আর অলংকরণের দায়িত্ব চাপিয়েছিলেন আলাপের উপর। সেইজন্যেই ধ্রুপদীয়ারা আলাপের ভূমিকা দিয়ে ধ্রুপদ গান শুরু করতেন। আলাপ-না-জানা ধ্রুপদীয়ার কোনো স্থানই ছিল না সে যুগে গায়কমহলে।

রাগিণীর অলংকৃত রূপ ও রাগিণীর বাণীরূপের একত্র মিলনের চেষ্টা থেকেই খেয়ালের উদ্ভব। উভয়ের জৈব মিলনে সে অন্য আকার গ্রহণ করল। খেয়ালের আসল কৃতিত্ব এইখানেই। আগে আলাপে ও ধ্রুপদে আলাদা করে যা দেখানো হত খেয়ালে একই সঙ্গে তা প্রকাশ পাচ্ছে বলেই ধ্রুপদ ও আলাপ আজ ধীরে ধীরে অনাদরের বস্তু হয়ে উঠছে। মিলনের প্রচেষ্টায় খেয়াল, আলাপ ও ধ্রুপদের সব কিছুকে গ্রহণ করতে পারে নি—কিছু কিছু বাদ দিতে হয়েছে। কথা ও সুরের মিলন ধ্রুপদের প্রধান বিষয় ছিল। গায়কেরা এ দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখত। খেয়ালে সে চেষ্টা হওয়া সত্ত্বেও ওস্তাদরা তা রাখতে পারে নি। কথাটা উপলক্ষমাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই দেখি ধ্রুপদের চার তুকের গান খেয়ালে ছোটো হয়ে দুই তুক থেকে এক তুক ও কখনো দুই পঙ্‌ক্তিতে এসে রূপ নিয়েছে। কথাহীন রাগিণীর সুরবিহার এত বড়ো স্থান নেয় যে, গায়কের কাছে তখন দুই পঙ্‌ক্তি বা এক পঙ্‌ক্তি কিছুই আসে যায় না। তাছাড়া আলাপের নানা প্রকার বিকাশ-ভঙ্গি খেয়ালে স্থান পায় নি। যাঁরা নাসিরুদ্দিনের কণ্ঠের আলাপ আর এ যুগের পরলোকগত আলাদিয়া খাঁর প্রচলিত ঢঙের বড়ো খেয়াল শুনেছেন তাঁরাই এ কথার তাৎপর্য বুঝবেন। আগের যুগের আলাপরীতির একটি শ্রেষ্ঠ ঢঙ নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে লুপ্ত হয়ে গেল বলে আমার বিশ্বাস। ধ্রুপদ কোনো-এক যুগে অলংকারহীন ছিল, এ কথা পূর্বে বলেছি। কিন্তু অলংকারযুক্ত ধ্রুপদও ধ্রুপদের শেষ যুগে সৃষ্ট হয়েছিল খেয়াল গানের অলংকরণ-রীতির চাপে, সে কারণে শোনা যায় যে, শেষ যুগে কোনো কোনো ধ্রুপদীয়ারা গানে তান লাগাতেন। খেয়াল গানে নূতনত্ব আনল, কিন্তু আলাপের মতো রাগিণীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও ধ্রুপদের অন্তর্মুখী গাম্ভীর্যকে হারাল। এতে ভারতীয় সংগীতে

কোনো ক্ষতি হল কি না সে বিচার রসজ্ঞ পণ্ডিতরা করবেন।

খেয়ালের ক্রমবিকাশ গত শ'খানেক বছরের মধ্যে কোন পথ ধরে চলছে এরও আলোচনার প্রয়োজন আছে। প্রথম দিকে খেয়াল ছিল ধ্রুপদ-ঘেঁষা, সেইজন্য গানে পুরুষোচিত গাম্ভীর্য ও গভীরতাই প্রকাশ পেত বিশেষ ক'রে। তাতে অলংকারের বাহুল্য আজকালের তুলনায় ছিল অনেক কম। গায়কী ভঙ্গিতেও ধ্রুপদের প্রভাব থাকত খুব। আর থাকত তানেতে ধ্রুপদীয়াদের মতো বোল তান ও নানা ছন্দ তোলার রীতি। আজকাল খেয়াল হল ঠুংরীঘেঁষা ও খুবই অলংকারবহুল। নারীসুলভ মাধুর্যই বর্তমান চলতি খেয়ালের প্রধান লক্ষণ। ঐতিহাসিকরা বলেন, সদারঙ্গের প্রবর্তিত খেয়ালে রাগের বিশুদ্ধি রক্ষা করে অল্প মাত্রায় অলংকার বা তান দেওয়া হত। রাগালাপের রীতিতে রাগ বিস্তার তান-কর্তব্যের চেয়ে বেশি করা হত, বিলম্বিত মধ্য ছিল গানের লয়। এই গানের সময় তবলায় পরন বা উপক্রমণিকা না বাজিয়ে কেবল তালের শুদ্ধ ঠেকা বাজাবার প্রথা ছিল। পরবর্তী কালের গায়করা বিলম্বিত লয়ে একখানি গান গেয়ে দুন লয়ে একই রাগের আর-একখানি গান করতেন, তবলা-বাদক তখন তার কায়দা দেখাত। শোনা যায় এই নূতন চালের প্রবর্তন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হয়েছিল গোয়ালিয়রের মহম্মদ খাঁ, হদ্দু, হস্সু ও নথ্থু খাঁ প্রভৃতি বিখ্যাত খেয়ালিয়াদের শক্তিতে। এঁরাই খেয়াল গানে গিটকারী, জমজমা, মুরকী, হলক তান, লাগডাট্ প্রভৃতি বহু প্রকার দুরূহ তানকর্তবের কারুকার্য প্রবর্তন করেন। হদ্দু খাঁ এ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তখনকার দিনের গায়করা খেয়াল গানের উক্ত বিভিন্ন প্রকার তানকে আলাদাভাবে প্রকাশ করাতেই আনন্দবোধ করতেন। গোয়ালিয়রের ও অন্য স্থানের কোনো কোনো প্রাচীন ওস্তাদের মধ্যে এখনো তার পরিচয় কিছু কিছু পাওয়া যায়। এ যুগের তানে গলার শব্দ প্রকাশের ক্ষমতাকে বিচিত্র ভঙ্গিতে সুরে প্রকাশ করার দিকে ওস্তাদদের আজকাল বিশেষ নজর নেই। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে খেয়ালে অলংকরণ-বৈচিত্র্য খুব বেড়েছে এ কথা সংগীতজ্ঞরা স্বীকার করেন। কিন্তু গলার শব্দ প্রকাশের ঐ প্রকার বৈচিত্র্য কমে যাচ্ছে।

টপ্পা শুরু হয়েছে খেয়ালের পরে। এ শোরী মিঞা নামে পাঞ্জাবের একজন গুণীর সৃষ্টি। কথিত আছে উষ্ট্রচালকদের গানের ঢঙ থেকে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন। পরে এই গানই উচ্চাঙ্গের সংগীতে স্থান পেল গুণীদের চেষ্টায়। তাঁরা মূল আদর্শকে বিস্তারিত অলংকৃত করে নিলেন। এমন-কি পরে খেয়ালের পর্যায়ে ভুলে তার নাম দিয়ে দিলেন—টপ্‌খেয়াল।

ঠুংরীর আসলে উৎপত্তি লক্ষ্ণৌ অঞ্চলে নবাবী দরবারের নাচের গানের সঙ্গে। এ গানেরও প্রেরণার মূল উৎস লোকসংগীত। দরবারে স্থান পেয়েই ধীরে ধীরে তার জাতের বাধা দূর হয়ে গেল। দরবারে বেশির ভাগ ঠুংরী হত মধ্য ও দ্রুত লয়ে। কথক ও বাইজিরাই নৃত্য ও অভিনয়ের সময় এই ধরনের ঠুংরী গায়।

কিন্তু আর-এক রকমের ঠুংরীর প্রচলন হল যা কেবল গায়কদের মধ্যে প্রচলিত। তাকে ওস্তাদ-মহলে বলত 'ঠাহকী ঠুংরী'। এর লয় বিলম্বিত। গায়ক এই গানে কবিতার এক-এক টুকরো ধরে ওর ভাবকে ভিন্ন প্রকার স্বররচনার দ্বারা প্রকাশ

করে। একে তারা বলে 'বোলবানানা'। এক বোল ধরে কখনো আলাপ, কখনো মীড় ইত্যাদি কয়েক প্রকার অলংকার দ্বারা ওর ভাবকে ব্যক্ত করে। কিছুক্ষণ গাওয়ার পর লয় একটু বাড়িয়ে দেয়। ভাবে ব্যগ্রতা প্রকাশ পায়। ঠুংরীতে তান অথবা সারগম হত না। ছোটো মুরকী ও গিট্‌কারী কাজ এতে থাকত। কিন্তু আজকাল বহু গায়ক খেয়ালের ঢঙে তান সারগম লাগিয়ে এই গানকে ছোটো-খেয়াল নাম দিয়েছেন। এইভাবে অপাংক্তেয় ঠুংরীও লোকসংগীত থেকে উচ্চাঙ্গ সংগীতের ওস্তাদদের কাছে চল হয়ে গেল।

বর্তমানে উচ্চাঙ্গ সংগীতের ওস্তাদদের মধ্যে 'ভজন' 'গীত' 'পদ' ও 'গজল' জাতীয় গান স্থান পেয়ে, কিভাবে অলংকৃত হয়ে পাংক্তেয় হবার চেষ্টা করছে তা সর্বদাই লক্ষ্য করছি। বাংলাদেশের সংগীতগুণী একটি গাইয়ের মুখে আজকাল পূর্ববাংলার লোকসংগীতের ঢঙ কিভাবে উচ্চাঙ্গের হিন্দী সংগীতের আদর্শে গড়ে উঠছে তাও লক্ষ্য করছি। আমার ব্যক্তিগত মতে, তাঁর সেই চেষ্টার মধ্যে অনেকখানি সফলতা দেখা গেছে। কিন্তু ভবিষ্যতে এর মাত্রা রাখা কতখানি সম্ভব হবে তা কে জানে। অবশ্য এ কথা ঠিক, তিনি একজন সত্যকার রসিক গাইয়ে, তাই তাঁর এই গায়কীতে আনন্দ পাই। কিন্তু বেরসিক গাইয়েদের কাছে এই পদ্ধতির কেবল অনুকরণ যে সফল হবে তা মনে হয় না।

খুব সংক্ষেপে ভারতীয় সংগীতে প্রগতিবাদী মনোভাবের পরিচয় দিতে চেষ্টা করলাম। এই এগিয়ে চলার আদর্শই গুরুদেবেরও সংগীতজীবনের প্রধান আদর্শ।

কিন্তু এই এগিয়ে চলা কর্তব্যবোধে বা অন্য কোনো কারণে কোমর বেঁধে চলা নয়—ভিতর থেকে একটি প্রেরণা এ চলাকে সাহায্য করছে।

হিন্দী গানের কতকগুলি আদর্শ তিনি খুবই মেনে চলতেন, যেমন, তাঁর যে গানে সকালের, আলোর, জাগরণের কথা আছে, সেখানে তিনি প্রাচীন মতকে বিনা দ্বিধায় স্বীকার ক'রে টোড়ী আশাবরী ভৈরব ভৈরবী রামকেলি কালেংড়া ইত্যাদি সকালের রাগিণী প্রচুর ব্যবহার করেছেন। সন্ধ্যার কথায় দেখি ইমন কিংবা পূরবী। রাত্রের কথায় বেজে উঠেছে বেহাগ কানাড়া খাম্বাজ ইত্যাদি রাত্রের সুর। বসন্তঋতুর সঙ্গে বাহারের শাস্ত্রগত যোগাযোগ হয়তো আছে, তাই বসন্তঋতুর বর্ণনামূলক বহু গানে পাই বাহার-রাগিণীর পরিচয়। এ-সব দিক থেকে তিনি বদলের একেবারেই পক্ষপাতী ছিলেন না। শরৎবর্ণনার গানে সকালের রাগিণীকেই বিশেষ ক'রে ব্যবহার করেছেন, কেননা শরতের সকালই হল তার রমণীয়তার বিশেষ রূপ। কবি দেশমল্লার বা মিঞামল্লারে ঘন ঘোর বর্ষার গানও রচনা ক'রে প্রাচীন মতের অনুকূলেও নিজেকে চালিয়েছেন। তাঁকে রাত্রির বর্ণনায় সকালের রাগিণী বা প্রভাত-আলোর বর্ণনায় রাত্রির সুর বসাতে কখনো দেখা যায় নি। ১২৮৭ সাল থেকে গুরুদেব বাড়ির উপাসনার জন্য গান রচনা শুরু করেন—মাঘোৎসব বর্ষশেষ নববর্ষ ইত্যাদি উপলক্ষে তখন থেকেই তিনি উপাসনার দিন সকালে গাইবার গানে সকালের রাগিণী ও সন্ধ্যার গাইবার গানে সন্ধ্যা বা রাত্রের সুর লাগিয়েছেন। এই অভ্যাসটি তাঁর শেষজীবন পর্যন্ত ছিল। ১৩৩৬ সালের মাঘোৎসবের গান ক'টি কলকাতায় সন্ধ্যায় গাইবার জন্য রচিত হয়, তাই সব ক'টি রাগিণী তাতে সন্ধ্যা বা রাত্রির। জীবনের সর্বশেষ

গান দুটি, 'ঐ মহামানব আসে' 'হে নূতন দেখা দিক', সকালে গাইবার জন্যে রচিত ব'লে দুটিতেই ভৈরবী-রাগিণী বসেছে।

রাগরাগিণীর সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যে একটি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, তাঁর মনে প্রথম এই চিন্তার উদয় হয়েছিল ১২৮৭ সালে। 'সংগীত ও ভাব' নামক সংগীত-বিষয়ের একটি বক্তৃতায় প্রথম এ বিষয়ে তিনি আলোচনার সূত্রপাত করেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন—

"কেন বিশেষ বিশেষ এক-এক রাগিণীতে বিশেষ বিশেষ এক-একটা ভাবের উৎপত্তি হয় [সংগীতবেত্তারা] তাহার কারণ বাহির করুন। এই মনে করুন, পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে আসে আর ভৈরোঁতেই বা কেন প্রভাত মনে আসে? পূরবীতেও কোমল সুরের বাহুল্য, আর ভৈরোঁতেও কোমল সুরের বাহুল্য, তবে উভয়েতে বিভিন্ন ফল উৎপন্ন করে কেন?...

"প্রথমত প্রভাতের রাগিণী ও সন্ধ্যার রাগিণী উভয়েতেই কোমল সুরের আবশ্যক। প্রভাত যেমন অতি ধীরে ধীরে, অতি ক্রমশ নয়ন উন্মীলিত করে, সন্ধ্যা তেমনি অতি ধীরে ধীরে, অতি ক্রমশ নয়ন নিমীলিত করে। অতএব কোমল সুরগুলির, অর্থাৎ যে সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প, যে সুরগুলি অতি ধীরে ধীরে অতি অলক্ষিতভাবে পরস্পর পরস্পরের উপর মিলাইয়া যায়, সন্ধ্যা ও প্রভাতের রাগিণীতে সেই সুরের অধিক আবশ্যক। তবে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় কি বিষয়ে প্রভেদ থাকা উচিত? না, একটাতে সুরের ক্রমশ উত্তরোত্তর বিকাশ হওয়া আবশ্যক, আর-একটাতে অতি ধীরে ধীরে সুরের ক্রমশ নিমীলন হইয়া আসা আবশ্যক। ভৈরোঁতে ও পূরবীতে সেই বিভিন্নতা রক্ষিত হইয়াছে, এইজন্যই প্রভাত ও সন্ধ্যা উক্ত দুই রাগিণীতে মূর্তিমান।"

পরবর্তী জীবনে এ বিষয়ে যা বলেছেন তাও তুলে দিচ্ছি—

"আমাদের গুণীরা ভৈরোঁতে টোড়িতে সুর বেঁধে বললেন, এ সকালবেলাকার গান। কিন্তু তার মধ্যে সকালবেলার নবজাগ্রত সংসারের নানাবিধ ধ্বনির কি কোনো নকল দেখতে পাওয়া যায়। কিছুমাত্র না। তবে ভৈরোঁকে টোড়িকে সকালবেলার রাগিণী বলবার কী মানে হল। তার মানে এই, সকালবেলাকার সমস্ত শব্দ ও নিঃশব্দতার অন্তরতর সংগীতটিকে গুণীরা তাঁদের অন্তঃকরণ দিয়ে শুনেছেন। সকালবেলাকার কোনো বহিরঙ্গের সঙ্গে এই সংগীতকে মেলাবার চেষ্টা করতে গেলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। আমাদের দেশের সংগীতের এই বিশেষত্বটি আমার কাছে বড়ো ভালো লাগে।

"আমাদের দেশে প্রভাত মধ্যাহ্ন অপরাহ্ণ সায়াহ্ন অর্ধরাত্রি ও বর্ষাবসন্তের রাগিণী রচিত হয়েছে। সে রাগিণীর সবগুলো সকলের কাছে ঠিক লাগবে কি না জানি না। অন্তত আমি সারং রাগকে মধ্যাহ্নকালের সুর ব'লে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি না। তা হউক, কিন্তু বিশ্বেশ্বরের খাসমহলের গোপন নহবৎখানায় যে কালে কালে ঋতুতে ঋতুতে নব নব রাগিণী বাজছে, আমাদের গুণীদের অন্তঃকর্ণে তা প্রবেশ করেছে। বাইরের প্রকাশের অন্তরালে যে একটি গভীরতর অন্তরের প্রকাশ আছে আমাদের দেশের টোড়ি কানাড়া তাই জানাচ্ছে।

"ভারতবর্ষে যেমন বাধাহীন পরিষ্কার আকাশ, বহুদূরবিস্তৃত সমতল ভূমি

আছে এমন য়ুরোপের কোথাও আছে কি না সন্দেহ।...এইজন্যে আমাদের পূরবীতে কিংবা টোড়িতে সমস্ত বিশাল জগতের অন্তরের হাহাধ্বনি ব্যক্ত করছে,...পৃথিবীর যে ভাবটা নির্জন বিরল অসীম, সেই আমাদের উদাসীন করে দিয়েছে। তাই সেতারে যখন ভৈরবীর মীড় টানে আমাদের ভারতবর্ষীয় হৃদয়ে একটা টান পড়ে।

"প্রকৃতির সঙ্গে গানের যত নিকট সম্পর্ক এমন আর কিছু না— আমি নিশ্চয় জানি এখনি যদি আমি জানালার বাইরে দৃষ্টি রেখে রামকেলি ভাঁজ্‌তে আরম্ভ করি তা হলে এই রৌদ্ররঞ্জিত সুদূর বিস্তৃত শ্যামল-নীল প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মতো আমার মর্মের কাছে এসে আমাকে অবলেহন করতে থাকবে।"

নানা রসের গানেও তিনি হিন্দী রাগ-রাগিণীর সাহায্য নিয়েছেন গানের ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে। এখানে ভাববার বিষয় হচ্ছে, কোনো করুণ গানে ভৈরবী সুর না বসিয়ে তাতে পিলু বা ঐরূপ কোনো রাগিণী বসালেন কেন? তাঁর গান-গুলিকে নিয়ে গভীরভাবে বিচার করলে কোন রাগিণী কিভাবে তাঁর মনে স্থান গ্রহণ করেছিল, তিনি কিভাবে তাদের অনুভব করতেন, তা ধরা পড়ে অতি সহজে।

হিন্দুস্থানী রাগ-রাগিণীকে তিনি কিভাবে অনুভব করতেন তার পরিচয় কিছুটা পাব তাঁরই উক্তি থেকে। সেগুলি তুলে দিচ্ছি—

"সানাইয়েতে ভৈরবী বাজাচ্ছিল, এমনি অতিরিক্ত মিষ্টি লাগছিল যে সে আর-কি বলব— আমার চোখের সামনেকার শূন্য আকাশ এবং বাতাস পর্যন্ত একটা অন্তর্নিরুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে যেন স্ফীত হয়ে উঠছিল, বড়ো কাতর কিন্তু বড়ো সুন্দর..."

"ভৈরবী সুরের মোচড়গুলো কানে এলে...মনে হয়...ঘর্ষণ-বেদনায় সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মর্মস্থল হতে একটা গম্ভীর কাতর করুণ রাগিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে।"

"ভোরবেলায় সানাইয়ের সুরে ভৈরবী আলাপ এখনো ক্ষণে ক্ষণে মনে প'ড়ে মনকে উতলা ক'রে দেয়।"

"ভৈরবী যেন সমস্ত সৃষ্টির অন্তরতম বিরহ-ব্যাকুলতা।"

"ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবিরহ বেদনা।"

"আমাদের উৎসবদেবতা প্রতিদিনের নিদ্রা থেকে আজ এই উৎসবের দিনে আমাদের জাগিয়ে তোলবার জন্যে দ্বারে এসে তাঁর ভৈরবরাগিণীর প্রভাতী গান ধরছেন..."

"ভৈরোঁ যেন ভোরবেলাকার আকাশেরই প্রথম জাগরণ।"

"একটি সংগীতকুশল লোক অর্ধেক রাত্রে ভৈরোঁ আলাপ করতে লাগল। বিবিধ কারণে সেটা নিতান্ত অসাময়িক বলে বোধ হতে লাগল।"

"রামকেলী প্রভৃতি সকালবেলাকার সুরের একটু আভাস লাগবামাত্র এমন-একটি বিশ্বব্যাপী করুণা বিগলিত হয়ে চারি দিককে বাষ্পাকুল করেছে যে এই সমস্ত রাগিণীকে সমস্ত আকাশের সমস্ত পৃথিবীর নিজের গান বলে মনে হচ্ছে।"

"এই ঝড়ের আঘাতে, মেঘের ছায়ায়, বৃষ্টির ঝর্ঝর শব্দে, বজ্রের গর্জনে আমার বুকের ভিতর একটা তুফান উঠচে...খুব গলা ছেড়ে দিয়ে একটা কানাড়া কিংবা মল্লার গেয়ে দিলেও সময়টা বেশ কাটে।"

"আমাদের অন্তরের সন্ধ্যাকাশেও এই শ্রাবণ অত্যন্ত ঘন হয়ে নেমেছে কিন্তু

সেখানে তার আপিসের বেশ নেই, সেখানে কেবল গানের আসর জমাতে, কেবল লীলার আয়োজন করতে·তার আগমন। সেখানে সে কবির দরবারে উপস্থিত। তাই ক্ষণে ক্ষণে মেঘমল্লারের সুরে কেবলই করুণ গান জেগে উঠ্‌ছে...”

“মেঘমল্লার যেন অশ্রুগঙ্গোত্রীর কোন্‌ আদি নির্ঝরের কলকল্লোল।”

“মেঘমল্লারে যখন বর্ষার গান চলে তখন তার মধ্যে না থাকে ঝরঝর বৃষ্টির অনুকরণ, না থ্যাকে ঘড়ঘড় বজ্রের ডাক। তবু কোনো বাস্তব-বিলাসী তাকে অবাস্তব ব'লে নিন্দা করে না।”

“মেঘমল্লার বিশ্বের বর্ষা।”...“যতবার পদ্মার উপরে বর্ষা হয় ততবারই মনে করি মেঘমল্লারে নতুন বর্ষার গান রচনা করি, কিন্তু ক্ষমতা কৈ? এবং শ্রোতাদের সম্মুখে তো এই বর্ষার নিত্যমোহ নেই, তাদের কাছে একঘেয়ে ঠেক্‌বে। কারণ, কথা তো ঐ একই—বৃষ্টি পড়চে, মেঘ করছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্চে। কিন্তু তার ভিতরকার নিত্য নূতন অনাদি অনন্ত বিরহবেদনা, সেটা কেবল গানের সুরে খানিকটা প্রকাশ পায়।”

“আমি যখন বর্ষার গান গেয়েছি তখন সেই মেঘমল্লারে জগতের সমস্ত বর্ষার অশ্রুপাতধ্বনি নবতর ভাষা এবং অপূর্ব বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে।”

“বর্ষার মেঘের ইচ্ছা ছিল, আমাকে তার কাজরী গান শুনিয়ে দেবে—তার পরে আমিও তাকে আমার গানে জবাব দেবো।”

“কতদিন পরে ঐ সজল মেঘ দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। যদি আমি তোমাদের কাশীর হিন্দুস্থানী মেয়ে হতুম তাহলে কাজরী গাইতে গাইতে শিরীষ গাছের দোলাটাতে দুল্‌তে যেতুম।”

“আবার তারা মুলতান বাজাচ্ছে, মনটা বড়ই উদাস করে দিয়েছে। পৃথিবীর এই সমস্ত সবুজ দৃশ্যের উপরে একটি অশ্রুবাষ্পের আবরণ টেনে দিয়েছে।”

“মাঝে মাঝে অনতিদূরে ঘণ্টা বাজে, সেই ঘণ্টাধ্বনি ভারি উদাস। আর সেই ঘণ্টার ধ্বনি যেন আকাশে নীরবে বাজছে, মুলতানে বলছে বেলা যায়।”

“মুলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্ত নিশ্বাস।”

“পূরবী যেন শূন্যগৃহচারিণী বিধবা সন্ধ্যার অশ্রু মোচন।”

“নৌকা থেকে বেহালাযন্ত্রে প্রথমে পূরবী ও পরে ইমানকল্যাণে আলাপ শোনা গেল—সমস্ত স্থির নদী এবং স্তব্ধ আকাশ মানুষের হৃদয়ে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল...যেই পূরবীর তান বেজে উঠল, অমনি অনুভব করলুম এও এক আশ্চর্য গভীর এবং অসীম সুন্দর ব্যাপার, এও এক পরম সৃষ্টি—সন্ধ্যার সমস্ত ইন্দ্রজালের সঙ্গে এই রাগিণী এমনি সহজে বিস্তীর্ণ হয়ে গেল, কোথাও কিছু ভঙ্গ হল না—আমার সমস্ত বক্ষস্থল ভরে উঠল।”

“সব যায়, চলে যায়, আমরাও যাই, এই বিষাদের ছায়ায় সর্বত্র একটি করুণা মাখিয়ে দিয়েছে—চারি দিকে পূরবী রাগিণীর কোমল সুরগুলি বাজিয়ে তুলে আমাদের মনকে আর্দ্র করেছে।”

“যদিও আজ চ'লেছি পশ্চিম সমুদ্রের তীরে, আমার মন খুঁজে বেড়াচ্ছে আর-এক তীরে সকল কাজভোলা সেই বালকটাকে। পূরবী গানে সে আপন লীলা শেষ

করতে না পারলে সন্ধ্যা ব্যর্থ হবে।"

"আজকের এই দিনটা সেই রকমের—এ আছে তবু নেই...এ গৌড়সারঙের আলাপ, যখন সমাপ্ত হয়ে যাবে তখন হিসাবের খাতায় কোনো অঙ্ক রেখে যাবে না।"

"বাতাসে ভূপালীর সুরে একটা ডাক শুনতে পাচ্ছি, থাম্ রে থাম্, আয় রে আয়।"

"পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা।"

"সাহানার সুর অচঞ্চল ও গভীর, যাতে আমোদ-আহ্লাদের উল্লাস নেই তাই আমাদের বিবাহ-উৎসবের রাগিণী।"

"কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথবিস্মৃতি।"

"খাম্বাজের করুণ তান সহরের আকাশে আঁচল বিছিয়ে দিল।"

মোটকথা ভারতীয় সংগীতের প্রাণলোক তাঁর গানের ভিতর দিয়ে এইভাবে প্রকাশিত হয়েছে বলেই বলতে বাধ্য হয়েছি, তিনি ভারতীয় সংগীতকে মোটেই ভাঙেন নি, তিনি ভেঙেছেন তার জড়ত্বের সম্ভাবনাকে। ঠিক এই রীতিই তাঁর শিক্ষার আদর্শে, ধর্মে কর্মে, কাব্যে সাহিত্যে, সর্বত্রই প্রকাশিত হয়েছে। গুরুদেবের গান প্রাচীনের উপর ভিত্তি ক'রে এ যুগের নূতন প্রকাশ মাত্র—যা ভারতে যুগে যুগে হয়ে এসেছে। এই কারণেই রবীন্দ্রসংগীত একটি নূতন ধারার প্রবর্তন করলেও ভারতীয় সংগীত থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখা উচিত নয়। কবিতার ভাব ও ছন্দ বাংলা গানের প্রধান বস্তু এবং হিন্দী গানের রাগ-রাগিণীর নিজস্ব ভাবপ্রকাশের ক্ষমতার বৈচিত্র্য আছে বলেই কবিতার ভাব ভাষা ও ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে ইচ্ছামতো তাকে চালনা করা যায়। এইখানেই তিনি ভারতীয় সংগীতে বিদ্রোহীরূপে দেখা দিয়েছিলেন।

গানের বিষয়বৈচিত্র্যেও রবীন্দ্রসংগীত অপূর্ব, এ পথে তিনি বোধহয় অদ্বিতীয় রচয়িতা। মানবমনের প্রায় সব অবস্থার গানই তিনি রচনা ক'রে গেছেন। কত রকম উৎসবের, অনুষ্ঠানের, গৃহপ্রবেশের, প্রতিষ্ঠানের, চাষ করার, ধান কাটার, নলকূপ স্থাপনের, খেলার, চলার, বৃক্ষরোপণের গান, জাতীয় সংগীত, উদ্দীপক সংগীত, প্রার্থনাসংগীত—তাঁর রচনায় কোনোটাই বাদ পড়ে নি। এমন-কি তিনি হাসির গান রচনাতেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সে গানগুলি সংখ্যায় খুব বেশি নয়। এ বিষয়েও সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

এটা হয়তো অনেকে লক্ষ্য করে থাকবেন যে উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় সংগীতে সাধারণত হাস্যরসের গান স্থান পায় নি। গুণীরা এগুলিকে খুব সম্মানের চোখে কোনো দিনই দেখেন নি, অন্ত্যজের মতোই তাকে অবজ্ঞা করা হয়েছে।

হাসি রসিকতা ঠাট্টার গান লোকসংগীতে বরাবর ছিল, আজও ভারতের নানা প্রদেশের লোকসংগীতে নানাপ্রকার হাস্যরসের গান গাওয়া হয়, তবে তার মধ্যে কুরুচির গানই বেশি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্তও বাঙলাদেশে কবির-গান, হাফ-আখড়াই ও তর্জার গানে যথেষ্ট ঠাট্টা ও রসিকতা থাকত। শ্রোতারাও এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিল বলে শোনা যায়। এখনো প্রচলিত কবির-গানে ঠাট্টা হাসি যথেষ্ট থাকে। তবে সাধারণত তা গ্রাম্যতাদুষ্ট ও অসংস্কৃত।

ইংরাজী সভ্যতার গুণে তথাকথিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও ধনীদের মধ্যে আর-এক রকমের হাসির গানের উদয় হয়েছিল—সে সব গানে বর্তমান সভ্যতা ও শিক্ষাদীক্ষা নিয়েই বিশেষভাবে ব্যঙ্গ করা হত। কিন্তু নির্ব্যঙ্গ নির্মল কৌতুকসংগীতও তখন শুরু হয়েছে। এইরকম গানের সূত্রপাত করেন রূপচাঁদ পক্ষী, ধীরাজ, প্যারীমোহন কবিরত্ন ইত্যাদিরা।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্বরচিত হাসির গানে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর গান যে বিলেতি একপ্রকার হাসির গানের আদর্শে রচিত এ কথা সকলেই জানেন। তাঁর গানের কবিতায় ব্যঙ্গ বেশি, রঙ্গ কম।

বাঙলাদেশে হাসির গান খুব বেশি না হলেও আজ পর্যন্ত যা রচিত হয়েছে, তাকে সুরের দিক থেকে তিনটি ভাগে ফেলা যায়। পল্লীগীতির সুরে রচিত গানগুলি এক দলের, রাগিণী অবলম্বনে রচিত গানগুলি আর-এক দলের, তৃতীয় দলের গান-গুলি হল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দেশী ও বিলেতি সুরে মিশ্রিত হাসির গান। গুরুদেব পল্লীগীতির সুরে ও রাগ-রাগিণীর সাহায্যে হাসির গান লিখেছেন। তাঁর কতকগুলি হাসির গানে রাগিণী ও কথা বিরুদ্ধ রসের দ্বারা হাসির উদ্রেক করে। দ্বিজেন্দ্র-লালেরও এ ধরনের কয়েকটি গান আছে। গুরুদেবের কেবলমাত্র দুটি গানের দ্বারা কথাটাকে এখানে একটু পরিস্ফুট ক'রে দেখানো যাক। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য় দস্যুদের হাসির বা কান্নার গান আছে। অট্টহাসির 'হাঃ হাঃ' শব্দটিকে তিনি পিলু রাগের গানের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। উঁচু সা থেকে এক সপ্তক সুর সেই 'হাঃ হাঃ' শব্দের সঙ্গে নেমে আসে; শুনে মনে হবে স্বাভাবিক হাসি। কান্নার 'উঃ উঃ' শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন গৌরী রাগের কান্নার গানে। সেখানে এই শব্দদুটি মুদারার কোমল রে থেকে সা সুরে এসে স্থিতি নেয়। কান্নাটা সুরে বানানো হয়েছে। তা ছাড়া 'তাসের দেশ' নাটকের 'হাই' ও 'হাঁচি'র গান দুটির প্রতি দৃষ্টি দিতে বলি। সবক'টি গানে হিন্দী বড়ো বড়ো রাগরাগিণী ছাড়া সুর বসে নি।

যে-সব হাসির গানে ব্যক্তি, সমাজ বা কোনো প্রথার প্রতি বিদ্রূপ তিরস্কার বা ঠাট্টা প্রকাশ পেয়েছে, সাময়িক ঠাট্টা-বিদ্রূপের কারণ যখন পার হয়ে যায় তখন সেই গানগুলির প্রতি মানুষের কোনো টান থাকে না। যেমন সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' কোনোদিন পুরোনো হতে পারে না, গুরুদেবের হাসির গানগুলি সেই দলের। কিন্তু একটা পার্থক্য আছে। সমালোচকের ভাষায় বলা চলে, "এ সুমার্জিত রুচিসম্পন্ন, এর উপভোগ বুদ্ধিগম্য ও শিক্ষাদীক্ষাসাপেক্ষ। সে কৌতুকে মুখ হাসে না, মন হাসে।...শব্দবিন্যাসের কৌশলে ভাবের অসংগতি অবলম্বনে ও শাণিত অথচ পূত রঙ্গে ও ব্যঞ্জনার দ্বারা হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন।" উদাহরণস্বরূপ আরও কতকগুলি ভালো গানের নাম উল্লেখ করি— 'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল, ভবের পদ্ম-পত্রে জল'; 'ফাল্গুনী'র 'আমাদের ভয় কাহারে', 'ভালো মানুষ নই রে মোরা', 'আমাদের পাকবে না চুল গো'; 'গোড়ায় গলদ' প্রহসনের 'তোমরা সবাই ভালো'; হৈহৈ সংঘের গান 'আমরা না-গান-গাওয়ার দল রে', 'কাঁটাবনবিহারিণী সুর-কানা দেবী' ও 'পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে।' এই কটি গান থেকেই আন্দাজ করা যায় তাঁর গান কী আদর্শে গঠিত। এগুলি সবই বাঙলাদেশের প্রচলিত হাল্কা ঢঙে

খাম্বাজ কীর্তন ও বাউলের সুরে রচিত। তিনি কোনোদিনই এ ধরনের গানরচনায় বিদেশী সুরের পক্ষপাতী ছিলেন না।

গুরুদেব গানের কথার সঙ্গে হিন্দীমতের চলতি নিয়মবিরোধী রাগিণী মিশিয়েও খুবই আশ্চর্য রস সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এ মিশ্রণকে অসম্পূর্ণ বলে অবজ্ঞা করাও সম্ভব নয়। যেমন বাগেশ্রী বা ইমন ভূপালীতে বর্ষার গান, ভৈরবীতে বীর্যের গান রচনা করেছেন যা শাস্ত্রানুযায়ী সম্ভব নয়। প্রাচীন রাগ-রাগিণীগুলি এক দিকে যেমন প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, অষ্ট প্রহরের এক-একটি ভাগের সঙ্গে এক-একটি রাগিণীকে গাইবার বাঁধা নিয়ম নির্দেশ করা আছে, তেমনি আবার সেই রাগিণীই মানুষের মনের নানা আনন্দ বেদনায় বিশেষ অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। শিল্পীর কাছে সুরের এই স্বরূপটি যখন ধরা পড়ে তখন যে-কোনো রাগিণী নিয়ে যেমন খুশি গান রচনা করা শিল্পীর কাছে অসম্ভব হয় না। গুরুদেব ছিলেন এরূপ লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী শিল্পী। তাঁর গীতিনাট্যে হাসিকান্না সুখদুঃখ ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে নানা রাগিণী মিশে। অত্যন্ত ক্রোধে যখন অভিসম্পাত করা হচ্ছে তখন সে কথার সঙ্গে দেখলাম ধ্রুপদী ঢঙে শংকরা রাগিণীতে বলাচ্ছেন 'কাঁদিতে হবে রে পাপিষ্ঠা।' এ রকম হাসিকান্না ইত্যাদি প্রকাশের আরো যে কত রকম বৈচিত্র্য আছে একটু আগেই তার উল্লেখ করেছি।

গুরুদেব গানে সুর যোজনার কয়েকটি মূল আদর্শ ঠিক করেছিলেন। যেমন, বীর্যপূর্ণ জোরালো উল্লাসের গানে ছন্দ হবে দ্রুত, স্বরগুলি তাতে বসবে কাটা কাটা ভাবে, এবং কয়েক সুর অন্তর লাফিয়ে লাফিয়ে চলবে। করুণ বিষাদের গানের লয় হবে অপেক্ষাকৃত ধীর, সুরগঠনে কাটা কাটা বা লাফিয়ে চলার ভাব থাকবে না, কিন্তু খুব মীড়ের কাজও তাতে স্থান পায় না, থাকে ছোট ছোট সুরের অলংকার। বিশেষ করে খাম্বাজ বেহাগ ভৈরবী মিশ্রমুলতান ইত্যাদি রাগিণীর বেদনার গানগুলির দিকে তাকালেই এ কথা স্পষ্ট ধরা পড়বে। মীড়ের কাজ থাকে বেশির ভাগ গম্ভীর প্রকৃতির গানে; এ গানের লয়ও খুব ধীর। এর মধ্যে ঋতুসংগীত ও ধর্মসংগীত দুই আছে। এ ছাড়া গানের ভাষায় যেখানে গম্ভীর একটি বিস্তারের ভাব প্রকাশ পায় সেখানে দু'একটি মাত্র স্বরের উপর কথা দাঁড়িয়ে থাকে। এই স্বরগুলি মীড়ে চলে একটি থেকে আর একটির দিকে ধীর গতিতে। অনেক সময় শুনে মনে হবে, প্রায় এক সুরেই দাঁড়িয়ে আছে। 'তুমি রবে নীরবে' ও 'জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে' গান দুটি থেকে আমার এই কথার সমর্থন পাওয়া যাবে। আর-এক রকমের গান আছে, যেগুলিতে মীড় নেই। ছোট ছোট সুরের অলংকার-যুক্ত স্বর কাটা কাটা নয় বা লাফিয়ে চলে না, এবং ছন্দ দ্রুত। এ গানের ভালো উদাহরণ হল বাউলের আদর্শে রচিত গানগুলি, এই গানে দেখি বেদনা; কিন্তু সে বেদনার অন্তরে যে আনন্দ আছে তাকে প্রকাশ করাই হল এর বৈশিষ্ট্য।

আমরা যখন পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান করি, তখন বাচনের বিশেষ ভঙ্গী আমাদের খুব কাজ দেয়—যেমন, তিনবার কোনো সংকল্পকে উচ্চারণ করে প্রতিজ্ঞা করার মধ্যে মনের যে দৃঢ়তা প্রকাশ পায় তাকেই আমরা বলি 'তিন সত্যি' করা। গুরুদেব বহু গানে কোনো কথার দ্বারা মনের দৃঢ়তা প্রকাশ করতে গিয়ে

সেই কথাটিকে গানেও তিনবার পর পর উচ্চারণ করেছেন। বহু গানে এর উদাহরণ ছড়িয়ে আছে যেমন—

১ যেতে যদি হয় হবে, হবে, হবে গো
যাব যাব যাব তবে।

২ না, না গো না, কোরো না ভাবনা।

৩ এসো, এসো আমার ঘরে
এসো আমার ঘরে।

৪ সব দিবি কে, সব দিবি কে,
সব দিবি পায় আয়, আয়, আয়।

৫ যেয়ো না, যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে।

৬ এবার
উজাড় করে লও হে আমার
যা কিছু সম্বল।
ফিরে চাও, ফিরে চাও,
ফিরে চাও ওগো চঞ্চল।

৭ ফিরে চল, ফিরে চল, ফিরে চল
মাটির টানে।

ঠিক যে ভাবে গানে কথাকে উচ্চারণ করে গাইতে হয়, সেইভাবেই উপরের গানের কথাগুলি লেখা হল।

এই রকমে আরও নানাভাবে আলোচনা করলে দেখতে পাব, তিনি গানরচনায় আমাদের ব্যবহারিক জীবন থেকে মনের অনেক রকমের অভ্যাসকে গ্রহণ করেছেন এবং সেই কারণেই গানগুলি এত প্রাণে ধাক্কা দেয়; মনে হয়, কথা বলছে।

প্রতিভাবান কবি হওয়ার দরুন যে-কোনো রকমের গান রচনা করার পক্ষে তাঁর অনেক সুবিধা ঘটেছিল। আবার গভীর সংগীতানুরাগের গুণে তিনি ভারতীয় সংগীতের মর্মস্থানে পৌঁছে তার রহস্যটি উদ্ঘাটিত করতে পেরেছিলেন, গানকে এত রকমে সকলের সামনে ধরতে পেরেছিলেন।

উচ্চাঙ্গ হিন্দীগানের প্রভাব

উচ্চাঙ্গের হিন্দী গান থেকে গুরুদেব কিভাবে উপকৃত হয়েছিলেন সে বিষয়ে আমরা গুরুদেবের দুটি মূল্যবান লিখিত উক্তি পাই। তিনি বলছেন—

"জনশ্রুতি আছে যে, আমি হিন্দুস্থানী গান জানি নে, বুঝি নে। আমার আদি যুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুপদপদ্ধতির রাগরাগিণীর সাক্ষীদল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণসহ দূর ভাবী শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাদবিতণ্ডার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও সেই সংগীতকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারি নে, সেই সংগীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি একথা যারা জানে না তারাই হিন্দুস্থানী সংগীত জানে না।"

অন্যত্র বলেছেন—

"আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করে। এই ধ্রপদ গানে আমরা দুটো জিনিস পেয়েছি—একদিকে তার বিপুলতা, গভীরতা; আর একদিকে তার আত্মদমন, সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা।"

ধ্রুপদের এই বিপুলতা, গভীরতা, আত্মদমন ও সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করার মূলনীতিটিকেই গুরুদেব তাঁর গানে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলেন। এটিই হল ধ্রুপদের প্রভাবের একটি বড় দিক। কিন্তু এখানে আমাদের আলোচনার বিষয় হল গুরুদেবের গানে আমরা চারিটি কলির যে ভাগ দেখি কেবল মাত্র সেই দিকটি। ধ্রুপদের প্রভাবেই এটি হয়েছে।

ধ্রুপদের গানে আমরা পাই স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ নামে চারিটি কলি। স্থায়ীতে রাগিণী যে ভাবে বসে অন্তরায় সেই রাগিণীকে আমরা ভিন্নরূপে দেখি। সঞ্চারীর সুর আস্থায়ী ও অন্তরার কোনোটার সঙ্গেই মিলবে না, রাগিণী এক হলেও। আভোগের সুর সাধারণত হয় অন্তরার সুরের পুনরাবৃত্তি মাত্র। একটি হিন্দী ধ্রুপদ গান শুনলে একথার অর্থ পরিস্কার ধরা পড়বে। হিন্দী ধ্রুপদ গানের অনুকরণে রচিত গুরুদেবের বাংলাভাষার একটি চৌতালের গান এখানে উল্লেখ করি। যেমন—

"স্বামী তুমি এসো আজ
অন্ধকার হৃদয় মাঝ।"

পূর্বে ধ্রুপদের যে সব গুণগুলির কথা গুরুদেবের উক্তি থেকে উদ্ধৃত করেছি বাংলাভাষায় ভাঙা এই ধ্রুপদ গানটিতে সেই গুণগুলির সবই যে বর্তমান, গানটি ভাল করে একবার শুনলেই বুঝতে পারা যাবে। এ ছাড়া এই গানটিতে বেহাগ রাগিণী যে ভাবে চার কলিতে বিভক্ত হয়ে বসেছে সেটিও লক্ষ্য করবার বিষয়। এই হল ধ্রুপদ গান রচনার মূল নীতি।

হিন্দী ধ্রুপদ গানগুলি সাধারণত চৌতাল, আড়াচৌতাল, সুরফাক্তালে রচিত হত। দাদরা বা কাহারবা ইত্যাদি লঘুতালের ছন্দে রচিত হত বলে শোনা যায় না। হিন্দী ধ্রুপদের অনুকরণে, (যাকে আমরা বলছি ভাঙা গান) গুরুদেব চৌতাল

ইত্যাদি নানাতালে অনেক গান রচনা করেছেন। কিন্তু দাদরা ও কাহারবা তালের গানকেও চার কলিতে ভাগ করে, ধ্রুপদের নিয়মে সুর বসিয়ে নিজের ধ্রুপদ নিষ্ঠার যে পরিচয় রেখে গেলেন, ধ্রুপদীয়াদের যুগে এমনটি দেখা যায় নি। এর দ্বারা ধ্রুপদ গান যে প্রচলিত নিয়মের বাঁধন থেকে মুক্তি পেল সে কথা মানতেই হবে। এই ধরনের গানের নমুনা আলাদা করে উদ্ধৃত করার প্রয়োজন বোধ করি না। দাদরা তালের বাউল ও কীর্তনাঙ্গ গানের সুরে রচিত গুরুদেবের গানের মধ্যেও এইরূপ চার কলির গান প্রচুর।

দুই কলির সমষ্টি এ যুগের হিন্দী খেয়াল গানের অনুকরণে গুরুদেব যখন বাংলা গান রচনা করলেন তখনো তাতে দেখেছি ধ্রুপদের মতো চারিটি কলির প্রভাব। দু কলির ত্রিতালের গানের সঙ্গে জুড়ে দিলেন আরো দু কলি নিজে থেকে। সঞ্চারীর সুরটি নিজে নতুন করে রচনা করলেন মূল রাগিণীটিকে ঠিক রেখে। "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে" গানটি তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। গানটির আরম্ভের আস্থায়ী ও অন্তরা ত্রিতালে রচিত একটি হিন্দী গানের অনুকরণে রচিত। কিন্তু সঞ্চারীর "বসিয়া আছ কেন আপন মনে" থেকে শেষ আভোগ পর্যন্ত তাঁর নিজের রচনা।

ঠিক একই ভাবে দুই কলির হিন্দী টপ্পা ও ঠুংরী গানকেও যখন বাংলাভাষায় রূপান্তরিত করলেন তখনও দেখতে পেলাম তাদের চার কলিতে সাজাচ্ছেন। নমুনা স্বরূপ, দুটি গানের উল্লেখ করি, যেমন, "বন্ধু রহো রহো সাথে" এবং "কখন দিলে পরায়ে স্বপনে বরণমালা"।

সুতরাং গুরুদেবের গানে হিন্দী গানের প্রভাব বিষয়ে যখন চিন্তা করব তখন আরম্ভে গুরুদেবের লিখিত উক্তি দুটি মনে রেখে তা করতে হবে।

দেশী সংগীতের প্রভাব

'লোকসংগীত' কথাটি আজ অতি প্রচলিত হলেও শব্দটির ব্যবহার ইংরেজ শাসনের পূর্বে ভারতে ছিল বলে জানা যায় না। এই কথাটি আমরা পেয়েছি ইংরেজদের কাছ থেকে তাদের folksong বা folkmusic কথার অনুবাদ হিসেবে। এই শব্দটির পিছনে একটি ইতিহাস আছে।

আঠারো শতকের মধ্যভাগে ইয়োরোপে যন্ত্রযুগের সূত্রপাত হয়। এর পর থেকেই দেখা দিল প্রাক্‌যন্ত্রযুগের সভ্যতার সংগে যন্ত্রযুগের সভ্যতার পার্থক্য। অর্থাৎ আগেকার সভ্যতা বা সংস্কৃতি ছিল গ্রামনির্ভর, আর যন্ত্রযুগের সভ্যতা হয়ে দাঁড়াল সম্পূর্ণ রূপে নগরকেন্দ্রিক। ক্রমে ইয়োরোপের এতদিনকার গ্রামনির্ভর সভ্যতাকে নতুন নগরসভ্যতা সম্পূর্ণ গ্রাস করল আর নগরগুলি হয়ে উঠল যন্ত্রযুগের সংস্কৃতির একমাত্র কেন্দ্র। এই পরিবর্তনের ছাপ সংগীতেও প্রকাশ পেয়েছে এবং সংগীতেও যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

ইয়োরোপের সংগীত যন্ত্রযুগের অনেক আগে থেকেই নগরকে কেন্দ্র করে হার্মনি সংগীতে আত্মবিকাশ করছিল। কিন্তু এ যুগে হার্মনি সংগীতের যে রূপ আমরা দেখি তার গোড়াপত্তন হয় ঐ আঠারো শতকের মধ্যভাগে। এতদিন পর্যন্ত ইয়োরোপের গ্রাম-জাত প্রাচীন সংগীতধারা নিজের পথে চলতে কোনো বাধা পায় নি। কিন্তু যন্ত্রযুগের সংগে সংগেই আপন অস্তিত্ব বজায় রাখা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। ইয়োরোপের নতুন যুগের নগরজাত সংগীত গ্রাম ও নগরে একই সংগে ব্যাপকভাবে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করায় গ্রামের প্রাচীন ধারার সব উৎস বন্ধ হতে লাগল। এই রকমের এক অবস্থার মধ্যে হঠাৎ গ্রামের প্রাচীন প্রথার প্রতি ইয়োরোপের নগর-বাসীদের প্রথম নজর পড়ে এই অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে। সে সময়ে একদল সংগীতরসিক মনে করলেন, নতুন যুগের ধাক্কায় প্রাচীন সংগীতকে যখন বাঁচানো যাবে না তখন অন্তত তার চিহ্ন যাতে সম্পূর্ণ লোপ না পায় সেরকম কোনো ব্যবস্থা করা দরকার। সেই চেতনাতেই দেখা দিল প্রাচীন ধারার গ্রামনির্ভর সংস্কৃতির অঙ্গ সংগীতের সংগ্রহের প্রতি ঝোঁক। কিন্তু ব্যাপকভাবে এ কাজে উৎসাহ দেখা দেয় উনিশ শতকের মধ্যভাগে। এর কারণ হল, তখনকার ইয়োরোপের রোমান্টিক আন্দোলনে নতুন স্বাদেশিকতা-বোধের আবির্ভাব। সাহিত্য ও শিল্পের মত সংগীতের মাধ্যমেও প্রত্যেক জাতি নিজের বৈশিষ্ট্যকে জানবার ও তাকে সকলের কাছে প্রকাশ করবার প্রেরণা অনুভব করল। বড় বড় সংগীতস্রষ্টারা নিজের দেশের সংগীতের ভাণ্ডার থেকে নানাভাবে উপকরণ সংগ্রহ করে নতুন সাজে তাকে সাজাতে চেষ্টা করতে লাগলেন। সংগ্রহের কাজ তখন থেকে শুরু করে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই ইয়োরোপের বহু দেশে এমন আগ্রহের সংগে চলছিল যে, সেখানকার কোনো কোনো অঞ্চলে সংগ্রহের উপযোগী প্রাচীন গান নিঃশেষ হয়ে গেল। এই সংগ্রহের দ্বারা প্রাচীন পদ্ধতির সংগীতকে নতুন করে সমাজে স্থান করে দেওয়া সংগ্রাহকদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁরা জানতেন তা কোনো দিনই সম্ভব নয়। তাঁরা চেয়েছিলেন তাঁদের দেশের প্রাচীন সংগীতের পরিচয়টিকে জানতে ও

তার সাহায্যে সেই কালের মানুষের প্রকৃতি ও তার সমাজকে বুঝতে। আর নতুন সৃষ্টির পথে তার কাছ থেকে প্রেরণা পেতে। এই জন্যে এই ভাবে প্রাচীন পদ্ধতির গ্রাম ও নগর-জাত সংগীতের দুটি দিককে বোঝাবার জন্যে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে তাদের আলাদা নামকরণ করা হল। গ্রামজাত সভ্যতায় বিকশিত সংগীতকে তাঁরা বললেন folksong ও নগরজাত সংগীত হল art song। এই দুই সংগীতপদ্ধতির যে পার্থক্য তাতে দেখা গেল যে, গ্রামসভ্যতা-জাত সংগীত কথা ও সুরকে একই সঙ্গে সমান প্রাধান্য দিয়েছে। এবং এমন-সব বিচিত্র সুর এই পথে আবিষ্কৃত হয়েছে যাদের বাইরের রূপ সহজ সরল হলেও শ্রোতার মন আকর্ষণ করার এক অসীম ক্ষমতা তাদের আছে। অন্য পক্ষে নগরজাত সংগীত আনল chord, counterpoint ইত্যাদি যোগে সুরের ইন্দ্রজালে সাজানো হার্মনি সংগীত নামে সম্পূর্ণ পৃথক এক সংগীতপদ্ধতি। এ ছাড়া বহু বিচিত্র স্বরের স্থান হল এই সংগীতে। গ্রামজাত সংগীত ছিল প্রধানত একক সংগীত। নগরজাত সংগীত হয়ে দাঁড়াল বিশেষ স্থানে সাজানো, বহুজন ও বহুযন্ত্রের বিচিত্র সুর সম্মিলনের সংগীত। এই হার্মনি সংগীতে ইয়োরোপ আজ এত অভ্যস্ত যে, প্রাচীন আদর্শের folksong গাইতে গিয়েও তারা তার সঙ্গে chord ব্যবহার না করে পারে না। হার্মনির আদর্শে না সাজিয়ে কোনো গানই আজ তারা শুনতে চাইবে না।

আমাদের দেশে ইংরেজ-পূর্ব যুগ পর্যন্ত সংস্কৃতির যাবতীয় ধারা যুক্ত ছিল গ্রামের সঙ্গে। ইংরেজ-যুগে গ্রামকেন্দ্রিক এই সংস্কৃতি যখন গ্রামকে ত্যাগ ক'রে শহরমুখী হল, তখন প্রাণবান গ্রামনির্ভর সংস্কৃতির সব উৎস শুকিয়ে আসতে লাগল। আমাদের ইংরেজ-যুগের শহরগুলিতে বিদেশী সভ্যতার প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও বিলেতের নগরকেন্দ্রিক যন্ত্রসভ্যতার সঙ্গে এরা সমান তাল রেখে চলতে পারে নি। তাই বিলেতের শহরকেন্দ্রিক প্রাণবান সভ্যতা এ দেশে গড়ে উঠল না। আমাদের শহরগুলিতে এমন-একটা মিশ্র ও দুর্বল সভ্যতার প্রকাশ দেখা দিল, ইয়োরোপের নগরসভ্যতার মত গ্রামকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করে নেবার ক্ষমতা যার ছিল না। অথচ এ দেশের নগরগুলি বিদেশের ব্যর্থ অনুকরণের দ্বারা এমন-একটা অবস্থার সৃষ্টি করল, যার ফলে নগর গ্রামকে অবহেলা করতে লাগল। এবং এই অবহেলা থেকেই গ্রামের সঙ্গে শহরের বড়-রকমের একটা ব্যবধান গড়ে উঠল। এরই একটি বড় নমুনা হল এ যুগের শিক্ষাব্যবস্থা। ইয়োরোপের অনুকরণে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে যে শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে উঠল তার সঙ্গে পূর্বযুগের গ্রামকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার কোনো যোগ রইল না। অথচ ভারতের প্রত্যেক চিন্তাশীল মনীষী একবাক্যে স্বীকার করেছেন, ইংরেজ যুগের এই শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের দেশের পক্ষে ব্যর্থ হয়েছে। এই জন্যেই গুরুদেব ও মহাত্মাজী যে নতুন শিক্ষাপদ্ধতির আদর্শ স্থাপন করলেন তা হল গ্রামকেন্দ্রিক।

চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও কারুশিল্পেও ঐ রকমের ভুল পথ আমরা ধরেছিলাম। ইয়োরোপীয় শিক্ষার গুণে আমরা গ্রামকেন্দ্রিক শিল্পপ্রথাকে অবহেলা ও অবজ্ঞা করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। ঠিক এই রকম অবস্থার মধ্যে বিদেশী হ্যাভেল সাহেব ও শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ আমাদের দেশকে বাঁচালেন। বিদেশী শিল্পের

ব্যর্থ অনুকরণের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করলেন। সৃষ্টি করলেন গ্রামজাত প্রাচীন প্রথাকে ভিত্তি করে নতুন শিল্পপদ্ধতি।

ভারতীয় নৃত্যকলার যে নবযুগ আমরা দেখছি, তার প্রেরণার একমাত্র উৎস হল আমাদের গ্রামকেন্দ্রিক প্রাচীন নৃত্য ও নৃত্যাভিনয়ধারা। ইংরেজ যুগের প্রথম থেকেই শহরবাসী আমাদের মনে গ্রামের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব এত তীব্র হয়েছিল যে, আমরা গ্রামকেন্দ্রিক ভারতীয় নৃত্যকলার রস গ্রহণের কোনো চেষ্টা করি নি; তাকে নিচুস্তরের শিল্পরূপে গণ্য করে ঘৃণা করেছিলাম। এই মনোভাবের দরুন কত রকমের গ্রামের নাচই না নষ্ট হল। কিন্তু গুরুদেবের চেষ্টায় যখন আবার শিক্ষিতদের মধ্যে নৃত্য-আন্দোলন শুরু হল তখন সকলকেই হাত পাততে হল ঐ গ্রামের কাছে। আজ ভারতের সব নৃত্য-আন্দোলনের প্রেরণার একমাত্র উৎস-স্থল হল গ্রাম। কেবল সংগীতের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা গেল। ইয়োরোপের সংগীতচিন্তা আমাদের শহরবাসী শিক্ষিতদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করলেও ভারতীয় সংগীতের প্রতি আমাদের মন বিমুখ হয় নি। আমরা বিদেশী সংগীতকে বুঝতে চেষ্টা করেছি তাকে গ্রহণও করেছি, বিশেষ করে যন্ত্রসংগীতের দিক থেকে, কিন্তু তার প্রভাবে আমাদের আত্মবিস্মৃতি ঘটে নি। আমরা এ কথা বলতে শিখি নি যে আমাদের সংগীত ইয়োরোপীয়দের তুলনায় কিছু নয়। শহরবাসীরাও প্রাচীন সংগীতকে মনেপ্রাণে ভালবেসেছে।

ভারতীয় সংগীতপদ্ধতি নিয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তাতে দেখেছি মার্গ বা উচ্চাঙ্গ ও দেশী নামে দুই ধারার সংগীতের বাহক আমরা। উভয় সংগীতই সুর কথা ও ছন্দে রচিত গান। কিন্তু মার্গ-পদ্ধতি সুর বা রাগিণী ও ছন্দকে কথার চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয় আর দেশী পদ্ধতি কথা ও সুরকে সমান স্থান দেয়। মার্গ-সংগীত পাঁচ সুরের কম গানকে তাদের দলে স্থান দিতে চায় নি। দেশী সংগীতে তিন স্বর থেকে সাত স্বরের গান আছে। ভাবের দিক থেকে উচ্চাঙ্গের সংগীত ভক্তি ও প্রেমকেই প্রাধান্য দিল, আর দেশী সংগীতে দেখলাম নানা রকম ভাবের প্রকাশ। গানে গল্প বলা, ব্রতকথা, ছড়া, 'বচন' গান, উৎসব অনুষ্ঠানাদির গান, নানা ভাবের প্রেমের গান, দেবতার প্রতি ভক্তি ও প্রেমের গান—এই জাতীয় বিভিন্ন ভাবে গান। গ্রামজীবনের নানা রকম হাসিকান্নার ঘটনা ও বিষয় নিয়েও কত বিচিত্র গানই রচিত ও গীত হচ্ছে। বাংলাদেশে দেশী সংগীতের বিষয়বৈচিত্র্য আরো বেড়েছে ইংরেজ যুগে; এ যুগের শিক্ষায় শিক্ষিত সংগীতকারদের অনুভূতির প্রসারে। এবং বাংলাদেশের গান মাত্রই দেশী সংগীতের আদর্শে পরিচালিত। মার্গ-সংগীতের প্রভাব সেখানে কার্যকর হয় নি।

আমাদের দেশে এই দুই পদ্ধতির গানেরই জন্ম প্রাচীন কালের গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতার কোলে, এবং এখনো একই আদর্শে নগরে ও গ্রামে সমান প্রাধান্য বিরাজ করছে। তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, এ যুগের ভারতীয় নগরসভ্যতা ইয়োরোপের প্রভাবে পরিচালিত হয়েও গানের বেলায় ভারতের গ্রামজাত প্রাচীন ধারারই অনুবর্তন করে চলল। সুতরাং ইয়োরোপে যে কারণে folksong বা art song কথার উদ্ভব হল, আমাদের দেশের সংগীতে ঐ রকমের কোনো শক্তিশালী কারণ আজও ঘটে নি। তাই

'লোকসংগীত' কথাটিকে ঠিক বিলিতি অর্থে ব্যবহার না করে আমরা তার দ্বারা বোঝাতে চেয়েছি ইংরেজি শিক্ষায় অশিক্ষিত, এবং উচ্চাঙ্গ হিন্দী সংগীতের কোনো পরিচয় রাখে না এমন-সব গ্রামবাসীদের গান। অথচ গঠনপদ্ধতিতে ও গীতরীতিতে বাংলার শহর ও গ্রামের গান আজ এক আদর্শে চললেও শহরবাসীদের গানকে 'লোকসংগীত' বলতে কেউ সাহস করবে না। তাকে বলতে হবে আধুনিক গান, রাগপ্রধান গান, ভাবপ্রধান গান, বা প্রগতিবাদী গান ইত্যাদি। ইয়োরোপের 'লোক সংগীত' ছিল একলার গান বা একই গান সকলে মিলে একভাবে গাইবার গান। আমাদের দেশের 'মার্গ' ও 'দেশী', উভয় সংগীত আজও একলা গাইবার আদর্শ ধরেই চলেছে। ইয়োরোপের মত বিচিত্র সুরজালে সাজানো হার্মনি সংগীত এ নয়। সুতরাং আমাদের দেশে, ইয়োরোপের folksong কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ যদি কিছু রচনা করতেই হয় তবে 'দেশী' কথাটাই হল তার পক্ষে সব চেয়ে উপযুক্ত। আর art song কথাটার উপযুক্ত প্রতিশব্দ হল 'মার্গ' সংগীত।

সংগীতে আমরা ইয়োরোপের প্রভাবে প্রভাবিত হই নি বটে, কিন্তু উচ্চাঙ্গ সংগীতের আভিজাত্যের গর্বে নিজেদের সংগীতের সঙ্গে আমরা কি রকম ব্যবহার করেছি তা উল্লেখযোগ্য।

এক সময়ে বাংলায় উচ্চাঙ্গ হিন্দী সংগীতের অনুরাগীরা সেই সংগীতের প্রতি এতটা অনুরক্ত ছিলেন যে, ভারতীয় সংগীত বলতে আর যে কোনো গান হতে পারে এ কথা তাঁরা মনেই করতে পারতেন না। শিক্ষিত ধনী নগরবাসীদের মধ্যে প্রচলিত কীর্তন, বা রামপ্রসাদী গানের চল থাকলেও উচ্চাঙ্গ সংগীতের অনুরাগীরা তা গাইতেন না, বরঞ্চ তাকে নিচু চোখেই দেখতেন। আর পল্লী-অঞ্চলের অন্যান্য গানকে তাঁরা গান বলেই মনে করতেন না। তাঁরা হয় হিন্দী ভাষায় গান লিখেছেন, নয় উচ্চাঙ্গের হিন্দী গানের হুবহু অনুকরণে বাংলাভাষায় গান লিখে তাকে সেই আদর্শে গেয়েছেন। তাঁরা হিন্দী টপ্পা গেয়েছেন, ঠুংরী গেয়েছেন, ভজন গেয়েছেন, তবুও বাংলার নিজের গানকে গাইবার যোগ্য বলে মনে করেন নি। ঠিক হিন্দু-সমাজের স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বাছবিচারের মতো। কলকাতা শহরেই এই ভেদের প্রবলতা ছিল সব চেয়ে বেশি। ঊনবিংশ শতকে কলকাতার শিক্ষিত ধনী সমাজই উচ্চাঙ্গ হিন্দী সংগীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাই তাঁরা সেই আদর্শে সাজানো বাংলা গানকে অধিক উৎসাহ দিতেন। পূর্বেই বলেছি যে যখনি গ্রামগুলি শহরের প্রভাবে নিজের পথ ছেড়ে শহরের পথ ধরতে চেষ্টা করেছে তখনি তারা নিজেদের পথ থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে, এবং যে গানগুলি তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, ধীরে ধীরে সেগুলিকে তারা ভুলেছে।

এই রকম এক অবস্থার মধ্যে বাংলাদেশের গ্রামের প্রাচীন গান ও সাহিত্যের প্রতি প্রথম দৃষ্টি ফেরালেন এবং অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন কলকাতাবাসী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁর প্রচারিত আন্দোলনের মূলে ইয়োরোপের ঐ যুগের একই আন্দোলনের কোনো প্রভাব ছিল কিনা সঠিক জানি না। তিনি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন ও লুপ্তপ্রায় 'লোকসাহিত্য' বা সংগীত বিষয়ে তাঁর পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রথম আলোচনা শুরু করেন শহরের শিক্ষিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে। সেই

পত্রিকার সাহায্যে তিনি বাংলার বহু প্রাচীন সংগীত উদ্ধার করে প্রকাশ করতে থাকেন। কিন্তু তিনি সেই-সব সংগীতের ভাব, ভাষা ও ইতিহাসেরই আলোচনা করেছিলেন, তার সুর ও তাল নিয়ে কোনো আলোচনা করেন নি। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত অনেকেই বাংলার নানা রকমের নিজের দেশী সংগীতের সংগ্রহ ও তার ভাব ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু সেই সংগ্রহের মধ্যে সুর ও তালের আলোচনা নেই।

পরে কলকাতার 'জাতীয় মেলা' বা 'হিন্দুমেলা'র আন্দোলনের দ্বারা দেশের সংগীত ও শিল্পের প্রতি শহরবাসীদের অনুরাগ বাড়াবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু উচ্চাঙ্গের হিন্দী সংগীত ছাড়া, বাংলার নিজের দেশী অর্থাৎ পল্লী গান সেখানে স্থান পেয়েছিল কিনা তা জানা যায় না। তবে বাংলা ভাষার স্বদেশী ভাব-উদ্দীপক গানের উদ্ভব প্রথম হয়েছিল এই স্বদেশী মেলার শুরু থেকে। সংগীতে স্বদেশী মেলা আন্দোলনের এটি একটি বিশেষ দান।

১২৭৪ সালের (১৮৬৮) মেলার উদ্বোধন-সংগীত হিসেবে গীত হল বাংলা ভাষার প্রথম জাতীয় ভাব-উদ্দীপক গান। দেশী সংগীতের আদর্শে রচিত হলেও এর রাগিণী ছিল উচ্চাঙ্গ হিন্দী সংগীতের। যেমন "মিলে সবে ভারত সন্তান" গানটির রাগিণী হল খাম্বাজ ও তাল হল 'আড়াঠেকা'। দ্বিতীয় গান "লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে" গানটির রাগিণী ছিল বাহার, তাল যৎ। এর পরে ঐ মেলা উপলক্ষে আরো অনেক জাতীয় সংগীত রচিত হল কিন্তু খাঁটি বাংলা ঢঙে ও সুরে জাতীয় সংগীত কেউ রচনা করেছে বলে জানা যায় না।

লিখিত ভাবে বাংলার দেশী সংগীতের প্রতি গুরুদেবের আগ্রহের প্রথম প্রকাশ দেখি ১২৯০ সালে ভারতী পত্রিকায়, তখন তাঁর বয়স বাইশ বছর। বাউল গানের একটি সংগ্রহ-পুস্তকের সমালোচনা করতে গিয়ে গুরুদেব লিখলেন যে, এ গান বাংলার নিজের গান। এ যাতে লুপ্ত না হয় তার জন্যে শিক্ষিত দেশবাসীর কাছে তিনি সংগ্রহের আবেদন জানিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন, তা ভারতীতে পাঠালে আনন্দের সঙ্গেই পত্রিকায় ছাপাবেন। কিছু সংগ্রহ প্রকাশিত হল কিন্তু সবই হল সুর-ছাড়া কথা মাত্র। কথার রসে সকলে মুগ্ধ হলেন বটে, কিন্তু সুরের আলোচনার প্রতি কারোই মন যায় নি।

এদিকে, প্রথম গান লেখার আরম্ভ থেকে সাতাশ বছর বয়স পর্যন্ত গুরুদেব দেশী সুরের সাহায্যে যে সব গান লিখলেন তার মধ্যে দেখলাম তার প্রায় সবই কলকাতা অঞ্চলে প্রচলিত কীর্তন ও রামপ্রসাদী সুরে রচিত। যেমন—

১	গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে	মিশ্র-কীর্তন সুর
২	আমিই শুধু রইনু বাকি	রামপ্রসাদী
৩	আমি জেনে শুনে তবু	কীর্তন সুর
৪	শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি	রামপ্রসাদী
৫	আবার মোরে পাগল করে	কীর্তন সুর
৬	সুখে আছি	মিশ্র-কীর্তন সুর

এই বয়সে রচিত মোট ৪০০টি গানের মধ্যে এই কটি ছিল তাঁর দেশী সুরের গান।

গুরুদেব গ্রাম-অঞ্চলের দেশী সংগীতের সাক্ষাৎসংস্পর্শে এলেন রাজসাহী ও কুষ্ঠিয়া জেলার জমিদারী তদারকের ভার নেবার পর। ত্রিশ বছর বয়সে এ কাজের দায়িত্বভার নিয়ে সেখানকার নদীপথে ও গ্রাম-অঞ্চলে প্রায় দশ-এগারো বছর বাস করেন। তাঁর সাংগীতিক জীবনে এই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বাংলার গ্রাম-অঞ্চলে বসে, সেই আবহাওয়ায় দেশী সংগীতের সাক্ষাৎপরিচয়ের তিনি তখনই সুযোগ পেলেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত কলকাতা অঞ্চলে প্রচলিত কীর্তন, রামপ্রসাদী, বাংলা দেশী বিভাস, ইত্যাদির বেশ প্রভাব রয়েছে তাঁর গানে। বাউল সুরের গান নামে উল্লেখিত দুটি গান পাই এইবারে প্রথম। এই সময়ে দেশী সুরে রচিত গান-গুলি হল—

১	তোমরা সবাই ভালো	বাউল সুর
২	খ্যাপা তুই আছিস আপন	বাউল সুর
৩	আমারে কে নিবি ভাই	কীর্তন সুর
৪	খাঁচার পাখি ছিল	কীর্তন সুর
৫	বড়ো বেদনার মতো	কীর্তন সুর
৬	ওহে জীবনবল্লভ	কীর্তন সুর
৭	ভালোবেসে সখী	কীর্তন সুর
৮	সংসারে মন দিয়েছিনু	কীর্তন সুর
৯	ওগো এত প্রেম আশা	কীর্তন সুর
১০	চাহি না সুখে থাকিতে হে	কীর্তন সুর
১১	একবার তোরা মা বলিয়া	কীর্তন সুর
১২	এবার যমের দুয়োর খোলা	মিশ্র
১৩	তোমরা হাসিয়া বহিয়া	মিশ্র
১৪	তোমার গোপন কথাটি	মিশ্র
১৫	আমরা মিলেছি আজ মায়ের	রামপ্রসাদী
১৬	বঁধু তোমায় করব রাজা	বিভাস
১৭	আজি শরত তপনে	যোগিয়া বিভাস
১৮	নয়ন তোমারে পায় না	যোগিয়া বিভাস
১৯	ওলো সই ওলো সই	মিশ্র বিভাস
২০	হৃদয়ের একূল ওকূল	মিশ্র বিভাস

গুরুদেবের চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত রচিত দেশী গানের এই দুটি তালিকা থেকে এটুকু আমরা বেশ বুঝতে পারি যে বাংলার কীর্তনে প্রচলিত কতগুলি সুরেই এ সময়ে তিনি বেশি গান লিখেছেন, তারপরেই লিখেছেন বিভাস নামে বাংলার প্রচলিত বাংলাদেশের নিজের একটি সুরে। দেশী সুরের গানের মধ্যে এই দুই সুরের প্রভাব তাঁর পরবর্তী জীবনেও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, এখানে কীর্তন বলতে যে গানকটিকে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেগুলি যেভাবে গাওয়া হয়, তার সঙ্গে বাংলার প্রচলিত কীর্তনের তো বিশেষ মিল দেখি না। সেই অমিলগুলি কী তা বুঝতে হলে বাংলার কীর্তন গান বিষয়ে সংক্ষেপে একটু আলোচনার দরকার হবে।

প্রাচীন কাল থেকে ভগবানের নাম গুণ লীলা উচ্চস্বরে কীর্তনের প্রথা ভারতে সর্বত্র প্রচলিত। পূর্বেই বলেছি উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বৈষ্ণবদের কতগুলি মন্দিরে মধ্যযুগের ভক্তদের রচিত যে-সব গান গাওয়া হয় তাকে ভজন না ব'লে বলে কীর্তন। দক্ষিণ-ভারতে বলে কৃতি বা কীর্তন। মহারাষ্ট্র অঞ্চলে এইরূপ একধরনের গানকেও কীর্তন বলে। কয়েক জনে মিলে নির্দিষ্ট সুরে তালে লয়ে গীত স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে রাধাকৃষ্ণের নাম-গুণলীলাত্মক যে গান, বাংলায় তাকেই বলে কীর্তন।

বাংলাদেশে এই কীর্তন গানের বিশেষ প্রচার হল শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে। তাঁর দ্বারা প্রচলিত দলবদ্ধভাবে রাধা-গোবিন্দের নামগানকেই বলা হল নাম-কীর্তন। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব কবিদের কাব্যগানকে বলা হল পদাবলী-কীর্তন বা লীলা-কীর্তন।

পদাবলী-কীর্তন গানের প্রচার করলেন বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনরোত্তম গোস্বামী, তিনি ষোড়শ শতাব্দীর লোক। বৃন্দাবন থেকে দেশে ফিরে তিনি রাজসাহীর অন্তর্গত খেতরীতে একটি সম্মিলনের আয়োজন করেন। সেই সম্মিলনেই প্রথম প্রণালীবদ্ধ-ভাবে গৌরচন্দ্রিকা গানের পর লীলাকীর্তন বা পদাবলী-কীর্তনের প্রথা প্রবর্তিত হয়। তাঁর প্রবর্তিত সেই লীলাকীর্তন গীতপদ্ধতির নাম দেওয়া হল গড়ের হাটি বা গরানহাটি কীর্তন। কারণ খেতরী গ্রাম গড়েরহাট পরগনায় অবস্থিত। এই গীতপদ্ধতির লয় বিলম্বিত, দীর্ঘচ্ছন্দ। পরে মনোহরসাহি নামে কীর্তন গানের আর এক পদ্ধতির উদ্ভব হয়, এর লয় ও ছন্দ অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত, সুরের কারিগরি ও মাত্রার জটিলতায় তা সমৃদ্ধ। রেনেটি, মন্দারিণী, ঝারখন্ডী নামে আরো তিনটি পদ্ধতির কথা শোনা যায়। ঢপ নামে কীর্তনের আর এক ঢঙের কথা অনেকেই জানেন। শোনা যায়, গত শতাব্দীতে এর উৎপত্তি। এই গান অন্যান্য পদ্ধতির কীর্তন অপেক্ষা সহজ এবং তার এক সহজ মাধুর্য আছে বলেই তা সাধারণকে সহজে মুগ্ধ করেছে।

গরানহাটি ও মনোহরসাহি কীর্তনের সৃষ্টি হয় সংগীত ও কাব্যরসের উঁচুদরের শিল্পীদের দ্বারা, যাঁরা কঠিন সাধনায় বৈষ্ণবকাব্যরসের অধিকারী ও সাধনার দ্বারা সংগীতের নানা সুর ও তালের জ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন। এই জন্যে উপরোক্ত দুই পদ্ধতিতে গাওয়া বৈষ্ণব পদাবলী, রাগিণী ও ছন্দের ঐশ্বর্যে ও বৈচিত্র্যে এত সমৃদ্ধ। এবং কলাবিদ্ কীর্তনীয়াদের সাহায্য ছাড়া এ কীর্তন গান শোনা বা তার রস গ্রহণ করা জনসাধারণের পক্ষে অসম্ভব।

পদাবলী-কীর্তনে গল্পের ধারাটি ঠিক রাখবার জন্যে বা কোনো পঙ্‌ক্তিকে ভালো করে করবার উদ্দেশ্যে কীর্তনীয়ারা কথকদের মতো কখনো অসম ছন্দে ও সুরে বা কথার ভঙ্গীতে যে কথাগুলি বলে যান, সেইটিই হল এই গীতপদ্ধতির একটি বিশেষ অঙ্গ। এই রকম কথা রচনায় কীর্তনীয়ারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। এখানেই তাঁদের সংগীত ও কাব্যরস-জ্ঞানের প্রকৃত পরিচয়। কীর্তনের আখর নামে একটি বিশেষ অঙ্গ আছে। তান ও আলাপে কথাহীন সুরের বিস্তার না ক'রে এ গান কথা বা শব্দের বিস্তার করে সুরে বা রাগিণীতে, খোলের সঙ্গে ছন্দ রেখে। একেই বলা হয় আখর দেওয়া। গুরুদেব আখরকে বলেছেন 'কথার তান'।

পদাবলীকার বৈষ্ণব কবিরা নিজেদের গানে স্বতন্ত্রভাবে কথা বা আখর লিখতেন বলে জানা যায় না। এগুলি রচনা করেন গায়ক কীর্তনীয়ারা। উচ্চাঙ্গের হিন্দী গানে ওস্তাদরা যেভাবে নিজেদের ইচ্ছামত নানা সুরে ও ছন্দের অলংকার রচনার সুযোগ পান, কীর্তনের গায়কেরা সে সুযোগ নেন কথার অলংকার রচনা করে।

উচ্চাঙ্গের কীর্তনে আখর বা কথাবিস্তারের প্রাচুর্য ছিল। এমনও দেখা যেত যে, মূল গানের কথার চেয়ে আখরের কথা বহুগুণ বিস্তৃত। উচ্চাঙ্গের হিন্দী গানে যেমন সুর-বিস্তার বা সুর-বিহারের ক্ষমতার উপর গাইয়ের সম্মান, ঠিক সেই রকম সম্মান পেত কীর্তনীয়ারা যারা আখর রচনার দ্বারা কথাবিস্তারে শ্রোতার মন গলাতে পারত।

ঢপ কীর্তনের উৎপত্তি হল কীর্তন সংগীতে অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের সংগীত-ক্ষুধা মেটাবার জন্যে। সুতরাং এ গান শুনে যেমন সহজে তার রস গ্রহণ করা যায় তা শিখে গাইতেও সাধারণ সংগীতপিপাসুদের তেমন কষ্ট হয় না। ঢপ কীর্তনের নমুনা আমরা বিশেষ ভাবে পাই রেকর্ডে গীত কীর্তন সংগীতে। সহজ তালের মধ্যে তিনমাত্রা, চারমাত্রা, পাঁচমাত্রা ও সাতমাত্রার তেওরা তাল ঢপ কীর্তনে অধিক ব্যবহৃত হয়। বড় তালের গান এতে পাওয়া যায় না।

দেশী সংগীতের আদর্শে রচিত বলেই বোধ হয় কীর্তনে রাগবিস্তার বা সুর বিহার, তান আলাপের সুযোগ উচ্চাঙ্গ হিন্দী গানের মতো নেই। যদিও বড়ো তালের কীর্তন গানের সময় কথার সঙ্গে জড়িয়ে সুরকে টেনে টেনে গাওয়া হয় কিন্তু তা একেবারে স্বতন্ত্র জিনিস। ঢপ কীর্তনে বড়ো তালের কীর্তনের মতো টানা সুরের গান নেই বললেই চলে।

পূর্বে পদাবলী-কীর্তনে উচ্চাঙ্গ হিন্দী গানের মতো রাগ-রাগিণীর ব্যবহার ছিল বলে শোনা যায়। কিন্তু আজকালকার কীর্তনীয়াদের গানে তার পরিচয় খুব পরিষ্কার ভাবে পাই না। পদাবলী কীর্তনীয়ারা যখন গান করেন তখন কখনো কখনো কোনো কোনো রাগিণীর আভাস তাঁরা দেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সেই রাগিণীটিকে সমস্ত গানটির ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত ফুটিয়ে তোলার কোনো চেষ্টা দেখা যায় না হিন্দী গানের মতো। আখর গাইবার বেলায় ঐ রাগিণীর অবশ্যই পরিবর্তন ঘটে। এর একটা কারণ হয়তো এই হতে পারে যে, এ যুগের কীর্তনীয়ারা রাগ-রাগিণীর সঠিক পরিচয় রাখবার কোনো শিক্ষা পান না, তাই সব ভুলেছেন।

বর্তমানে কীর্তন বলতে আমরা এক ধরনের কতগুলি বিশেষ সুরের গানকেই বুঝি, যার সঙ্গে বাংলার গ্রাম-অঞ্চলের সুরের খুবই মিল পাওয়া যায়। এ সুর-গুলিকে প্রচলিত উচ্চাঙ্গের হিন্দী রাগিণীর দলে কোনো রকমেই ফেলা যায় না। তাই এই সুরের গানের মাথায় বাঙালি সংগীতজ্ঞরা সাধারণত 'কীর্তনের সুর' এই নামটি ব্যবহার করেন। এই ধরনের সুর বেশির ভাগ সহজ তালের কীর্তনেই অধিক প্রচলিত।

পূর্বেই বলেছি যে, বাংলাদেশে কীর্তন গান বলতে খোল-করতালসহযোগে বিশেষ ঢঙ ও সুরের বাংলার বৈষ্ণবদের রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক ভক্তিরসের একরকম গানকে বোঝায়। কিন্তু বিষয়ের এই শক্ত বাঁধুনি থেকে এই ঢঙের গান প্রথম ছাড়া

গেল বোধ হয় ১৮৬৭ খৃস্টাব্দে, সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর চেষ্টায়। তখনো তিনি ব্রাহ্মসমাজের একজন উৎসাহী প্রচারক। ভক্তি ও প্রেমের গানকে রাধাকৃষ্ণ-বিষয় থেকে বিচ্যুত করে তিনি নিরাকার ব্রহ্মের প্রতি ভক্তি ও প্রেমের কীর্তন ঢঙের গানে রূপান্তরিত করলেন। এর পরেই ব্রাহ্মসমাজে শুরু হল নগর-সংকীর্তন, বৈষ্ণবদের মতো। কিছু পরে পেশাদারি যুগের প্রথম থেকেই কীর্তনের পদ্ধতিতে থিয়েটারি গান রচিত হতে লাগল। এইভাবে কীর্তনের সুর ও ঢঙ ব্রাহ্মসমাজে ও থিয়েটারের গানে স্থান পেয়ে বিষয়ের দিক থেকে আরো ছড়িয়ে পড়তে লাগল। পরে লৌকিক প্রেম ও হাসিঠাট্টার গানও কীর্তনের সুরে ও কায়দায় তৈরি হয়েছে। কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে যে, ব্রাহ্মসমাজে বা থিয়েটারে যে ঢঙের কীর্তন তৈরি হতে লাগল তা উচ্চাঙ্গের পদাবলী কীর্তন গানের মতো দুরূহ নয়। তার মধ্যে ছিল সহজ কীর্তনেরই প্রভাব।

গুরুদেব ভানুসিংহের পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম উপলক্ষ করেই প্রথম কীর্তন সুরের গান রচনা করেছিলেন। তার পরে রচনা করলেন কীর্তনে লৌকিক প্রেমের গান, আদি ব্রাহ্মসমাজের উপযোগী কিছু উপাসনার গান ও দু-একটি জাতীয় সংগীত। এইভাবে ধীরে ধীরে রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত করলেন নিজেকে। জীবনের শেষার্ধে প্রেম ও ধর্মসংগীত ছাড়া ঋতুসংগীতও কীর্তন সুরে রচনা করলেন। কিন্তু এই-সব গানকে মনোহরসাহি বা গরানহাটি পদ্ধতির মতো বড়োতালের গান করতে চান নি। সকলে সহজে যে ধারায় কীর্তনের রস গ্রহণ করতে পারে গুরুদেবের লক্ষ্য ছিল সেই দিকেই।

কীর্তন গানে সাধারণত দেখা যায় যে, গান ঢিমা লয়ে শুরু হয়ে ক্রমশই দ্রুত লয়ে বাড়তে থাকে, বা দ্রুত লয়ের ভিন্ন তালে পরিবর্তিত হয়। এও একরকমের তালফেরতা। সেই সুরে ও লয়ে কথা জুড়ে গায়ককে তা গেয়ে যেতে হয়। খোলের বোলেও সেই অনুসারে ক্রমশ ঢিমা থেকে দ্রুত ছন্দের অলংকার বাজতে থাকে। এইভাবে ধীরে ধীরে গানের কথা এগোতে থাকে বলে পুরো গানটি শেষ হতে বেশ সময় নেয়। এই গীত-পদ্ধতিটি গুরুদেবের কীর্তন গানে আমরা পাই নি। তিনিও সহজ কীর্তনের তিন চার পাঁচ ও সাত মাত্রার সহজ তালগুলিকেই গানে ব্যবহার করলেন।

বৈষ্ণব কবিরা তাঁদের কবিতার জন্যে আখর যে লিখতেন না এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে গীতকারেরা কীর্তনের আদর্শে গান রচনার সঙ্গে তার আখরগুলিও নিজেরাই লিখে দিতে লাগলেন। প্রাচীন প্রথামত গায়কদের আখর রচনার স্বাধীনতা তাঁরা আর দিতে চাইলেন না। গুরুদেবও তাঁর কীর্তন সুরের গানে গায়কদের আখর দেবার স্বাধীনতা দেন নি। তিনি নিজের গান আখর সমেত নিজেই লিখেছেন। কিন্তু আখর দিয়ে গাইবার ইচ্ছা যে তাঁর ছিল না এ আমরা বুঝি তাঁর আখর দেওয়া গানের স্বল্পতায়। জীবনের প্রথমার্ধে কয়টি গানে আখর দিয়েছিলেন, কিন্তু সুর যোজনার দিক থেকে এই-সব গানে নিজের কোনোরকম শিল্পনৈপুণ্যের প্রকাশ নেই। অধিকাংশ গান অনেকগুলি কলিতে বিভক্ত এবং প্রথম দুই কলির হুবহু অনুকরণে অন্য-সব কলিতে সুর

বসিয়েছেন। গান কটি হল,—'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে', 'আমি জেনেশুনে তবু ভুলে আছি', 'ওহে জীবনবল্লভ', 'কে জানিত তুমি ডাকিবে', 'আমি সংসারে মন দিয়েছিনু' ও 'তুমি কাছে নাই ব'লে হের সখা তাই'।

'তুমি কাছে নাই ব'লে' গানটি গুরুদেব তাঁর পরবর্তীকালে গীতসংগ্রহ পুস্তক থেকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছিলেন, হয়তো কাঁচা রচনা বলেই। তালিকার দিকে লক্ষ রাখলে বুঝতে পারা যাবে যে এই গানগুলি ধর্মসংগীত পর্যায়ের গান, রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক নয়। পরবর্তী জীবনে এ ধরনের আখর দেওয়া গান আর লিখলেন না। বহু বৎসর পরে, মৃত্যুর বছর কয়েক আগে, ১৯৩৭ সালের বর্ষামঙ্গলের জন্যে রচিত 'আমি শ্রাবণ আকাশে ওই' মল্লার রাগিণীর উপর রচিত গানটিতে এর ব্যতিক্রম দেখি। এতে আখর জুড়েছিলেন। ইচ্ছা ছিল আখর সমেত গানটি অনুষ্ঠানে গীত হবে। কিন্তু তা হয় নি। আখর সমেত গানটি গাইবার সময় দেখা গেল যে, অন্যান্য কীর্তন গানের আখরের মতো মূল গানের সঙ্গে ভালো মিশ খাচ্ছে না, আখর যেন নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার জন্যে ব্যস্ত। তাই আর গানের আখরের প্রতি মমতা না দেখিয়ে বর্ষামঙ্গলের অনুষ্ঠানে মূল গানটিই গাইয়েছিলেন আখর বাদ দিয়ে।

আখর ইত্যাদি বর্জিত, বাউলের প্রভাবযুক্ত ও গুরুদেবের শান্তিনিকেতনের জীবনে যার সূত্রপাত, এরূপ কীর্তনাঙ্গের গানকেই আমি প্রকৃত রাবীন্দ্রিক কীর্তন বলি।

গুরুদেবের এই কীর্তন গানগুলি ভালো করে অনুশীলন করলে অপ্রচলিত দেশী সুরের অনেকগুলি ভালো নমুনার সন্ধান মেলে, যা আজকাল কীর্তনীয়াদের মধ্যেও সচরাচর শোনা যায় না। ঐ-সব সুরের ইঙ্গিত তিনি পূর্ববর্তী রচয়িতাদের কীর্তন গান থেকেই পেয়েছিলেন বলে অনুমান করি। নিজের গানে তার কয়েকটির হুবহু অনুকরণ করলেন, কয়েকটিতে তার সামান্য পরিবর্তন ক'রে নতুন রূপে তাকে সাজাবার চেষ্টা করলেন।

১৩১২ সালে শুরু হল বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলন। গুরুদেবের বয়স তখন প্রায় চুয়াল্লিশের কাছাকাছি। কতকগুলি গান রচনা করলেন তিনি বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের বাউলদের এক ধরনের গানের সুরে। গানগুলি হল—

১ আমার সোনার বাংলা	২ ও আমার দেশের মাটি
৩ ওরে, তোরা নেই বা কথা বললি	৪ ঘরে মুখ মলিন দেখে
৫ ছি ছি, চোখের জলে	৬ যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
৭ যে তোরে পাগল বলে	৮ যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে

সাধারণ লোকসংগীতের মতো তিন চার বা পাঁচ সুরের গান এগুলি নয়। এতে পুরো সাতটি সুরই খেলা করছে এবং মধ্যে কোমল সুরেরও ব্যবহার দেখি। উদারা সপ্তকের দিকেও যেমন কিছুটা নামে, আবার তার সপ্তকেরও দু-এক সুর পর্যন্ত উঠতে হয়। উপরের গানগুলি বাংলার নিজস্ব কয়েকটি সুরে রচিত। অন্য কোনো-রূপ মিশ্রণ নেই। এই সুরগুলি সহজ ও সরল। গুরুগম্ভীর সুরের বা তালের গান এ নয়। সুরে আছে বাঁশির মতো উদাস-করা ব্যথায়-ভরা একটি আবেগ। গান-কটির ভাষা ও সুরের সামঞ্জস্য মনকে আকর্ষণ করে। লোকসংগীতের এইটিই হল

বিশেষত্ব। গুরুদেবের এই গানে সেই আদর্শটি রক্ষিত হয়েছে—যদিও এগুলি জাতীয়-সংগীত। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, এ ধরনের প্রাচীন বাউল ধারার ও সুরের গান আজকাল কমই শুনতে পাওয়া যায়। গত শতাব্দীর শেষ দিকে বাঙলায় 'বাউলখেদা' আন্দোলনের চাপে ভালোমন্দ অনেক কিছু নষ্ট হয়েছে। এ ছাড়া এ যুগের থিয়েটার যাত্রা ও রেকর্ড সংগীতের প্রভাব সাধারণ বাউলদের মধ্যে যথেষ্ট পড়াতেও এ ক্ষতি সম্ভব হয়েছে। সে যুগের বাউল সুরের গান আজকাল পথে-ঘাটে শুনতে পাওয়া না গেলেও সে গানের নিখুঁত সুর-রূপ গুরুদেবের বহু গানের মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

বাউলদের জীবনাদর্শ ও তাদের গানের সুর ও ঢঙ গুরুদেবের জীবনে যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল সে কথা তিনি নিজেই লিখে গেছেন—

"আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউলদলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি। এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিল ঘটেচে। এর থেকে বোঝা যাবে. বাউলের সুর ও বাণী কোন্ এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হ'য়ে মিশে গেছে।...

"...এমন বাউলের গান শুনেচি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না, তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব তেমনি কাব্যরচনা, তেমনি ভক্তি রস মিশেচে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় ব'লে বিশ্বাস করি নে।"

বাউলের আদর্শে রচিত গানের আলোচনার আগে আমাদের জানতে হবে, বাংলার বাউল কী, আর বাউল সংগীতই বা কোন জিনিস।

বাউলরা হল বাংলার মুক্তিপাগল সংগীতসাধক। এদের জীবনে সুরই হল প্রাণ, সুরই হল আনন্দ, সুরেই কথা; এরা সুরের ভিতর দিয়ে জীবনের মূল সত্যকে বুঝতে চেষ্টা করে।

সাম্প্রদায়িক ধর্ম এরা পালন করে না। এদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান নেই। বিধি-নিয়ম আচার-অনুষ্ঠান এরা মানে না। শাস্ত্রের অনুশাসন দ্বারা এরা নিয়ন্ত্রিত নয়। কৃচ্ছ্রসাধনেও এরা অসম্মত। এইজন্যে বাউলদের সাধনার এক নাম 'সহজিয়া' সাধনা। এদের বলে রসিক, কেননা এরা রসোপলব্ধির সাধনা করে, এরা আনন্দ-রসের অনুরাগী। এরা প্রেমের সাধনা করে, যে-প্রেমের উদ্দেশ্য কেবল ভালোবেসে যাওয়া। এদের ভালোবাসা অধরার প্রতি। কিন্তু এই অধরাকে তারা ধরতে চায় রূপের জগতের সাহায্যে। তাই তারা বলে অধরাকে ধরতে হলে ধরা-র সঙ্গ করা চাই। ধরার জগৎ, রূপের জগতের আনন্দকে আগে বুঝতে চেষ্টা কর, তবেই অধরাকে ধরতে পারবে, তখনই অধরার প্রতি তোমার ভালোবাসা সার্থক হয়ে উঠবে। এই অধরাই হল এদের আর এক ভাষায় মনের মানুষ। এই 'মনের মানুষের' প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা পূজার ভাব একেবারে নেই; বন্ধু, সখা ভাবের সঙ্গেও সম্পূর্ণ মেলে না—যদিও কাছাকাছি যায়। বিরহকাতর প্রেমিকপ্রেমিকার প্রেমের সঙ্গে হয়তো

এদের প্রেমের তত্ত্ব মেলে, কিন্তু তাতে মিলনের কোনো কথাই নেই। মিলন হলে কি হবে, কি করবে সে কথা ভাববার তাদের অবসরই মেলে নি। এতখানি প্রেমপাগল এই সম্প্রদায়। এরা বলছে এই মনের মানুষ অধরার স্থান হচ্ছে এই দেহে—এর মধ্যেই তিনি আছেন, আমরা মূর্খের মতো ভ্রমে পড়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। অর্থাৎ নানা প্রকার আচার বিচার প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাকে আয়ত্ত করতে চাচ্ছি বাইরের জিনিস ভেবে। অথচ আমার মধ্যেই সেই অধরা, সেই প্রাণের মানুষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এইভাবে তাঁকে অনুভূতির সাহায্যে জানাই হল এদের মূল কথা।

(এ সাধনা গুরুপরম্পরা সাধনা, তাই এরা মনে করে এদের এই সাধনার পথে অগ্রসর হতে হলে গুরুই হল প্রধান অবলম্বন। তিনি ছাড়া এই পথে অগ্রসর হবার পথ আর কেউ বলতে পারে না। তাই এরা গুরুকে এদের সাধনায় বিশেষ স্থান দিয়েছে। কখনো কখনো এমনও বলেছে যে. অধরাকে ধরতে গেলে যে 'ধরা'-র সঙ্গ করতে হবে সে 'ধরা'ই হলেন গুরু। আর এই গুরুর শ্রীচরণ পূজাতেই অধরার সন্ধান পাওয়া যায়। এইরকম গুরুবাদের বড়ো কারণ হল লেখাপড়া-না-জানা বাউলদের কাছে গুরুরাই প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রগ্রন্থ। পণ্ডিত, জ্ঞানীরা পুস্তক পাঠে নিজেদের মনের ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারেন. কিন্তু অশিক্ষিতদের পক্ষে এরকম কোনো সুবিধাই নেই। এরা লেখাপড়া জানা সম্প্রদায় নয় বলেই এদের গুরুরাও কোনোদিনই কিছু লিখে রাখতে পারে নি, তাদের জ্ঞানের কথাকে, গূঢ় তত্ত্বকথাকে, কেবল গানের ভাষায় মুখে মুখে বলে গেছে। তাই বলেছি গুরুরা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে লিখিত ধর্ম-পুস্তকের সমান, যে কারণে হিন্দুদের বেদ, খৃস্টানদের বাইবেল, মুসলমানদের কোরান ও শিখদের গ্রন্থসাহেব নিজ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ঈশ্বর-সমতুল্য পূজাগ্রন্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(আজকাল আমরা সাধারণত কিভাবে তাদের দেখি। মুখে দাড়িগোঁফ, লম্বা চুল, তালুতে উঁচু করে চুড়ো বাঁধা। গায়ে সাধারণত হাতকাটা লম্বা জোব্বা, হাঁটুর একটু নীচ পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। ভিক্ষাজীবী। সাধারণ লোকে গান শুনে যা দেয়, তাতেই তারা খুশি। যাঁরা আখড়াধিপতি গুরুস্থানীয় তাঁরা তাঁদের আখড়া থেকে বড়ো একটা নড়েন না। আবার পূর্ববঙ্গের খ্যাতনামা বাউলদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যাঁরা দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতেন। গুরুদেবের গগন হরকরা ছিলেন পিয়ন, লালন ফকিরের ছিল পানের বরোজ, তাঁর গুরু ছিলেন পালকিবাহক। বাউলরা সঙ্গে স্ত্রীপুত্র নিয়ে বসবাস করেন, সংসারও করেন, অথচ এঁরা যেন হাঁসের মতো। জলের মধ্যে ডুব দিলেও জল এঁদের গা ভেজাতে পারে না। এঁরা ঘর যেমন বাঁধেন আবার যে কোনো মুহূর্তে ঘর ভাঙতেও সেইরকম দক্ষ। এরকম আত্মভোলা এঁরা।)

পণ্ডিতদের মতে এই ধরনের সাধনার ধারা নাকি ভারতের অতি প্রাচীন প্রথা। বৈদিক যুগেও নাকি এরকম এক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল, তারাও আচারবিচার জানত না, আপন ইচ্ছায় চলত। তার পরে নাথযোগীরাও নাকি ছিল এই ধরনের একটি আত্মভোলা ও ত্যাগী সম্প্রদায়। বৌদ্ধগান ও দোঁহার সঙ্গেও নাকি ভাবের দিক থেকে বাউলদের গানের সঙ্গে বহু সাদৃশ্য আছে। সেই যুগের বৌদ্ধ সহজিয়া-

সাধনার সঙ্গে বাউলদের সহজিয়া সাধনার মিল অনেকে দেখেছেন। তা ছাড়া সব চেয়ে বড়ো কথা হল এই যে, মুসলমান যুগের সুফীরা এদের চিন্তাধারা ও জীবনযাত্রা-প্রণালীকে বিশেষভাবে চালিত করেছে। তান্ত্রিক যুগের বৌদ্ধরা মুসলমান সভ্যতার চাপে যদিও মুসলমান হল, কিন্তু তারা তান্ত্রিক বৌদ্ধদের বহু প্রকার বিন্যাসকে ছাড়তে পারে নি। সেই সাধনার বহু প্রকার গুপ্ত প্রক্রিয়াকে নিজেদের এই সাধনার অঙ্গ করে নিয়েছে। পণ্ডিতেরা আরো বিশ্বাস করেন যে, পারস্যদেশের সুফীদের মধ্যে সেই অঞ্চলের প্রাচীন বৌদ্ধ মতবাদ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তা না হলে গুরুবাদে বিশ্বাস করা ও ইসলামের নীতিবিরোধী নাচ-গানকে সাধনার অঙ্গরূপে গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হত না। যাই হোক, ভারতে এইভাবে সুফী ও বৌদ্ধ-ভাবাপন্ন হিন্দুসাধনার সংমিশ্রণে আমরা বাউল নামে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে পেয়েছি।

সব ধর্মমতই যখন মূল আদর্শচ্যুত হয়, তখন তা থেকে নানাপ্রকার মতবাদ ও দলের সৃষ্টি হয়। এই বাউলদের মধ্যেও তাই ঘটেছিল। তারই ফলে আউল, নেড়া-নেড়ীর দল, কর্তাভজার দল, বৈষ্ণব বাউল বা ফকির ইত্যাদির আবির্ভাব। এই-সব দলগত প্রভাব বাউল গানে যথেষ্ট পড়েছে। যার বড়ো উদাহরণ পশ্চিম বাংলায় পেয়েছি বাউলদের রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গানে, গৌরনিতাইবিষয়ক ভক্তির গানে।

এদের প্রচলিত গুপ্ত সাধনপ্রণালী আমি দেখি নি ও জানি না। কিন্তু এরা যখন গানের ভাষায় নিজেদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদানে জমায়েত হয়, তখনকার সেই আবহাওয়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি। দেখেছি, এরা দল বেঁধে বসে গেছে গোল হয়ে, মাঝখানে একটু প্রশস্ত জায়গা। প্রায় প্রত্যেকের হাতে একতারা, কিন্তু সে একতারা পশ্চিম-ভারতের ভজনপন্থী গায়কদের একতারা নয়, পশ্চিমের একতারাকে বলা চলে তানপুরার ছোটো সংস্করণ। তানপুরার চার তারের বদলে এতে থাকে এক তার, কিংবা দুই তার। বাংলার বাউলদের মধ্যে প্রচলিত একতারা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং আমার ব্যক্তিগত মত হল পশ্চিম বাংলা অঞ্চলের বাউলদের একতারা সম্পূর্ণরূপে বাংলারই নিজস্ব জিনিস। বাংলার বাউলদের এই একতারা একমাত্র তাদেরই হাতে ছাড়া ভারতের আর-কোনো প্রদেশে দেখা যায় না।

এই একতারার বাঁশের দুটি পাতলা ডাণ্ডার যে-কোনো একটিকে এক হাতে চেপে ধরে অপর হাতের দ্বিতীয় আঙুলে গানের ছন্দে ছন্দে আঘাত করে ঝংকার তুলতে হয়। লাউয়ের অংশটিকে কানের কাছে চেপে ধরে বাজাতে দেখি। তার একটি প্রধান কারণ হল লাউয়ের ভিতর দিয়ে একতারার শব্দঝংকার যেভাবে কানে বিশেষ-ভাবে ধরা পড়ে, সেরকম আর কোনো উপায়ে সম্ভব নয়। তখন মনে হয় জগৎটা যেন একটি বিরাট সুরে ডুবে আছে।

কোমরে থাকে ছোটো একটি 'বাঁয়া', বাঁ দিকে সামনে ঈষৎ বাঁকানো; কোমর ও বাঁ কাঁধ থেকে ফিতে দিয়ে ঝুলিয়ে কাপড়ের পাড়ে শক্ত করে বাঁধা। কেবলমাত্র বাঁ হাতে বাঁয়ার উপরে নানাপ্রকার শব্দে ছন্দ তুলতে হয় গানের সঙ্গে মিলিয়ে। বাংলা-দেশের এই দলের বাউলদের সব চেয়ে বড়ো গুণ হল বাঁ হাতে বাঁয়ার উপর তাল দিয়ে ডান হাতের এক আঙুলে একতারায় তালে তালে ঝংকার তুলে, পায়ে বাউলের কাঁসার

বাঁকা নূপুরের শব্দে নৃত্য ও একসঙ্গে গান গাওয়া। এইরূপ স্বাবলম্বনের ক্ষমতা এই বাউলদের একটি আশ্চর্য জিনিস। আমার মতে বাউলদের এই বিশেষত্বটিও বাংলারই একটি নিজস্ব বিশেষ গুণ।

বাউলের নাচ এক ধরনের পাঁচালি নাচ। কোনো একটি বিশেষ রীতিতে বাঁধাধরা নাচ এ নয়। যখন যে বাউল যেখানে যে নৃত্য-ছন্দ পেয়েছে তাকেই গ্রহণ করেছে সহজভাবে। যত দূর মনে হয় চেষ্টাকৃত কোনো নৃত্যরূপ এরা পছন্দ করে নি। গান গাইবার রীতিতে এরা যত প্রকার ছন্দ পেয়েছে তাকেই নৃত্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা থেকেই এদের নাচের উদ্ভব বৈচিত্র্য ও উৎকর্ষ। যার নাচতে ভালো লেগেছে সে নেচেছে, যার ইচ্ছা করে নি সে নাচে নি। এদের গানের আনন্দকে একসঙ্গে গানে ও নৃত্যে ফুটিয়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা থেকেই এ নাচের উদ্ভব। এ যে সুফী দরবেশদের 'সমা'-র প্রেমোন্মত্ততা, তাদের গান ও নাচ দেখে সে কথা মনে হয় না। তারা যখন ভক্ত দরদী বা মরমীদের 'সঙ্গ' করে, তখন তাদের আলাপ-আলোচনার ভাষা হল গান। তখন গান গাইতে বা গান শুনতে তাদের যে আনন্দ হয় সেই আনন্দই তাদের নাচের মূল প্রেরণা—এ ঠিক প্রেমোন্মাদ হয়ে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হওয়া নয়।

বাউল গানের সুরে আমরা দেখি দুটি ভাগ। সাধারণ নিয়মে এই গানের যত কলিই থাকুক-না কেন, সুরে পার্থক্য দেখা যায় কেবল প্রথম কলির সঙ্গে দ্বিতীয় কলির। পরের আর-সব কলির সুর দ্বিতীয় কলিকে অনুসরণ করে চলে, এবং প্রথম কলি ছাড়া অন্যান্য সবক'টি কলির ছন্দও এক।

অন্যত্র বলেছি যে, জমিদারির গ্রামাঞ্চলে বাসকালীন সেখানকার বৈরাগী ও বাউলদের গানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়েছিলেন গুরুদেব এবং সে-গান তাঁর রচনাকে প্রেরণার সন্ধান দেয়। তাদের সেই সহজ সরল প্রাণ-মাতানো গানের ভিতরে যে আনন্দের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন তা তাঁর জীবনে চিরদিনের সম্পদ হয়েছিল। তিনি হয়তো সেখানে আরো অনেক রকমের গান শুনেছিলেন, কিন্তু সে গান এদের মতো এত গভীরভাবে তাঁর মন আকর্ষণ করে নি। এই অঞ্চলের সুরগুলিতে একটি অবিমিশ্র নিজস্ব রূপ ছিল যা সেখানকারই প্রাণের সুর।

সব লোকসংগীতের ভাষা হবে সব সময় সহজ পল্লীপ্রাণের ভাষা। যে মানুষের মুখে এ গান ভাষা ও সুরে প্রকাশ পায়, তারা চিরকালই এ যুগের শিক্ষার আদর্শে অশিক্ষিত, তাই তাদের গানে কখনো কোনো উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যের ভাষার স্পর্শ থাকে না। খাঁটি বাউল ও অন্যান্য পল্লীগানে জাতীয়-সংগীতের মতো উদ্দীপনার বাণী থাকে না। এদের আদর্শ সম্পূর্ণ বিপরীত। এদের গান চিরকালই একটি বিশেষ উন্মাদনার ভাবকে অবলম্বন করে গঠিত। কখনো অন্য কোনো ভাবের সঙ্গে এ সুরের মেশবার প্রয়োজন হয় না, কারণ এরা একভাবের ভাবুক। গুরুদেবই প্রথম বাউল গানে এ ধারার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। স্বদেশী যুগের প্রেরণায় এই গানের সুরের অনুকরণে উপরোক্ত জাতীয়-সংগীত রচনা করে তিনি বাংলাদেশের গানে একটি নতুন পথ খুলে দিলেন। এই সময়কার জাতীয়-সংগীতে আমরা পাই আশা উদ্দীপনার বাণী, যা কথার ছন্দে ভাবের বলিষ্ঠতায় ভরপুর। চলতি সহজ ভাষায় রচিত জাতীয়-সংগীতগুলির সঙ্গে বাউল ও অন্যান্য পল্লীগানের সুর ও ঢঙ অতি

সুন্দর ভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে। এদিক থেকে তাঁকে পথপ্রদর্শক বলা যায়। পূর্বেই বলেছি যে, ঊনবিংশ শতকে রোমাণ্টিক আন্দোলনের যুগে ইয়োরোপে এক প্রকার স্বাদেশিকভাবোধের উন্মেষ হয়। তখন দেখা দেয় গ্রামসংস্কৃতির প্রতি অনেকের বিশেষ আগ্রহ। সেই প্রেরণায় বড়ো বড়ো স্রষ্টারা অনেকেই গ্রামের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করেন নিজেদের সৃষ্টির কাজে। ইয়োরোপের আধুনিক বিরাট যন্ত্রসংগীত সিম্ফনি বাজনার প্রবর্তক Haydn, যাঁকে বলা হয় "father of modern symphony"। তিনি এই সংগীতের জন্যে বহু সুর সংগ্রহ করেন তৎকালে প্রচলিত নিজের দেশের লোকসংগীতের কাছ থেকে এবং তার সঙ্গে মিশিয়েছিলেন প্রাচীন উচ্চশ্রেণীর সংগীতপদ্ধতি। অনুমান করি সেই রকমের কোনো প্রেরণাই হয়তো গুরুদেবকে তখন বাংলার পল্লীগানের সুর ও ঢঙে জাতীয়-সংগীত রচনা করতে উৎসাহিত করেছিল।

স্বদেশী যুগের প্রেরণা তাঁর গানের যে নতুন উৎসটি খুলে দিয়েছিল, বহু বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে শেষ জীবন পর্যন্ত তার ধারা প্রবাহিত ছিল। ঋতুসংগীত, জাতীয়-সংগীত, প্রেমসংগীত, পূজা বা ধর্মসংগীত, এমন-কি গীতিনাট্যের কথাতেও এই সুর ও ঢঙ অতি সহজ সুন্দরভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। আবার খাঁটি বাউল তত্ত্বাদর্শে রচিত তাঁর বাউল গানগুলি এত সুন্দর যে, ভাবে ভাষায় ও সুরের সম্মিলনে যে-সব গান যে-কোনো শ্রেষ্ঠ বাউল গানের পাশে স্থান গ্রহণ করতে পারে, যেমন—'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই' ও 'আমি কান পেতে রই'।

গুরুদেবের হাতে পড়ে বাউলদের গানের ঢঙ অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ সীমা থেকে এইভাবেই বড়ো ও বিচিত্র হয়ে উঠেছে। তাঁর বাউল সুরের বহু গানে আছে ধ্রুপদের মতো চারিটি অংশ। আস্থায়ী অন্তরা ও সঞ্চারীতে আছে সুরের বৈচিত্র্য ও আভোগ ঠিক ধ্রুপদের মতো অন্তরাকে অনুসরণ করে। অধিকাংশ গানের সঞ্চারীর সুর গুরুদেবের নতুন সৃষ্টি। বাউলদের সুরের গঠন-প্রণালীর সঙ্গে মিল রেখেই এগুলি তিনি তৈরি করেছিলেন। এই কাজে গুরুদেবকে অনেক সময় প্রাচীন রাগ-রাগিণী বা কীর্তনের সুরের সাহায্য নিতে হয়েছে। বাউলের বৈশিষ্ট্যও তাতে আছে, অথচ সুরে বৈচিত্র্য পেয়েছে গানগুলি। তাঁর বাউল গানে রাগ-রাগিণী মিশেছে, অথচ বাউল সুরের সঙ্গে তার সামঞ্জস্যটি চমৎকার। নমুনা স্বরূপ কয়েকটি গান উল্লেখ করি :

'বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা, আষাঢ়, তোমার মালা' গানটির সঞ্চারীতে বা তৃতীয় অংশে যে সুর বসেছে তাতে পাচ্ছি 'দেশ' রাগিণীর রূপ। 'আমি তারেই জানি তারেই জানি আমায় যে জন আপন জানে' গানটির সঞ্চারীতে বসেছে 'পিলু' রাগিণী। 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও গো এবার যাবার আগে' গানটি গুরুদেবের বাউল সুরের গানের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বাউল সুরের সঙ্গে পিলু রাগিণী এতেও মিশেছে অথচ ধ্রুপদের মতো নিয়মের চারিটি ভাগে এর সুর গঠিত নয়। গান আরম্ভ হয়েছে বাউলের সুরে কিন্তু গানটি সুনির্দিষ্ট কোনো বিশেষ ভাবে বিভক্ত নয় বলে সুর-যোজনাও কোনো বাঁধাধরা নিয়মে হয় নি; দুই রাগিণী একটি আর-একটির সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। গানের কথায় যেখানে যেভাবে সুর বসানো দরকার ঠিক সেই ভাবেই সুরগুলি নিজের

স্থান করে নিয়েছে। গানটির প্রথম অংশে যে বেদনা প্রকাশ পায়, সুরও ঠিক সেই বেদনার অনুকূল এবং শেষ অংশে যেখানে একটা উন্মাদনার ভাব ফুটে উঠেছে কথার সাহায্যে, সুরও তাকে সেই পথেই সাহায্য করেছে।

বাউলদের প্রধান লক্ষ্য কথার ছন্দোবন্ধ সহজ গতি। তাই অন্যান্য লোকসংগীতের তুলনায় বাউলগান ছন্দোবহুল। তার একমাত্র কারণ বোধ হয় বাউলদের নৃত্যের আবেগ। ভাবের আবেগে যখন তারা নেচে ওঠে, তখন সে উন্মাদনার জন্যে সে রকমের ছন্দের প্রয়োজন হয়। যে ছন্দ মানুষ সহজে পেয়েছে আপনা হতে সেই সহজ ছন্দটি বাউলদের একমাত্র লক্ষ্য। সহজ ভাষা ও সুরের সঙ্গে গানের ছন্দও সহজ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই আমরা বাউলদের গানে তিন মাত্রার দাদরা বা কখনো চার মাত্রার কাহারবা জাতীয় ছন্দের পরিচয় পাই। গুরুদেব সেই কারণেই তালের দিক থেকে বাউল গানে নতুন কিছু করার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

১৩১২ সালের স্বদেশী আন্দোলনের যুগে পূর্ববাংলার সারিগানের সুরে রচিত একটি জাতীয়-সংগীত আমরা পাই। গানটি হল 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে'। সারিগানের সুরে খুব বেশি গান পরে আর লেখেন নি। পরবর্তী যুগের রচনার মধ্যে 'বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা' ও 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়' গান-দুটি সুপরিচিত। 'আজ ধানের ক্ষেতে' গানটির সাহায্যেই সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে গুরুদেব প্রথম সারিগানকে ঋতু-সংগীতে পরিণত করলেন।

বাউল, সারিগান ও ভাটিয়ালির মধ্যে অনেকেই পার্থক্য খুঁজে পান না। কিন্তু আসলে তা নয়। এ কটির স্বরবিন্যাস প্রায় একই, কিন্তু ছন্দের গতিতে এরা পৃথক। ভাটিয়ালি গানের সুর টেনে টেনে গাইতে হয়, তাই তার ছন্দ অত্যন্ত ঢিমালয়ের। বাঁধাছন্দের তাল প্রায় থাকেই না। সারিগানের উৎপত্তি পূর্ববঙ্গের নৌকা দৌড়ের বাজিতে, তাই এ গান ছন্দ-প্রধান এবং গুরুদেবের সারিগানের প্রভাবে রচিত সব-কটি গান চার মাত্রায় দ্রুত ছন্দে রচিত। গুরুদেবের স্বদেশী যুগে রচিত বাউল সুরের গানগুলির সবেতেই আছে তিনমাত্রার ছন্দ।

পশ্চিমবঙ্গের বাউলদের মধ্যে পূর্ববঙ্গের বাউলদের সুর, ভাটিয়ালি সুর বা সারিগানের সুর শোনা যায় না। এখানকার গানে যাত্রা-প্রভাবিত রাগ-রাগিণীর ছাপ অধিক। তবে এমন কয়েকটি সুর শুনেছি যার স্বরগঠন-প্রণালী পূর্ববঙ্গের বাউল, ভাটিয়ালি ও সারিগানের সমগোত্রীয়।

বাংলার নিজস্ব সুর ও ঢঙে রচিত গুরুদেবের গানের আর-একটি নতুন সৃষ্টির প্রকাশ আমাদের কাছে ধরা পড়ে যাকে আমি বলি রাবীন্দ্রিক কীর্তন বা রাবীন্দ্রিক বাউল। অর্থাৎ আখর ইত্যাদি বর্জিত, বাউলের প্রভাবযুক্ত ও গুরুদেবের শান্তিনিকেতনের জীবনে যার সূত্রপাত, সেই গান। আসলে এ হল কীর্তন ও পূর্ববঙ্গের বাউলদের সুরের মিশ্রণে উদ্ভূত এক বিশেষ সুরের গান। জীবনের শেষ অর্ধেই এই গান তিনি সব চেয়ে বেশি রচনা করেছেন। এই গানে বাউল ও সারিগানের মতো জলদ লয়ের ছন্দ পাব কিন্তু তা কেবল বাউলের মতো চার বা তিন মাত্রা ছন্দের তালে বাঁধা নয়, এতে তেওরা ঝাঁপতালও স্থান পেয়েছে। কিন্তু ত্রিতাল, চৌতাল, ধামার, আড়াচৌতাল, সুরফাক্তাল ইত্যাদি উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালগুলি একেবারেই এ গানে

স্থান পায় নি। এই ধরনের গানের কয়েকটি নমুনা তুলে দিচ্ছি—

১ ওরা অকারণে চঞ্চল—চার মাত্রার ছন্দ

২ আমার কী বেদনা সে কি জানো—তিন মাত্রার ছন্দ

৩ যেতে যেতে চায় না যেতে—ঝাঁপতালের ছন্দ

৪ লহো লহো তুলে লহো—তেওরা তালের ছন্দ

হিন্দী মার্গ-সংগীতের প্রভাবে রচিত একটি সম্পূর্ণ নতুন ঢঙের কীর্তন গান। এখানে ধ্রুপদের মতো চারিটি কলি, এবং সুরেও ধ্রুপদের মতো ভাগ দেখা দিল। ৫৪ বৎসর বয়সে রচিত "এই তো ভালো লেগেছিল" গানটি বাউল-কীর্তন মিশ্রিত সুরের একটি অপূর্ব নিদর্শন। দেশী সুর এত বড়ো গানটির সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবে মিশে গেছে। সুরের পুনরুক্তি নেই। এ ধরনের রচনার নমুনা আগে পাই নি

বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে এর আগে রচিত দেশী সুরের গানের মধ্যে ধর্ম-সংগীত ছিল সংখ্যায় সব চেয়ে বেশি, তার পর জাতীয়-সংগীত ও মানবিক প্রেমের গান। ঋতুবিষয়ক সংগীত দু-একটি মাত্র। কিন্তু এখন থেকে ঋতুসংগীত যেমন প্রাধান্য পেয়েছে, তেমনি ঐ সুরে রচিত জাতীয়-সংগীত লেখা বন্ধ হয়ে গেল। জীবনের প্রথম দিকে রামপ্রসাদী সুরের গান কিছু পেয়েছিলাম, কিন্তু শেষার্ধে সে সুরে আর একটিকেও রচনা করতে দেখি না। প্রথম জীবনে রচিত কীর্তনের বিভিন্ন সুর ও ঢঙের মধ্যে কয়েকটিকে আর পরবর্তী জীবনে দেখা গেল না। দেখা গেল নতুন ঢঙের দেশী, মিশ্রসুরের গান। যেমন—'আজি এ নিরালা কুঞ্জে', 'পুরানো জানিয়া চেয়ো না', 'রোদনভরা এ বসন্ত' ইত্যাদি গান। 'গহনকুসুমকুঞ্জমাঝে' বা 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' গানদুটিতে যে ধরনের প্রচলিত কীর্তনের সুর শুনি ঠিক ঐ সুরের গান আর তিনি রচনা করেন নি। এই দুটি গানের সুরের নাম হল 'ঝিঁঝিট'। অথচ উচ্চাঙ্গ হিন্দী গানের প্রচলিত ঝিঁঝিটের সঙ্গে এই কীর্তনের সুরের খুব একটা মিল ধরা পড়ে না। যেমন গুরুদেবের হিন্দী ভাঙা ঝিঁঝিট রাগিণীর বাংলাগান 'তোমারি মধুর রূপে' গানটি। এটির সঙ্গে তুলনা করলেই আমার এই কথার সার্থকতা ধরা পড়বে।

জীবনের শেষ পঁচিশ বছরের রচনায় বাউল কীর্তন বা অন্য দেশী গানের হুবহু অনুকরণে গান রচনা করতে দেখি না। অর্থাৎ আস্থায়ীর পর অন্য কলিগুলিতে একই সুর যোজনা করা তিনি পছন্দ করেন নি। সুরগুলিকে ধ্রুপদের মতো চার ভাগে সাজিয়েও চেষ্টা করেছেন কবিতার ভিন্ন অংশে দেশী সুর ও উচ্চাঙ্গের রাগ-রাগিণীকে পাশাপাশি বসিয়ে গানে সুর যোজনা করতে। এরই একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন হল, পূর্বে উল্লিখিত 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' গানটি। তবে গানটি বাঁধা ছন্দে গাইবার নয়, কথার ভাঙা ছন্দে গাইতে হয়।

আরম্ভে গুরুদেবের জীবনের প্রথম অর্ধে রচিত দেশী সুরের গানের তালিকায় আমি বিভাস রাগিণীর কয়েকটি গানকে কেন স্থান দিয়েছি এ প্রশ্ন হয়তো অনেকের মনেই উঠতে পারে। বাংলাদেশের বিভাস যে সত্যই এ অঞ্চলেরই একটি সুর তা বোঝা যায় পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার নানাপ্রকার গান শুনে। বিভাস পল্লীঅঞ্চলে এমনভাবে নিজের রূপ প্রকাশ করেছে যে, তাকে পল্লীগানের সুর বলে ভ্রম হওয়া

স্বাভাবিক। পশ্চিমের ওস্তাদমণ্ডলী বাংলার এই বিভাসের সঙ্গে পরিচিত নন। তাই পণ্ডিত ভাতখণ্ডে যাকে বিভাস বলেন তা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। তাঁর মতে বাংলার বিভাস ও দেশকার রাগিণী এক।

বাংলায় বিভাস রাগিণীর জাতি ওড়ব-খাড়ব। আরোহণে মধ্যম ও নিষাদ বর্জিত। অবরোহণে মধ্যম বর্জিত। রাগের মূল গতি—সা রা গা পা ধা র্সা না ধা পা গা রা সা। প্রচলিত স্বরবিন্যাস এইরূপ—সরগপধা, পধনধা, পধপনধা, পগরা, সরগগরসা, সরা, রগা, গপা, পধা, ধর্সা, নধা, পধর্সা, নধা, পর্সনধা, পগরা, সরগরসা। ভাতখণ্ডেজি বলেছেন, এই রাগিণীতে রে ও ধা হবে কোমল। বাংলায় সবই শুদ্ধ স্বর।

গুরুদেবের কতগুলি গানকে বিভাস রাগিণীর গান বলে চিহ্নিত করা হলেও এর সুরের মধ্যে বাংলার পল্লীঅঞ্চলের সুরের এমন একটি ছাপ আছে যে একে রাগিণী-সংগীত বলে আলাদা করে ভাবতে পারা যায় না। যেমন তাঁর মিশ্র বিভাসে রচিত 'হৃদয়ের এ কূল ও কূল' ও 'ওলো সই, আমার ইচ্ছা করে' গান দুটি। এদিকে ওস্তাদি আবহাওয়ায় চৌতালে রচিত বিভাস রাগিণীর 'ওঠো ওঠো রে—বিফলে প্রভাত বহে যায় যে' গানটিকে পল্লীঅঞ্চলের গান বলে মনে হবে না। পরবর্তী জীবনে গুরুদেব বাংলার বিভাস রাগিণীতে আরো অনেক গান রচনা করেছেন। সেগুলি ওস্তাদি ঢঙে রচিত না হওয়ায় স্বভাবতই অনেকে মনে করবেন এগুলি বাউল বা ঐ ধরনের কোনো পল্লীসুরের গান। 'ডাক্‌ব না, অমন করে বাইরে থেকে', 'এ বেলা ডাক পড়েছে', 'নিশিদিন ভরসা রাখিস' ও 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে' তার কয়েকটি নমুনা। এগুলিকে অনেক সময় ভুল করে বাউলদের গানে পাওয়া এক ধরনের সুর বলে মনে করি, কিন্তু এ হল বাংলা দেশী বিভাস, যা উচ্চ নীচ সব শ্রেণীর গাইয়েদের মধ্যে সহজে স্থান পেয়েছিল।

বাংলার নিজস্ব দেশী সুরের প্রেরণায় রচিত গুরুদেবের গান হবে প্রায় দুশোর মতো। সংখ্যার দিক থেকে এই গানে তিনি বাঙালি সুরকারদের মধ্যে অগ্রণী বলেই অনুমান করি। সুরের ও ভাবের বৈচিত্র্যেও তিনি সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন। রবীন্দ্র-কীর্তন বা রবীন্দ্রবাউল নামে যে সুরগুলি এই গানের মাধ্যমে আমরা আজ পাচ্ছি নিয়মজালে ফেলে অন্যান্য রাগিণীর মতো তার নাম দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এ কাজ গুণী সংগীত-পণ্ডিতের।

তাঁর এই গানের আলোচনাতে এটুকু বোঝা গেল যে, বাংলা গানের জড়ত্বের সম্ভাবনা দূর করার পথেই তিনি নতুন সৃষ্টির পথ দেখিয়েছেন। গুরুদেব ছাড়া তাঁর সমসাময়িক অন্য রচয়িতাদের মধ্যে কেউ কেউ এই-সব দেশী সুরে গান রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এত বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য ছিল না গুরুদেবের মতো। এ যুগে গীত-রচয়িতাদের মধ্যে যাঁরা লোকসংগীতের সুর নিয়ে গান রচনা করছেন, তাঁদের মধ্যে বেশি চলছে সুরের ও ভাবের দিকে অনুকরণের পালা। তবে আশা হয়, চেষ্টা যখন আছে ভবিষ্যতে হয়তো কোনো শক্তিশালী রচয়িতা এতে হাত দেবেন ও গুরুদেবের মতো নতুন পথে কৃতকার্য হবেন।

গানের বিষয়বৈচিত্র্য ও কালিবিভাগ

বাংলাদেশে গত দুশো বছরের মধ্যে গীতকার রূপে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকের রচনা স্বতন্ত্রভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, তাঁদের গানে বিষয়বৈচিত্র্যের অভাব আছে। তাঁরা প্রায় সকলেই দু-একটি বিষয় বা ভাগের গানই রচনা করে গেছেন। তাঁরা হয়তো একটি বিষয়ের গান রচনায় সফল হয়েছেন, অন্যগুলিতে সমান সফল হতে পারেন নি। যেমন, প্রেমের গান রচনায় যিনি বিখ্যাত হয়েছেন, তাঁর ভগবদ্‌ভক্তি বা পূজার গান তেমন জমে নি। পূজার গান রচনায় যিনি দক্ষ, প্রেমের গানে তাঁর সেই দক্ষতা প্রকাশ পায় নি। এইভাবে বিষয়ের দিক থেকে তাঁদের গান সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন গত শতাব্দীর নিধুবাবু। তিনি বাংলা ভাষার টপ্পা গানের প্রবর্তক। বহু উৎকৃষ্ট বাংলা টপ্পা গানের রচয়িতা। এবং সেই গানের প্রভাব সমস্ত ঊনবিংশ শতকের বাংলা গানে প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু বিষয়ের দিক থেকে তাঁর গানগুলি সবই ছিল একই আদর্শের বিরহ বেদনার গান। বাংলার প্রাচীন কীর্তন গানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বৈচিত্র্যই কেবলমাত্র প্রকাশ পেয়েছে। শাক্তরা প্রচার করে গেলেন আর-এক ধরনের ভক্তির গান। ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলনের সঙ্গে হিন্দী ধ্রুপদ খ্যালের ভঙ্গিতে বাংলা ভাষায় বহু উপাসনার গান রচিত হল। গুরুদেবের সমসাময়িক বাঙালিদের মধ্যে যাঁরা বাংলা গানে বৈশিষ্ট্য এনেছিলেন, এবং খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের নামই আমি করব। এঁরা সকলেই একাধিক বিষয় নিয়ে গান রচনা করেছেন। কিন্তু তবুও দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশী ও হাসির গানের কবিরূপে যতটা খ্যাতি পেয়েছিলেন ঠিক সেই খ্যাতি প্রেম বা ভক্তির গান লিখে পান নি। অতুলপ্রসাদের ভক্তি ও প্রেমের গানই বাঙালিকে মুগ্ধ করেছে বেশি। নজরুলের কয়েকটি উদ্দীপক গান ও উর্দু গজলের আদর্শে রচিত প্রেমের গানগুলিই লোকপ্রিয় হল, অন্যগুলি তেমন স্থান পেল না জনসাধারণের মনে।

বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকে গুরুদেবের গান বহুমুখী। এবং প্রায় প্রত্যেক বিষয়ের গানই রসোত্তীর্ণ হয়েছে এ কথা বলা চলে। গীতবিতানের পূজা অংশের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়গুলির নাম হচ্ছে, গান, বন্ধু, প্রার্থনা, বিরহ, সাধনা ও সংকল্প, দুঃখ, আশ্বাস, অন্তর্মুখে, আত্মবোধন, জাগরণ, নিঃসংশয়, সাধক, উৎসব, আনন্দ, বিশ্ব, বিবিধ, সুন্দর, বাউল, পথ, শেষ, পরিণয়। এই অংশেই আছে বিখ্যাত স্বদেশী গানগুলি সব। আর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রেম পর্যায়ে পাচ্ছি প্রেমবৈচিত্র্য ও নানা ঋতু বা প্রকৃতিকে নিয়ে গান। এ ছাড়া এই ভাগের বিচিত্র অংশে এমন বহু গান আছে যা বিষয়ের দিক থেকে উপরের কোনোটার মধ্যে স্থান পায় না। লিরিক কবিতা হিসেবে এই-সব গান যে বাংলার চিরকালের সম্পদরূপে গণ্য হয়েছে এ কথা সকলেই জানেন। এ ছাড়া ছটি পূর্ণাঙ্গ গীতিনাট্য রচনা করে বাংলা গানে তিনি যে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে গেছেন এ কথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি। এই গীতিনাট্যগুলি বহুদিন পর্যন্ত বাংলা সংগীতের প্রেরণার বিষয় হয়ে থাকবে। আরো এমন কতকগুলি বিষয়ের গান রচনা করে গেছেন যা নিয়ে গান রচনার কথা তাঁর আগে কেউ ভাবে

নি। যেমন খেলার গান, চলার গান, পথের গান, জন্মদিনের গান, বিবাহের গান, মৃত্যুলোকের শান্তির গান, চাষকরার গান, ধানকাটার গান, গৃহপ্রবেশের গান, চায়ের গান, হাসিঠাট্টার গান, তৃষ্ণার জলের গান, দীনের হতে দীন যে মানুষ তাদের প্রতি সমবেদনার গান, এ ছাড়া শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের নানা উৎসবের উপযোগী নানা গান। এইভাবে মানুষের এই কঠোর বাস্তব জীবনকে নানা দিক থেকে সংগীতের রসে সিঞ্চিত করবার চেষ্টা বাংলা দেশে আর-কোনো একজন গীতকার কখনো করেন নি।

গানের কলিবিভাগ ও তার সঙ্গে মিলিয়ে সুর যোজনায়ও গুরুদেবের গান বাংলা গানে অনেক বৈচিত্র্য এনেছে। এবার সেই বৈচিত্র্যের আলোচনা করব।

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'গীতসূত্রসার' গ্রন্থে ধ্রুপদ খ্যালের পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন, "ধ্রুপদের রচনা বিস্তৃত, এবং চারি অংশে অর্থাৎ কলিতে বিভক্ত।... চারি তুকের চারিটি ভিন্ন ভিন্ন নাম; যথা,—আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ... অনেক ধ্রুপদের কেবল দুই তুক মাত্র পাওয়া যায়; তাহা বিস্মৃতি অথবা শিক্ষার ত্রুটির ফল।

"গানের প্রথম ভাগের নাম আস্থায়ী, যাহাকে মহড়া, কিম্বা ধুয়া (ধ্রুব) বলে; ইহা আরম্ভ হবার কোন সুর নির্দিষ্ট নাই।

"গানের দ্বিতীয় কলির নাম অন্তরা; ইহাতে সুরের একটি নিয়ম নির্দিষ্ট আছে এই যে, ইহা প্রায়ই মধ্য সপ্তকের মধ্য স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া তার সপ্তকের সা-এ আরোহণ করতঃ তথায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লইয়া, তৎপরে রাগ বিশেষে কেহ আরো উপরে যাইয়া নামিয়া আইসে, কেহ বা ঐ সা হইতেই নামিয়া আসিয়া আস্থায়ী সুরের সহিত মিলিত হইয়া সমাপ্ত হয়।

"গানের তৃতীয় কলির নাম সঞ্চারী; ইহার নিয়ম এই যে, গানের আস্থায়ী ভাগ যে মধ্য সপ্তকে সম্পাদিত হয়, তাহারই উচ্চাংশ হইতে অবরোহণ করিয়া গায়কের সাধ্যমত খাদ সপ্তকের কতক দূর পর্যন্ত নামিয়া, আবার আরোহণ করতঃ সা-এ সমাপ্ত হয়। তৎপরে গানটি পুনর্বার আরোহণ গতি অবলম্বন করতঃ তার সপ্তকের কতক স্থান পর্যন্ত বিচরণ পূর্বক পুনর্বার অবরোহণ করিয়া, মধ্য সপ্তকের কোন স্থানে সমাপ্ত হয় এই প্রকার অবস্থাপন্ন কলিকে আভোগ বলে; ইহা গানের শেষ কলি।

"রচনা কৌশলাভাবে আভোগের সুর প্রায়ই অন্তরার ন্যায় দেখা যায়। এই চারি কলি গাওয়ার নিয়ম এই : আস্থায়ী বারম্বার গাইতে হয়; তৎপরে অন্তরা গাইয়া আবার আস্থায়ী গাইতে হয়; তৎপরে সঞ্চারী তৎপরে আভোগ, তৎপরে আবার আস্থায়ী গাইয়া সমাপ্ত করিতে হয়; সঞ্চারী গাওয়ার পর আস্থায়ী গাওয়ার রীতি নাই; সঞ্চারীর পরই আভোগ গাইতে হয়।

"খেয়ালের রচনা ধ্রুপদাপেক্ষা সংক্ষেপ; ইহাতে দুই তুকের অধিক সচরাচর ব্যবহার হয় না, অর্থাৎ ইহাতে কেবল আস্থায়ী ও অন্তরা। কখন কখন ইহাতে তিন চারি কলিও থাকে, কিন্তু তাহাদের সুর সবই অন্তরার ন্যায়।"

টপ্পা ও ঠুংরী গানেও দুইটি মাত্র কলি বা তুক্। খেয়ালের আস্থায়ী ও

অন্তরার নিয়মেই সুর বসে।

ধ্রুপদ, খ্যাল, টপ্পা ও ঠুংরী গানের মোট পঙ্‌ক্তি বা লাইন-সংখ্যা বিষয়ে বিচার করলে দেখতে পাব যে বেশির ভাগ ধ্রুপদ গানের মোট লাইন-সংখ্যা হল আট; প্রতি দুই লাইনে এক কলি; আর খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরীতে থাকে মোট চার লাইন; সেখানেও দুই লাইনে এক একটি কলি গঠিত। এই চার ঢঙের গানে সুর যোজনা করা হয় একই রীতিতে।

হিন্দীভাষী অঞ্চলের পল্লীসমাজে প্রচলিত নানারূপ গানের সুর বসে খেয়ালেরই মতো দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে। বহু কলির সমষ্টি লম্বা গল্প-গান পল্লীতে বেশ চলে। কিন্তু সুর তৈরি হয় আরম্ভের আস্থায়ী অন্তরার দুই কলির অনুকরণ করে। প্রত্যেক কলি পরিবর্তনের সময় আস্থায়ী গেয়ে অন্য কলি ধরতে হয়। ভারতের সব রকমের পল্লীগানে এইভাবে সুর বসে। পল্লীতে দুই লাইনের গান থেকে শুরু করে বহু লাইনের সমষ্টি বড়ো গানও পাওয়া যায়। প্রথম পঙ্‌ক্তি বারে বারে গাইবার রীতি ধ্রুপদ, খ্যাল, টপ্পা, ঠুংরী ও দেশী গান সবেতেই আছে, আর আছে আস্থায়ী অন্তরার মতো কলির ভাগ ও এক রীতিতে সুর বসানোর ইচ্ছা। এই হল মোটামুটিভাবে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ ও দেশী আদর্শে রচিত গানের কলি বিভাগ ও তার সুর-গঠন-পদ্ধতির অধিক প্রচলিত নিয়ম।

গুরুদেবের গানের কলিবিভাগ, লাইন সমষ্টি ও তার সঙ্গে মিলিয়ে সুর যোজনার রীতিটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে উচ্চ ও দেশী, উভয় সংগীতে প্রচলিত যাবতীয় নমুনাই এতে মিলবে, আর মিলবে তার সঙ্গে তাঁর নিজস্ব নতুন সৃষ্টির নিদর্শন। এদিক থেকে সব মিলিয়ে বৈচিত্র্যের যে নমুনা তাঁর গানে পাই, এ রকমের বৈচিত্র্য একক আর কোনো রচয়িতার গানে দেখা যায় না। এবং অনুমান করি এ পথেও তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্।

মোট তিন লাইনের গান থেকে শুরু করে ১৬ লাইনের রচিত গানের কলি ভাগ কিভাবে গুরুদেব করেছেন তার কতগুলি নমুনা এখানে তুলে দিচ্ছি। এর মধ্যে কিছু হিন্দী গান ভেঙে বাংলা গান রচনা করতে গিয়ে তারই অনুকরণে করেছেন। অন্যগুলি করেছেন নিজেই স্বাধীনভাবে।

মোট দুই কলির গান

		কত লাইনে কলি বিভক্ত		
		আস্থায়ী	অন্তরা	লাইন-সংখ্যা
১। নূতন প্রাণ দাও	নাচারীতোড়ি—ধামার	১	২	৩
২। বিমল আনন্দে জাগো রে	বাহাদুরীতোড়ি—ঢিমে তিনতালা	২	২	৪
৩। বন্ধু তোমায় করব রাজা	বিভাস—একতালা	২	৩	৫
৪। বাজাও তুমি কবি	বাহার—সুরফাক্তা	৩	৩	৬
৫। শুভ্র আসনে বিরাজ'	ভৈরব—আড়াচৌতাল	৩	৪	৭

পূর্ব পৃষ্ঠার গানগুলির পঙ্‌ক্তি বিভাগ খেয়ালের নিয়মে করা হয়েছে। অর্থাৎ এর কলি খেয়ালের মতো দুই ভাগে বিভক্ত। সুরও বসানো হয়েছে একই নিয়মে। এই পঙ্‌ক্তি বিভাগ ও সুরযোজনায় তাঁর নিজের খুব বেশি হাত নেই কারণ তৃতীয়-সংখ্যক গানটি ছাড়া আর সব-কটিই হিন্দী-ভাঙা বাংলা গান।

মোট চার কলির গান

	রাগ ও তাল	কত লাইনে কলি বিভক্ত: স্থায়ী	অন্তরা	সঞ্চারী	আভোগ	মোট লাইন-সংখ্যা
১। কেমনে ফিরিয়া যাও	ভৈরবী—চৌতাল	২	২	২	২	৮
২। এ ভারতে রাখো নিত্য	সুরট—চৌতাল	৩	২	২	২	৯
৩। দীপ নিবে গেছে মম	বেহাগ—ঝাঁপতাল	২	৩	২	৩	১০
৪। মম অন্তর উদাসে	ত্রিতাল	২	৩	৩	৩	১১
৫। তুমি কেমন করে গান	মিঃ খাম্বাজ—কাহারবা	২	৪	২	৪	১২
৬। যারা কাছে আছে তারা	মিঃ সাহানা—একতালা	২	৪	৩	৪	১৩
৭। সফল করো হে প্রভু	মল্লার—ত্রিতাল	২	৪	৪	৪	১৪
৮। ভয় হতে তব অভয়মাঝে	বেহাগ—চৌতাল	২	৪	৪	৪	১৪
৯। আমি কেমন করিয়া	আশাবরি—একতালা	৪	৪	৩	৪	১৫
১০। এসো হে এসো সজল	মল্লার—ঝাঁপতাল	৪	৪	৪	৪	১৬

এইভাবে উপরোক্ত ৮ থেকে ১৬ লাইনের পরেও চার কলিতে ভাগ করা গান আরো আছে কিন্তু অধিক নমুনার প্রয়োজন নেই।

উপরের সবকটি গানের কলি চার ভাগে বিভক্ত। এদিক থেকে প্রচলিত ধ্রুপদের নিয়মের সঙ্গে এর মিল রয়েছে এবং চার কলিতে সুর যোজনা করেছেন ধ্রুপদের নিয়মে। এই রকমের চার কলির গানই গুরুদেব রচনা করেছেন সব চেয়ে বেশি। কিন্তু এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করতে হবে যে, বিশেষ করে চার কলির গানগুলির মধ্যে এমন অন্য তাল সব রয়েছে যা ধ্রুপদের চৌতাল নয়। চৌতালের হিন্দী ধ্রুপদে কেবল চার কলির প্রয়োগ প্রশস্ত। অন্য তালের গানে তা দেখা যায় না। কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি চৌতাল ছাড়াও ঐ-সব চার কলির গানের মধ্যে ঝাঁপতালের ছন্দ, তিন মাত্রা একতালার ছন্দ, চারমাত্রা ত্রিতালের ছন্দ সবই পাওয়া যাচ্ছে। এদিক থেকে গুরুদেবের গান হিন্দী গানকে যে মুক্তির ইঙ্গিত দিচ্ছে তা উল্লেখ-যোগ্য।

চার কলিতে বিভক্ত হিন্দী ধ্রুপদ গানের কথা কবিতার আদর্শে আবৃত্তি করতে গেলে মনে হবে যেন তা বাংলার মতো মুক্ত-ছন্দ, গদ্য-ছন্দ, বা অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতা। গুরুদেবের রচিত হিন্দী-ভাঙা বহু বাংলা গান সেই কারণে কাব্যরসিকদের কাছে মুক্ত-ছন্দ, গদ্য-ছন্দ বা অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতার মতো ঠেকে। কিন্তু উপরের

এই চার কলিতে বিভক্ত গানগুলির মধ্যে পাব ব্যতিক্রমের নমুনা। 'কেমনে ফিরিয়া যাও' ও 'এ ভারতে' গান দুটি ছাড়া বাকিগুলি ছন্দে ও মিলে বাঁধা পাকাপোক্ত কবিতা। উচ্চাঙ্গের চার কলির হিন্দী গানের কথা ঠিক এ ধরনের ছন্দে, নিয়মে সাজানো নয়। গুরুদেব তাঁর গানের এই কলিবিভাগের প্রেরণা হিন্দী ধ্রুপদ গানের কাছ থেকে পেয়েছিলেন, তার প্রভাবে ভাঙা ছন্দে গানও লিখেছেন অনেক, কিন্তু সে প্রভাব তিনি কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তাই চার কলির গান হলেও বাংলা গানের কথাকে বাংলা কবিতার আদর্শে ছন্দে ও মিলে নিখুঁত করে তুলতে পেরেছিলেন। এটিও তাঁর একটি বড়ো কৃতিত্ব। ছন্দে ও মিলে নিখুঁত, চার কলিতে বিভক্ত, বাংলা গানের কথার এই যে রূপ আমরা পেলাম, গুরুদেবের আগে বাংলা দেশে তার এরকম ব্যাপক প্রচার কেউ করেছিলেন কিনা জানি না। কাব্যরসিকেরা তাঁর গানে 'ভাঙা ছন্দের নানাপ্রকার নমুনা দেখে মনে করেন যে ঐ ছন্দ তিনি বিশেষ চেষ্টার দ্বারা' পেয়েছিলেন। কিন্তু গানে ভাঙা ছন্দের কথা বসানোই গুরুদেবের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কারণ কৈশোর থেকেই হিন্দী-ভাঙা বাংলা গান রচনা করে, আর শিশুকাল থেকেই দাদাদের ভাঙা ছন্দের হিন্দী-ভাঙা ব্রহ্মসংগীত গাইতে গিয়ে, ভাঙা ছন্দের গানের চালের সঙ্গে তাঁর বেশ একটা ঘনিষ্ঠতা জন্মে গিয়েছিল। তাই শেষ জীবনে হিন্দী ধ্রুপদের প্রভাবহীন নানা গানের কথায় মুক্ত-ছন্দ বা ভাঙা-ছন্দ বিনা দ্বিধায় ব্যবহার করে যেতে পেরেছিলেন। এবং এ কথা মনে রাখতে হবে যে, চার কলির গানের কথাকে কবিতার ছন্দে সুন্দর করে সাজানো মুক্ত-ছন্দের চেয়ে কঠিন।

উপরের গানগুলির সবকটি রাগ-রাগিণী অবলম্বনে রচিত। দেশী সুরের গানেও এদিক থেকে লক্ষ্য করবার জিনিস আছে।

১। 'নমো নমো নির্দয় অতি করুণা তোমার' হল মোট পাঁচ লাইনের গান। আস্থায়ী তিন লাইনের। অন্তরায় আছে দুই লাইন। কীর্তনের সুর বসেছে গানটিতে। কেবল আস্থায়ী ও অন্তরাযুক্ত এত ছোটো গান কীর্তনের সুরে বড়ো দেখা যায় না।

২। 'যে তোরে পাগল বলে' মোট দশ লাইনের গান। আস্থায়ী দুই লাইনের। প্রথম অন্তরা চার লাইনের ও শেষ চার লাইন হল দ্বিতীয় অন্তরা। এর সুর অবিকল প্রথম অন্তরার মতো। পাশাপাশি দুই অন্তরা যুক্ত, একই সুরে রচিত গান উচ্চাঙ্গের হিন্দী খ্যাল গানেও পাওয়া যায়। বাউলের সুরে গানটি রচিত।

৩। 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি' মোট ৪ কলি ও ১৫ লাইনের গান। আস্থায়ী দুই লাইনের, প্রথম অন্তরায় আছে চার লাইন, দ্বিতীয় অন্তরার লাইনও চার, তৃতীয় অন্তরার লাইন হল পাঁচ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অন্তরার সুর অবিকল প্রথম অন্তরার সুরে বসানো হয়েছে। এটিও বাউলের সুরের গান। কলি ও তার সুর যোজনার দিক থেকে উপরের গানটি ও এ গানটি দেশী পদ্ধতির একটি অতি প্রচলিত নমুনা।

৪। 'আমার সোনার বাংলা' মোট ৩৯ লাইনের গান। আস্থায়ী তিন লাইনের, বাকি নয়টি কলির প্রত্যেকটি চার লাইনে সাজানো। এই বাউলের সুরের গানটির প্রথম তিন কলিতে সুর তিন ভাবে বসেছে। চতুর্থ কলির সুর দ্বিতীয় কলির মতো।

এর পর থেকে প্রতি দুই কলিতে পরপর তৃতীয় ও দ্বিতীয় বা চতুর্থ কলির সুরের হুবহু পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এ গানটির উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, এই গানের প্রথম চারিটি কলিকে আলাদা করে সুরের দিক থেকে বিচার করলে দেখতে পাব ধ্রুপদের মতোই আছে বাউলের সুরের চারিটি ভাগ। ধ্রুপদে যে নিয়মে আস্থায়ী অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগে সুর বসানো হয়, এ গানের এই চার কলিতে ঠিক তাই ঘটেছে।

৫। 'এবার তোর মরা গাঙে' মোট ১৩ লাইনের গান। আস্থায়ী দুই লাইনের, অন্তরাতে চার লাইন, সঞ্চারীতে তিন লাইন ও আভোগে চার লাইন পাচ্ছি। গানটি পূর্ববাংলার সারিগানের অনুকরণে রচিত, অথচ এতেও ধ্রুপদের মতো সুরের চারিটি ভাগ পাচ্ছি। যেমন আস্থায়ী, অন্তরা ও সঞ্চারীর সুরগুলি আলাদা বসেছে. আভোগের সুর অন্তরার মতো। এ ছাড়া ধ্রুপদেরই মতো সঞ্চারী থেকে সোজা আভোগ গাইতে হয় আস্থায়ী না গেয়ে। এটিও এদিক থেকে একটি উল্লেখযোগ্য গান।

উল্লিখিত তালিকা থেকে এটা বেশ বোঝা যায় যে দুই ও চার কলিতে গানের বিভাগ ও তার সঙ্গে মিলিয়ে সুর যোজনা করার পথে গুরুদেব পূর্বপ্রচলিত উচ্চাঙ্গের হিন্দী ও দেশী পদ্ধতিকে নানাভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। এবারে এদিক থেকে উল্লেখযোগ্য আরো কয়েকটি গানের উল্লেখ এখানে করছি।

'আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে' মোট ২৯ লাইনের গান। কিন্তু কলি মাত্র দুটি। চার লাইনের আস্থায়ী, আর বাকি ২১ লাইন হল অন্তরা। একে অন্তরা বলছি এই কারণে যে, এর প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন, একটানা গেয়ে যেতে হয়। মাঝের আর কোনো লাইন থেকে আস্থায়ীতে ফেরবার উপায় নেই। এবং এই ২১ লাইনের অন্তরাতেও সুরের পুনরাবৃত্তি নেই। মিশ্র বেহাগ হল এই গানের সুর।

'এ শুধু অলস মায়া' মোট ১৬ লাইনের গান, এবং সবটাই হল আস্থায়ী। একে কোথাও দুইভাগে গাইবার উপায় নেই। আরম্ভের লাইন থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা গেয়ে শেষ করতে হবে। একই রাগিণী নানারূপে বিস্তারিত হয়ে গানের কথাকে ঘিরে আছে। এতে আস্থায়ী অন্তরার মতো সুরের ভাগ নেই, বা পুনরাবৃত্তি নেই। রাগিণী হল মিশ্র ইমন।

'এই তো ভালো লেগেছিল' গানটি মোট ২৪ লাইনে বসানো। এবং মোট ৫টি ভাগে বিভক্ত এই রকমের ২, ৪, ৬, ৬, ৬ লাইনে। গানটির সুর বাউল ও কীর্তনের সুরে মেশানো। পাঁচটি ভাগ থাকলেও এর সুর প্রত্যেকটিতে ভিন্নভাবে বসেছে। আর প্রত্যেক কলি শেষ করে পরের কলি গাইবার সময় কেবলমাত্র 'এই তো' শব্দটি গাইতে হয়। প্রথম লাইনের বা কলির সবটা গাওয়া হয় না।

'এসো এসো বসন্ত ধরাতলে' গানটির পুরো লাইন-সংখ্যা হল ২৩। ৮, ৪, ৩, ৩, ৫; এইরকম লাইনের ভাগে. পাঁচ অংশে বিভক্ত। মিশ্র বসন্ত গানটির সুর। সমস্ত গানটিতে ঐ মিশ্র সুর বিচিত্ররূপে আপনাকে প্রকাশ করেছে। কোথাও কোনো কলিতে সুরের পুনরাবৃত্তি করা হয় নি। কলি শেষে আস্থায়ীতেও ফিরে আসা যায় না। কেবল প্রত্যেক কলি শেষে 'এসো এসো' কথাটি একবার গাইতে হয়।

'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' হল মোট ৪০ লাইনের গান। পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

প্রত্যেক ভাগে আছে আট লাইন। এই আট লাইনের শেষ দুই লাইন, অর্থাৎ 'কালো? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ', প্রত্যেক কলির শেষে ব্যবহার করা হয়েছে একই সুরে। কলির এই শেষ দু-লাইনই আস্থায়ীর কাজ করছে এই গানটিতে। গানটির পাঁচটি কলির মধ্যে প্রথম কলি ও শেষ কলির সুর এক। বাকি তিন কলির প্রত্যেকটির সুর আলাদা। এবং এই গানে উচ্চাঙ্গ হিন্দী গানের রাগিণী ও দেশী সুরকে মেশানো হয়েছে। শুনে একটুও বেখাপ মনে হবে না। এ গানটির গাইবার ঢঙ বাংলাদেশের কথকতার মতো। তবলা বা পাখোয়াজের তালে এ গান বাঁধা নয়। আবৃত্তির ছন্দে গাইতে হয়। এটি ছাড়া উপরের গানগুলির সবকটিই কোনো-না-কোনো তালের ছন্দে বাঁধা।

গুরুদেবের গানের প্রকৃত রস আস্বাদনের জন্য চাই একাধারে সংগীত ও কাব্য-রসের সমান অনুভূতিশীল মন। যে শ্রোতা বা গায়ক গুরুদেবের গানের রাগিণী ও ছন্দের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন, কথাকে স্থান দেন তার নীচে, তাঁরা এ সংগীতের প্রকৃত রসিক নন। আবার যাঁরা তাঁর গানের কাব্যরসের উপর জোর দিয়ে গানের সুর ও ছন্দকে দেখেন গৌণভাবে তাঁরাও এ গানের পূর্ণ রস গ্রহণে অক্ষম। দুই রসের সমান অধিকারী রবীন্দ্রসংগীতরসিকের সংখ্যা বাংলাদেশে অতি সামান্য। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রসংগীতরসিক গায়ক ও শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশই গানের সুর ও ছন্দের মাধুর্যের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কাব্যরসিকেরা এই গানকে উপভোগ করেন লিরিক কবিতার আদর্শে। কিন্তু পরিপূর্ণ গান হিসেবে উপভোগ করতে হলে গানের রাগিণী ও ছন্দের ব্যাপক পরিচয়েরও যে প্রয়োজন আছে তা তাঁরা মনে করেন না। রবীন্দ্রসংগীতরসিকদের পক্ষে উচিত সব রকম সংগীতের সুর বা রাগিণীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যরস আস্বাদনের চর্চা করা। উচ্চাঙ্গ সংগীতের মতো কেবল রাগ-রাগিণীর অলংকৃত প্রকাশ এ গান চায় নি, এ গান চেয়েছে 'দেশী' সংগীতের আদর্শে কাব্য ও সুরকে সমান স্থান দিয়ে জনসাধারণের সংগীত-রস-পিপাসা মেটাতে।

কাব্যগীতি

আমাদের দেশে বড়ো কবিতায় সুর দিয়ে গান গাইবার রীতি বহুদিন থেকে প্রচলিত। য়ুরোপীয় সাহিত্য এ দেশে প্রভাব বিস্তার করার আগে পর্যন্ত প্রত্যেক প্রদেশেই কবিতামাত্রই সুরে গীত হত। এখনো আধুনিক হিন্দী ও উর্দু কবিদের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত।

দক্ষিণভারতে বিভিন্ন ভাষার কবিতা গানের সুরে পাঠ করতে শুনেছি। জয়দেবের গীতগোবিন্দের মতো কাব্য আজও গেয়ে শোনানো হয়। দক্ষিণভারতের নৃত্যনাট্য-গুলির নির্ভর হল নানা রাগিণী ও তালে বাঁধা গীতকাব্যগুলি। লোকসাহিত্যের গাথা আজও গ্রামে গ্রামে সুরে গেয়ে লোকের চিত্ত বিনোদন করা হয়ে থাকে। গুরুদেবও বড়ো কবিতায় সুর দিয়ে বহু গান রচনা করেছেন—যে-গানগুলি কোনো কবির গানের অনুকরণ নয়, যা সম্পূর্ণ রাবীন্দ্রিক।

এ বিষয়ে গুরুদেবের গানের সঙ্গে পূর্বকৃত কবিদের রচনার অমিল কোথায় তা ভাববার বিষয়।

হিন্দী ধ্রুপদ খেয়াল ও ঠুংরিতে বড়ো গান রচনার চলন নেই। পূর্বে ধ্রুপদ যদিও আকারে বড়ো ছিল, আজকাল চারটি তুকের গানই প্রসিদ্ধ। হিন্দী বা উর্দু কবিতায় যে সুর ব্যবহৃত হয়, তাতে বৈচিত্র্য থাকে না, থাকে কেবল একটি সহজ সুরের পুনরাবৃত্তি; বাংলার বড়ো বড়ো পল্লীগীতিরও এই ধারা। বাংলাদেশে বহু যুগ থেকেই উচ্চশ্রেণীর সংগীতানুরাগী গানরচয়িতাদের মধ্যে দেখি হিন্দী গানের প্রভাব। তাঁদের গান সেইজন্যেই হিন্দী মার্গ-সংগীতের মতো আকারে ছোটো হতে বাধ্য হয়েছে। তাই বাংলা ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পা ও ঠুংরি জাতীয় যাবতীয় গান ঐ-সব হিন্দী গানের অনুকরণেই আকার গ্রহণ করেছে। বাংলার প্রাচীন সংগীত কীর্তনে বড়ো গান আছে; অনেক সময় সুরযোজনার বৈচিত্র্য তাতে দেখা যায়। ছোটো গানে আখর বসিয়েও কীর্তনীয়াদের মধ্যে গানটিকে বড়ো করে খাড়া করবার প্রথা আছে; তাতে সুরে ও ঢঙে পুনরাবৃত্তির প্রকাশ বেশি। কোনো কোনো কীর্তনগানে প্রথম কলির সুর অন্য সব কলির সমান। হিন্দী গানে 'রাগমালা' নামে একরকম বড়ো গান আছে, কিন্তু তার প্রধান দোষ হল, কথার সঙ্গে রাগিণীর মিলনের কোনোই চেষ্টা তাতে নেই; বিভিন্ন রাগ-রাগিণীকে শব্দের দ্বারা বাঁধবার জন্যেই যেন গান গুলি রচিত। স্বাদেশিকতাবোধ আমাদের দেশে জাগ্রত হবার সঙ্গে সঙ্গে বড়ো বড়ো গান অনেকেই রচনা করেছেন, এই-সব গানের বেশির ভাগ সুরই হিন্দী রাগ-রাগিণী থেকে গৃহীত, কিন্তু তাতে প্রায়ই একই সুরের পুনরাবৃত্তি দেখা যায়।

ছোটো লিরিক-কবিতায় সুর যেভাবে রূপ গ্রহণ করে, বড়ো লিরিক-কবিতায় তা হওয়া উচিত নয়। গুরুদেবের পূর্বেও বাংলাদেশে বড়ো বড়ো লিরিক-কবিতায় একই সুরের পুনরাবৃত্তি আমরা লক্ষ করেছি বেশি। ছোটো গানের অল্প পরিসরের মধ্যে একই রাগিণীর রূপ রক্ষা করে সুরযোজনায় বৈচিত্র্য সঞ্চার করা যে সহজ, সে কথা বুঝিয়ে লেখার প্রয়োজন করে না। কিন্তু বড়ো লিরিক-কবিতায় একই রাগিণী বা বহু রাগিণীর সামঞ্জস্যময় মিশ্রণে সুরবৈচিত্র্য আনা খুবই কঠিন।

আমার মনে হয়, বড়ো লিরিক-কবিতায় হিন্দী রাগ-রাগিণীর সাহায্যে সব কলিতে একই সুরের পুনরাবৃত্তি দ্বারা গান রচনা না করে গুরুদেব এ দেশে একটি নূতন চেষ্টার সূচনা করেন। অথচ গানের ভাবের সঙ্গে সুরের ঐক্যও তাতে ঘটেছে আমার অনুমান, বাংলাদেশ কেন, ভারতের অন্যত্রও এই পদ্ধতিতে আর-কোনো রচয়িতা এত গান রচনা করে যান নি।

এ ধরনের গানের কবিতা কোনো-একটি বিশেষ হৃদয়াবেগকে যেমন নানাভাবে খেলাতে খেলাতে এগিয়ে নিয়ে গেছে, সেই রসের অনুগামী রাগিণীটিও ভাবের সঙ্গে মিল রেখে নানারূপে আপনাকে বিস্তার করতে করতে কবিতার সঙ্গে চলেছে। সেইজন্যে একই সুরের পুনরাবৃত্তি দেখি না। তা ছাড়া কবিতাপাঠের সময় আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা যেমন পড়ে যেতে হয়, এই-সব গানের গায়কীরীতিও বহুক্ষেত্রে সেই নিয়ম রক্ষা করতে চেয়েছে।

এইরূপ রচনাপদ্ধতির মধ্যে বিলেতি সুরযোজনার আদর্শ যে কাজ করেছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। সুরযোজনায় ভাগ্‌নার ও স্পেন্সর যে-মতবাদের প্রচার করেছিলেন, এই ধরনের গানগুলিতে তার প্রভাব লক্ষ করি। এই গানরচনার উৎসাহ তাঁর হয়েছিল যখন তিনি ভাগ্‌নার ও স্পেন্সরের মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে সেই আদর্শে প্রথম 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া'-র সুরযোজনায় প্রবৃত্ত হন।

সেই সময়ে তিনি মনে করেছিলেন যে, কবিতা যেমন 'ভাব হইতে ভাবান্তরে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গমন করিতে' পারে, রাগ-রাগিণীকেও সেই পথে পরিচালিত করে গানকে চলনশীল করা সম্ভব। তাই সেই বয়সেই সাহসের সঙ্গে লিখেছিলেন, 'গতিশীল ভাব যে সংগীতের পক্ষে একেবারে অননুসরণীয় তাহা নহে।' এই মনোভাবের যুগেই প্রথম চলনশীল ভাবের গান রচনা করলেন 'আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে'। গানটি খাম্বাজ পরজ কালাংড়া রাগিণীর মিশ্রণে রচিত। এ গানের সুর ভাবের সঙ্গে মিল রেখে নানারূপে আপনাকে বিস্তার করতে করতে কবিতার পঙ্‌ক্তির সঙ্গে সঙ্গে চলেছে; একই সুরের পুনরাবৃত্তির চেষ্টা এতে দেখি না। কবিতাপাঠের সময় আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা যেমন পড়ে যেতে হয়, এই গানের গায়কীরীতিটিও তাই। যদিও উপরোক্ত গানটিতে সুরযোজনায় নৈপুণ্য আছে, তবুও একে রাবীন্দ্রিক মিশ্রণ বলতে বাধে। এ গানটিতে সুরকে কথার সঙ্গে ভালোভাবে মেশানো হলেও পরিবর্তিত রাগিণী বেশ স্পষ্টভাবে আপনাকে বুঝিয়ে দেয় যে, গানের এই অংশে সে স্থান নিল। এ মিশ্রণে পরীক্ষামূলক মনোভাবের পরিচয় পাই। তা সত্ত্বেও এটি সুরযোজনার দিক থেকে তাঁর প্রথম জীবনের একটি বিশেষ রচনা।

মোটামুটি হিসাব করে দেখা গেছে, ১২৯১ সালের ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী থেকে শুরু ক'রে ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, কল্পনা, ক্ষণিকা, খেয়া, গীতাঞ্জলি, উৎসর্গ, বলাকা, পূরবী, মহুয়া ও ঋতুরঙ্গ পর্যন্ত তিনি বহু গ্রন্থের কবিতায় উপরোক্ত প্রথায় সুরযোজনা করেছেন। সব চেয়ে বেশি গান রচনা করেছেন ক্ষণিকা ও মহুয়া থেকে।

ভানুসিংহের পদাবলীতে আমরা পাই সাতটি গান, যা এখন পর্যন্ত গাওয়া

হয়। যেমন 'গহনকুসুমকুঞ্জ-মাঝে', 'মরণ রে, তুঁহু মম শ্যামসমান', 'সজনি সজনি রাধিকা লো', 'শুন লো শুন লো বালিকা', 'আজু সখি মুহু মুহু', 'শাওনগগনে ঘোর ঘনঘটা' ও 'বজাও রে মোহন বাঁশি'। এ গানগুলির সুরে একটি সহজ মাধুর্য আছে, এবং তা কথার সঙ্গেও মানিয়েছে, কিন্তু অল্পবয়সের রচনা বলে শিল্পীর সহজাত নৈপুণ্য সুরযোজনার দিক থেকে তেমন প্রকাশ পায় নি। আমার মনে হয় রচনার সঙ্গেসঙ্গেই কবিতাগুলিতে সুর বসানো হয় নি, সুর বসেছে অনেক পরে।

এ গানগুলিতে পাশ্চাত্য সুরযোজনাপদ্ধতির কোনো প্রভাব আছে বলে মনে হয় না। সব-ক'টি গানই কোনো-না-কোনো দেশী প্রচলিত রাগিণীতে ও ঢঙে গঠিত। এবং এক-একটি গানের অন্যান্য সব-ক'টি তুকে প্রায় একই সুরের পুনরাবৃত্তি। সুরের দিক থেকে কোনোরূপ কল্পনার কোনো চেষ্টা এগুলিতে দেখা যায় না।

'কড়ি ও কোমলে' পাচ্ছি 'এ শুধু অলস মায়া' গানটি। এটিকে ১৩২৬ সালেই প্রথম গানের দলে স্থান গ্রহণ করতে দেখি, তাই অনুমান করি ঐ সালের কিছু পূর্বে এটি গানে পরিণত হয়েছিল।

গানটি সুরের দিক থেকে একটি সুন্দর রচনা। ইমন-ভূপালী রাগিণীতে রচিত, সন্ধ্যার কথা আছে বলেই হয়তো এই রাগিণীটিকে গুরুদেব গ্রহণ করেছেন, কারণ সন্ধ্যায় এই রাগিণী আমাদের দেশে চলিত।

এ গানটি গাইবার সময়ও প্রথম লাইনে বারে বারে ফিরে আসি না, শেষ পর্যন্ত একেবারে গেয়ে যেতে হয়। গানটির গতিশীল ভাবের সঙ্গে সুরগুলি মিশেছে ভালো, সেইজন্য এক রাগিণীতে থেকেও সমগ্রভাবে গানটিতে বিশেষ-একটি সুর-বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে, পুনরাবৃত্তির প্রশ্ন মনে জাগে না।

'মানসী'র 'কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া' গানটি কবিতারূপেই প্রথমে গণ্য হত, ১৩২৬ সালে গানের দলে এটি প্রথম স্থান পেল। গানটির সুর রামকেলী পরজ বসন্তে মেশানো। অনাবশ্যক একই রকমের সুরের পুনরাবৃত্তি এতে নেই। এটিও একটানা গাইবার গান। তবে এই গানে দু-তিনটি রাগিণীর সমাবেশ হলেও পরস্পরের সঙ্গে একটা আত্মিক যোগ কোথাও আছে বলে গানের সঙ্গে কথার পার্থক্য তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। বড়ো গান হলেও কথার ও ভাবের সঙ্গে সঙ্গে রাগিণীগুলি সেইভাবেই বসেছে। এটিও একটি সার্থক রচনা।

১৩১৬ সালে রচিত 'ওগো শেফালিবনের মনের কামনা' গানটিও সেদিক থেকে একটি ভালো গান, মিশ্র টোড়ী বা টোড়ী ভৈরবীতে সুর চারটি স্তবকে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে। গানটি বেশ বড়ো, সুরযোজনায় পুনরাবৃত্তি নেই। কিন্তু দু-একবার প্রথম পঙ্‌ক্তিটিকে ফিরে গাইতে হয়।

১৩২২ সালে রচিত 'এই তো ভালো লেগেছিল' গানটির বাউলের সুরেও বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে। এটি খুবই বড়ো কবিতা, তাই ঐ সুর গোড়া থেকে নানারূপে কবিতাটির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত গিয়ে থেমেছে। বাউলের সুরে রচিত এটি একটি উল্লেখযোগ্য গান। কারণ, সাধারণত ঐ সুরের গানে পুনরাবৃত্তি থাকে বেশি। ১৩২২ সালের পূর্ব থেকেই আমরা গুরুদেবের বড়ো গানগুলিতে সুরযোজনার পদ্ধতির পরিবর্তন লক্ষ করি ও বেশ বুঝতে পারি যে, তাঁর সুরযোজনার শক্তি

অনেকখানি পরিণতি লাভ করেছে এবং গানরচনার একটা বিশেষ ধারা দেখা দিয়েছে।

'চিত্রা'র বিখ্যাত কবিতা 'উর্বশী'র প্রথম কয়েকটি স্তবককে গুরুদেব সুরে গাঁথলেন ১৩৪৭ সালে পৌষ মাসে 'শাপমোচন' অভিনয়কালে। এর রাগিণী হল মিশ্র কানাড়া। গানটি খুব গম্ভীর প্রকৃতির এবং এর সুরযোজনার ভিতরে স্বকীয় বৈচিত্র্য ফুটেছে। এটি যদিও খুব বড়ো গান নয় তবুও সুরযোজনায় আস্থায়ী-অন্তরার নিয়ম এতে নেই। সুর বা রাগিণী গানের ভাবের সঙ্গে মিশে একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করেছে। 'কল্পনা'র 'ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ ১৩২৩ সালে 'শেষবর্ষণ' গীতাভিনয়ের সময় সুর দেন। এর রাগিণী মিশ্র কানাড়া, ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে মাঝে মাঝে কয়েকটি স্তবকে তালের পরিবর্তন করা হয়েছে। কবিতার ভাবের দিক বিচার করে গানটি সুর ছন্দ ও ভাবের সামঞ্জস্যের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু প্রথম লাইনে ফিরে আসা বিষয়ে অন্য গানের মতো বাঁধাবাঁধি এতে নেই।

এর পরে 'ক্ষণিকা'র গান পাচ্ছি গোটা ছয়, যেমন, 'যাবই আমি যাবই ওগো, বাণিজ্যেতে যাবই' 'নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে' 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে' 'হে নিরুপমা' 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' 'ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে' এবং 'গীতাঞ্জলি'র 'আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে'। এ কয়টি গানে সুর দেওয়া হয়েছিল ১৩৩৮ সালের পর থেকে ১৩৪৪ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে। বেশ কয়েক বছর পূর্বে ঠিক তারিখ মনে পড়ে না, কোনো-এক সময়ে গুরুদেব তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বিদায়-অভিশাপে' ঠিক এই আদর্শে সুরযোজনা করবার চেষ্টা করছিলেন, কিছুদূর অগ্রসরও হয়েছিলেন। দিনেন্দ্রনাথকে শুনিয়েছিলেন, আমিও সেই সময় উপস্থিত ছিলাম। তাঁর ইচ্ছা ছিল, সেইভাবেই গান গেয়ে এই কবিতাটিকে অভিনয় করাবেন। এই কবিতায় সুরযোজনার সময় কবিতার ছন্দকে বজায় রাখবার চেষ্টা করেছিলেন, অন্য গানের মতো বাঁধা ছন্দে তাকে বাঁধতে চেষ্টা করেন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ইচ্ছা তিনি ত্যাগ করেন; কারণ, এ কাজে যতখানি অবসরের প্রয়োজন তা তখন তাঁর ছিল না। তার কিছুকাল পরে অপেক্ষাকৃত ছোটো কবিতা নিয়ে আর-একবার সুরে আবৃত্তি করাবার চেষ্টা করেন। ১৯৩১ সালে বর্ষামঙ্গল উপলক্ষে 'ক্ষণিকা'র "কৃষ্ণকলি" কবিতাটিতে সুর দিলেন কীর্তন ও নানা রাগিণী মিশিয়ে—বর্তমান লেখককে দিয়েই সেই পরীক্ষা চালালেন। গানের বাঁধা ছন্দকে ভেঙে আবৃত্তির ধরনটিকে বজায় রেখে আমাকে সর্বসমক্ষে প্রথম গাইতে হল। সেখানে প্রশ্নসূচক 'কালো?' কথাটি তিনি অবিকল কথার সুরে রাখলেন, একটুও বদলালেন না। আবৃত্তির এরকম নতুন রূপ সকলের কাছেই ভালো লেগেছিল। গানটি শোনার পর অনেকের মনে আমাদের দেশের প্রাচীন কথকতাপদ্ধতির কথা জাগতে পারে। ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এক-এক কলিতে এক-একটি রাগিণী ব্যবহার কিরকম সার্থক হয়েছে গানটি শুনলেই তা বোঝা যায়—এবং বলতে হয় না যে, পাশ্চাত্য আদর্শে কথার ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে সুরযোজনার চেষ্টা হয়েছে; 'কালো' শব্দটির নানা ধরনে উচ্চারণে তা ধরা পড়ে। 'ধানের ক্ষেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ' পঙ্‌ক্তিতে সুরের দোলায় ঢেউয়ের দোলার ইঙ্গিত লক্ষণীয়। একটু লক্ষ্য করলে ঐ গানে ঐ-

রকম আরো পরিচয় খুঁজে পাওয়া যাবে। কৃষ্ণকলি গানটিতে রাগিণী মিশেছে গানের প্রত্যেক স্তবকে আলাদা ভাবে। কেবল ধুয়াতে এক সুর ঘুরে আসছে। রাগিণীকটিকে খেলানো হয়েছে স্তবকের ভাবের সঙ্গে মিলিয়ে। ধুয়াতে তা হয় নি। এ গানটি একবারে গেয়ে যেতে হয়। এই সময়ে 'যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ' কবিতাটিতে এই প্রথায় সুরযোজনা করবার ইচ্ছা তাঁর ছিল, দু-এক লাইন সুরে রচনা করে শুনিয়েও-ছিলেন, কিন্তু সেটি আর শেষ করে উঠতে পারেন নি।

'যাবই আমি যাবই' রচিত হয় ১৩৪০ সালে 'তাসের দেশ' রচনাকালে, সমস্ত কবিতাটি খাম্বাজ-রাগিণীতে বাঁধা। 'হে নিরুপমা' কবিতাও গানে পরিণত হয় এই সময়ে। গুরুদেব এর চারিটি কলিতেই চারিটি রাগিণী ব্যবহার করেছেন; প্রথমটিতে মিশ্র বসন্ত, দ্বিতীয়টিতে রামকেলী মিশ্র, তৃতীয়টিতে সিন্ধু, চতুর্থটিতে দেশ, প্রত্যেক কলিতে ছন্দ ভিন্ন। চার-মাত্রা তিন-মাত্রা ও সাত-মাত্রার তেওরা তালের ছন্দ এতে আছে, এখানে এই বিভিন্ন ছন্দ ও সুর ব্যবহারের একমাত্র কারণ আমার মনে হয়, প্রত্যেক কলিতে কবির মনের যে আবেদন ভিন্নভাবে প্রকাশিত হচ্ছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা; সেইজন্যেই ছন্দে ও সুরে চারিটি কলিতে চারিটি ভিন্ন সুর বসেছে। 'নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে' ও 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে'তে সুর দেওয়া হয় ১৩৪২ সালে। দুইটি মিশ্র ইমনকল্যাণ রাগিণীর গান। দুটিকে পাশা-পাশি রেখে গাইলে ইমনের দুটি ভিন্ন রূপ প্রকাশ পায়—একটি ধীর গম্ভীর, অপরটি চঞ্চল প্রাণবান। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, কবিতার ভাবই গানে ও সুরে এইরূপ পার্থক্যের কারণ; উভয়ে একই মাত্রা ও ছন্দের গান, কিন্তু তাদের গতি ও সুরের গঠনে বিশেষ পার্থক্য আছে। হিন্দী 'রাগমালা' গানে তালফেরতা করতে দেখি না, 'হে নিরুপমা' গানে তালফেরতা আছে, প্রত্যেক কলিতে ছন্দের বদল হয়েছে রাগিণী বদলের সঙ্গে সঙ্গে, এইখানেই হিন্দী 'রাগমালা'র সঙ্গে গুরুদেবের রাগ-মালা-জাতীয় গানের প্রধান তফাত।

'ভোর থেকে আজ বাদল ছুটেছে' কবিতাতে সুর দেন ১৩৪৩ সালে। এটি ভৈরবী রাগিণীর গান, সুর নানাভাবে বিচরণ করেছে। 'আজি বরষার রূপ হেরি' গানটিতে সুরযোজনার বৈচিত্র্য আছে, এর পিছনে যে ইতিহাসটুকু আছে তা জানা দরকার।

১৩৪২ সালের পয়লা বৈশাখের উৎসবের জন্যে বেদের বিখ্যাত 'উষোবাজেন বাজিণী' স্তবে গুরুদেব ঠিক করলেন সুর বসাবেন। বৈদিক মন্ত্রের শব্দের উদাত্ত ও অনুদাত্ত স্বরের চিহ্নস্বরূপ শব্দের মাথায় ও নীচে দাঁড়ি ও কষি দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, সেই নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভৈরবী রাগিণীতে সুরযোজনার উৎসাহ তাঁর আসে। এটিকে বাঁধা মাত্রার ছন্দে রচনা করেন নি, মন্ত্র-আবৃত্তির ছন্দে এটি রচিত, সুরকে উদাত্ত ও অনুদাত্ত স্বরের সঙ্গে মিলিয়ে ওঠানামা করিয়েছেন, ভৈরবীর ঠাট ঠিক রেখে সুরে এরকম ওঠানামার ভিতরেও সেই মন্ত্রটির গাম্ভীর্য অব্যাহত আছে, মন্ত্রটির সুর শুনে মনে হবে বিদেশী ঢঙের অনুসরণে এটি রচিত। সেই বৎসর বর্ষার সময় গুরুদেব যখন গানরচনায় মগ্ন, তখন একদিন তাঁর কাছে এই ইচ্ছা প্রকাশ করি যে, সেই মন্ত্রটির ঢঙে বাংলা গান রচনা করা যায় কি না।

তারই পরীক্ষাস্বরূপ 'আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে' মিশ্র ইমন রাগে সেই মন্ত্রটির ধরনে তিনি সুরযোজনা করলেন। রচনার আগে কবিতাটির বহু শব্দের উপরে ও নীচে দাঁড়ি ও কষি টেনে দিয়েছিলেন, কিন্তু কী নিয়মে করেছিলেন তা বলতে পারি না। শেষ পর্যন্ত বৈদিক মন্ত্রটির ঢঙ অবিকল এ গানটিতে ব্যবহার করতে পারেন নি, এটিতে বাঁধা ছন্দ রাখতে হল যা মন্ত্রে করেন নি, তা ছাড়া সুরকে অনেকখানি সংযত করতে হয়েছিল। কারণ এ ধরনের বাংলা কবিতায় বাঁধা সুরকে দ্রুত ওঠানামা করালে ভালো শুনতে হয় না; কিন্তু বাঁধা ছন্দের ভিতরে থেকেও সুরের ওঠানামার পরিচয়ে এ গানটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'খেয়া'র 'আমার গোধূলিলগন এল বুঝি কাছে' কবিতার গীত-রূপ ইমনপুরবী সুরে ১৩২৬ সালের কিছু আগে রচিত। অন্যত্র বলেছি, প্রকৃতির সঙ্গে রাগ-রাগিণীর যোগাযোগের যে নিয়ম এতকাল আমাদের দেশে চলে এসেছে সেটাকে অযথা ভঙ্গ করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না, গোধূলি-বেলার সঙ্গে দিনাবসানের যে শান্ত ভাবটি প্রকাশ পায়, তিনি মনে করতেন, পুরবী-রাগিণী তার বিশেষ পরিপোষক, তাই এতে সেই রাগিণী বসিয়েছেন; খুবই বড়ো এই কবিতাটি, কথার সঙ্গে নানা ভঙ্গিতে সুরটি প্রবাহিত হয়েছে।

'গীতাঞ্জলি' গানের বই বলে পরিচিত হলেও, এর অনেকগুলি কবিতা বস্তুত গান নয়। সেই কবিতার দলে ছিল, 'হে মোর চিত্ত পুণ্যতীর্থে' ও 'যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন' গান-দুটি। ১৩৩৩ সালে ৭ই পৌষের উৎসবে এ-দুটিকে তাঁর গাওয়াবার ইচ্ছা হল, তাই এ-দুটিতে সুরযোজনা করলেন। 'হে মোর চিত্ত' গানটি হল প্রভাতী-রাগিণীতে, ও 'যেথায় থাকে' গানে আছে ভৈরবী সুর।

'বলাকা'র 'তুমি কি কেবলি ছবি' ও 'পূরবী'র 'আনমনা আনমনা' কবিতাতে সুরযোজনা করেছিলেন ১৩৩৮ সালে, কলকাতায় প্রথমবার 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্য অভিনয়কালে। নাটকের রাজপুত্রের ছবি দেখার অভিনয়ের জন্য এ কবিতাটির যতটা অংশ প্রয়োজন সেইটুকু অংশেই সুর বসালেন। 'পূরবী'র কবিতাটির সাহায্যে রাজকুমার তার মনোবাসনা প্রকাশ করেছিল রাজকুমারীর কাছে। 'ছবি' কবিতাটির সুর হল মিশ্র কানাড়া, 'পূরবী'র কবিতাটিতে বসল কীর্তনের সুর। 'শিশু'র (১৩১০) 'তোমার কটিতটের ধটি কে দিল রাঙিয়া' কবিতাতে ১৩৩৮ সালে একটি শিশুর নাচের জন্য সুর দেন। গানের সঙ্গে নাচটি সেই বৎসরেই বর্ষার সময় কলকাতার 'বর্ষামঙ্গল' ও 'শিশুতীর্থ' উৎসবে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়।

১৩৪০ সালে ফাল্গুন মাসে বড়ো কবিতায় সুর দেবার বিশেষ ঝোঁক তাঁর মনে দেখা দিয়েছিল। এই মাসের শেষ সপ্তাহে একটানা 'মহুয়া'র সাতটি কবিতায় সুর-যোজনা করেন; কীর্তনের সুরে 'আজি এ নিরালা কুঞ্জে' মিশ্র পরজ, বসন্ত-ভৈরবী সুরে 'অজানা খনির নূতন মণির গেঁথেছি হার'। এই গানটিতে সব রাগিণীগুলির একটা অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখিয়েছেন। খাম্বাজে জোরালো ঢঙের গান রচনা করেছেন, 'আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না', ভৈরবীতে 'প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায়' মিশ্র দেশ-এ 'আরো কিছুখন নাহয় বসিয়ো কাছে', মিশ্র সারঙ্গে 'বাহির পথে বিবাগী হিয়া কিসের খোঁজে গেলি', পিলু-রাগিণীতে 'আমার নয়ন তব নয়নের নিবিড়

ছায়ায়'। বড়ো কবিতায় সুরযোজনার দিক থেকে এ-গানগুলি তাঁর রচনার খুবই ভালো নিদর্শন।

'মহুয়া'র 'আমার নয়ন তব নয়নের' গানটির সঙ্গে 'পরিত্রাণ' নাটকের 'আমার নয়ন তোমার নয়নতলে মনের কথা খোঁজে' গানটির ভাবগত ঐক্য আছে। 'পরিত্রাণে'র গানটি আকারে অনেক ছোটো এবং তার রাগিণী হল ছায়ানট। তেমনি ভাবগত ঐক্য দেখি 'মহুয়া'র 'অজানা খনির নূতন মণির গেঁথেছি হার' গানটির সঙ্গে 'কাহার গলায় পরাবি গানের রতনহার' গানটির। 'মহুয়া'র কবিতাটি যে রাগিণীতে গঠিত, 'কাহার গলায় পরাবি'তে সে রাগিণী বসে নি, এখানে আছে ভৈরবী, 'অজানা খনির নূতন মণির' গানটিতেও সুরযোজনায় বিদেশী আদর্শের ছাপ লক্ষ করি। এদিকে 'কাহার গলায় পরাবি' গানটিতে প্রচলিত হিন্দীগানের আদর্শে সুর বসানো হয়েছে। এ-দুটি গান ও 'মহুয়া'র কবিতা-দুটি একই বৎসরের রচনা।

১৩৩৪ সালে 'ঋতুরঙ্গ' গীতনাট্যে 'ওগো কিশোর আজি তোমার দ্বারে পরাণ মম জাগে' কবিতাটি গুরুদেব আবৃত্তি করেন। তাঁর যাবতীয় গানের মধ্যে এটি পঙ্‌ক্তি হিসেবে সব চেয়ে বড়ো। ১৩৪৫ সালের চৈত্র মাসে তিনি এটিতে সুর দেন : ইমন পিলু খাম্বাজ ও কানাড়া রাগিণী এতে মিশেছে, তাল তেওরা। এত বড়ো গান গাইবার সময় একবারও মাঝখান থেকে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে ফেরা যায় না।

জীবনের শেষদিকে এই আদর্শে বড়ো গানে গুরুদেব বেশি সুরযোজনা করেছিলেন। এবং শেষজীবনে কিছু ছোটো গানও এই আদর্শে রচনা করেন। তবে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে পুনরাবৃত্তি না করা নিয়ে শেষদিকে কড়াকড়ি করেন নি। ধ্রুপদের নিয়মে সুরগঠন না করলেও প্রথম পঙ্‌ক্তি অনেক গানেই ফিরে গাইতে হয়েছে। শেষজীবনে বড়ো-ছোটো সব গানেই ঐ প্রথা চলিত ছিল। এখানে যে গানগুলি নিয়ে আলোচনা করলাম সে সব তা নয়, আরো অনেক গান আছে। সেগুলিকে এর পরে শুনে বুঝতে বেশি অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না, তাই আর নামের তালিকা দিয়ে এই পরিচ্ছেদের আয়তন বৃদ্ধি করলাম না।

প্রশ্ন হতে পারে, এই অধ্যায়ে আলোচিত গানগুলির সঙ্গে গুরুদেবের অন্য গানের পার্থক্য কোন্‌খানে। আগেই বলেছি যে, ভাষার সঙ্গে সুরের ও ছন্দের মিলন যেমন তাঁর অন্য গানে দেখা যায়, তেমনি এতেও আছে, কিন্তু আকারে ছোটো গানের রচনায় যে সুবিধা, বড়ো গানের বেলায় তা নেই। তাতে অধিকতর দক্ষতার প্রয়োজন হয়। গুরুদেবের পক্ষে বড়ো কবিতায় নানা রাগিণীতে সুরযোজনা করা আবৃত্তির মতো সহজ হয়ে গিয়েছিল, বিশেষত বৃদ্ধবয়সে। তাই 'শ্যামা' ও 'চণ্ডালিকা'র মতো গীতনাট্যে সুরযোজনা করা তাঁর কাছে একেবারেই কষ্টকর হয় নি।

কিন্তু এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত, কেউ যেন মনে না করেন যে, তিনি সুরকে কবিতার অনুচরের মতো ব্যবহার করেছেন। তিনি জানতেন কবিতা যেমন হৃদয়াবেগের ভাষা, রাগ-রাগিণী বা সুরও তেমনি হৃদয়াবেগের ভাষা। যদি কবিতা ও রাগিণীতে ভাবের মিল পাওয়া যায় তা হলে সেই রাগিণী সেই কবিতাতে ব্যবহার করা কিছু অন্যায় হয় না, বরঞ্চ কবিতার ভাব আরো নিবিড় ভাবে মনে ধরা পড়ে।

স্বদেশী গান

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আমলে প্রথম স্বদেশী গানের ভালোভাবে সূচনা হয় হিন্দুমেলার যুগে, ১৮৬৭ সাল থেকে। এই সময় আমরা নিজের শক্তির প্রতি, নিজের সংস্কৃতির প্রতি অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা পোষণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। এইরকম নির্জীব নৈরাশ্যের ভাবকে দূর করার প্রচেষ্টা থেকেই মনে হয় হিন্দুমেলা-আন্দোলনের উৎপত্তি। এই আন্দোলনের রূপ বাইরে থেকে আজকালকার তুলনায় অতি নগণ্য। কিন্তু সেদিন বাংলাদেশের অনেক মনীষীই এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত অথবা সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। গুরুদেবের পরিবারের সকলে ছিলেন এর সম্বন্ধে প্রধান উৎসাহী। এই হিন্দুমেলার উদ্যোগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সম্পাদনায় ১৮৭৬ সালে 'জাতীয়-সংগীত' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। সেই পুস্তকে দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গুণেন্দ্রনাথ গোবিন্দচন্দ্র রায় প্রভৃতির লেখা এবং ভারতমাতা সুরেন্দ্রবিনোদিনী সরোজিনী-নাটক নীলদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত প্রায় উনত্রিশটি জাতীয়-সংগীত আছে। এগুলি পাঠ করলে দেখতে পাওয়া যায় তখনকার শিক্ষিত ব্যক্তিরা ভাবতে শুরু করেছেন যে, তাঁরা যেভাবে দিন কাটাচ্ছেন এ ঠিক মানুষের মতো দিনযাপন নয়। তাই এই-সব গানে অন্যদেশের সঙ্গে স্বদেশের তুলনা ও নিজের দেশের প্রাচীন হিন্দুগৌরব-কাহিনী বর্ণনা করে ক্রমাগত দেশবাসীকে উদ্বোধিত করবার চেষ্টা।

এই যুগের কয়েকটি গান এখনো অনেকের সুপরিচিত যথা হেমচন্দ্রের 'বাজ্‌রে শিঙা বাজ্ এই রবে', গোবিন্দচন্দ্রের 'কতকাল পরে বল ভারত রে' ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সবে ভারতসন্তান'। এর মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানটি কিরকম উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশস্তি থেকে তা বুঝতে পারি। 'বঙ্গদর্শনে' তিনি বলেছেন, 'গানটি ভারতের সব জায়গায় ধ্বনিত হোক— বিংশতি কোটি ভারত-বাসীর হৃদয়-যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।' রাজনারায়ণ বসু বলেছিলেন, "সত্যেন্দ্রবাবু স্বদেশপ্রেমোত্তেজক কতগুলি গীত রচনা করিয়া এ [স্বদেশী গানের] অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূর করিয়াছেন।" এ গানেও বলা হয়েছে, ভারতের প্রাচীন হিন্দুগৌরবের কথা। হিন্দুমেলার স্বাদেশিকতার আবহাওয়া, তা ছাড়া জীবন-স্মৃতিতে উল্লিখিত সঞ্জীবনীসভার আবহাওয়ার মধ্যে গুরুদেবও সেই অল্পবয়সে কিছু কবিতা ও গান রচনা করেছিলেন, তা আমরা জানি। তখন থেকেই তাঁর গানে হিন্দুগৌরবের উল্লেখের চেয়ে নির্ভয় চিত্তের উন্মাদনা, সংঘবদ্ধতার শক্তিতে জীবন-পণের দৃঢ়তা, ছন্দের ঝোঁকে সুরে কথায় সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। সঞ্জীবনীসভা উপলক্ষে রচিত তাঁর গান 'একসূত্রে বাঁধা আছি' একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি এই সময়ের কাছাকাছি আরো কয়েকটি গান রচনা করেছিলেন, যেমন 'তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ' 'অয়ি বিষাদিনী বীণা' ও 'ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণু-রাশি।' যৌবনের প্রারম্ভে, অর্থাৎ ১২৯১ সালের মধ্যে, গুরুদেব আরো অনেকগুলি স্বদেশী-সংগীত রচনা করেছিলেন, কিন্তু তার প্রায় সবগুলিই অপটু রচনা মনে করে তিনি পরবর্তী জীবনে প্রকাশিত গানের বই থেকে সেগুলো বাদ দিয়েছেন।

এখানে গানগুলির নাম উল্লেখ করছি—'ঢাকো রে মুখচন্দ্রমা', 'একি অন্ধকার এ ভারতভূমি', 'মায়ের বিমল যশে', 'দেশে দেশে ভ্রমি তব যশোগান গাহিয়ে', 'ও গান আর গাস্ নে গাস্ নে', 'শোনো শোনো আমাদের ব্যথা'।

আমার মতে এই সব-কটি গানের মধ্যে 'একসূত্রে বাঁধা আছি' গানটিই তাঁর সব চেয়ে ভালো ও উল্লেখযোগ্য রচনা এবং যা চিরকালের মানুষের গান হিসেবে সম্মান পাবার যোগ্য—ভাবে ভাষায় ও সুরে। 'শোনো শোনো আমাদের ব্যথা' গানটি ১২৯১ সালের মাঘোৎসবের গান হিসেবে প্রথম রচিত। পরে এটি 'জাতীয়-সংগীত'এ স্থান পেয়েছে।

এর পরে ১২৯৯ সাল পর্যন্ত যে-ছয়টি স্বদেশী সংগীত তিনি রচনা করেন সে কটি হল—

'আগে চল্, আগে চল্ ভাই'
'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে'
'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'
'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না'
'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক'
'তবু পারি নে সঁপিতে প্রাণ'

এর মধ্যে 'আগে চল্' ও 'তবু পারি নে সঁপিতে প্রাণ' গান-দুটির রচনা ১২৯৩ সালে কলকাতার একটি ছাত্রসম্মিলন উপলক্ষে এবং তিনি নিজেই গান করেন। 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি ঐ বৎসরে কলকাতার দ্বিতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি নিজে গেয়ে শোনান। 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' গানটি মূলত রচনা ১২৯২ সালের ৯ মাঘ, তিনটি সমাজের ব্রাহ্মদের একত্র উপাসনা উপলক্ষে। তার আগের বৎসর থেকে কলকাতার তিনটি ব্রাহ্ম সমাজকে মেলাবার একটা চেষ্টা চলছিল—সেই মিলন উপলক্ষে ঐ উপাসনা-সভা বসে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। গুরুদেব ঐ গানটি এই উপলক্ষে রচনা করেন ও নিজে গেয়েছিলেন বলে শোনা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত 'বন্দেমাতরম্' গানটিকে নিয়ে এখানে একটু বলবার আছে। এটিকে স্বদেশী গান হিসেবে প্রথম সুপ্রচলিত করেন গুরুদেব। এইরূপ শোনা যায় যে, তিনি ১২৯২ সালে দেশ রাগিণীতে এটিতে সুর যোজনা করেছিলেন। বঙ্কিম-চন্দ্রের উপস্থিতিতে কোনো এক সভায় তাঁকে গেয়ে শুনিয়েছিলেন এবং ১৩০৩ সালের কংগ্রেসে নিজে সে গান গেয়েছিলেন। বর্তমানে ভারতীয় কংগ্রেসে 'বন্দে-মাতরম্' সংগীতের যে অংশটি গাওয়া হয়, গুরুদেব কেবলমাত্র সেই অংশটিতেই সুরযোজনা করেছিলেন। গুরুদেব-প্রদত্ত সুরটি ক্রমে দেশের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিল, সুরের আংশিক বদল সমেত। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং মল্লাররাগে ও কাওয়ালী তালে এই গানটিতে সুরযোজনা করেছিলেন এবং নিজে বন্ধুদের কাছে নাকি গেয়েও শোনাতেন। কিন্তু বঙ্কিম-প্রদত্ত সুরটি কোথাও শুনতে পাই নি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় নতুন কয়েক রকম সুর এতে যোজনা করা হয়েছিল, এবং গত কয়েক বৎসরে আরো কয়েকটি সুরযোজনা করা হয়েছে। গুরুদেবের প্রদত্ত সুরের সঙ্গে অন্য সুরের পার্থক্য হল, গুরুদেব 'দেশ' রাগিণীর সাহায্যে গানে ভক্তির আবেগকে জাগিয়ে

রেখেছেন। অন্যেরা বেশির ভাগ সুরযোজনার সময় সৈন্যদলের কুচকাওয়াজের কথাটাই ভেবেছেন বলে মনে হয়। ১৩১০ সাল পর্যন্ত 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী', 'কে এসে যায় ফিরে ফিরে', 'আজি এ ভারত লজ্জিত হে', 'জননীর দ্বারে আজি ওই', 'নব বৎসরে করিলাম পণ', 'হে ভারত আজি নবীন বর্ষে' এই ক'টি জাতীয়-সংগীত তিনি রচনা করেন।

গুরুদেবের জীবনে ১৩১২ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় স্বদেশী গানের যে-বন্যা এসেছিল, সে যুগটি স্বদেশী গান রচনার ইতিহাসের একটি প্রধান অধ্যায়। এ সময়ের গানের আন্তরিকতা ও উন্মাদনা খুব বড়ো হয়ে ফুটে উঠেছিল। স্বদেশী-যুগে লেখা গুরুদেবের গান সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর বলেছিলেন, "'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে' গানটি শুনিয়া, 'তরী ভাসাইব' কি, গঙ্গাগর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িতে অনেকের প্রবৃত্তি হইয়াছে।" সেদিন এই উন্মাদনাই ছিল বড়ো কথা, কারণ দেশের জন্য দুঃখকষ্ট বরণ করা, দরকার হলে মৃত্যুকেও নির্ভয়ে বরণ করার প্রবৃত্তি তখন যদি না জাগত তবে রাষ্ট্রীয় আত্মচেতনা ভারতব্যাপী বিস্তৃত হয়ে পড়তে আরো বিলম্ব হত। স্বদেশী যুগে আরো অনেক গান রচনা করে দেশবাসীর মনে উন্মাদনা জাগিয়েছেন, তাঁদের নির্ভয় আত্মনির্ভর করতে চেষ্টা করেছেন।

সুরের দিক থেকে গুরুদেবের স্বদেশী গানে দুটো ধারা লক্ষ করি, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর গানে তিনি হিন্দী রাগ-রাগিণীতেই সুরযোজনা করবার পক্ষপাতী ছিলেন বলে যথাসম্ভব রাগ-রাগিণী বজায় রেখেই সে-সব গান রচনা করেছেন। কেবল কীর্তনাঙ্গ সুরে 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' ও রাম-প্রসাদী প্রথায় 'মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গান-দুটিতে বাংলাদেশের নিজস্ব সুরের রূপ দেখা গেছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই প্রথম বাউল সারি ইত্যাদি বাংলার নিজস্ব সুরের প্রাধান্য প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁর সংগীতজীবনকে এই-সব গান কিভাবে প্রভাবান্বিত করে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তী গানের সুরের দিকে লক্ষ করলে দেখতে পাব, বাউল সুরে আর স্বদেশী গান বাঁধতে তিনি চেষ্টা করেন নি। তার কারণ, আমার মনে হয়, ভাষা। কারণ বাউল সুরের গানে সাধারণত তিনি যুক্তাক্ষরবহুল শব্দ বসাতেন না, বাউলদের মতনই সহজ কথার ভাষা সে সুরের অবলম্বন ছিল। প্রথম থেকে শুরু করে ১৩১০ সাল পর্যন্ত গুরুদেব মোট প্রায় ২৪টির কাছাকাছি জাতীয়-সংগীত রচনা করেছিলেন—তার মধ্যে বাউল সুরের গান একটিও ছিল না। কিন্তু ১৩১২ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাউল সুরে গান লিখলেন সব চেয়ে বেশি। সব সমেত বাইশটি গানের মধ্যে দশটিই ঐ সুরে রচিত।

এই বৎসরের জাতীয়-সংগীত রচনার পর গুরুদেবের জাতীয়-সংগীতের জীবনে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। এর পরে ঐ গান রচনার প্রতি তাঁর আর তেমন উৎসাহ দেখা যায় না। সংখ্যার দিক থেকে পরবর্তী জীবনের জাতীয়-সংগীত অনেক কম। তা ছাড়া মহাত্মাজী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনকে উপলক্ষ করে এযুগে একটিও গান তিনি লেখেন নি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর থেকে গুরুদেব যে ক'টি

জাতীয়-সংগীত রচনা করলেন তার মধ্যে 'জনগণমন' ও 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গান-দুটি ছাড়া আর সব গানের উপলক্ষ ছিল উপাসনা বা শান্তিনিকেতনের নানা-প্রকার অনুষ্ঠান। যার মধ্যে 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান', 'সর্ব খর্বতারে দহে', 'শুভ কর্মপথে ধরো' ইত্যাদি গানগুলির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। তা ছাড়া বেশির ভাগ গানই বাউলের মতো সহজ ভাষায় ও সুরে না লিখে সংস্কৃতবহুল, যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট গম্ভীর প্রকৃতির কথা ও গম্ভীর রাগিণীর দিকে ঝোঁক দিয়েছিলেন খুব। গুরুগম্ভীর রাগিণী ধ্বনিবহুল যুক্তাক্ষর শব্দেরই উপযুক্ত।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের গানগুলিতে যে সহজ আবেগ সুরে ও কথায় প্রকাশ পেয়েছে, পরবর্তী গানে তা ফোটে নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গান আমাদের মধ্যে মাতৃপূজার দিকটাই বড়ো ক'রে তুলে ধরে। দেশবাসীকে মাতৃপূজার ব্রত গ্রহণ করানোই যেন তার প্রধান লক্ষ্য, "পবিত্র স্বদেশপ্রেম দীপশিখার ন্যায় স্বর্গের দিকে, ভগবানের দিকে উত্থিত করে।" গুরু-দেবের 'নৈবেদ্য' কাব্যে ও তৎপরবর্তী জাতীয়-সংগীতে এই কথারই পরিচয় পাই। 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে' গানটি ১৩১৮ সালে রচিত হবার পর থেকেই প্রসিদ্ধি-লাভ করে এবং জাতীয়-সংগীত হিসাবে গণ্য ও গীত হয়। একজন বাঙালি মনীষী বলেছিলেন, "স্বদেশপ্রেম স্বদেশের সঙ্গে মানুষকে সংযুক্ত করে।" গুরুদেবের পরবর্তী জীবনের জাতীয়-সংগীত ধর্মের ভাবে ও স্বদেশপ্রেমে মিলে এক হয়ে সকল মানুষের মধ্যে স্থান পেল। 'ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা' গানটিতে তিনি যে 'বিশ্বমায়ের আঁচলের' কথা বলেছেন তাতে তাঁর স্বদেশপ্রেম যে কত উচ্চগ্রামে বাঁধা তা বুঝতে পারি। 'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে' গানটিতেও সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় নি, উদার মহা-ভারতের কথাই আমাদের শুনিয়ে আমাদের মনকে মহত্তর ভারতের কল্পনায় উদ্বোধিত করতে চেয়েছেন।

গানের ক্ষেত্রে বাংলার স্বাদেশিকতার বড়ো দান পৌরুষের তেজ, গুরুদেবের মধ্যেই তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখি। স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত রচনার মূল সুর হচ্ছে নির্ভীকতা, গানেও তাই। আত্মশক্তিতে যতক্ষণ নিজেকে দুর্বল ভাবব ততক্ষণই আমরা অসহায়, নিজেকে বলহীন মনে করাই হল মানুষের সব চেয়ে বড়ো পরাধীনতা এই বন্ধন থেকে মানুষ যখন মুক্তি পায় তখন কোনো বন্ধনই তার কাছে বন্ধন বলে মনে হয় না। গুরুদেবের জাতীয়-সংগীতে এই মুক্তির সুরই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। সুর কথা ও ছন্দের একত্র বিচারে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, 'সার্থক জনম আমার', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'নিশিদিন ভরসা রাখিস' এবং 'আপন জনে ছাড়বে তোরে' গানগুলি 'বন্দেমাতরম্' কিংবা 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে' গানের চেয়ে বড়ো স্থান পাওয়ার যোগ্য। কারণ পূর্বোক্ত গানগুলি সর্বকালের মানবের মুক্তির গান, ভাবে সুরে ও ছন্দে মিশে এর যে গান-রূপ দেখি তার প্রয়োজন কখনো কমতে পারে বলে বিশ্বাস হয় না, বার্ধক্যের শেষ দিকে উদ্দীপনাপ্রধান যে কয়টি সংগীত তিনি লিখেছিলেন, তার মধ্যে 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান', 'খরবায়ু বয় বেগে চারি দিক ছায় মেঘে' ও 'শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয় গান' উল্লেখ-যোগ্য। এ গান-ক'টিতে আমরা বুঝতে পারব তাঁর স্বদেশপ্রেম দেশকে কি প্রেরণায়

উদ্বোধিত করতে চেয়েছিল, যার ফলে এগুলিও হয়ে উঠেছে মানুষের চিরকালের জাগরণের গান।

বর্তমানে কোনো কোনো লেখক গুরুদেবের স্বদেশী গানের মধ্যে 'হিন্দু ভাবাপ্লুতি' সহজেই লক্ষ্য করেছেন। তাঁদের মতে এটি গুরুদেবের স্বদেশী গানের একটি ত্রুটি। কিন্তু উপরে যে-সব গানের কথা উল্লেখ করেছি, সেগুলি এবং ঐ-জাতীয় অন্যান্য বহু গান কি স্বদেশী গান নয়? এই-সব গান কি স্বদেশী বলে আলোচনার যোগ্য নয়? এগুলি কি যে-কোনো ধর্মের, যে-কোনো দেশের লোকে নির্বিবাদে গাইতে পারে না? কেবল এক ধরনের কয়েকটি গানকে উদাহরণস্বরূপ খাড়া করে গুরুদেবের স্বদেশী গানকে বিচার করলে গুরুদেবের প্রতি অবিচার করা হবে। বরঞ্চ ধর্ম ও দেশের গণ্ডি-নিরপেক্ষ সর্বকালের মানুষের গানই তিনি সব চেয়ে বেশি লিখেছেন, যা আজ পর্যন্ত আর কোনো ভারতীয় কবি পেরেছেন বলে আমি শুনি নি।

ঋতুসংগীত

গুরুদেব মনে করতেন আনন্দের সাধনার পথে প্রকৃতি মানুষের একটি বড়ো অবলম্বন। প্রকৃতি আমাদের চারি দিকে ঋতুতে ঋতুতে যে সৌন্দর্য বা আনন্দ বিতরণ করে তা আমাদেরই ভোগের জন্য। আমরা তাকে গ্রহণ না করলে আমাদেরই মনের একটি অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য থেকে আমরা বঞ্চিত হই। গুরুদেব প্রকৃতির এই সত্যটির কথা আমাদের বারে বারে স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেছেন। কিন্তু তিনি নিজে অন্তরের উপলব্ধি থেকে এ সত্য প্রকাশ করেছিলেন, না এ তাঁর বুদ্ধিজাত কল্পনা, বা আমাদের প্রাচীন ভারতের ঋষিদের কাছ থেকে তিনি এ চিন্তা সংগ্রহ করে আমাদের জানিয়েছিলেন মাত্র, এই হল প্রশ্ন। আর যদি তিনি অন্তরের অনুভূতি থেকে এই সত্যটিকে পেয়ে থাকেন তবে সেই অনুভূতি তাঁর হল কি করে? এরই উত্তর আমি পেতে চেষ্টা করেছি গুরুদেবেরই ঋতুর গান থেকে।

অসতর্ক কোনো ব্যক্তির দেহে আঘাত লাগলে আপনা থেকেই তার কণ্ঠে প্রকাশ পায় আর্তনাদের সুর। অথচ এই আর্তনাদের জন্যে তার মন আঘাতের মুহূর্তেও প্রস্তুত ছিল না। সে জানতও না যে তাকে আর্তনাদ করতে হবে। এবং বেদনায় আর্তনাদের মুহূর্তেও সে বোঝে না যে সে আর্তনাদ করছে। এই স্বতঃস্ফূর্ত আর্তনাদ মানুষের হৃদয়াবেগকে স্পষ্ট ও সরল ভাবে প্রকাশ করে বলেই তা অন্যের অন্তরকেও গভীরভাবে নাড়া দেয়। এই কারণে আমরা প্রত্যেকেই অন্যের যে-কোনোরূপ বেদনার কাতরতায় আন্তরিক ব্যথা বোধ করি।

সংগীতকেও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বলেন অন্তরের সেইরকম এক অজানা বেদনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। এ বেদনার সুর প্রকাশেও স্রষ্টা শিল্পীর মন আগে থেকে তৈরি থাকে না, সে বুঝতেও পারে না। হঠাৎ না-জানা কিসের বেদনায় আপনা থেকেই তার অন্তর গেয়ে ওঠে বা নিজের হৃদয়-বেদনাকে বাইরে প্রকাশ করে গানের সুরে। তাই গান হল মানুষের হৃদয়াবেগকে সরল ও সহজ করে প্রকাশ করবার একটি উৎকৃষ্ট অবলম্বন। বুদ্ধি ও চিন্তার অগোচরেই আঘাতের বেদনা যেমন মানুষের কণ্ঠে আর্তনাদরূপে প্রকাশ পায়, সেইরকম সংগীতের সাহায্যে মানুষের হৃদয়াবেগও মানুষের বুদ্ধি বা জ্ঞানের অগোচরেই আপনাকে প্রকাশ করে। তাই তাকে দেখি নির্মল আনন্দরূপে এবং গানের সেই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগও অন্যের মনোহরণের অসীম ক্ষমতা রাখে।

গুরুদেবের নানা হৃদয়াবেগের সঠিক পরিচয় যদি পেতে হয় তবে তার সব চেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে তাঁর গান। তাঁর ঋতু-চিন্তা বা বাংলাদেশের ছয় ঋতু তাঁর মনকে কী ভাবে খুশি করেছে তা যদি জানতে চাই তবে ভালো করে শুনতে হবে তাঁর ঋতুর গানগুলিকে। এ ছাড়া এই-সব গান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলে দেখা যায় যে ঋতুর আনন্দ গুরুদেবের জীবনে সহজে স্থান পায় নি, তার জন্যে তাঁকে বিশেষ চেষ্টা করতে হয়েছিল।

প্রকৃতির অত্যন্ত নিকট পরিবেষ্টনে বাস করেও মানুষের মধ্যে তার রসবৈচিত্র্যের অনুভূতি লাভের সামর্থ্য যে থাকে না এ তো আমরা সর্বদাই দেখতে পাই আমাদের

জীবনে। সেই কারণে প্রকৃতি মনের অনুকূল হলেও মনকেও তার অনুকূলে তৈরি করে নিতে হয়।

তরফের তার সুরে বাঁধা নেই, এমন একটি সেতার বা এস্রাজের মূল একটি তারে আমরা গান বা গৎ বাজিয়ে একটি সুরের আবহাওয়া তৈরি করতে পারি, কিন্তু তাতে করে বেসুরো তরফের তার গানের সুরে কখনোই বাজবে না। তাকে গানের ঠাটে বাঁধতে বা মেলাতে হবে। এই সুর বাঁধাটাই হল তরফের পক্ষে সাধনা। সেইরকম ঋতুর আবেষ্টনে বাস করলেই যে, আমাদের অন্তর ঋতুর অনুকূল সুরে মিলে যাবে এ কথা মনে করা ভুল। সাধনার দ্বারাই তাকে সফল করতে হবে। অর্থাৎ অনুকূল ঋতুর পরিবেশে বাস করলেও সেই ঋতুর সুরে জীবনকে বেঁধে নেবার সাধনা দরকার।

গুরুদেবের মধ্যে আমরা সেইরকম একটি সাধনার পরিচয় পাই। অল্প বয়স থেকেই তাঁর কাছে বিশ্বপ্রকৃতির লীলা বিশেষ উপভোগের বস্তু ছিল। তিনি মুগ্ধ চিত্তে তখন থেকেই তার ঋতুকে, তার বৈচিত্র্যকে মনে প্রাণে উপভোগ করবার চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতির ঋতুলীলা তাঁর প্রাণে আঘাত করেছে, তিনি অভিভূত হয়েছেন, কিন্তু তার সঙ্গে নিজের সত্তাকে প্রথম থেকেই একসুরে বাঁধতে পারেন নি। তিনি পরে সফল হয়েছিলেন কিন্তু অনেক সময় লেগেছিল।

তাঁর জীবনের প্রথম দিকের ঋতুর গানগুলিতে তিনি ঋতুকে বর্ণনা করেছেন খুবই সুন্দর ভাবে কিন্তু তার মধ্যে পাই না তাঁর অন্তরের অনুভূতির যোগ। আবার এও দেখেছি যে, ঋতু তাঁর মনকে কখনো কখনো বিরহ-বেদনায় অশান্ত করেছে কিন্তু সেখানে সেই বিরহ-বেদনাটুকুই তাঁর কাছে হয়েছে মুখ্য। তাঁর মনের ঐ অবস্থার জন্যে অনুকূল কারণটিকে তিনি গানে স্বীকার করেছেন, কিন্তু তার বেশি মর্যাদা তাকে দিতে চান নি। তাঁর কাছে প্রকৃতির প্রয়োজন যেন ঐটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। হৃদয়-বেদনা উদ্রেক করাই যেন ঋতুর একমাত্র কাজ। যেইমাত্র সেটি সম্পন্ন হল ঋতুর আর কোনো প্রয়োজন তিনি অনুভব করছেন না। এইভাবে ঋতুকে পৃথক করেই তিনি দেখছেন।

৩০ বছর বয়সে তিনি যখন উত্তরবঙ্গে নিজেদের জমিদারি তদারকের ভার নিয়ে সেই অঞ্চলে বাস করতে লাগলেন, তখনই প্রথম প্রকৃতিকে ভালো করে চেনবার তাঁর অবসর হল। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর সেখানকার বৃক্ষ, লতা, শস্যপূর্ণ প্রান্তর, গ্রাম, সেখানকার আকাশ, বাতাস, মাঠ ও ভরানদীর কোলে প্রায় ১০।১২ বছর একটানা কাটালেন। এইভাবে প্রকৃতির সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্থাপনের সাধনা চলতে লাগল। সেই সময় সেখানকার প্রকৃতি তাঁর মনে যে রসের সঞ্চার করেছিল তার প্রকাশ দেখা গেল পরে, ৪৭ বছর বয়সে লেখা শারদোৎসব নাটিকার গানগুলিতে। শারদোৎসবের মতো সুন্দর ঋতুর গান এর আগে আর পাই না। এই গানেই প্রকাশ পেল যে ঋতুর সঙ্গে একটি আন্তরিক যোগ স্থাপনার সূচনা তিনি করতে পেরেছেন।

তাঁর ৪০ বছর বয়সে তিনি স্থাপন করলেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়টি। এবং জমিদারির পল্লীঅঞ্চল ত্যাগ করে শান্তিনিকেতনে এলেন স্থায়ীভাবে বাস করবার

ইচ্ছায়। বাংলার এ অঞ্চলের প্রকৃতি তাঁর জমিদারি অঞ্চলের তুলনায় যে এক নয় তা আমরা সকলেই জানি। এখানকার মাটি পূর্ববঙ্গের মতো সরস ও শস্যশ্যামল নয়। এখানকার গ্রীষ্মের তাপ সেখানকার তুলনায় অনেক বেশি। এখানকার বর্ষার বৃষ্টিধারা সে অঞ্চলের বর্ষার মতো অবিরাম নয়। শীতের তীব্রতা এখানকার তুলনায় সেখানে অনেক কম। এ ছাড়া শান্তিনিকেতনে প্রত্যেকটি ঋতুকে যতটা স্পষ্ট অনুভব করা যায় সেখানে ঠিক সে রকমটি হয় না। তাই এখানকার ঋতু মনের উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে।

প্রথম যুগে শান্তিনিকেতন ছিল নির্জন প্রকৃতির আবেষ্টনে ঘেরা ছোটো একটি পল্লীর মতো। তাই এখানে বাস করে এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে গুরুদেবের অন্তরের যোগ-সাধনার পথ সহজ হল। তিনি তার অনুকূল একটি আবহাওয়া পেলেন।

আকাশ, বাতাস, আলো, জল, গাছ, ফুল, ফলের সাহায্যেই ঋতুর লীলা বা তার আসা-যাওয়া আমরা অনুভব করি। এই উপলক্ষগুলিকে বাদ দিয়ে ঋতুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। কারণ ঋতুর নিজের কোনো আলাদা রূপ নেই। উল্লিখিত বস্তুগুলির একত্র বিশেষ বিকাশে আমাদের মনের উপর যে ক্রিয়া হয় তাকেই আমরা বলব ঋতুর বিকাশ।

এক ঋতুতে এক-এক রকমের ফুলের প্রাচুর্য দেখি, ফলের প্রাচুর্য দেখি। সূর্য-তাপের প্রখরতার কম-বেশি লক্ষ করি। বাতাসের উষ্ণতার তারতম্য ঘটে। ঋতুর নির্দেশে, কখনো উত্তর, কখনো দক্ষিণ, কখনো পূর্ব দিক থেকে বাতাস বয়। এক ঋতুতে গাছের পাতা ঝরে, আবার নতুন পাতা গজায়। কোনো ঋতুতে সূর্যতাপে মাটির রস যায় কমে, তখন সব মনে হয় শুক্‌নো। আবার আর-এক ঋতুতে আকাশে ঘন মেঘের ঘটার সঙ্গে ,প্রচুর বৃষ্টিপাতে, মাটির শুষ্কতা দূর হয়ে মাঠ, প্রান্তর সব সবুজ সরস হয়ে ওঠে। এক ঋতুতে ফসলে মাঠ ভরে ওঠে। অন্য ঋতুতে তাকে কেটে ঘরে তুলতে হয়। বর্ষার ঘোলাজল অন্য ঋতুতে থিতিয়ে পরিষ্কার নির্মল হয়ে ওঠে। এইভাবে বহু বিচিত্র উপলক্ষের দ্বারা ঋতুচক্র আমাদের মনে আঘাত করে। আসলে প্রকৃতির ঋতুলীলা ঐখানেই।

গুরুদেবের শেষ জীবনের ঋতুসংগীতগুলি শুনলে মনে হবে যে, তিনিও যেন প্রকৃতির ঋতুলীলার ঐ রকমের একটি প্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছেন। গাছ-পালা ফুল ফল আলো বাতাসের মতো তাঁর জীবনটিও ঋতুলীলার বিকাশে সাহায্য করেছে। প্রত্যেক ঋতুই যেন গুরুদেবের গান ছাড়া অসম্পূর্ণ। তিনি ঋতুতে ঋতুতে তাঁর গানের ফুল ফুটিয়েছেন আর তারই সাহায্যে ঋতুর আনন্দ অনুভব করা আমাদের পক্ষে আরো সহজ হয়েছে। ফুলের মতনই গানগুলি স্বতঃস্ফূর্ত সহজ সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে উঠেছে প্রকৃতির ঋতুলীলাটিকে আমাদের অন্তরে ধরিয়ে দেবার জন্যে।

১৫।১৬ বছর বয়স থেকে গান লেখা শুরু করে শান্তিনিকেতনের জীবনের আরম্ভ অর্থাৎ তাঁর ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি যত গান রচনা করেছেন তার মধ্যে খাঁটি ঋতুসংগীত ছিল সংখ্যায় অত্যন্ত কম। অর্থাৎ বর্ষার গান প্রায় ৭টি, বসন্তের গান ৩টি, আর শরতের গান ১টি, আরো একটি গান পাই যাতে উপরোক্ত তিনটি ঋতুর

বর্ণনা একই গানের তিনটি অংশে করা হয়েছে। এই ১২টি ঋতুর গানের মধ্যে বর্ষার ৭টি গানের রাগিণী হল মল্লার ঘরের। বসন্তের গান তিনটির রাগিণী হল বাহার ও বসন্ত। শরতের গানের রাগিণী হল যোগিয়া-বিভাস। একসঙ্গে তিনটি ঋতুর বর্ণনামূলক গানটির রাগিণীর নাম শংকরাভরণ। অবশ্য এটিকে সুরের দিক থেকে তাঁর স্বকীয় রচনা বলা চলে না।

পরবর্তী ৪০ বছরের মধ্যে গুরুদেব ঋতুসংগীত লিখলেন সংখ্যায় অনেক। সেখানেও দেখলাম ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত, বর্ষা, শরৎ ও বসন্ত ঋতুরই একমাত্র প্রভাব। কিন্তু সুরযোজনায় ব্যতিক্রম দেখা দিল। আগে যেমন বিশেষ করে বর্ষার গান হলেই মল্লার রাগিণী বসাতেন এখন দেখছি এধরনের দুর্বলতা থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছেন। এখন থেকে অন্যান্য রাগিণীও বর্ষার গানে স্থান পেল। যেমন, ইমন বা ইমনকল্যাণ, সিন্ধু বা সিন্ধুকাফি, ভূপালী, বেহাগ, ভৈরবী ইত্যাদি। আর দেখা গেল শরত তপন, বা শরতের রৌদ্রছায়ার গান মাত্রেই তিনি যোগিয়া-বিভাস, কালাংড়া, বিলাবেল, ভৈরবী ইত্যাদি সকালের রাগিণীই কেবল বসাতে চাচ্ছেন না। চেষ্টা করছেন বাংলার লোকসংগীতের সুরকেও এর মধ্যে স্থান দিতে। কিন্তু বসন্তের গান রচনায় প্রায় ৫৩ বছর বয়স পর্যন্ত বাহারের প্রভাব তিনি এড়াতে পারেন নি। এই সময়ে রচিত আটটি বসন্ত ঋতুর গানের মধ্যে ছয়টিরই রাগিণী বাহার বা মিশ্রবাহার।

১৩২৮ সাল থেকে গুরুদেবের জীবনের শেষ ২০ বছরের আরম্ভ। অর্থাৎ তখন তিনি ষাট বছর বয়সে পা দিলেন। ঋতুর গানের দিক থেকে এই সময়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতনে তাঁর এই ২০ বছর ব্যাপী সাধনার প্রকৃত পরিচয় এখনই প্রকাশ পেল। অথবা এও বলা চলে যে, এখন থেকেই তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার সার্থক পরিণতি দেখা দিল। এখন থেকেই রচনা করতে লাগলেন গ্রীষ্ম ও হেমন্তের গান। আগে এই দুটি ঋতু তাঁর গানের দলে স্থান পায় নি। এই প্রথম তারা প্রবেশের অধিকার পেল। এরই ৭ বছর আগে, ১৩২১ সালে ৫৩ বছর বয়সে, তিনি দুটি মাত্র শীতের গান লিখেছিলেন। কিন্তু এইবারে আবার নতুন করে সেই শীতেরই গান রচনা করতে লাগলেন নতুন অনুভূতি থেকে। ৪৭ বছর বয়সে শারদোৎসবে গান রচনার সময় ঋতুপর্যায়ের গানগুলি একটি বিশেষ পথে মোড় নিলেও পথের শেষ লক্ষ্যের নির্দেশ পেলাম এই ১৩২৮ সালে।

এখন থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর অন্তরের গভীর যোগের পরিচয়টি প্রকাশ পেল। যেন প্রকৃতি তাঁর মনের সব রহস্য দ্বিধাহীন চিত্তে গুরুদেবকে শোনাচ্ছে, গুরুদেবের বেদনাময় চিত্ত সেই-সব কথায় নানা ভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া এই শেষ কুড়ি বছরে যত ঋতুর গান রচনা করেছেন সংখ্যার বিচারেও তা আগের জীবনের তুলনায় অনেক বেশি। আর দেখা গেল গানের সুরযোজনার দিক থেকে তাঁর মনে আর কোনো দ্বিধাবন্ধন নেই। তাই এই সময়ের ঋতুর গানে শুনতে পেলাম রাগ-রাগিণীর নানা বৈচিত্র্য।

অন্তরে অন্তরে তিনি যে কী পরিমাণে বাঙালি ছিলেন তাঁর ঋতুসংগীতগুলি তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাব যে তাঁকে এই গান রচনায়

অনুপ্রাণিত করেছে কেবলমাত্র শান্তিনিকেতন ও উত্তরবঙ্গের পদ্মা অঞ্চলের প্রকৃতি। তাঁর ছয় ঋতুর গানগুলির প্রায় সবই রচিত এই দুই অঞ্চলের প্রকৃতিকে ঘিরে। বাংলার এ অঞ্চলে কোনো পাহাড় নেই, সমুদ্র নেই তাই তাঁর ঋতুর গানে পাহাড় বা সমুদ্র অঞ্চলের ঋতুকে পাওয়া যাবে না। পৃথিবীর কত দেশের কতরকমের পাহাড় বন নদ নদী ঘেরা নানা ঋতুবৈচিত্র্যের স্বাদ তিনি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তারা কেউ তাঁর মনে গানের বেদনা জাগাতে পারে নি। সে বেদনা জাগাল একমাত্র বাংলাদেশের সরল শান্ত উদার প্রকৃতি।

উদ্দীপক বা উল্লাসের গান

বাংলাদেশের সমালোচকমহলে একটি মতবাদ চলিত আছে যে, দ্বিজেন্দ্রলাল "বাংলা গানে প্রথম ইংরেজি সুর সংযোজন করেছেন।" তিনি দেশী সুরে accent ও movement অর্থাৎ একটি নতুন ঝোঁক এবং দ্রুতগতি এনে বাংলা গানে দেশী সুরের ভিতরে একটা নতুন চাঞ্চল্য ও স্পন্দনের সৃষ্টি করেছিলেন; তাঁরা বলেন এর জন্যে তিনি বিলেতি সংগীতের কাছে ঋণী, "আমাদের রাগ-রাগিণী বিলেতি চাল এত সহজভাবে অঙ্গীকার করেছে যে, তার সুরের এই বিলেতি ভঙ্গি আমাদের কানে মোটেই বেখাপ্পা লাগে না।" এবং এ-বিষয়ে এ-যুগের বাংলা গানে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় "একটি নতুন ঢঙের সৃষ্টি করেছেন" ও "এই গানে একটি বিশিষ্ট ওজস্বিতা আছে যা সচরাচর অন্য গানে মেলে না।" সম্প্রতি কিছুদিন থেকে আর-এক দল বলছেন, বাংলা গানে বলিষ্ঠ পৌরুষকে গানের আসরে প্রথম এনেছেন কাজি নজরুল ইসলাম। এই দুটি মত সম্বন্ধেই সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

বাংলাদেশে বিলেতি সংগীতের প্রথম প্রভাব নিয়ে পূর্ব পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তখন এও লক্ষ করেছি যে, গানের তেজ বীর্য বা উল্লাসের ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা শুরু হয়েছিল হিন্দুমেলা আন্দোলনের যুগে। সেই যুগের জাতীয় সংগীত রচনার প্রেরণা থেকেই উল্লাসের গানের সূত্রপাত। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জয় ভারতের জয়' গানটিকে এদিক থেকে প্রথম উল্লাসের গান বলা চলে। এটি খাম্বাজ রাগিণীতে রচিত, শোনা যায় এর প্রথম সুরযোজনা করেছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ও ঠাকুরবাড়ির গৃহশিক্ষক বিষ্ণু। এই গানটি যদিও দেশী রাগিণীতে গঠিত, কিন্তু উল্লাসের গান রচনায় সুরকে যে পদ্ধতিতে সাজাতে হয়, সেরকম কাটাকাটা লাফানো ভঙ্গিতে এই রাগিণীকে সাজানো হয়েছিল। ঠিক এই আদর্শে ও একই রাগিণীতে এর কয়েক বৎসর পরে, যখন গুরুদেবের বয়স ষোলোর কাছাকাছি, তখন সঞ্জীবনী সভার জন্যে 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গানটি তিনি রচনা করেন। ভাবে ভাষায় দেশী সুরে উদ্দীপক গান হিসেবে এটি গুরুদেবের ঐ বয়সের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। সেই সুরটিকে শৃঙ্খলার সঙ্গে নানাপ্রকার ওঠানামার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়াতে পাশ্চাত্য জোরালো গানের ভাব তাতে ফুটে উঠেছে এবং ভাষা ও ছন্দের জোরে গানটি এমন প্রাণবান হয়ে উঠেছে যে, সকলেরই প্রাণে উন্মাদনা আনে। পরে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য় এই প্রথায় আরো দু-একটি গান রচনা তিনি করেছিলেন। এই নাটকের 'এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে' গানটি 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গানটির অনুকরণে রচিত। 'গহনে গহনে যা রে তোরা—নিশি বহে যায় যে' গানটি বাহার রাগিণীতে রচিত এবং এর সুরের গঠনে উপরের গানের মতো তেজ বা ওজস্বিতা আছে।

বাংলা গানে তেজ বা ওজস্বিতা প্রকাশের প্রেরণা আমরা কেবলমাত্র বিলেতি গানের অনুকরণে পেয়েছি, এমন কথা বললে ভুল বলা হবে। কেউ যেন মনে না করেন যে, আমাদের প্রাচীন গানে এদিকটির অভাব ছিল। অল্পবয়সে গুরুদেবের মনেও এই রকমের একটি ধারণা যে ছিল, তা তাঁর সেই বয়সের একটি লেখা থেকে

বুঝতে পারি। সেখানে তিনি লিখেছেন—

"ঘোরতর উল্লাসের সুর ইংরেজি রাগিণীতে আছে, আমাদের রাগিণীতে নাই বলিলেও চলে।"

কিন্তু এ ধারণা তাঁর মন থেকে পরে চলে গিয়েছিল। এর কারণ হল আমাদের দেশের প্রাচীন ধ্রুপদসংগীত।

শোনা যায়, ভারতীয় নওহরবাণী চালের ধ্রুপদগানের স্বর লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। খান্ডারবাণী চালের ধ্রুপদগানে কাটা-কাটা সুরের প্রকাশ দেখা যায়; কিন্তু নওহরবাণীর মতো এতটা জোরালো নয়। এই ধ্রুপদসংগীতের মধ্য দিয়ে শক্তির প্রকাশ পেত। কিন্তু এ সংগীতের সঙ্গে গুরুদেবের বিশেষ পরিচয় ছিল বলে মনে হয় না, কারণ গুরুদেব যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন দেশে একমাত্র গওহরবাণী ধ্রুপদ ছাড়া অন্য চালের ধ্রুপদগান যে খুবই কম গাওয়া হত সে কথা প্রমাণ হয় তৎকালীন সংগীতানুরাগীদের মন্তব্য থেকে। কিন্তু তিনি পরে জোরালো খান্ডারবাণী ধ্রুপদ-সংগীতের সঙ্গে পরিচিত হন যদুভট্ট ও রাধিকা গোস্বামীর সাহায্যে। তা ভেঙে এক সময় গানও বাংলাভাষায় রচনা করেছেন। আমরা জানি ঝাঁপতাল সুরফাক্তা ও তেওড়া তাল ধ্রুপদগানেই বেশি ব্যবহার হয় এবং গানে এই বিষম তালের ছন্দের সাহায্যেই উল্লাসের ভাব প্রকাশ পায়। এখানে তাঁর হিন্দী ধ্রুপদভাঙা ভৈরবী রাগিণীর 'আনন্দ তুমি স্বামি, মঙ্গল তুমি' গানটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এর তাল হল সুরফাক্তা। এরকম ঢঙের ভৈরবী রাগিণীর গান আজকাল বাংলাভাষায় তৈরি হয় না, এবং হিন্দুস্থানী ওস্তাদের মুখেও আজ এ গান শুনতে পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভৈরবী রাগিণীতে প্রকাশ পায় একটি বেদনা। প্রার্থনা-বিষয়ক বা স্তুতি, প্রতারণা, কলহ ও বিয়োগ ইত্যাদি যে-কোনো ভাবের কথা থাক্-না কেন, মূলে ঐ বেদনাই হল এর স্থায়ী রস। করুণ রস প্রকাশের জন্যেই ভারতীয় সংগীতে এ রাগিণীটি বিখ্যাত। অথচ উপরোক্ত গানটিতে সে সুর বিপরীত ভাবের অর্থাৎ উল্লাসের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ গানের এক-একটি স্বর পাশ্চাত্ত্য সংগীতের মতো যদিও ব্যবধান সৃষ্টি করেছে এক সুর থেকে আর-এক সুরের মধ্যে, তবুও রাগিণীর গঠনপ্রণালী যে বাঁধা-নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত, তা থেকে এর বিচ্যুতি ঘটে নি।

ভূপালী জাতীয় পাঁচটি স্বরের রাগিণীতে তবুও স্বরের ওঠানামায় অনেকখানি ব্যবধান আছে, কিন্তু যেগুলি সম্পূর্ণ রাগ, সেগুলিতে রাগিণীর বৈশিষ্ট্য রেখে স্বরের ব্যবধানে গান রচনা করা খুবই কঠিন। গান দ্রুত লয়ে গাওয়ার দরুন, অথবা দুগুণ চৌগুণ বা দ্রুত লয়ের অন্য ছন্দে, একটা জোরালো বেগ প্রকাশ পায়। এই কথা মনে করে গুরুদেব বলেছেন— "অনেক সময়ে আমরা উল্লাসের গান রচনা করিতে হইলে রাগিণী যে ভাবেরই হউক তাহাকে দ্রুত তালে বসাইয়া লই, দ্রুত তাল সুখের ভাব প্রকাশের একটা অংগ বটে।"

কিন্তু এ ধরনের হিন্দী গানে কথার দিকে গায়কের কোনো দৃষ্টি থাকে না, কথার মৃত্যু ঘটে, অনেক সময় তার অর্থবোধ অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাংলা গানে তা কোনোরকমেই চলে না। বোধ হয় সেই কারণেই হিন্দী ধ্রুপদ গানের রচয়িতারা

জোরালো গানে ঝাঁপতাল তেওড়া সুরফাক্তা ইত্যাদি বিষম মাত্রার তাল ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। দ্রুত লয়ের তেতালা ছন্দে বিষম মাত্রার ধ্রুপদী গানের মতো জোরালো গান সেই তুলনায় অল্পই পাই। দাদরা ছন্দের জোরালো হিন্দী গান কোনো ওস্তাদের মুখে শুনবার সৌভাগ্য এখনো হয় নি। এইখানে খাঁটি হিন্দী গানের সাহায্যে ত্রিতালের ছন্দে রচিত গুরুদেবের জোরালো উদ্দীপক গানের একটি উদাহরণ দেওয়া হল। গানটি হল 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র 'এই বেলা সবে মিলে চলো হো'। এ ভূপালী রাগিণী ও দ্রুত তেতালা ছন্দে রচিত। ভাষায় সুরে ও ছন্দে দস্যুদের উদ্দীপক গানের এটি একটি ভালো নিদর্শন। এ রকমের হিন্দীভাঙা বাংলা গান আরো আছে।

গুরুদেব তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন বীর্যের গানে, সুরফাক্তা ঝাঁপতাল তেওড়া দুই-চার ছন্দ সহজ চতুর্মাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক ইত্যাদি নানা ছন্দ ব্যবহার করে। আজকাল হিন্দী গানের গায়কদের মধ্যে বীর্যসূচক গানে এইরূপ বৈচিত্র্য একেবারেই দেখা যায় না। এবং বিলেতি উল্লাসের গানে আমরা পাই কেবলমাত্র সমমাত্রার ছন্দ। হিন্দী গানে কথার মর্যাদা বড়ো থাকে না, বিলেতি গানে কথাকে কিছুটা মর্যাদা দেয়। গুরুদেবের গানের অপর বিশেষত্ব হল, সুরের ও ছন্দের চাপে পড়ে কথার কিছুমাত্র হানি না ঘটা। তাঁর সব জোরালো গানই যে দ্রুত লয়ে তৈরি, এমন নয়। মধ্য লয়েও বহু গান আছে। তাঁর জোরালো গানের মধ্যে খাঁটি বা মিশ্র ভৈরবী ইমন ভূপালী খাম্বাজ বাহার রাগিণীই বেশি; তার পর মিশ্রভৈঁরো, শংকরা। এবং বাংলার সুরের মধ্যে বাউল ও কীর্তনাঙ্গ সুরের গানও আছে অনেক। উপরের এই বিভিন্ন রাগিণীতে জোরালো গানের একটি করে উদাহরণ নীচে দেওয়া গেল—

ভৈঁরোতে : 'ঐ মহামানব আসে'
ভৈরবীতে : 'ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়'
ইমন ভূপালী : 'খররায়ু বয় বেগে, চারি দিক ছায় মেঘে'
খাম্বাজ : 'আমরা নূতন যৌবনেরই দূত'
শংকরা : 'আর নহে, আর নয়'
বাহার : 'ওরে আয় রে তবে, মাত্ রে সবে'
বাউল ও কীর্তন : 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি।'

এ রকমের জোরালো গান তিনি বহু রচনা করেছেন। বিলেতি গানে উল্লাসের কথায় কিভাবে সুরগুলি বসে সে বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান থাকার দরুন ভারতীয় রাগসংগীতের ভিতর থেকে উল্লাসের ঢঙ খুঁজে নিতে তাঁকে বেগ পেতে হয় নি। খাণ্ডারবাণী ঢঙে তা পেয়েছিলেন, প্রয়োজনমত তাকে আরো একটু বলিষ্ঠ করেছিলেন মাত্র। এগুলো হুবহু বিলেতি গানের অনুকরণে রচিত নয়, এগুলোতে পাই উভয় আদর্শের একটি অপূর্ব সংমিশ্রণের রূপ।

ধ্রুপদী গানে গায়করা সাধারণত তাল ও সুরটাকেই বড়ো করে দেখে বলে কথার সহজ ছন্দোবন্ধ গতিকে উপেক্ষা করে। এই কারণেই হিন্দী গানে কথার ছন্দে এত ভাঙচুর হয়। তাই কথার নিজস্ব কোনো ছন্দোবন্ধ ঝোঁক থাকে না, তাল ও সুরের মিলিত ঝোঁকের সঙ্গে ওস্তাদেরা কথাকে মেলাবার দরকার বোধ করেন নি। গুরু-

দেবের উপরের আদর্শে রচিত গানগুলি বা জাতীয় সংগীত সে অভাব পূরণ করেছে। গাইবার সময় কথার ছন্দে ঝোঁক দিয়ে গাইলেই এই-সব গানের আসল রূপ সুন্দর ফুটে ওঠে। দেখা যায় গুরুদেবের গান কেবল স্বরলিপির সাহায্যে শিখতে গিয়ে বহু গাইয়ে জোরালো গানের প্রকৃত রূপটি তাতে ফোটাতে পারেন না, নিজেদের পছন্দমত কোমল ভাবের গানে পরিণত ক'রে তোলেন। কীর্তন বা বাউল সুরে এই জোর প্রকাশ করাও গুরুদেবের রচনার একটি বিশেষ গুণ। আমাদের দেশে কীর্তনাঙ্গ সুরে জোরালো গান পূর্বে হয়েছে বলে শুনি নি, এখন পর্যন্ত এই সুরে কোনো রচয়িতার কোনো উল্লেখযোগ্য গানেরও পরিচয় পাই নি।

উপরের এই ছয়টি রাগিণীর জোরালো গানগুলি গুরুদেবের জীবনের শেষের দিকে রচিত; অথবা বলা যেতে পারে এ ধরনের বেশির ভাগ গান তাঁর শান্তিনিকেতনের জীবনেই তৈরি। পূর্ববর্তীকালে রচিত ধ্রুপদের নকলে বা বিলেতি ধরনের গান গুলিতে এই-সব গানের মতো নিজস্ব ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে নি।

আরম্ভে যে প্রশ্ন তুলেছিলাম, এখন আবার সেই কথায় ফিরে আসা যাক। ১৮৮৭র পূর্বে যে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা গানে ইংরেজি সুর ব্যবহারের কাজে হাত দেন নি, আমরা তাঁর জীবনী থেকেই তা জানতে পারি। দেশী ও বিলেতির সংমিশ্রণে বাংলা গানে জোরের দিক থেকে নতুন ঢঙ তিনিই প্রথম আমদানি করেছিলেন বলে যে কথা বলা হয় তাও ঠিক নয়, কারণ স্বদেশী যুগের পূর্বে তিনি এ ধরনের গান-রচনায় হাত দেন নি; স্বদেশী যুগেই প্রথম তিনি জোরালো গান রচনা শুরু করেন কাজি নজরুলের জোরালো গানের সূচনা আমরা দেখলাম গত প্রথম মহাযুদ্ধের পর। এই সময়ের ভিতরে গুরুদেব বীর্যব্যঞ্জক গান যতগুলি রচনা করেছিলেন তার খবর না রাখার দরুন এইরকম ভ্রান্ত ধারণা প্রকাশ পেয়েছে।

আজকাল যাঁরা সিনেমার ও গ্রামোফোনের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বিদেশী উদ্দীপক গানের আদর্শে দেশী গান রচনা করছেন, তাঁদের মধ্যে একদল করছেন পাশ্চাত্য সংগীতের অনুকরণ, কেউ কেউ করছেন গুরুদেবের আদর্শে উল্লাস বা তেজের গান রচনা। কিন্তু এ ধরনের গানের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাঁদের চেষ্টা হল বিলেতি করুণ মেলোডিকে সংগীতে স্থান দেবার। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, করুণ মেলোডির জন্য ভারতীয় সংগীতের ইয়োরোপের দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন আছে কি? আমাদের আজ বিশেষ প্রয়োজন তেজ ও বীর্য প্রকাশক গানের। সে তেজ বা উল্লাস যে কেবল জাতীয়তাবোধ-উদ্দীপক গানেই সীমাবদ্ধ থাকবে এমন নয়। প্রতিদিনের জীবনেও মানুষ কতরকম মানসিক অবসাদের মধ্যে ইচ্ছা করে গানের সাহায্যে তার মানসিক দুর্বলতা কেটে যাক। প্রাচীন হিন্দী গানের ভিতর থেকে সে সুযোগ বা সুবিধা আহরণ করা আমাদের মতো সাধারণ লোকের জীবনে সম্ভব নয় নানা কারণে। প্রথমত, আমাদের সংগীত যে আদর্শ থেকে উদ্ভূত তা থেকে বিচ্যুত সে হতে চায় নি। দ্বিতীয়ত, প্রাচীন সংগীতে উদ্দীপনার প্রকাশ যা দেখি, তা কঠোর সাধনা ব্যতীত অসম্ভব। সাধারণের সেই অভাব পূরণ করেছেন গুরুদেব বিশেষভাবে। কেবল স্বদেশপ্রেম-উদ্দীপক গান ছাড়া, নানা ঋতুর ও প্রেমের সংগীতে পৌরুষের ভাব কিরকম ফুটেছে এই কয়টি গান তার উদাহরণ : 'ওই বুঝি কালবৈশাখী', 'আজ

বারি ঝরে ঝরঝর', 'শীতের হাওয়ার লাগল নাচন', 'বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা'। এই বিভিন্ন ঋতুসংগীতগুলি ও 'মহুয়া' কাব্যের প্রেমসংগীত 'আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে' উল্লেখ করে এ কথা বলা চলে যে, এদিক দিয়েও গুরুদেব ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর রচয়িতা। সংখ্যার দিক থেকে ও বৈচিত্র্যের বিচারে গুরুদেবের সমকক্ষ আর কেউ আছেন বলে আমাদের জানা নেই। উল্লাসের গানে এই বৈচিত্র্যের মূলে কেবলমাত্র বিদেশী পদ্ধতিই আমাদের আদর্শ এ কথা বললে একটু ভুল বলা হবে। আজকাল কেবল মধুর ব্যথা ও কান্নাভরা দরদের বা প্রেমের গান রচনার প্লাবন ব'য়ে চলেছে।

বাংলার স্বদেশী যুগে রচিত গানে যে তেজ প্রকাশ পেত, উত্তরকালে রাজনৈতিক আদর্শ অন্য দিকে মোড় ফিরেছে বলেই কি সে ভাবের গানের আর বেশি কদর নেই? জাতীয় পতাকা উত্তোলন উপলক্ষে গেয় হিন্দী ভাষায় রচিত গানটি যখন গাইতে শুনি, তখন স্বদেশের স্বাধীনতার প্রেরণা জাগাবার পক্ষে এত বড়ো দুর্বল সুরের গান কী ভেবে নেতারা নির্বাচন করেছিলেন সেই প্রশ্নই মনে লাগে। কথা বাদে এ গানের সুর ও ছন্দের ভিতর দিয়ে যে নির্জীব ভাব প্রকাশ পায় স্বাধীনতাবোধ-উদ্দীপনার পক্ষে তা অচল। গত বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে ভারতবর্ষের উপর দিয়ে বেশ একটা বড়ো রকমের রাজনৈতিক বিপ্লব বয়ে গেছে। এর মধ্যে অনেকে নতুন করে কিছু উদ্দীপক সংগীত রচনা করেছেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, সে-সব গানের প্রায়শই সাহিত্যিক মূল্য তো নেই-ই, তা ছাড়া সে গানগুলি সাময়িক উত্তেজনার ইন্ধন জোগানোর উদ্দেশ্যে রচিত ব'লে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মৃত্যু ঘটেছে। মহাত্মাজির জীবনাবসান উপলক্ষে, নেতাজীর বিষয়ে, ও নতুন রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পরিবর্তন নিয়ে অনেক গান রচিত হল, কিন্তু উত্তেজনার উপশম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার সংগীতমূল্যেও অন্তর্ধান করল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলতে হবে, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে রচিত কয়েকটি গানে সুরযোজনার বৈশিষ্ট্য প্রশংসনীয়। সেগুলি সম্মেলক সংগীতের পক্ষে উপযুক্ত। এগুলি সুরে ও ছন্দে বীর্যপ্রকাশক। এর মধ্যে বেশির ভাগ গানেই সুরের গঠনে বিলেতি সংগীতের ছাপ প্রকাশ পায়, ছন্দে প্রকাশ পায় কেবলমাত্র তিন বা চার মাত্রার দ্রুত লয়, আর তার সঙ্গে দেখা যায় যন্ত্রসংগীতের প্রাধান্য।

বাংলা গানে বিলেতি অনুকরণে হার্মনি-সংগীতের চেষ্টা শুরু কখন হয়েছে তা আগেই বলেছি। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যাপকভাবে কোনোদিনই রূপ গ্রহণ করে নি। তার একটা কারণ হল, কণ্ঠের সাহায্যে বিভিন্ন সুরে একই সঙ্গে অনেকে মিলে গাইতে গেলে যেভাবে কণ্ঠস্বরকে নানাস্তরের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হয় সে দিকে কোনো চেষ্টা আমাদের দেশে নেই। কারণ আমাদের কণ্ঠসংগীতে আমরা গলার স্বাভাবিক স্বরের প্রকাশকেই আদর করি ও সেইভাবেই গান শুনতে ও গাইতে আমরা অভ্যস্ত। তাই বিলেতি কায়দায় অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের গান উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় সংগীতে অচল এবং যেখানে কথা ও সুরের একত্বই হল মূল বিষয়, সেখানে হার্মনি-সংগীতের প্রচলনে গানের নিজস্ব রূপটি খর্ব হবেই। তাতে বাংলা গানকে আর-এক পথে চলতে হবে। কারণ, কথার সহজ গতি ও সৌন্দর্যকে নষ্ট ক'রে সুরই পাবে

প্রাধান্য। সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করাই হল হার্মনি-সংগীতের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু দেখছি বর্তমান ভারতীয় যন্ত্রসংগীতে এর চেষ্টা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে এবং হয়তো ভবিষ্যতে অনেক নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকতে পারে। আজকাল বাংলা গানের সঙ্গে কণ্ঠে ও যন্ত্রসংগীতে হার্মনির সামান্য চেষ্টা লক্ষ করেছি। এই হার্মনি-সংগীত কোন্ পথ নেবে এখনো বলা শক্ত। এ বিষয়ে গুরুদেব নিজে কি মনে করতেন তা আমাদের জানা উচিত। তিনি বলেন—

"য়ুরোপীয় সংগীতে যে-হার্মনি অর্থাৎ স্বরসংগতি আছে আমাদের সংগীতে তা চলবে কি না। প্রথম ধাক্কাতেই মনে হয়, 'না, ওটা আমাদের গানে চলবে না, ওটা য়ুরোপীয়!'...কিন্তু যে-হেতু এটা সত্যবস্তু, এর সম্বন্ধে দেশকালের নিষেধ নেই।... তবে কিনা এও নিশ্চিত যে, আমাদের গানে হার্মনি ব্যবহার করতে হলে তার ছাঁদ স্বতন্ত্র হবে। অন্তত মূল সুরকে সে যদি ঠেলে চলতে চায় তবে সেটা তার পক্ষে স্পর্ধা হবে।

"...আমাদের গানের বিপুল তান-কর্তব ঐ হার্মনি বিভাগে চালন করে দিলে মূল গানটার সহজ স্বরূপ ও গাম্ভীর্য রক্ষা পায়, অথচ তার গতিপথ খোলা থাকে।"

গুরুদেব সকলকে সতর্ক করে বলেছেন—

"আমাদের রাগরাগিণী স্বরসংগতিকে স্বীকার করেও আত্মরক্ষা করতে একেবারেই পারে না এ কথা জোর করে কে বলতে পারে।...কিন্তু সৃষ্টিতে নূতন রূপের প্রবর্তন বিশেষ শক্তিমান প্রতিভার দ্বারাই সাধ্য, আনাড়ির বা মাঝারি লোকের কর্ম নয়।"

গুরুদেব নিজে কখনো তাঁর গানে বহু কণ্ঠের সম্মিলিত স্বরে হার্মনি-সংগীত রচনা করেন নি। কিন্তু এ কাজে তাঁর আত্মীয়দের তিনি যে উৎসাহ দিতেন সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

ভারতে ইংরেজি ভাষায় দেশী সুরের সাহায্যে গান রচনা কেউ কেউ করে থাকেন। এ বিষয়ে ভালোমন্দ বিচারের সময় এখনো আসে নি এবং পাশ্চাত্য জাতি এ রচনার ভিতর দিয়ে কিছু আনন্দ পেয়েছে কি না, এখন পর্যন্ত তা জানতে পারা যায় নি। শোনা যায়, এ পথে গুরুদেবও যে চেষ্টা না করেছেন তা নয়, কিন্তু তাঁর উৎসাহ একটিমাত্র গানের ভিতরেই নিঃশেষিত হয়েছে বলেই মনে হয়। সেই গানটি হল—

The bee is to come,
The bee is to hum.

১৯১৫ সালে গুরুদেবের 'দালিয়া' গল্পটিকে ইংরেজিতে নাটকাকারে লিখেছিলেন জর্জ ক্যালডেরন নামে একজন ইংরেজ। নাটকটির নাম দিয়েছিলেন *The Maharani Of Arakan,* লণ্ডনে ভারতবর্ষীয়দের নিয়ে সেটি অভিনীত হয়। ১৯১৩ সালে গুরুদেব যখন লন্ডনে উপস্থিত ছিলেন, তখন তিনি এই নাটকের জন্যে ইংরেজিতে তিনটি গান লিখে দেন। কিন্তু শোনা যায় নিজে সুর যোজনা করেছিলেন মাত্র উল্লিখিত গানটিতে। এ গানটির সুরে বিদেশী ঢঙের প্রাধান্যই বেশি, কিন্তু মাঝে মাঝে দেশী সুরের আভাস স্পষ্ট অনুভব করি গাইবার সময়।

বিদেশী প্রথায় স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন দ্বারা গানে ভাবপ্রকাশের সহজ

রীতির চলন আছে, সেখানে গলার স্বরের বিকৃতিকেই বড়ো করে দেখা হয়েছে সেই ধরনের গানে। আমাদের দেশের পদ্ধতি ঠিক তার উল্টো; ভারতীয় সংগীত কোনো-দিনই ব্যক্তিগত জীবনের হাসিকান্নাকে অনুকরণ করে নি। কারণ এ গানের উৎস সাধকের সমাহিত চিত্ত থেকে। আমাদের দেশের গাইয়েরা যখন গান করেন, তখন তাঁরা চেষ্টা করেন না অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে গানের অর্থটিকে সুরে ফুটিয়ে তুলতে। তাঁদের কাজ হল গানের ভাবকে রাগিণী-বিকাশের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা। কিন্তু বিলেতি সংগীতে দেখা যায়, "হৃদয়াবেগের উত্থানপতনকে সুরের ও কণ্ঠস্বরের ঝোঁক দিয়ে খুব করে প্রত্যক্ষ করে দেবার চেষ্টা।" এই প্রথা ভারতীয় সংগীতের পক্ষে উপযুক্ত নয়, তাই গুরুদেব বলেন যে, "দুঃখের গানে গায়ক যদি সেই অশ্রুপাতের এবং সুখের গানে হাস্যধ্বনির সহায়তা গ্রহণ করে তবে তাতে সংগীতের সরস্বতীর অবমাননা করা হয় সন্দেহ নেই।" "সুরে ও কণ্ঠে জোর দিয়ে হৃদয়াবেগের নকল করতে গেলে সংগীতের সেই গভীরতাকে বাধা দেওয়া হয়। সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার মতো সংগীতের নিজের একটা ওঠানামা আছে কিন্তু সে তার নিজেরই জিনিস, কবিতার ছন্দের মতো সে তার সৌন্দর্যনৃত্যের পাদবিক্ষেপ; তা আমাদের হৃদয়াবেগের পুতুলনাচের খেলা নয়।"

গুরুদেব নিজের জীবনে ভারতীয় সংগীতকে অন্যান্য সাধকের মতোই উপলব্ধি করেছেন এবং তিনি যে সেই আদর্শে নিজেও গান রচনার পক্ষপাতী ছিলেন, তাও উদ্ধৃত রচনাংশটি থেকে অনায়াসে ধারণা করতে পারি। তা ছাড়া তাঁর অনেক রচনাও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে। গানের কথাকে রাগিণীতে মিশিয়ে হৃদয়াবেগ প্রকাশের চেষ্টা তিনি করেছেন, অথচ কণ্ঠবিকৃতি ঘটে নি, এরকম একটি গানের উদাহরণ এখানে দিই। ১৩৩২ সালে রচিত 'শেষবর্ষণ' গীতনাট্যে 'শ্যামল ছায়া, নাইবা গেলে' বলে একটি গান আছে। সেখানে 'নাইবা গেলে' কথাটির মধ্যে 'না' কথাটিকে গানের মাঝে সুরে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তা শুনলে মনে হয় যেন মনের বিশেষ আবেগের বা আগ্রহের সুরেই 'না' বলা হচ্ছে। 'না, যেয়ো না, যেয়ো নাকো' গানটিতে, 'না' কথাটির সুর একই আদর্শে বসানো হয়েছে। গানটির রাগিণী সিন্ধুড়া। উঁচু সপ্তকের র্সা র্রা ছুঁয়ে মীড়ের সঙ্গে যেভাবে কোমল নিখাদে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে যেতে না দেবার ব্যাকুলতা স্পষ্টই অনুভব করা যায়।

এরকমের আরো অনেক উদাহরণ তাঁর গানে ছড়িয়ে আছে। এভাবে গানে ভাব-প্রকাশের ইচ্ছা বিদেশী সংগীত থেকে হয়েছিল। কিন্তু কণ্ঠে ভাবাবেগের সাহায্যগ্রহণ তিনি এ-সব গানে একেবারেই করেন নি। রাগিণীকেই খাড়া করেছেন সেই আদর্শে। 'না' কথাটির সুর গানের মূল রাগিণী থেকে সরে যায় নি; এখানেও দেশী ও বিদেশী আদর্শের আর-একটি নতুন সমন্বয় আমরা দেখতে পাই।

আমাদের দেশে কীর্তনগানে কখনো দেখেছি ভাবাবেগের আনন্দে কীর্তনীয়ার চোখ জলে ভরে আসে ও কণ্ঠের স্বর হয়ে আসে ভারাক্রান্ত। সে ভাববিহ্বলতা ইচ্ছাকৃত অভিনয় নয়। চিত্ত পুনরায় প্রকৃতিস্থ হলেই তাঁদের গান আবার স্বাভাবিক রূপ নেয়। কেবল কথক সম্প্রদায়ের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যায় কণ্ঠে স্বাভাবিক সুরের ব্যবহার দ্বারা গানে অভিনয় করতে।

হাস্যরসের গান ছাড়া বিলেতি অনুকরণে ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস প্রকাশরীতি সম্প্রতি বাংলা গানে কখনো কখনো দেখেছি। এরূপ গানের রচয়িতারা হয়তো মনে করেন যে, উঁচুদরের গানেও এ-সব সস্তা ভাব বাতলানোর রীতি প্রচলন করে তাঁরা বাংলাগানের রসটি আরো ফুটিয়ে তুলতে পারছেন। গুরুদেবের গানকেও এই অভিনব 'ভাব' বাতলানোর হাত থেকে অনেকে রেহাই দেন না। কিন্তু যাঁরা গান করেন তাঁরা যদি প্রকৃত রসিক হন তবে গুরুদেবের গানকে কখনো এভাবে ব্যবহার করতে রাজী হবেন না। তাঁরা কেবল সুর ও কথার রসটি মনে বসিয়ে আপন আনন্দে গেয়ে যাবেন।

গানরচনার বিভিন্ন পদ্ধতি

আগে কথা ও পরে সুররচনা করাই প্রচলিত রীতি। এ ভাবেই গুরুদেব বেশি গান রচনা করেছেন। রচনার পূর্বে তিনি ভেবে নিতেন, কোন্ রাগিণীটি বা সুরটি গানের মূল ভাবের সঙ্গে খাপ খাবে, পরে সেই রাগিণীতে বা সুরে আগের দিনে শেখা হিন্দী গান বা অন্য কোনো গান আউড়ে নিয়ে তার রূপটি অন্তরে ধরতেন, তার পরে শুরু করতেন গানে সুরযোজনার পালা। কোন্ বিশেষ গানকে ভেবে নিজের গানের সুর যোজনা যে করতেন, তার পরিচয় পাব গুরুদেবের স্বহস্তলিখিত গানের খাতাগুলিতে। নূতন গানের সুর পুরাতন যে গান থেকে আহরণ করেছেন, তার প্রথম পঙ্‌ক্তিটি খাতায় গানের উপরে লিখে রাখতেন। এইভাবে লেখার কারণ হল, গান রচনা করার পর একবার অন্যদিকে মন গেলে প্রায়ই সুর হারিয়ে ফেলতেন। এক-এক সময়ে এমন হত যে, রাগিণীটিকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হতেন; কিছুতেই মনে আনতে পারতেন না। এইজন্যে মূল গানটি উপরে লিখে রেখে নিজেকে হুঁশিয়ার ক'রে রাখতেন। কিন্তু মুশকিল হত যখন গানের সুর এক রাগিণীতে আরম্ভ হওয়ার পর অন্য পথে চলে যেত। সে সময় তাঁর খেয়ালই থাকত না কিভাবে কোন্ রাগিণীতে কী হচ্ছে। সম্পূর্ণ তৈরি ক'রে তখন বুঝতে পারতেন কী হল, মূল রাগিণী থেকে বদলে গেল কি না।

অনেক সময় অকারণ আনন্দে তাঁর অন্তরে সুরের প্রেরণা জেগেছে আগে, কথা জুড়েছেন পরে। 'ছিন্নপত্রে' এ রকমের একটি বর্ণনা পাই তাতে লিখেছেন, "এই শৈবালবিকীর্ণ সুবিস্তীর্ণ জল-রাজ্যের মধ্যে শরতের উজ্জ্বল রৌদ্রে আমি জানালার কাছে চৌকিতে বসে আর-এক চৌকির উপর পা দিয়ে সমস্ত বেলা কেবল গুন্‌গুন্ ক'রে গান করেছি। রামকেলী প্রভৃতি সকালবেলাকার সুরের একটু আভাস লাগবামাত্র এমন একটি বিশ্বব্যাপী করুণা বিগলিত হয়ে চারি দিককে বাষ্পাকুল করেছে যে এই সমস্ত রাগিণীকে সমস্ত আকাশের সমস্ত পৃথিবীর নিজের গান বলে মনে হচেছ। এ একটা ইন্দ্রজাল, একটা মায়ামন্ত্র। আমার এই গুন্‌গুন্ গুঞ্জরিত সুরের সঙ্গে কত টুকরো টুকরো কথা যে আমি জুড়ি তার সংখ্যা নেই। এমন এক-লাইনের গান সমস্ত দিন কত জমেছে এবং কত বিসর্জন দিচ্ছি।...আজ সমস্ত সকাল নিতান্ত সাদাসিধা রামকেলীতে যে গোটা দুই তিন ছত্র বার বার আবৃত্তি করেছিলুম সেটুকু মনে আছে,—নমুনাস্বরূপ উদ্‌ধৃত ক'রে দিলুম—'ওগো তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে।' এই গানটি পরে 'গীতাঞ্জলি'তে স্থান পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি। 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের রচনা নিয়ে যখন তিনি মেতে আছেন, সেই সময় একদিন অতি প্রত্যুষে ডাক পড়ল। সচরাচর এত সকালে তিনি ডাকতেন না। গিয়ে দেখি তখন তাঁর সকালের খাওয়া শেষ হয় নি। বললেন একটি গান তাঁর মাথায় হঠাৎ ঘুমের মধ্যে মাঝরাতে এসেছিল, কিন্তু সেই যে ঘুম ভাঙল, আর সারারাত ঘুমুতে পারেন নি। গানের সুর ও অমার্জিত তার ভাষা নিয়ে সারারাত কাটালেন। সকালে বিছানা ত্যাগ ক'রে তার পরে কাগজে-কলমে তাকে লিখেছেন। দুঃখ ক'রে বললেন, রাত্রে গানটি তাঁর মাথায়

বেশ পরিষ্কার ছিল, সকালে নানা বাধায় একটু এদিক ওদিক হয়েছে সুরে। গানটি হল, 'আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি'।

স্নানের সময় গানের প্রেরণা গুরুদেবের মনে জাগে, এ রকমের কথা শুনলে অনেকেরই হয়তো মনে হাসির উদ্রেক হতে পারে। কিন্তু বস্তুত তাও হয়েছে। 'ছিন্নপত্রে' সেই বিষয়ের অবতারণা ক'রে তার কারণও বিশ্লেষণ করেছেন; তাতে বলেছেন, "ও গানটা আমি নাবার ঘরে অনেকদিন একটু একটু করে সুরের সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করেছিলুম। নাবার ঘরে গান তৈরি করবার ভারি কতকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমত নিরালা, দ্বিতীয়ত অন্য কোনো কর্তব্যের কোনো দাবি থাকে না; মাথায় এক টিন জল ঢেলে পাঁচ মিনিট গুন্‌গুন্‌ করলে কর্তব্যজ্ঞানে বিশেষ আঘাত লাগে না—সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে কোনো দর্শক-সম্ভাবনামাত্র না থাকাতে সমস্ত মন খুলে মুখভঙ্গী করা যায়। মুখভঙ্গী না করলে গান তৈরি করবার পুরো অবস্থা কিছুতেই আসে না। ওটা কিনা ঠিক যুক্তিতর্কের কাজ নয়—নিছক ক্ষিপ্তভাব।"

নাবার ঘরে তাঁকে গান গাইতে অনেকেই শুনেছেন, আমার নিজের শোনা একটি গানের কথা আজ মনে পড়ে। সিংহলে ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে যখন গুরুদেবের সঙ্গে আমরা যাই, তখন প্রায় একই বাড়িতে আমরা সকলে থাকতাম। একদিন সকালে স্নানের সময় তিনি প্রাণ খুলে সকালের নানাপ্রকার রাগিণী আলাপ করেছিলেন। তাতে কোনো কথা ছিল না।

আমরা জানি, গুরুদেব বাল্যকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচিত পিয়ানোর গতের সুরে গান রচনা করেছেন। অর্থাৎ, পিয়ানোযন্ত্রে রাগ-রাগিণী যে ছন্দে বাজত তার সঙ্গে মিল ক'রে তিনি কথা বসিয়েছেন। 'মায়ার খেলা'য় (পরে বসানো হয়েছে) 'দে লো সখী দে পরাইয়ে গলে' গানটি তার একটি উদাহরণ। এরকম যতগুলি গান আছে, সে-সবের সঙ্গে পরবর্তী জীবনের গানের তুলনা করা চলে না—ভাবে ভাষায় ও রচনায়।

এর পরে তাঁকে দেখছি হিন্দী গানের সাহায্যে ধর্মসংগীত ও 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র গান রচনা করতে। বিশেষ ক'রে ১৩১৪ সাল পর্যন্ত ঐ প্রথায় বেশির ভাগ ধর্মসংগীত রচনা করেছেন। এর পর থেকে উক্ত পদ্ধতিতে সংগীত রচনা করতে দেখলাম খুব কম। তার কারণ পিতার মৃত্যু আর দাদাদের মধ্যে অনেকেই ছড়িয়ে পড়লেন জোড়া-সাঁকোর বাইরে—তাই মাঘোৎসবে কলকাতার প্রতি তেমন আর টান রইল না। জোড়া-সাঁকোর বাড়িতে ওস্তাদদের গানের মজলিসও তখন বন্ধ হয়ে গেছে। অন্য গানের সাহায্যে বাংলা গান রচনা করার প্রয়োজন তিনি আর তখন বোধ করছেন না, 'গীতাঞ্জলি'র গানে তা প্রতিভাত।

এখানে হয়তো অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, গুরুদেবের হিন্দীভাঙা বাংলা গানের মূল হিন্দী গান বা অন্য সব গানগুলি কি? সব গানের কথা বলা যাবে না, তার কোনো প্রয়োজনও নেই। কেবলমাত্র বিভিন্ন প্রকৃতির এক-একটি গানের বিষয়ে উল্লেখ ক'রে পাঠকের কৌতূহল মেটাতে চেষ্টা করব। হিন্দী গানের কাব্যসম্পদ সাধারণত উৎকৃষ্ট নয় ব'লে গুরুদেবের মতো কবি সে গান ভেঙে বাংলা গান রচনাকালে তার সুর ও ছন্দ-সম্পদকেই গ্রহণ করেছেন, কথার প্রতি বেশির

ভাগ ক্ষেত্রেই নজর দেন নি। তিনি নিজের মনের আবেগে হিন্দী গানের সুর ও ছন্দকে বজায় রেখে পৃথক ভাবের কথা তাতে জুড়েছেন। গানগুলি প্রায়ই ধর্মসংগীত, অন্যান্য গানও আছে।

রবীন্দ্রসংগীতে 'আড়ানা' রাগিণীতে একটি প্রচলিত গান আছে, সেটি অনেকেই শুনে থাকবেন। ওস্তাদমহলে এক সময় আদরের সঙ্গে গানটি গাওয়া হত। সেই গানটি হল 'মন্দিরে মম কে আসিলে হে'। হিন্দী ভাষার—

'সুন্দর লাগোরী হৈ পিয়রবা
চঞ্চল চপল চখন লখন
দোরে দোরে মোরে মোরে
ফির মুস্‌কানী বাণী ॥...'

গানটি থেকে ঐ বাংলা গানটি রচনার প্রেরণা তাঁর মনে এসেছিল। 'ছেলেবেলা' পুস্তকে গুরুদেব কাফি রাগিণীর ধ্রুপদ—

'রুম ঝুম বরখে আজু বাদরওয়া পিয়া বিদেশ মোরি;
থরথরাত ছতিয়া ন নিশ দিন মন ভাবে।
নৈন ন নীদ আবে দামিনী দমক লাগ
উন বিন কল ন পরত নাথ নাথ ধাবে।

গানটির উল্লেখ ক'রে বলেছেন যে, তাঁর বর্ষার গীতকুঞ্জে এই সুরটি স্থান পেয়েছে। কিন্তু এ গানটি তিনি বর্ষাসংগীতে পরিণত করেন নি ব'লেই আমার বিশ্বাস, করেছেন একটি উপাসনার গীতে। গানটি হল—

'শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ, পথে পথে,
ফিরি হে দ্বারে দ্বারে,—
চির-ভিখারী হৃদি মম নিশিদিন চাহে কারে ॥...'

এই সুরে তাঁর কোনো বর্ষার গান না পেয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, হয়তো ভুল করেছেন, তাঁর ঠিক স্মরণ ছিল না যখন এ কথা লেখেন, পরে সংশোধন ক'রে দেবেন এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

কোনো কোনো বাংলা গানের আরম্ভে হিন্দী গানের সঙ্গে ভাবের একটু মিল দেখি। কিন্তু পরে আবার অন্য পথ ধরেছে।

মুরলী ধুনি শুনি অরী মাই, যমুনাতীর
তব সোঁ হম তন মন যোবনসোঁ বিকাই।'

গানটি সিন্ধু রাগিণীর। এরই থেকে বাংলা গান রচনা হল 'চরণধ্বনি শুনি তব নাথ জীবনতীরে'। 'মুরলি ধুনি' ও 'যমুনাতীর' কথা দুটি বদলে 'চরণধ্বনি' ও 'জীবনতীর' হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে যদিও একটু ভাবগত মিল পেলাম, অন্য পঙ্‌ক্তিগুলি একবারে আলাদা পথ ধরেছে। ভৈঁরো রাগে, 'মন জাগো মঙ্গল-লোকে' উপাসনার গানটি রচিত হয়েছিল হিন্দী—

'জাগো মোহন প্যারে,
সাঁবরী সুরত মোরে মন ভাবে
সুন্দর লাল হমারে...'

গানটির অনুসরণ ক'রে।

ভাবের দিক থেকে প্রায় সব গানটিই মেলে এরকম হিন্দী গানে বেশি না থাকলেও একেবারে নেই এমন নয়। হিন্দী গানের ভাষাও কখনো তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছে। গুরুদেবকে প্রায়ই গাইতে শুনেছি বেহাগ রাগিণীর হিন্দী গান—

'ক্যায়সে কাটোঙ্গে রয়না সে পিয়া বিনা
একেলি জাগি সজনি আজু মোরা
নয়ন মে নিদ ন আওয়ে ছোঁড়ি সৈয়াঁ॥'

এর উপরে নির্ভর ক'রে বহু বৎসর পূর্বে একটি ধর্মসংগীত লিখেছিলেন 'তিমির বিভাবরী কাটে কেমনে জীর্ণ ভবনে, শূন্য জীবনে।' পরে যখন 'শাপমোচন' লিখলেন, তখনো পেলাম ঐ গানটির অনুসরণে—

'হে বিরহী, হায়, চঞ্চল হিয়া তব—
নীরবে জাগ একাকী শূন্য মন্দিরে
কোন্ সে নিরুদ্দেশ-লাগি আছ জাগিয়া।...'

প্রাচীন রচয়িতা জানকী দাস রচনা করেছিলেন বর্ষার গান—

'প্রচন্ড গর্জন সজল বরখা ঋতু,
কাম অগম অত বিরহিনী জীয়ন তর্জন।
ঝট অস দামিনী মতঙ্গ সম যামিনী।
অরুদ্রুম চাপ কর্কশ বুঁদ বারি বরখন।...'

এই গানটি অবলম্বন ক'রে বাংলা ভাষায় চমৎকার বর্ষার গান রচিত হল—

'প্রচন্ড গর্জনে আসিল একি দুর্দিন—
দারুণ ঘনঘটা অবিরল অশনিতর্জন॥
ঘন ঘন দামিনী-ভুজঙ্গ-ক্ষত যামিনী,
অম্বর করিছে অন্ধনয়নে অশ্রু-বরিষন।'

'ভানুসিংহের পত্রাবলী'তে এক চিঠিতে জানাচ্ছেন, "আমি সন্ধ্যাবেলায় সেই যে গান গাই 'বীণা বাজাও হে মম অন্তরে' এই গানটি তোমার মনের মধ্যে বরাবরকার মতো স্বরলিপি করে লিখে রেখে দেবার ইচ্ছা আছে—মনটি গানের সুরে এমনি বোঝাই হয়ে থাকবে যে বাহিরের তুফানে তোমাকে নাড়া দিতে পারবে না।" এ গানটি গুরুদেবের অতি প্রিয় গান ছিল সে কথা উপরের মন্তব্যেই দেখা যাচ্ছে; আমি তাঁকে বহু বার এ গানে মগ্ন হতে দেখেছি। বাংলা কথা সম্পূর্ণ এখানে তুলে দিয়ে তার পরে হিন্দী গানটিও সম্পূর্ণ তুলে দিচ্ছি। বাংলা গানটি হল—

'বীণা বাজাও হে মম অন্তরে॥
সজনে বিজনে, বন্ধু, সুখে দুঃখে বিপদে—
আনন্দিত তান শুনাও হে মম অন্তরে॥

এর হিন্দী কথা হল—

'বীণ বাজাই রে মন লে গয়ো।
মধুর মধুর ধ্বনি অধর না ধররে
রস ভরি তান শুনাইরে মন লে গয়ো॥'

হিন্দী সংগীত যে সর্বত্রই কাব্যরসবিহীন, এ কথা মনে করতে বাধে যখন দেখি উপরের এই হিন্দী গানের মতো অনেক হিন্দী গান আছে যার কাছে ভাবের দিক থেকেও কিছু আহরণ করতে গুরুদেব কুণ্ঠিত হন নি।

হিন্দীতে তেলেনা গান কাকে বলে তা আমরা জানি; নটমল্লার রাগের তেলেনা গান—

'দারাদীম্ দারাদীম্ দারাদীম্ দারা তাদারে দানি দানি
তানা না দের্ দের্ তোম্ তা নানা তা না
তোম্‌দের্ তদারে দানি তাদানি তাতা দানি দানি দানি দানি ॥'

এর সুর ও ছন্দে অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করেছিলেন, 'সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে' এই ব্রহ্মসংগীতটি। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'তে ভূপকল্যাণের একটি গানে আছে 'এইবেলা সবে মিলে চলো হো', এই গানটি হিন্দী চতুরঙ্গের গান—

'চতুরঙ্গ রস সন গায়ে হো গায়ন গুণী আয়ে
মহম্মদসাকে ঘর কাজ হস্তী তুরঙ্গ সরস সুখ পাবে...'

থেকে সংগ্রহ করা। হিন্দী গানের সঙ্গে কিভাবে মিলিয়ে গানের কথা বসাতেন এ বিষয়ে অনেকের জানতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

হিন্দী গানের কথা রাগিণীতে মিশে যখন প্রকাশ পায় তখন কথাটা সম্পূর্ণ না বুঝলেও সুরে ও ছন্দে মনের উপর একটা বিশেষ রেখাপাত করে, এ আমরা জানি। একটা বিশেষ রসের সৃষ্টি করে। সেই রসটিকে মনের মধ্যে রেখে, কথার ছন্দ মিলিয়ে তিনি মনে মনে একটা কোনো ভাবকে গড়ে তুলতেন। তিনি হিন্দী গানের সুর-ছন্দের সম্পদে যে রস মনে অনুভব করতেন তারই উপরে বিশেষ জোর দিতেন। হিন্দী গানের ভিতর দিয়ে তাঁর মনে যে রস জাগত তাকেই তিনি নিজের ভাষায় বেঁধে ফেলতেন। এই দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় হিন্দী গানের ছন্দে ও সুরে যে রস তাঁর মনে জাগে তার বিপরীত কথা তাঁর হিন্দী-ভাঙা বাংলা গানে নেই। তিনি তার বিরুদ্ধাচরণ করেন নি।

এটি হল তাঁর সবরকম ভাবের গানরচনার মূল আদর্শ। বোলের ছন্দে নাচকে বা সেতারের গতের ছন্দে বাজনাকে যে ভাবে অন্তরে উপলব্ধি করেছেন, কথাটা সেইভাবেই বসিয়েছেন।

এই পদ্ধতিতে গুরুদেবকে গান রচনা করতে হয়েছিল অনেক। রচনা করবার কারণ হল যখনই কোনো গান কানে শুনতে ভালো লেগেছে তখনই তাকে বাংলা-ভাষায় ধরে রাখবার চেষ্টা। এই পদ্ধতিতেই তিনি বহু প্রকার রাগিণীর ও ঢঙের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। তা ছাড়া আরো দেখা যায় যে, ব্রহ্মসংগীতগুলি সব সময় তিনি নিজে গান নি। সাধারণত বাড়ির ওস্তাদরা বা বাড়ির ছেলেমেয়েরা গেয়েছে। তখনকার দিনে ওস্তাদরা নিজেদের কোনো অভ্যস্ত গানের শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে বাংলা কথা বসিয়ে না দিলে কেবল ছন্দের উপরে সুর বসাতে পারতেন না। সেইজন্য বাড়ির ওস্তাদরা গুরুদেবকে গান শোনাতেন, তিনি তাদের সেই গানের কথার ছন্দে মিলিয়ে বাংলা কথা বসাতেন।

এই প্রসঙ্গে গুরুদেবের হিন্দী-ভাঙা বাংলা গানগুলি নিয়ে কিছু বলতে চাই।

অনেকেই এ গানগুলিকে উদাহরণ হিসেবে নিয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীতের রচয়িতাদের সঙ্গে গুরুদেবকে সমান স্থান দিতে চান। আমি মনে করি এ চেষ্টা করা বৃথা কারণ গুরুদেবের সংগীত-প্রতিভার বিকাশ আসলে এদিকে নয়। উচ্চাঙ্গ সংগীত ভেঙে বাংলা ভাষায় রচনা করে উচ্চাঙ্গ সংগীত রচয়িতার সমান তিনি কোনোদিন হতে চান নি। ভাঙা গানগুলি নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব যে গুরুদেব পুরাতন গানের কথার পরিবর্তে কেবল নতুন কথা তাতে বসিয়েছেন, সুর বা তালের দিক থেকে পরিবর্তন কিছুই করেন নি। যা ছিল তাই আছে। কথা সুর ও ছন্দকে একত্রে মিলিয়েই গান রচনা করেন সুরকারেরা। গুরুদেবের ভাঙা গানে তিন ভাগের মধ্যে দু ভাগের কৃতিত্ব হল পুরাতনদের, এক ভাগের ভাগী হচ্ছেন গুরুদেব। সুতরাং এ গানকে কি করে আমরা গুরুদেবের নিজস্ব সৃষ্টির দলে ফেলতে পারি? কিন্তু এই গানে তিনি আসলে যে ক্ষমতার পরিচয় দিলেন তা হল প্রাচীন গানের সুর ও ছন্দের সঙ্গে নিজের কথার মিলন। প্রায় প্রত্যেকটি গানই সুর ছন্দ ও কথা এক হয়ে গিয়ে এমন একটি পরিপূর্ণ রূপে আমাদের সামনে দাঁড়ায় যে, তাতে মুগ্ধ না হয়ে পারি না। এদিক থেকেই আমি এ গানগুলি রচনার সার্থকতা অনুভব করি। কেবল ধ্রুপদ ধামার খেয়াল অঙ্গের গান বলেই তার গৌরব যাঁরা দেখেন তাঁরা ভুল করেন।

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে বর্ষামঙ্গল উপলক্ষে দুটি সেতারের গৎ-ভাঙা গান রচনা করলেন। প্রথমটি হল 'এসো শ্যামলসুন্দর', অপরটি 'মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো'। এ দুটি গতে 'দা, দারা'র ছন্দে মিলিয়ে কথা বসিয়েছিলেন।

দক্ষিণভারতের গানের সুর তাঁর মন আকর্ষণ করেছিল, সে কথার পরিচয় পাই সেই ঢঙের বাংলা গানে। গুরুদেব অল্পবয়সে যখন কারোয়ার অঞ্চলে তাঁর দাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বাস করতেন, তখন কর্ণাটি কতকগুলি গানকে বাংলা গানে রূপান্তরিত করেন। তারই একটি গান 'আজি শুভদিনে পিতার ভবনে অমৃতসদনে চলো যাই'; এটি 'পূর্ণ চন্দ্রাননে চিন্ময় হরণে মন্মথ মোহনে মোহিনী' গানের সাহায্যে রচনা। শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবীর কাছ থেকে প্রাপ্ত 'নাদবিদ্যা পরব্রহ্মরস জানবে' নামক একটি হিন্দী গান থেকে রচনা করলেন 'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে' গানটি। 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর' গানটি ভাগিনেয়ী সরলা দেবী কর্তৃক সংগৃহীত মহীশূরের একটি ভজন গান ভেঙে রচনা। এইভাবে আরো অনেক-গুলি গান রচনা করেছিলেন।

১৩৩৭ সালে শান্তিনিকেতন-কলাভবনের দক্ষিণভারতীয় ছাত্রী সুগায়িকা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর কণ্ঠে তাঁদের দেশের কয়েকটি সুর তাঁর মন আকর্ষণ করে। 'বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী', 'বেদনা কী ভাষায় রে', 'বাজে করুণ সুরে' ও 'নীলাঞ্জন-ছায়া' গান কয়টি আমরা তারই ফলে পেয়েছি।

ছোটো ছোটো ঠুংরী বা টপ্পা-চালের গান থেকে অল্পবয়সে কিছু গান রচনা করেছিলেন, 'বাল্মীকিপ্রতিভা'য় তার পরিচয় স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু মূল হিন্দী গানগুলির নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। পরবর্তী জীবনের রচনার মধ্যে মনে পড়ে 'খেলার সাথি, বিদায়দ্বার খোলো' গানটি। এর মূল হিন্দী গানটি শুনেছিলেন

সুগায়িকা শ্রীমতী সাহানা দেবীর মুখে। এটি লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের একটি প্রচলিত গান 'তুমি কিছু দিয়ে যাও' গানটি ঠুংরী-চালের 'কৈ কছু কহরে' নামে একটি গান থেকে তৈরি, সুরটি শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর কাছ থেকে পাওয়া। মীরাবাঈয়ের নামে চলিত একটি ভজনও তাঁর কাছে শুনে বাংলায় তাকে রূপান্তরিত করেন। 'কখন দিলে পরায়ে স্বপনে বরণমালা ব্যথার মালা' গানটি সেইভাবে তৈরি। মূল হিন্দীতে কথা ছিল 'কিহে দেখা কান্‌হাইয়া প্যারা কি বন্‌শীবালা।' হিন্দী কথায় রাগিণী ছিল ভৈরবী। কিন্তু সুরে ও ছন্দে একটি লঘু চপলতার প্রকাশ ছিল, তা বাংলা কথার সঙ্গে মানায় না দেখে সুর বদল ক'রে করলেন পিলু-বাঁরোয়া এবং গতি হল অনেক ধীর। এই সুরটি আজকাল চলতি। শিখদের বিখ্যাত দোঁহা 'বাদৈ বাদৈ রম্য বীণ বাদৈ' শুনে ভাষা ও ভাব ঠিক রেখে গান রচনা করেছিলেন 'বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে'। গুজরাটি ভজন ভেঙে রচনা করলেন 'এ কী অন্ধকার এ ভারতভূমি'। গুরুদেবের গানে বাউল সুরের প্রভাবের কথা এই গ্রন্থে অন্যত্র আলোচনা করেছি। এখানে কয়েকটি বিখ্যাত স্বদেশী সংগীতের কথা উল্লেখ করছি। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' গানটি তিনি রচনা করেছিলেন—

'হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই ॥
আমার নিতাই যদি, (ডাক রে নিতাই গৌর ব'লে)
যদি মনে করে, তবে গৌর দিলেই দিতে পারে
একলা নিতাই (ও নিতাই) ॥'

গানটি অবলম্বন ক'রে। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি তিনি রচনা করেছেন 'গগন হরকরা'র রচনা—

'আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে ॥
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দিশে
দেশ বিদেশে
আমি দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে'

গানটির সঙ্গে মিলিয়ে।

'মন মাঝি, সামাল সামাল, ডুবল তরী,
ভবনদীর তুফান ভারী।
তোর হেলে পেলে না জল, কী করবি বল
কেমনে জমাবি পাড়ি...'

গানটিকে ভেঙে রচনা করেছেন 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে' গানটি। 'হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে' ও 'মন মাঝি সামাল সামাল' গান দুটি চুঁচুড়ার নৌকার মাঝিদের কাছ থেকে স্বর্গীয়া সরলা দেবী সংগ্রহ করেছিলেন।

• গানরচনায় আরো বিচিত্র নানা পথ গ্রহণ করতে তাঁকে হয়েছিল, সে কথাও এখানে বলা ভালো। শান্তিনিকেতনের নাচে, আগে গান রচনা হয়েছে নাচ যুক্ত হয়েছে পরে। কিন্তু নাচের চর্চা যতই বাড়তে লাগল ছেলেমেয়েদের নাচের ছন্দে নানা রকমের উৎকর্ষ দেখা দিল; তাদের নাচের মৃদঙ্গের তালের বোলে অনেক সময় কথা

বসিয়েছেন নাচটিকে গানে আরো জমাট করবার ইচ্ছায়। 'যায় দিন, শ্রাবণদিন যায়' গানটি তারই একটি উদাহরণ।

'চণ্ডালিকা' নাটকের জন্য একটি দক্ষিণী তালের নাচের কথা ভেবে 'আমার মালার ফুলের দলে আছে লেখা' গানটি লিখেছিলেন। নাচের তালে যে তেহাই পড়ে তাকেই মিশিয়ে দিলেন 'আয় তোরা আয়' কথাটিকে তিন বার গাইয়ে। এ-সব মৃদঙ্গের তালগুলি তাঁর সামনে আমি আউড়ে গেছি, তিনি সেই শব্দঝংকারে মিলিয়ে গান বেঁধেছেন। সিংহলের ক্যাণ্ডিনাচের তালের বোলের সঙ্গে হুবহু মিলিয়ে নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার আর-একটি গান বাঁধলেন 'যে আমারে এনেছে এই অপমানের অন্ধকারে'। এরকমের আরো একটি গান আছে। এত বিচিত্র প্রথায় গান রচনার দ্বারা গুরুদেবের কবিপ্রতিভা যে একটুও খর্ব হয়েছে তা মনে হয় না, অতি সামান্য কথার গানকে খুব উঁচুতে তিনি তুলে দিয়েছেন। তাঁর কবিত্বশক্তি এত সহজসিদ্ধ ছিল যে ঐরূপ প্রথাবহির্ভূতভাবে লিখেও কবিতাগুলি কাব্যে স্থান পেয়েছে।

অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন যে, গুরুদেব যে-সকল বাংলা গান হিন্দী বা অন্য গানের ছন্দ ও সুরের অনুকরণে রচনা করেছেন সেগুলি গাইবার সময় মূল গানের সঙ্গে অবিকল সুরে মিল রেখে গাওয়া হয়। সর্বত্র এই নিয়ম খাটে নি। এমন গান দেখা যায় যার সুর অনেক বদলে গেছে। পূর্বে উল্লিখিত 'কখন দিলে পরায়ে স্বপনে' গানটি তার একটি ভালো নমুনা। 'কোথা যে উধাও হল' গানটি রচিত বিখ্যাত হিন্দী গান 'বোলরে পাপৈয়ারা' গানটির অনুসরণে। সুরের মূল কাঠামোটি প্রায় ঠিক আছে, কিন্তু দুটো গান পাশাপাশি গাইলেই ধরা পড়বে তবু কত তফাত ঘটেছে সাধারণ রূপের দিক থেকে। সংগীতপণ্ডিতদের কাছে সেই পরিবর্তন এত বেশি মনে হয়েছে যে, তাঁরা মনে করেন এ মিঞা-মল্লার রাগিণীর গান নয়; এতে মল্লারের সুর থাকলেও আড়ানা ও কাফী রাগের স্বরবিন্যাসও আছে, সুতরাং এ রাগিণীর নাম অন্য কিছু হওয়া উচিত। একজন বলেছেন, রবিমল্লার বললে ক্ষতি কী। সাবিত্রী দেবীর গাওয়া মূল কর্ণাটি গানক'টির সঙ্গে রূপান্তরিত বাংলা গানের সুর-রূপে বেশ পার্থক্য আছে, গাইবার সময় বিশেষভাবে তা ধরা পড়ে। মূলের সঙ্গে তুলনায় মীড় ও গমকের কাজ বাংলা গানে অতি সামান্যই আছে, সুরেরও পরিবর্তন ঘটেছে। এইরকম প্রায় ঘটেছে, সে সম্বন্ধে বেশি উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

এ কথাটা বলতে হল এই ভেবে যে, কেউ কেউ মনে করেন এই পরিবর্তন গুরুদেবের অনুমোদিত নয়, তাঁর অজানিতে এ-সব ঘটেছে। কিন্তু কথাটা একেবারেই সত্য নয়। তাঁর মতে, বদল কিছু করতেই হবে, হুবহু এক রাখা সব সময় সম্ভব নয়।

বিদেশী গানের অনুকরণে রচিত রবীন্দ্রসংগীত আছে জানি। জীবনের প্রথম দিকেই সেরূপ কিছু বাংলা গান রচনা করেছিলেন। 'সকলি ফুরালো স্বপনপ্রায়' গানটি 'Robin Adair' নামে একটি স্কচ গান থেকে নেওয়া। 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদুবায়' গানের সুর দিলেন Ye banks and braes of Bonnie Doon' নামে বিখ্যাত স্কচ গান থেকে। 'কালমৃগয়া'র 'তুই আয় রে কাছে আয়,

আমি তোরে সাজিয়ে দিই' ও 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র 'কালী কালী বলো রে আজ' গান-দুটির সুর যথাক্রমে 'The British Grenadiers' এবং 'Nancy Lee' থেকে নেওয়া।

এই তালিকা থেকে একটা কথা না মনে হয়েই যায় না যে, গানে তিনি বিস্ময়কর উদার মনোভাব দেখিয়েছেন। এটি তাঁর পরিবারেরই একটি বিশেষ সম্পদ। ধ্রুপদের আওতায় তিনি বড়ো হয়েছেন বটে, খেয়াল গানও গেয়েছেন, আবার অনেক বাংলা ও হিন্দী টপ্পা গানও শুনেছেন ও গেয়েছেন এবং সে গানে তিনি বিশেষ আনন্দও পেয়েছেন। ঠুংরী গৎ তেলেনা বাউল ও কীর্তন ইত্যাদিতে গান বেঁধেছেন, যেখানে যেটা ভালো লেগেছে, তাকেই আহরণ করে বাংলার সুরসম্পদকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

ছন্দ ॥ তাল

ভারতবর্ষীয় গানের নিয়মমত গানের ছন্দকে যে তাল বলা হয় এ কথা আমরা সকলেই জানি। সে তাল হবে গানের কথার ছন্দনিরপেক্ষ। অর্থাৎ গানের কথায় কী ছন্দ আছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নিজে সম্পূর্ণ আলাদা তালে গানটি গড়ে ওঠে। গীতছন্দ ও পঠিতছন্দ সাধারণত এক হয় না। সেইজন্যে গানের তাল কবিতার কথার সঙ্গে বাঁধা থাকলেও সম্পূর্ণ নূতন জগৎ সৃষ্টি করে। ধ্রুপদ খ্যাল টপ্পা ঠুংরী থেকে গান নিয়ে প্রথমে তাকে কবিতার মতো পড়ে তার পর সুরে-তালে গাইলে উভয়ের মধ্যের পার্থক্য বোঝা যায়।

ভারতীয় সংগীতজগতে গানকে কবিতা হিসেবে ছন্দ মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে পদে পদে ছন্দপতন-দোষে তা পূর্ণ নয়, নানাপ্রকার মিশ্র ছন্দে বা ভাঙা ছন্দে তা তৈরি। অতি প্রাচীন কাল থেকে, কি লোকসংগীত কি উচ্চাঙ্গসংগীত, প্রাদেশিক ভাষায় হাজার হাজার রচিত হয়েছে অথচ কবিতা হিসেবে এর ছন্দপতনদোষকে কোনোদিনই কেউ দোষ বলে মনে করে নি। গানের সঙ্গে জড়িয়ে এ ধরনের একটা বিরাট কাব্যসাহিত্য আমরা পাই যাকে কোনোদিনই ছন্দে দীন বলে কাব্যজগৎ থেকে কেউ স্থানচ্যুত করতে পারে নি যতক্ষণ তার মধ্যে একটুকুও ভাবরসের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ ধরনের গানের নমুনা দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করি না, কারণ প্রাচীন ও আধুনিক সবরকমের বাংলা গানে এর প্রচুর দৃষ্টান্ত পাব; লোকসংগীতের যে-কোনো গানেও তাই পাচ্ছি, হিন্দীভাষার প্রায় সব গানই এইরকম ছন্দোহীন কবিতা। দক্ষিণভারতের গানেও ঠিক একই ধারা লক্ষ করেছি। গানে কবিতার মতো ছন্দ নেই বটে কিন্তু আরম্ভেই বলেছি আছে তবলা পাখোয়াজ বা ঢোলের তাল। সেই তালই কবিতার সব ত্রুটিকে উড়িয়ে দিয়ে সুরের সঙ্গে মিশে এক অনির্বচনীয় জগতের সন্ধান দেয়।

আধুনিক বাংলা গানের তাল নিয়ে আলোচনা করলে দেখতে পাই যে, হিন্দী-গানে ও আগেকার দিনের বাংলা গানে যেমন নানা তালের ব্যবহার ছিল, আধুনিক রচয়িতাদের মধ্যে তার বিশেষ অভাব। তিন-মাত্রা বা চার-মাত্রার চলতি ছন্দের তালের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ বেশি। দুরূহ ছন্দের বা বিষম মাত্রার তালে রচিত গানের স্বল্পতা দেখে মনে হয় এই ছন্দে গান বাঁধতে তাঁরা বোধ হয় কোনো উৎসাহ পান না।

গত শতাব্দীতে যখন হিন্দীগানের অনুকরণে বাংলাভাষায় নানাপ্রকার গানরচনা শুরু হয়, তখনো দেখেছি হিন্দীগানের নানাপ্রকার তাল নিয়ে রচয়িতারা গানরচনা করেছেন। কিন্তু বাঙালি সুরে ও তালে হিন্দীর অনুকরণের যতই ঊর্ধ্বে উঠতে লাগল, ততই দেখা গেল একমাত্র গুরুদেবই গানের তালের বৈচিত্র্যে আর-সকলের চেয়ে অগ্রসর। হিন্দীগানের মতো গুরুদেব তাঁর গানে নানারকম তালের ছন্দকে সমান ভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

এতদিন পর্যন্ত তাঁর গানের তাল নিয়ে ব্যাপক আলোচনা না হবার কিছু কারণও আছে। একদল শ্রোতা আছেন, যাঁদের কাছে সুরের সঙ্গে কথার মিলনই হল প্রধান।

গানের তালের গূঢ় তত্ত্বের কোনো খোঁজ তাঁরা রাখেন না। গানের সঙ্গে ছন্দের যোগ থাকা সত্ত্বেও গান থেকে তাকে আলাদা করে তাঁরা বিচার করেন না। এমন বহু শৌখিন গাইয়ে আছেন যাঁরা গুরুদেবের গানের ভক্ত, নিজেরা ছন্দ রেখে গান গেয়ে আনন্দ দেন ও আনন্দ পান, কিন্তু জানেন না যে, গানটি যে ছন্দে বা তালে গাইছেন, সে তালটি কী। অনেকে আছেন, যাঁদের কাছে গানের কাব্যরসই প্রধান হয়ে ওঠে, রাগিণী ও গানের তালের প্রতি কোনো লক্ষই থাকে না। ওস্তাদমহলে যাঁরা গুরুদেবের গানের কিছু চর্চা করেন তাঁরা পছন্দ করেন কেবল গুরুদেবের হিন্দীভাঙা বাংলা গান; সে গানে তাঁদের সংস্কারগত তালের পরিচয় পেয়ে তাঁরা খুশি হন।

গুরুদেব প্রথমজীবনে, অর্থাৎ যতদিন বিষ্ণু যদুভট্ট এবং তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতো সংগীতজ্ঞের আওতায় ছিলেন, ততদিন তবলা-পাখোয়াজের তালের নিয়মকে অবহেলা করতে পারেন নি। সেই কারণে তখনকার গানগুলিকে নানাপ্রকার তালের নাম দ্বারা চিহ্নিত করবার প্রয়াস দেখি। এমন-কি, সে প্রভাব শান্তিনিকেতনের জীবনে 'শারদোৎসব' নাটকের গানরচনাকালেও দেখি। তখন পর্যন্ত গানের মাথায় রাগ-রাগিণী ও তালের নাম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার পরে এভাবে মৃদঙ্গ বা তবলার তালের নাম দেওয়া তিনি পছন্দ করেন নি, তাই জীবনের শেষ পর্যন্ত বাকি গানের তালের কোনো নির্দেশ নেই। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী প্রশ্ন তোলায়, গুরুদেব উত্তরে জানিয়েছিলেন, "আমার আধুনিক গানে রাগ তালের উল্লেখ না থাকাতে আক্ষেপ করেছিস। সাবধানের বিনাশ নেই। ওস্তাদেরা জানেন আমার গানে রূপের দোষ আছে, তার পরে যদি নামের ভুল হয় তা হলে দাঁড়াব কোথায়?" এটা ঠাট্টা হলেও অত্যন্ত সত্য কথা—তিনি ওস্তাদদের সঙ্গে এক পথে চলেন নি বলেই এইভাবে কথাটা বলেছেন।

'শারদোৎসবে'র বছর দশেক পরে 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধে গুরুদেব তাঁর গানের তালের নাম না দেওয়ার কারণ আরো স্পষ্ট করে বুঝিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেছেন, "অনেক দিন থেকেই কবিতা লিখছি, এইজন্য...ছন্দের তত্ত্ব কিছু-কিছু বুঝি। সেই ছন্দের বোধ নিয়ে...গান লিখতে বস্‌লেম," কারণ "কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানের তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে-নিয়মে কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে গানে চলবে..." অন্যত্র বলেছেন, "কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেইটেই লয়।...অতএব কাব্যেই কী গানেই কী এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটলেও ভয় করবার প্রয়োজন নেই।" অর্থাৎ তেতালার ছন্দের গান হলেই ষোলো মাত্রা পূর্ণ করে প্রথম মাত্রায় ঝোঁক ও নয় মাত্রায় ফাঁক দেখাতে হবে, এরকম নিয়মের আর কোনো বাধা থাকল না। একতালা ছন্দে ও ঝাঁপতালে তাই ঘটেছে। তাঁর গানে সর্বত্রই যে তালের সম ও ফাঁক দেখাবার প্রয়োজন আছে, তাও নয়। সেদিকেও তিনি শেষজীবনের গানে একেবারেই ভ্রূক্ষেপ করেন নি। যদিও আট-মাত্রা ও ছয়-মাত্রায় পূর্ণ তালে তাঁর শেষদিককার গানের স্বরলিপি করা হয়, তাতেও অনেক সময় মাত্রা ঠিক রাখতে গিয়ে বহু গানের সুরকে কোনো কোনো জায়গায় টেনে বা ছোটো করে তবলার নিয়মে মেলানো হয়েছে।

এ কথা আমরা মেনে নিতে পারি যে, ছন্দের নিজস্ব ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা আছে। বিভিন্ন ছন্দের দোলা যে মনে বিভিন্ন রসের সঞ্চার করে এ কথাও সত্য। তাই যাঁরা প্রকৃত রসিক তাঁরা শান্ত ও গম্ভীর রসের কবিতায় ধীর লয়ের ছন্দের পক্ষপাতী হবেন। উদ্দামতায় ও চাঞ্চল্যে দেখা দেবে দ্রুত বা চঞ্চল ছন্দের প্রকাশ। ভালো কবিতায় ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছন্দ ব্যবহৃত হয়। কবিতার রস আমাদের কাছে আরো সুন্দর ফুটে ওঠে ছন্দের সাহায্যে। কিন্তু গানের বেলা আমরা পাচ্ছি কথার সঙ্গে সুর ও তাল। কবিতায় সুর ও তাল যেই বসল তখন তার নিজস্ব ছন্দের দায়িত্ব বলতে গেলে কিছুই থাকল না। কবিতা তখন সুর ও তালের সঙ্গে মিলে চলে।

কোনো কবিতা যখন গানে পরিণত হয়, তখন সেই কবিতার ছন্দ সুরকে যে অনুসরণ করবে তার কোনো কথা নেই। গানের সুরের সাহায্যে অন্য তালের ভিতর দিয়েও সেই ভাব ফুটিয়ে তোলা যায়। একটি উদাহরণ দিই—গুরুদেবের 'ক্ষণিকা'র কবিতা 'হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে' অনেক বৎসর পূর্বে রচিত, তিন-মাত্রার ছন্দে। কিন্তু সুরে ও তালে এই ভাবটি বজায় রেখে এটিকে গানে পরিণত করতে গিয়ে চার-মাত্রার তালের সাহায্য নিতে হয়েছে।

গানরচনায় অনেক সময় কবিতার ছন্দ-বদলের প্রয়োজন হলে গুরুদেব পূর্বে সেই গানের কথাকে নতুন ছন্দে কয়েকবার আবৃত্তি করে কথার একমেটেরূপ খাড়া করতেন। পরে সেই কথার উপর ভর করে সুরযোজনা করতেন। এইভাবে কথাকে সাজিয়ে নেবার সুবিধা এই যে, সুরযোজনার সময় কথার বৈশিষ্ট্য তাতে ঠিক থাকে! গানের কথার রসকে আরো সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলাই হল সুরের কাজ। এই কথাটি মনে রেখে সুরযোজনা করলে গানের কথা সুর ও ছন্দের সহযোগে মিলনের একটি সুন্দর রূপ আমরা দেখতে পাব। গুরুদেবের গানে কথা সুর ও ছন্দের অপূর্ব মিলনের এইটিই হল বড়ো কারণ।

গুরুদেবের গানে গীতছন্দ ও পঠিতছন্দ অনেক সময় এক হয় নি। গানের পঠিতছন্দ নিখুঁত হয়েছে তাও নয়। তাঁর গানগুলির পঠিতছন্দে পাকাপোক্ত ছন্দের বাঁধুনি গদ্য, গদ্যছন্দ, মিশ্র বা মুক্তছন্দ থাকলেও গানের বেলায় সেই-সব কথা তালের আশ্রয়ে নতুন রূপ নিতে বাধ্য হয়েছে।

গানের এই তথ্যগুলি না জানা থাকার দরুন গুরুদেবের গানকে সুরছাড়া ছাপার অক্ষরে পড়ে তাতে নানারূপ মিশ্র ও ভাঙা ছন্দের বিচিত্ররূপ দেখে কাব্যরসিকরা অবাক হন। একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক-কবি বলছেন—'সুর বাদ দিয়ে গান যখন কবিতার মতো পড়ি, তখনও তার ছন্দ একেবারে নিখুঁত হবে। যে-গান কবিতা হিসেবে ভাঙাচোরা ছন্দে গাঁথা, তাকে গ্রহণ করতে কাব্যবিলাসী মন সম্মত হয় না।' কিন্তু তাঁরা এ কথা জানেন না যে কাব্যজগতে ভাঙা ছন্দ দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও গানের জগতে কেউ তাকে লক্ষ করে না। এই কথা মনে করে পাঠককে সতর্ক করিয়ে দেবার জন্যে গুরুদেব বারে বারে গানের কথায় ছন্দপাত দোষের উল্লেখ করেছেন।

মায়ার খেলার ভূমিকায় আছে—

"ইহাতে সমস্তই কেবল গান, পাঠোপযোগী কবিতা অল্পই আছে।"

"এই গ্রন্থের অধিকাংশ গানই পাঠ্য নহে। আশা করি সুরসংযোগে শ্রুতিযোগ্য হইতে পারে।"—গানের বহি।

"গান ও গীতিনাট্যগুলি পাঠযোগ্য কবিতা নহে কেবল গ্রন্থাবলীর অসম্পূর্ণতা নিবারণার্থে প্রকাশকের অনুরোধে এই গ্রন্থে স্থান পাইল"—কাব্যগ্রন্থাবলী ১৩০৩।

'প্রবাহিণী' নামে গানের বইয়ের ভূমিকায় গুরুদেব এ কথা স্বীকার করে বলেছেন যে, "যে সমস্ত রচনা প্রকাশ করা হইল তাহার সবগুলিই গান, সুরে বসানো। এই কারণে কোনো কোনো পদে ছন্দের বাঁধন নাই।"

'গীতাঞ্জলি'র বিষয়ে বলেছেন, "গোড়াতেই বলে রাখা দরকার গীতাঞ্জলিতে এমন অনেক কবিতা আছে যার ছন্দোরক্ষার বরাত দেওয়া হয়েছে গানের সুরের পরে। অতএব, যে-পাঠকের ছন্দের কান আছে তিনি গানের খাতিরে এর মাত্রা কম বেশি নিজেই দুরস্ত করে নিয়ে পড়তে পারেন, যাঁর নেই তাঁকে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে।" উদাহরণস্বরূপ যে ক'টি কবিতার উল্লেখ করেছেন তার সব-ক'টিই হল গান।

'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচনার সময় বলেছেন, "এই গীতিনাট্যখানি ছন্দ ইত্যাদির অভাবে অপাঠ্য হইয়াছে। ইহা সুর লয়ে নাট্যমঞ্চে শ্রবণ ও দর্শনযোগ্য।"

'চিত্রাঙ্গদা' রচনাকালে বলেছেন, "এ কথা মনে রাখা কর্তব্য যে, এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূরে অতিক্রম করে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়।"

'শ্যামা' নৃত্যনাট্যটির প্রথমে নাম ছিল 'পরিশোধ'। তখন ভূমিকায় লেখা ছিল, "প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর সমস্তই সুরে বসানো। বলা বাহুল্য ছাপার অক্ষরে সুরের সঙ্গ দেওয়া অসম্ভব ব'লে কথাগুলির শ্রীহীন বৈধব্য অপরিহার্য।"

১৩৪৩ সনের 'বর্ষামঙ্গলে'-র 'চলে ছলোছলো নদীধারা', 'আঁধার অম্বরে', 'ওই মালতীলতা দোলে' গান-ক'টির কথা উল্লেখ করে বলেছেন, "এই গানগুলি কবিতা নয় এগুলি গান। পাঠ-সভায় এদের স্থান নয়, গীত-সভায় এদের আহ্বান; সঙ্গে সুর না থাকলে এরা আলো-নেভা প্রদীপের মতো।"

গুরুদেবের মতো ছান্দসিক কবি ও গীতরচয়িতার বেলায় এরূপ কেন হল, এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে জাগে। আবার অনেকে বিস্মিত হন মুক্তছন্দ, ছন্দশৈথিল্য, গদ্যরচিত বা অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতার রূপ দেখে। তাঁদের ধারণা গুরুদেব এই সব কাজ খুব ভেবে চিন্তে চেষ্টা করে করেছেন। কিন্তু তাঁদের এ ধারণা যে ঠিক নয় কেন তা বুঝিয়ে বলি।

তাঁর হিন্দীভাঙা, তেলেনাভাঙা, বা গৎভাঙা বাংলা গানের বেলায় মুক্তছন্দ ছন্দশৈথিল্য ইত্যাদির চেহারা ফুটে উঠেছে। কারণ হিন্দীগানে, তেলেনায় বা গতে, কথা বা যে শব্দ বসে, কবিতার ছন্দের মতো তার বাঁধন থাকে না। আশৈশব এধরনের নানাপ্রকার অমিল, ভাঙা ছন্দের গান শুনে, গেয়ে এবং সেই ভাঙা ছন্দের অনুকরণে গান রচনা করে গুরুদেবের এ বিষয়ে একটি পরিষ্কার ধারণা হয়েছিল। তাই প্রচলিত বাঁধা ছন্দের ব্যতিক্রমে গান রচনা করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। আবার গানের

আবেগে গুরুদেবের মনে অনেক সময় গানের সুর ও কথা একসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে, সেই-সব গানের কথাকে সাধারণত তিনি আলাদা করে ছন্দের বাঁধনে বাঁধতে ইচ্ছা করতেন না, ছন্দের নিয়মে ত্রুটি থাকলেও। যেমন আছে সেইভাবে রাখারই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। তাই এরকম গানের পদে গোড়া থেকেই ছন্দের বাঁধনের কড়াকড়ি করবার প্রয়োজন হয় নি বলে সেখানে শিথিলতা দেখা গেছে। কারণ তিনি জানতেন, এ অভাব গানের সুরে তালে মিশে পূর্ণ হয়ে যাবে। এ ধরনের গানকেই কেউ কেউ বলছেন মুক্তছন্দ বা গদ্যেরচিত গান।

'তুমি তো সেই যাবেই চলে', 'দখিন-হাওয়া জাগো জাগো' ও 'পূর্ণচাঁদের মায়ায় আজি ভাবনা আমার পথ ভোলে' ধরনের গানে ছন্দের ঝোঁক যে মাত্রায় পড়ে সে গুলিও উল্লেখযোগ্য। এর বৈশিষ্ট্য হল গানের সময় প্রতি কথার দ্বিতীয় অক্ষরকে তালের প্রথম মাত্রা ধরা হচ্ছে, এবং তার উপরেই ছন্দের ঝোঁক পড়ে। আমরা গানে সাধারণত শব্দের প্রথম অক্ষরের উপরেই তালের ঝোঁক দেখতে অভ্যস্ত। গানের মাঝে কখনো কখনো তারও ব্যতিক্রম ঘটে, কিন্তু আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত উপরের তিনটি গানের মতো এক রকমে দ্বিতীয় অক্ষরে ঝোঁক রেখে যাওয়ার রীতি আর কারো বাংলা গানে দেখি নি। চলতি প্রথামত উপরের গান-ক'টির প্রথম অক্ষরে ঝোঁক দিয়ে যদি গান করি তবে দেখব গানটি একটি স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ছন্দের ভাগ এইরকম—

তু I মি ০ তো। সে ই যা। বে ই চ। লে ০ কি I

I ছু ০ তো। না ০ র। বে ০ বা। কি ০ ০ I

এ ধরনের ছন্দোযুক্ত গান আরো অনেক আছে, এবং এখানেও বলে রাখা ভালো যে, তাঁর বৃদ্ধবয়সের গানের মধ্যেই এইরূপ ছন্দের ভাগ ব্যবহৃত হয়েছে বেশি।

কবিতার ছন্দকে যথাসম্ভব বজায় রেখেও গুরুদেব অনেক গান রচনা করেছেন। এই রকমের বিভিন্ন ছন্দের কয়েকটি গান নিয়ে এখানে আলোচনা করব। 'খর বায়ু বয় বেগে চারি দিক ছায় মেঘে', 'জনগণমন-অধিনায়ক' গান-দুটি চার-মাত্রা ছন্দের গান। দুটিকে সুর-ছাড়া কবিতার ছন্দে আবৃত্তি করলে দেখতে পাব গানে কবিতার ছন্দটিকে রাখবার চেষ্টা তিনি করেছেন। সাত-মাত্রার তালকে তিনে-চারে ভাগ করলে যে ছন্দ হয়, সেই ছন্দের গান 'হৃদয়ে মন্দ্রিল ডমরু গুরু গুরু' ও 'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন'; এ-দুটি আবৃত্তি করলে দেখব গানের ছন্দের সঙ্গে প্রায় এক। তিন-মাত্রার ছন্দ আছে 'নীল-অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর' ও 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গান-দুটিতে। আবৃত্তিকালে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, গানের ছন্দ আবৃত্তির প্রস্বন, যতি, টান ইত্যাদিকে বজায় রেখে তিন-মাত্রার তালে দাঁড়িয়ে আছে।

এই ভাবের কবিতার ছন্দ গানের বেলায় বদল না করবার কতকগুলি কারণও আছে। এখানে গীতরচয়িতা আগে গানের কথাগুলিকে লিখে ছন্দে সাজিয়ে নিয়ে তার পরে সুরযোজনা করেছেন। এই-ক'টি গানে কথার বাঁধুনি ও ছন্দের গতি এমনভাবে মিশে আছে যে, তাকে সুরযোজনার সময় কোনো রকমে বদলানো সম্ভব হয় নি। তা করতে গেলে এই-সব গানের কথার ভিতর দিয়ে শব্দঝংকারে বা

ছন্দে যে রস প্রকাশ পেয়েছে সেটি খর্ব হত। বাংলা গানে কথা বা গানের ভাবকে ফুটিয়ে তোলাই হল রচয়িতার একমাত্র লক্ষ্য। সেখানে যদি মনে হয় যে, ছন্দেরও মস্ত বড়ো স্থান আছে, তবে গানরচনার বেলায় সে কথাটিও আমাদের সর্বদাই মনে রাখা উচিত। রবীন্দ্রসংগীত আমাদের এদিক থেকেও বিশেষভাবে সাহায্য করে। এবং সেই গানকে ছন্দের দিক থেকে আলোচনা করলে আমরা এই সত্যে উপনীত হব যে, কবিতার ভাবপ্রকাশে ছন্দ যেমন অত্যাবশ্যক, বাংলা গানে তেমনি সুর ছাড়া ছন্দোবন্ধ কথারও মস্ত বড়ো স্থান আছে।

ছান্দসিকেরা এ বিষয়ে একমত যে, গুরুদেব তাঁর প্রথমজীবনের কবিতারচনায় অক্ষরবৃত্ত ছাড়া অন্য ছন্দের কবিতায় যুক্তাক্ষর ব্যবহারে বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু পরে ছন্দ ও ধ্বনি-বৈচিত্র্যের জন্যে তাঁকে নানাপ্রকার যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট শব্দ কবিতায় বসাতে হয়েছে। তিনি নিজেও সে-কথা স্বীকার করে বলেছেন, "সে-কালে অক্ষর-গণতি করা তিন-মাত্রামূলক ছন্দে যুক্ত ধ্বনি বর্জন করে চলতুম। কিন্তু তাতে রচনায় অতিলালিত্যের দুর্বলতা এসে পৌঁছত। সেটা যখন আমার কাছে বিরক্তিকর হল তখন যুক্ত ধ্বনির শরণ নিলুম।" সাধারণ পাঠযোগ্য কবিতায় এর পরিচয় যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও তাঁর যুক্তাক্ষরবহুল গানের সংখ্যা খুব বেশি নয়। লিরিক বা গীতকবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর ভাব ও ভাষার সহজ সরল সাবলীল গতি, আন্তরিকতাপূর্ণ অনুভূতি, অবয়বের স্বল্পতা ও সংগীতমাধুর্য—গানরচনায় এই ধরনের কবিতাই সব চেয়ে উপযুক্ত বলে স্বীকৃত। তাই গানে যুক্তাক্ষরবহুল শব্দ না থাকাই স্বাভাবিক। তবু তাঁর পরবর্তী জীবনে যুক্তাক্ষরবহুল গান পূর্ব-জীবনের তুলনায় সংখ্যায় কিছু বেশি। দেখা গেছে, যুক্তাক্ষরবিশিষ্ট গানগুলি সাধারণত গম্ভীর প্রকৃতির অথবা জোরালো ভাবে পূর্ণ। 'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একি দুর্দিন', 'আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু', 'নীল-অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায়', 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী', ও 'মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন' প্রভৃতি গানে কথাটা পরিষ্কার বোঝা যায়। এ বিষয়ে তিনি নিজেও বলেছেন যে, "বাংলা ভাষার শব্দের মধ্যে আওয়াজ মৃদু ব'লে অনেক সময় আমাদের কবিদেরকে দায়ে প'ড়ে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতে হয়।" ..."এ সমস্ত গম্ভীর শব্দের আওয়াজে...মনটা ভালো ক'রে জেগে ওঠে।"

রবীন্দ্রসংগীতে লয়ের প্রতি লক্ষ রাখলে দেখা যায় প্রথমজীবনে তিনি দ্রুত ছন্দের গানের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। ১২৯১ সালে, অর্থাৎ যখন তাঁর বয়স ২৩ বৎসর মাত্র তখন 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র গান বাদ দিলে তিনি গান রচনা করেছেন শতাধিক। কিন্তু তাতে দ্রুত বা নাচুনে ছন্দের গান আছে প্রায় বারোটি এবং সব-ক'টি গানই খেমটা তালের। ১২৯৯ সাল পর্যন্ত আরো পাঁচটি মাত্র ঐরূপ গান রচিত হয়েছে। লক্ষ্য করে দেখা গেছে এই নাচুনে ছন্দে তিনি এ পর্যন্ত একটিও ধর্ম-সংগীত জাতীয়-সংগীত বা ঋতুসংগীত রচনা করেন নি। তার একমাত্র কারণ ছোটো-বেলা থেকে তাঁর মন ভারতীয় সংগীতের গাম্ভীর্যের প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হয়েছিল। দ্রুত ছন্দের তাল গাম্ভীর্যের পরিপন্থী।

মধ্যজীবনে দেখি ছন্দপ্রধান গানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ বেশি, ও আগের অনুপাতে ঢিমে লয়ের গানের সংখ্যা অনেক কম। এই পরিবর্তনের একমাত্র কারণ মনে হয়

বাউলসংগীতের প্রভাব। বাউলসংগীতে নাচনে ছন্দের প্রকাশ আছে, কিন্তু সে ছন্দ হিন্দী গানের খেমটার তালের মতো আবহাওয়া তৈরি করে না। যদিও ব্যাকরণগত মিলে উভয় তালই সমান। উভয় প্রকৃতির গানের গঠনে এমন কোথাও তফাত আছে, যার ফলে এদের চঞ্চলতার মধ্যেও পার্থক্য দেখা দেয়। বাউলের নৃত্যোপযোগী দ্রুত ছন্দের গানে তিনি পেয়েছিলেন অনির্বচনীয় আনন্দে নিজেকে ভুলে যাবার পরিচয়। বাউলের ছন্দে জাতীয়সংগীত রচনাকালে তিনি এই মুক্তির রূপ ফোটাতে পেরেছিলেন বলেই সেই প্রেরণা তাঁর বাকি জীবনের সমস্ত গানে প্রভাব বিস্তার করেছে। তখন থেকে বাউলের ভাবে বহু ধর্মসংগীত তিনি রচনা করেছেন, ঋতুসংগীতও করেছেন নানা রকমের, অন্যান্য গানও আছে অনেক।

যাঁরা গুরুদেবের সঙ্গলাভের সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা জানেন যে, গুরুদেব আপন মনে গান গাইবার সময় কখনো দ্রুত লয়ে গান গাইতেন না, সে বাংলাগানই হোক, আর অল্পবয়সে শেখা হিন্দীগানই হোক। আগের জীবনের গানই তিনি গাইতেন বেশি, কারণ শেষজীবনের গানের চেয়ে সেগুলি তাঁর বেশি মনে থাকত। যৌবনের গানগুলিতে বিগত দিনের নানা আনন্দবেদনার স্মৃতি তাঁর মনে যেমন জাগত শেষজীবনের গানে তা হত না। পরবর্তীকালের বহু গান কখন রচনা করেছেন, অনেক সময় তাও তাঁর মনে পড়ে নি। কিন্তু যৌবনের রচনার প্রায় প্রত্যেকটি গান তাঁর মনে ছিল এবং গেয়েও শোনাতে পারতেন। লক্ষ্য করে দেখেছি যে, তিনি সে-সব গান গাইবার সময় প্রায়ই বাঁধা তালে বা ছন্দে গাইতেন না, দ্রুত লয়ের গান ছাড়া। বহু নাটকের অভিনয়েও তাঁকে গান গাইতে শুনেছি, তখনো দেখেছি ঢিমে লয়ের গানে বাঁধা-ছন্দের নিয়ম একেবারে রাখেন নি; গান গাইতেন স্বাভাবিক কথা বলার ছন্দে, যেন গানেই কথা বলছেন। এইপ্রকার গায়কীপদ্ধতিটি খুবই মনোহর বলে মনে হত। তাতে গানের ভিতর দিয়ে ভাবটি খুবই সুন্দরভাবে প্রকাশ পেত। তবে এ বিষয়ে একটু বলবার আছে এই যে, বাঁধা-ছন্দকে ভেঙে কথার ছন্দে গান গাওয়ার রীতি খুব সহজ ব্যাপার নয়, এর জন্য চাই সংগীতে ও কাব্যে অতি গভীর রসবোধ, কারণ গানের সময় কোথায় সুরে টান ছোটো বড়ো হবে, লয় দ্রুত ও ঢিমে হবে, গানের কথা একটা আর-একটার গায়ে লেগে চলবে বা ছেড়ে ছেড়ে চলবে, এ-সবই ভালো ক'রে লক্ষ্য করতে হবে। তা না হলে সুর কথা সবই ছাড়া-ছাড়া শোনাবে, জোট বাঁধবে না।

তালওয়ালা অনেক গান এইরকম কথার ছন্দে তিনি গেয়েছেন, অনিয়ন্ত্রিত ছন্দে গানও অনেক রচনা করে গেছেন যা সেই ভাবেই গাওয়া হয়, যদিও তাঁর অনেক গানকে স্বরলিপির নিয়মে বাঁধতে গিয়ে সুনিয়ন্ত্রিত তালের নিয়মে বাঁধতে হয়েছে। সেই-সব গানের স্বরলিপিকে দেখব আমরা সুরের কাঠামো হিসেবে। সুতরাং যাঁরা কেবলমাত্র স্বরলিপির আনুগত্য স্বীকার করে এ ধরনের গান গাইবেন, তাঁরা সে-সব গানের উপর অত্যন্ত অবিচার করবেন। সে-সব গানের গায়কীপদ্ধতিটিকে শুনে না শিখলে সব মাটি। 'সখী, আঁধারে একেলা ঘরে', 'অশ্রুভরা বেদনা', 'কার বাঁশি নিশিভোরে', 'এসো শরতের অমল', 'বেদনা কী ভাষায় রে', 'বাজে করুণ সুরে', 'বন্ধু, রহো রহো সাথে' ও 'কখন দিলে পরায়ে' ইত্যাদি গান-ক'টি স্বরলিপি আকারে প্রকাশিত

হয়েছে নানা পুস্তকে। এইখানে প্রত্যেক সংগীতানুরাগীকে মনে রাখতে হবে যে, এই-সব স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ যখন তৈরি করেন তখন স্বরলিপির নিয়মে বাঁধবার জন্যে কোনো গান চার-মাত্রা কোনো গান তিন-মাত্রা দাদ্‌রা, সাত-মাত্রা তেওড়া ইত্যাদি নানা রকমের ছন্দের মাত্রায় তাঁকে স্বরলিপিতে লিখতে হয়েছিল। স্বরলিপি দেখে কেউ যেন মনে না করেন যে, গুরুদেব বা দিনেন্দ্রনাথ উভয়েই স্বরলিপির ছন্দে এই-সব গান গাইতেন। আমার শান্তিনিকেতনবাসের জীবনে রচিত যাবতীয় গান-রচনা এবং শিক্ষার সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম বলেই এ কথা আরো জোর করে বলতে পারছি।

গুরুদেবের গীতনাট্যগুলির কথা ধরা যাক। এ-সকল নাটকের গানগুলি বিভিন্ন স্বরলিপিকার বিভিন্ন কালে লিখে গেছেন, পুস্তকাকারে ছাপাও হয়েছে। কিন্তু অভিনয়কালে কোনোদিনই তার সব গান স্বরলিপির নিয়মে গাওয়া হয় নি। বহু গান অভিনয়ের মতো করেই গাইতে হয়েছে। আজ যদি সে ঢঙটিকে অবজ্ঞা করে হুবহু পুস্তক অনুযায়ী সেই-সব গীতনাট্যের গান গেয়ে অভিনয় করতে হয়, তবে সে অভিনয় কখনো সাফল্যমণ্ডিত হবে না।

এতক্ষণ গানরচনায় কথার ছন্দ ও তালের বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম, এইবার দেখা যাক ছন্দের সাহায্যে গানের দিক থেকে কতরকম নতুন তাল তিনি আবিষ্কার করেছেন।

প্রাচীন বা আধুনিক হিন্দীগানে যতরকম তাল আছে, রবীন্দ্রসংগীতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। ধ্রুপদ খেয়াল ঠুংরী টপ্পা ইত্যাদি কোনো চালেরই গানের তাল তাঁর সংগীতে বাদ পড়ে নি। তা ছাড়া বাংলার কীর্তনের ও লোকগীতির তালও তাতে স্থান পেয়েছে।

১৩০৩ সাল পর্যন্ত গুরুদেবকে গানে নতুন কোনো ছন্দ বা তাল নিয়ে পরীক্ষা করতে দেখি না। তার পরে ১৩১০ সালে প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে তিনটি গান পাওয়া যায়, সেগুলির তাল গুরুদেবের নিজের নতুন সৃষ্টি ব'লে স্বীকৃত হয়েছে। তাতে ধ'রে নেওয়া যায় ১৩০৩ থেকে ১৩১০ সালের মধ্যেই এই নতুন তালগুলি তিনি রচনা করেছিলেন। গান তিনটি হল 'গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে', 'নিবিড় ঘন আঁধারে' ও 'দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া'।

আট-মাত্রা ছন্দকে চারে-চারে সমান ভাবে ভাগ করে গাইবার চলন আছে সর্বত্রই, কিন্তু একে বিষম মাত্রায় ভাগ করে ৩-২-৩ মাত্রায় যদি আমরা গান করি, তা হলে তার চেহারা কী দাঁড়ায়? এই তালের 'গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে' 'ওই রে তরী দিল খুলে' 'জীবনে যত পূজা হল না সারা' 'কত অজানারে জানাইলে তুমি' ও 'জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে' গান-কটি শুনলে কথাটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। 'গভীর রজনী' গানটিকে ভাগ করে দেখাচ্ছি তালটি কিভাবে গানে বসেছে—

| । । | । । | । । । | । । । | । । | । । । |
I গ ভী র | র ০ | জ নী ০ I না মি ল | হৃ ০ | দ য়ে ০ I

এই গানের তালকে এক মাত্রা কমিয়ে যদি তেওড়া তালের ছন্দে ফেলতে যাই তা

হলে গানের চেহারা অনেক বদলে যাবে এবং এ তালটিতে যে-ক'টি গানের নাম উল্লেখ করেছি, সব-ক'টিই ঢিমে লয়ের গান। আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম গায়ক কাঙালী-চরণ সেন এই তালটি গুরুদেব-রচিত নতুন তালরূপেই ১৩১১ সালের 'ব্রহ্মসংগীত-স্বরলিপি'তে উল্লেখ করেছেন; তাতে এর নামকরণ করা হয়েছে 'রূপক্‌ড়া' এবং এর একটা ঠেকাও তিনি তৈরি করে দিয়েছেন—

I ধাগে তেটে তেটে | তাগে তেটে | কেটে তাগে তেটে I

এ তালের সম প্রথম অক্ষরেই—ফাঁকের ব্যবহার নেই—সম থেকেই গান শুরু হয়। উত্তরভারতীয় সংগীতে তালটি সম্পূর্ণ নতুন, কিন্তু দক্ষিণভারতের কর্ণাটি সংগীতে এ তালটি প্রচলিত; এর নাম তারা দিয়েছে 'সারতাল'।

নয়-মাত্রার তালকে তিন-চার রকমে ভাগ করে গুরুদেব কতকগুলি গান রচনা করেছেন। তার মধ্যে 'নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা' ও 'প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে' ধর্মসংগীত-দুটিতে নয় মাত্রাকে ৩-২-২-২ ভাগে বিভক্ত করেছেন-

I । । । | । । | । । | । । I

I নি বি ড় | ঘ ন | আঁ ০ | ধা রে I

I প্রে মে প্রা | ণে গা | নে গ | ন্ ধে I

'ব্রহ্মসংগীত-স্বরলিপি'তে কাঙালীচরণ লিখেছেন, এর নাম 'নবতাল'—এর ঠেকা হল—

I ধা দে ন্তা | তেটে কতা | গদি ঘেনে | ধাগে তেটে I

এটি গুরুদেবের সৃষ্ট নতুন তাল। 'ব্যাকুল বকুলের ফুলে ভ্রমর মরে পথ ভুলে' গানটি নয়-মাত্রা ছন্দে রচিত. স্বরলিপিতে এর ছন্দ দিনেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন ৫-৪ মাত্রায়।

। । । । । | । । । ।

I ব্যা কু ল ব কু | লে র ফু লে I

কিন্তু 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধে গুরুদেব বলেছেন তার ভাগ তিনে-ছয়ে

I ব্যা কু ল | ব কু লে র ফু লে I

'যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে' গানটিও নয়-মাত্রার বলে গুরুদেব 'সংগীতের মুক্তি' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, এবং ভাগ করেছেন এই ভাবে—

। । । । । । | । । ।

I যে কাঁ দ নে হি য়া | কাঁ দি ছে I

কিন্তু দিনেন্দ্রনাথ স্বরলিপিতে যে মাত্রা-ভাগ করেছেন তাতে সাধারণ দাদ্‌রার ছন্দই আছে। 'দুয়ার মোর পথপাশে' গানটিও নয়-মাত্রার তালের—

। । । । । । । । ।

I দু য়া র মো র প থ পা শে I

এইভাবে একে সাজানো হয়েছে। এর তালের ঝোঁক আসছে পূর্ণ নয়-মাত্রার শেষে.

প্রথম মাত্রায়। বাংলা সংগীতে বা উত্তরভারতীয় কোনো সংগীতে নয়-মাত্রার তালের চলন একেবারেই নেই। কিন্তু কর্ণাটি সংগীতে এ তাল নতুন নয়। তবে গুরুদেব নয় মাত্রাকে যেরূপ ভাগ করেছেন, তা সর্বত্রই কর্ণাটি সংগীতের সঙ্গে মিলবে না। তাদের আছে ৫-২-২ মাত্রার 'দুষ্কর তাল', ২-৭ মাত্রার 'ফুল তাল'। গুরুদেবের গানে এরকমের কোনো নয়-মাত্রার তাল নেই, কিন্তু 'দুয়ার মোর পথপাশে' গানটির সঙ্গে কর্ণাটি সংগীতের 'বস্তুতাল'-এর হুবহু মিল আছে। রবীন্দ্রসংগীত সংগ্রহে দুটি গানই এখন পর্যন্ত পেয়েছি যার তালের মাত্রা হল ১০। কিন্তু এ চলিত ঝাঁপ-তালের মতো নয়। 'ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল' গানটি ১০ মাত্রার, এর ভাগ হল ৫-৫ অর্থাৎ—

। । । । ।   । । । । ।

I দে খা দি য়ে যে | চ লে গে ল ও I

'ব্রহ্মসংগীত-স্বরলিপি'তে কাঙালীচরণ গুরুদেব-রচিত 'একাদশী' নামে একটি তালের উল্লেখ করেছেন, তার গানটি হল 'দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া'। এই তালের মাত্রা হল ৩-২-২-৪, যেমন—

। । ।   । ।   । ।   । । । ।

I দু য়া রে | দা ও | মো রে | রা ০ খি য়া I

এর ঠেকা দিয়েছেন—

I ধা দে ন্তা | তেটে কতা | গদি ঘেনে | ধাগে তেটে তাগে তেটে I

দিনেন্দ্রনাথ 'কাঁপিছে দেহলতা থর থর' গানটিকে ১১ মাত্রার তালে লিখেছেন, তার মাত্রা ভাগ করা হয়েছে ৩-৪-৪ মাত্রায়, যেমন—

। । ।   । । । ।   । । । ।

I কাঁ পি ছে | দে হ ল তা | থ র থ র I

কিন্তু কোনো তালের নাম নেই, ঠেকাও দেওয়া হয় নি। কর্ণাটি সংগীতে ১১ মাত্রার তাল আছে, তাদের নাম হল 'মণিতাল', 'বিন্দুতাল' ও 'নীলতাল'।

নবপঞ্চতাল অর্থাৎ ২।৪।৪।৪।৪ মাত্রা যোগে ১৮ মাত্রার তালের গান হল—

। ।   । । । ।   । । । ।   । । । ।   । । । ।

I জ ন | নী ০ তো মা | ০ র ক রু | ণ চ র ণ | খা ০ ০ নি I

২-৪ মাত্রায় বিভক্ত, মোট ৬ মাত্রার একপ্রকার তালের গান রবীন্দ্রসংগীতে আছে। উত্তর ভারতীয় সংগীতে অনুরূপ ছন্দের কোনো তাল আছে বলে জানা যায় না। কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় কর্ণাটি সংগীতে এই তালটি অতি প্রসিদ্ধ। কর্ণাটি সংগীতের শিক্ষার্থীকে এই তালে, 'মায়ামালব গৌড়' নামক রাগের, 'সারগম' ও একটি গান দিয়ে সংগীতের শিক্ষা শুরু করতে হয়। দক্ষিণীসংগীতে তালটির নাম হল, 'পত্তিতাল' বা 'রূপক তাল'।

গুরুদেব, এই ছন্দের তালটি তাঁর গানে ব্যবহার করলেও তার নামকরণ তিনি করে যান নি। ২-৪ মাত্রার, কর্ণাটি রূপক তালের ছন্দে তিনি, ১৩২৯ সালে প্রথম

যে গানটি রচনা করেছিলেন সেটি হল, “আমার যদিই বেলা যায় গো বয়ে’। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এর পূর্বে তিনি এই ছন্দ বা তালটি তাঁর গানে ব্যবহার কেন করেন নি? এর কারণ হল, ১৯১৮ খৃস্টাব্দের পর, এই ছন্দটির সঙ্গে গুরুদেবের ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ।

অন্ধ্রপ্রদেশস্থিত পিঠাপুরম রাজদরবারের প্রখ্যাত কর্ণাটি সংগীতজ্ঞ বীণাবাদক, সংগমেশ্বর শাস্ত্রী, সেযুগে মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে এসে বেশ কয়েক মাস থাকতেন। প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যায় গুরুদেব এবং শান্তিনিকেতনবাসীদের বীণা বাজিয়ে শোনাতেন। সেই যুগের, কিছু অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীরা, তাঁর কাছে বীণাবাজানোর শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এইভাবে তিনি, ইংরাজি ১৯২৫ সাল পর্যন্ত বেশ কয়েকবার শান্তিনিকেতনে এসে, কয়েক মাস থেকে, বীণার বাজনা শুনিয়েছেন এবং বীণা্‌ বাজাতে শিখিয়েছেন। তাঁর কাছে বীণার প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হত ‘মায়ামালব গৌড়’ রাগের নানাবিধ ছন্দবহুল ‘পাল্টা’, রূপকতালের ‘সারগম’ ও একটি গান দিয়ে। তিনি যখন সন্ধ্যায় সকলকে বীণা বাজিয়ে শোনাতেন, তখন তাতে প্রায়ই নানা রাগিণীতে গঠিত ২-৪ মাত্রার রূপক তালের কিছু গানও থাকত। দক্ষিণ ভারতীয় বীণা বাজাবার রীতি হল, ‘সা’ ও ‘পা’ সুরে বাঁধা চিকারীর তারে, ডান হাতের কড়ে আঙুলে, গানের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, তালের ঝংকার তোলা। এর দ্বারা গানের মূল ছন্দ বা তালটি বীণাতে খুবই স্পষ্ট বোঝা যায়। সংগমেশ্বর শাস্ত্রীর বীণাবাদন শোনার পর ২-৪ মাত্রার রূপক তালের সঙ্গে গুরুদেব ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পান। এবং তার পর থেকেই কর্ণাটি রূপক তালের ছন্দে গান রচনায় উৎসাহিত হন।

কর্ণাটি সংগীতের রূপক তালটি যে ভাবে সম, ফাঁক এবং মাত্রার দ্বারা গঠিত, তা হল—

+   0   +
।   ।   ।   ।   ।   ।
I ১   ২ | ৩   ৪   ৫   ৬ I

অর্থাৎ ১ম ও ৩য় মাত্রায় তালি, ২য় মাত্রায় ফাঁক।

গুরুদেব এই তালটিকে তাঁর গানে গ্রহণ করেও তার তালি অংশের ঝোঁকটি কেবল গ্রহণ করলেন। ১ম ও ৩য় মাত্রায়, বীণার চিকারীতারে যেভাবে ছন্দটি প্রকাশ করা হয়, সেইরূপ তালি বা ছন্দের ঝোঁকের উপরেই তিনি নির্ভর করলেন। সেই কারণে, দিনেন্দ্রনাথ ২-৪ ছন্দে রচিত গুরুদেবের প্রথম গানটির স্বরলিপি করলেন, এইভাবে—

II সা -ঋা | ঋমা -া -া -া I জ্ঞঋা - সণ্‌া | সা -া -া -া I
য ০   দি ০০০   বে ০ ০০   লা ০০০

গুরুদেবের মৃত্যুর পর, রবীন্দ্রসংগীত-বিশেষজ্ঞরা এই তালটির নামকরণ করে বললেন, ‘যষ্ঠী তাল’।

২-৪ মাত্রার এইরূপ একটি তাল, ১২৯৮ সালে (১৮৯৩), গুরুদেবের পরি-

বারে পরীক্ষামূলক ভাবে, নামসহ প্রচলনের চেষ্টা যে করা হয়েছিল, সম্প্রতি তার সন্ধান পাওয়া গেল। গুরুদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র, হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, একটি ব্রহ্মসংগীতে এইরূপ একটি তাল ব্যবহার করেছিলেন। তিনি 'সংখ্যামাত্রিক' স্বরলিপিতে, ১৮১৪ শকাব্দের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়, 'লচ্ছাসার' রাগে এবং 'চপক' নামক তালে, 'জয় জয় ব্রহ্মণ ব্রহ্মণ, মহাদেব, ভূমা ভূমা, অজর অমর' শীর্ষক একটি গান প্রকাশ করেন। 'চপক' তালটি, সেযুগে উত্তর ভারতীয় সংগীত-রসিকদের মধ্যে অজানা ছিল বলেই বোধ হয়, স্বরলিপির সঙ্গে তার পরিচয় দিয়ে, তিনি লিখেছিলেন—

"চপক তালটি অনেকটা সুরফাঁকতালের মত। সুরফাঁকতাল তিনটি তালিতে বিভক্ত। তাহার প্রথম এবং সর্বশেষ তালি প্রত্যেকে চারি মাত্রা এবং মধ্যের তালি দুই মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে। এই সুরফাঁকতালের প্রথম তালিবিভাগটি ছাড়িয়া দিয়া অবশিষ্ট তালিবিভাগ রাখিয়া দিলেই তাহা চপক তালের তালিবিভাগ হইল। সুরফাঁকতালের যেমন প্রথম তালিতে সম চপকতালেরও সেইরূপ প্রথম তালিতে সম পড়ে।" এই তালটি কিভাবে তিনি পেয়েছিলেন, বা নতুন সৃষ্টি কিনা সেইরূপ কোনো কথা তিনি পরিষ্কার করে বলেন নি।

হিতেন্দ্রনাথের বক্তব্যটিকে মাত্রাবিভাগের দ্বারা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছি।

সুরফাঁকতাল মোট ১০ মাত্রার তাল।

দুই প্রকার মাত্রা ভাগে, এই তালটি **সংগীত**জ্ঞদের মধ্যে প্রচলিত। যথা—

+ ২ ৩

১. I ১ ২ ৩ ৪ | ৫ ৬ | ৭ ৮ ৯ ১০ I অর্থাৎ এইরূপ সুরফাঁকতালে, সম সমেত মোট তিনটি তালি পড়ে, কোনো ফাঁক নেই।

+ ০ ২ ৩ ০

২. I ১ ২ | ৩ ৪ | ৫ ৬ | ৭ ৮ | ৯ ১০ I অর্থাৎ এতে সম সমেত মোট তিনটি তালির সহিত দুটি ফাঁক দেখাবার রীতি প্রচলিত। গুরুদেব এবং তাঁর আত্মীয়দের গানে দুই রকমের সুরফাঁকতালই ব্যবহৃত হয়েছে। হিতেন্দ্র-নাথ, ফাঁকবিহীন সুরফাঁকতালের সাহায্যেই যে 'চপক' তালটির উদ্ভাবনের কথা বলেছিলেন, তাঁর উপরের উদ্‌ধৃত উক্তি থেকে তা অনুমান করা যায়।

মোট ১০ মাত্রার এই তাল থেকে, প্রথমদিককার ৪ মাত্রা বাদ দিয়ে, ৫ম মাত্রাকে 'সম' বা প্রথম মাত্রা হিসেবে গ্রহণ করে তার দ্বারা পরবর্তী দুই তালিযুক্ত মোট ৬ মাত্রার যে ছন্দ বা তাল আমরা পাব, তাকেই হিতেন্দ্রনাথ বললেন **'চপক'** তাল। তিনি, মূল সুরফাঁকতালের ।৫ ৬। ৭ ৮ ৯ ১০। মাত্রা কটিকে যথাক্রমে ১ ২ । ৩ ৪ ৫ ৬। মাত্রায় সাজিয়ে নেবার কথা বলেছিলেন।

'চপক' তালের প্রকৃত রূপটি দেখাবার জন্য, সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপিতে প্রকাশিত হিতেন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতটির, আকারমাত্রিক স্বরলিপি মুদ্রিত হল—

II সা সা | সা সা রা -া I গা -া | -া -া -া -া I গা-মা | পা -া -া -া I

জ য় জ য় ব্র ০ হ্ম ণ্ ০ ০ ০ ০ ব্র ০ হ্ম ০ ণ্ ০

I মা মা | -া -া মা মা I মা মা | -া -া মা গা I র্সা-র্সা | র্সা -া র্সা-না I
মহা ০০দেব মহা ০০দেব ভূ০ মা ০ভ্০

I ধা - না | র্সা র্রা র্সা র্সা I র্সা র্সা | -া -া -া -া I
মা ০ অজরঅ মর ০০০০

এই গানটির আর-একটি স্বরলিপি পাওয়া যায়, সরলাদেবী-কর্তৃক ১৩০৭ সালে প্রকাশিত 'শতগান'-নামক স্বরলিপি গ্রন্থে। তাতে বলা হয়েছে যে, একটি হিন্দীগান ভেঙে এটি রচনা করেছিলেন, গুরুদেবের সেজদা, হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গানটির উপর 'লচ্ছাসার' রাগিণী ও 'চপক' তালটির নাম আছে। কিন্তু, হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার স্বরলিপির সঙ্গে তার তালের মিল নেই। সরলাদেবী, গানটি 'চপক' তালে রচিত বলেছেন, অথচ স্বরলিপি করেছেন চার-মাত্রার ভাগে মোট ১৬ মাত্রার তালের, যথা—

II সা সা সা সা | রা -া গা -া | -া -া গা -মা | পা -া -া মা I মা -া মা -া | মা মা মা -া I
জয়জয় ব্র০হ্ম্‌০ ০০ব্র০ হ্মণ্ ০০ম হা০দে০ বমহা০

| গা -া গা -া | -া -া -া -া I র্সা -া র্সা -া | না-র্সা ধা -না | র্সা র্রা র্সা র্সা | র্সা র্সা -া -া I
দে০ব০ ০০০০ ভূ০মা০ ভূ০মা০ অজরঅ মর০০

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি যে, চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে, অর্জুনের "ক্ষমা করো আমায়, বরণযোগ্য নহি বরাঙ্গণে" কথাটির সুর গুরুদেব বসিয়েছিলেন এই গানটিকে স্মরণ করে, কিন্তু 'চপক' তালের ছন্দটিকে তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন।

২-৪ মাত্রার ছন্দকে উল্টে নিয়ে গুরুদেব 'হৃদয় আমার প্রকাশ হল' গানটিতে ব্যবহার করেছেন—

। ।।। । । ।।।। ।।
I হৃ দ০য়্ | আ মার্ I প্র কা০শ্ | হ ল I...

অর্থাৎ এ গানের ঝোঁক দাঁড়াচ্ছে গিয়ে চারে-দুয়ে। এর কোনো নাম পাই না।

২-৩ মাত্রার তালের মধ্যে 'ঝাঁপতাল' প্রসিদ্ধ; সেখানে আমরা মাত্রার ঝোঁক পাই দুই-তিনে, কিন্তু এই দুই-তিন মাত্রাকে ঘুরিয়ে গুরুদেব অনেক গানেই ব্যবহার করেছেন। এর নাম হল 'ঝম্পক'। এটি একটি অপ্রচলিত তাল। হিন্দীগানে কদাচিৎ এর চলন দেখা যায়। এর প্রথম পদে তিন-মাত্রা, দ্বিতীয় পদে দুই-মাত্রা। এই তালের গান-কটি হল, 'যেতে যেতে একলা পথে নিবেছে মোর বাতি', 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে', 'ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার', 'দুখের বেশে এসেছ বলে', 'শুভ্র নব শঙ্খ তব', 'এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর' ও 'বিপদে মোরে রক্ষা কর'। এইভাবে গানের ভাগ করা হয়েছে—

। । । । । । । । । ।
I যে তে যে | তে ০ I এ ক্ লা | প থে I

কোনো তাল-বিশেষজ্ঞ এর ঠেকা দিয়েছেন—

I ধা গে না | ধা গে I ধা গে না | তে টে I

প্রথম মাত্রায় সম, ও সেখান থেকেই গানের শুরু।

এতক্ষণ যে-সব তালের বিষয়ে আলোচনা করলাম, তার অনেক তালের সঙ্গে কর্ণাটি সংগীতে মিল থাকাতে হয়তো সহজেই মনে হতে পারে, তবে কি সে-দেশের সংগীতের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল? তার প্রমাণ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু কর্ণাটি রাগিণীর অনুকরণে তাঁর অনেকগুলি গান আছে। সে গানগুলি কর্ণাটি সংগীত ভেঙেই রচিত। সে গানের একটিতেও ছন্দোবৈচিত্র্য দেখি না, উপরে উল্লিখিত তালের মতো। হয়তো তাঁর গানের তালবৈচিত্র্যে এই প্রবর্তনা এসেছিল কবিতার ছন্দোবৈচিত্র্যের সাফল্যের উৎসাহ থেকে।

উপরে যতগুলি নতুন তালে রচিত গানের নমুনা দেখানো হল তাতে যেন কারও মনে এই ধারণা না জাগে যে, গুরুদেবের গানে ঐ তালের সংখ্যা অনেক। কিন্তু তা নয়। নবপঞ্চতাল, নবতাল, একাদশী তাল, দশ-মাত্রার তাল, ২-৪ মাত্রা ইত্যাদি নতুন তাল হলেও কোনোটিতে একটি গান কোনোটিতে দুটি মাত্র গান রচনা করেছেন। নতুন তালের অধিকাংশ পরীক্ষামূলক মনোভাব থেকেই উৎপত্তি। স্বতঃউৎসারিত নয়। যে কারণে পরবর্তী জীবনে সেই-সব তালে আর গান রচনা করলেন না। এর মধ্যে কেবল দুই-চার মাত্রার তালকেই তিনি কিছুটা সহজ করে নিয়েছিলেন বলে বাকি জীবনে ঐ ছন্দের একাধিক গান পাই।

'রূপকড়া', 'একাদশী', 'নবতাল', 'ঝম্পক' ও ৪-২ মাত্রা ভাগে ৬-মাত্রা তালে গানগুলির উল্লেখ আমরা প্রথম পাই ১৩১০ সাল থেকে ১৩২৪ সালের মধ্যে ছাপা গানের বইগুলির মধ্যে। এর পরে ১৩২৯ সালে আমরা দুই-চার মাত্রার তালটির প্রথম ব্যবহার দেখলাম। এবং এর প্রথম গানটি হল 'আমার যদিই বেলা যায় গো ব'য়ে'। উপরে উল্লেখ করা নতুন তালগুলির মধ্যে এটিরই ব্যবহার সব চেয়ে বেশি, তার পরে 'ঝম্পক', 'রূপকড়া' ও 'একাদশী'র স্থান।

আরো একটি গান পাচ্ছি যার তালের মাত্রা ভাগ করা হয়েছে ৬-৬, এই তালের গান মাত্র একটি পাচ্ছি। গানটি যদিও ১৩০৪ সালের প্রকাশিত গান, কিন্তু ১৩২৬ সালে প্রকাশিত 'শেফালি' নামে স্বরলিপির বইতে গানটিকে ৬-৬ মাত্রায় ভাগ করে ১২-মাত্রার তালে সাজানো হয়েছে। ১৩০৪ সালে প্রকাশিত গানের বইয়ে ত্রিমাত্রিক একতালা ছন্দের কথা লেখা আছে। পুরো মাত্রা হিসেবে উভয়েই ১২-মাত্রার তাল কিন্তু উভয়ের ঝোঁক বা প্রস্বনের স্থান ভিন্ন।

নবপ্রবর্তিত তালে কেবল সমপ্রস্বন বা ঝোঁক দেখানো হয়েছে। যেমন আমরা দেখি 'তেওরা', 'আড়াচৌতাল' ও 'সুরফাঁকতালে'। তাতে চৌতাল ত্রিতাল বা দাদ্‌রা ইত্যাদির মতো ফাঁকের কোনো স্থান গুরুদেব দেন নি। প্রত্যেক ভাগের মুখেই ঝোঁক।

গুরুদেব প্রথমজীবনের লৌকিক ও ধর্মসংগীতে 'কাওয়ালি' ও 'ঠুংরী' নামে দুটি তাল অনেক ব্যবহার করেছেন। এ-দুটি তালের নাম তখনকার দিনে বাংলা-দেশের ওস্তাদমহলের খুব পরিচিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে এ-দুটির মধ্যে প্রথমটি হল

আজকালকার অধিক-প্রচলিত 'ত্রিতাল', এবং 'ঠুংরী' নামটি তাল রূপেও ব্যবহার হত ঐ জাতীয় একপ্রকার গানে। অবশ্য সে 'ঠুংরী' আজকালকার প্রচলিত 'ঠুংরী' নয়। সে ছিল অধিক সহজ ও সাদামাটাগোছের। কাওয়ালি বলতে তখনকার দিনে ত্রিতালের ছন্দকেই বোঝাত বলে গুরুদেবের কোনো গানে 'ত্রিতাল' নামটি নেই, কিন্তু ঢিমা তেতালা আছে। ১৩১৬ সালের আগে পর্যন্ত 'কাহারবা' তালটির নামও কোনো গানে পাই নি।

গুরুদেবের নতুন ও বাংলা সংগীতে অপ্রচলিত তালের গানগুলির প্রথম প্রকাশের একটি তালিকা একসঙ্গে দিলাম—

১৩১০ কাব্যগ্রন্থ। মোহিত সেন-সম্পাদিত।

গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে। রূপকড়া—৩।২।৩=৮ মাত্রা

দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া। একাদশী—৩।২।২।৪ =১১ মাত্রা

নিবিড় ঘন আঁধারে। নবতাল— ৩।২।২।২= ৯ মাত্রা

১৩১৬ গান। ইণ্ডিয়ান প্রেস-সম্পাদিত

জননী, তোমার করুণ চরণখানি। নবপঞ্চতাল— ২।৪।৪।৪।৪=১৮ মাত্রা

আজি ঝড়ের রাতে। ঝম্পক—৩।২=৫ মাত্রা

বিপদে মোরে রক্ষা করো। ঝম্পক—৩।২=৫ মাত্রা

১৩২১ গীতালি। হৃদয় আমার প্রকাশ হল। ৪।২=৬ মাত্রা

১৩২৪ সঙ্গীতের মুক্তি—(প্রবন্ধ)

ও দেখা দিয়ে যে চলে গেল। ৫।৫=১০ মাত্রা

ব্যাকুল বকুলের ফুলে। ৫।৪= ৯ মাত্রা

কাঁপিছে দেহলতা। ৩।৪।৪=১১ মাত্রা

দুয়ার মোর পথপাশে। ৯= ৯ মাত্রা

যে কাঁদনে হিয়া। ৬।৩= ৯ মাত্রা

১৩২৬ শেফালি। সখী, প্রতিদিন হায়। ৬।৬=১২ মাত্রা

১৩২৯ নবগীতিকা—১।

আমার যদিই বেলা যায় গো। ২।৪= ৬ মাত্রা

শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারা

আধুনিক ভারতীয় নৃত্যকলার বিষয়ে কিছু বলতে গেলেই গুরুদেবের নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তিনি যদি শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে নৃত্যকলাকে প্রথম উৎসাহিত না করতেন, তবে আজ আমরা আমাদের দেশে নাচের প্রচারের জন্যে বহু বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠান ও সংঘের পরিচয় পেতাম না এবং যে সম্মান আজ নাচিয়েদের আমরা দিচ্ছি, তাও এত সহজ হত কি না কে জানে।

গুরুদেব নিজে নাচিয়ে নন, অথচ তিনি নাচের নবযুগ সূচনা করেছেন, ভারতের অভিজাতসমাজে। তৈরি করেছেন জনসাধারণের মন, নানাভাবে বিরুদ্ধ মনোভাবের আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে। তারই ফলে এমন-সব নাচিয়েদের পেলাম যাঁরা দেশবিদেশে সম্মান পেয়ে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন।

তিনি দেশের মনোভাবকে নাচের অনুকূল পথে চালনা করলেন, তাঁরই রচিত শান্তিনিকেতনের সাহায্যে। প্রশ্ন উঠতে পারে শান্তিনিকেতন হল একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সেখানে কেন তিনি নৃত্যকলার আয়োজন করলেন। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হল সকল দিক দিয়ে মানুষকে বড়ো করে তোলা। সংস্কৃতির যে-ক'টি বাহন আছে, তার মধ্যে নৃত্যকলাকে একটি প্রধান বাহনরূপে একদিন আমাদের দেশে ধরা হয়েছিল। নানা কারণে নৃত্যকলা আমাদের সমাজ-জীবন থেকে বর্জিত হয়েছিল, বিশেষত শিক্ষাভিমানী উচ্চশ্রেণীর সমাজ থেকে। কিন্তু সুপরিচালিত নৃত্যকলা মানবমনের মহৎ আনন্দের উপাদান। শিক্ষার প্রধান কর্তব্য চিত্তকে নানাপ্রকার শিল্প ও জ্ঞানের দ্বারা সংস্কৃতির পথে জাগ্রত করে তোলা। গুরুদেব শান্তিনিকেতনে নৃত্যকলাকে স্থান দিয়েছিলেন এই কথা ভেবেই। এখানকার নাচকে এবং তার আদর্শকে ঠিকভাবে বুঝতে পারলে আমরা দেখতে পাব শান্তিনিকেতনে নাচের শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা কেবল নাচিয়ে তৈরি করা গুরুদেবের উদ্দেশ্য ছিল না; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা জ্ঞান ও অন্যান্য কলাবিদ্যা সমাজ-জীবনকে যেমন উন্নত শান্তিময় করে তোলে, নৃত্যকলাও যেন তাই করে।

এই চেষ্টার ফল গুরুদেব তাঁর জীবিতাবস্থায়ই দেখে যেতে পেরেছেন। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা নাচে তৈরি হয়ে উঠে প্রথম আশ্রমে নাচের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে এবং পরে তা ক্রমশ বাংলাদেশে ও সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে।

আগেই বলেছি নাচিয়ে তৈরি করা গুরুদেবের উদ্দেশ্য ছিল না, নাচের একটা মান নির্ধারণ করাই ছিল তাঁর প্রকৃত ইচ্ছা, যা হবে আজকালকার শিক্ষিত ও মার্জিত রুচিসম্পন্ন নরনারীর মনের খোরাক।

গুরুদেব নব্যভারতীয় নৃত্যকলায় এরূপ একটি ধারা প্রচলিত করে গেছেন, যার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যতের ভারতীয় নৃত্যকলা আরো বহুদূর এগিয়ে যেতে পারবে, যদিও এ সত্যিকার মার্জিত ও শিক্ষিত মনের খোরাক ব'লে, বৃহত্তর জন সাধারণের মন এখনো তেমনভাবে আকর্ষণ করতে পারে নি; শিক্ষিত ও অ-সংস্কৃত মনের আনন্দের উপাদানের এ প্রভেদ বোধ হয় চিরদিনই থাকবে।

গুরুদেবের প্রবর্তিত নাচের মূল বৈশিষ্ট্য হল তা খাঁটি ভারতীয় আদর্শের উপর গঠিত। ভারতীয় নৃত্যাভিনয়ের নিজস্ব যে বিশেষ ধারাটি বহুযুগ থেকে বয়ে এসেছে, এবং যে নৃত্যাভিনয়-পদ্ধতি একদিন সমগ্র প্রাচ্যকে একটা উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেই আদর্শ থেকে তিনি ভ্রষ্ট হন নি। অথচ তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টির বলে তাঁর রচনা প্রাচীন আদর্শের উপর দাঁড়িয়েও আধুনিক শিক্ষায় বর্ধিত নরনারীর অতি উপযোগী হয়েছে। গুরুদেবের প্রচলিত এই নৃত্যান্দোলনের মূল কাঠামোটি সকলেরই জানা থাকা উচিত মনে করে শান্তিনিকেতনের নাচের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করে দিচ্ছি।

গুরুদেব ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে 'বাল্মীকিপ্রতিভা', ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে 'কাল-মৃগয়া' ও ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে 'মায়ার খেলা' গীতনাট্য লিখেছিলেন এবং প্রত্যেকটি নাটকের অভিনয় দেখে তখনকার দর্শকমণ্ডলী মুগ্ধ হন। গান গেয়ে এগুলি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অভিনয় করতে হয়েছিল। এইভাবে একটা বিশেষ অভিনয়ধারা তখন প্রবর্তিত হয়। এইগুলি পুরোদস্তুর নাটক—নানা দৃশ্যে বিভক্ত হয়ে ও নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে এগুলির সমাপ্তি। কোনো-না-কোনো রকমের গল্পের সঙ্গে নাটকগুলি বাঁধা। সাধারণ গদ্যভাষায় একটিও কথা নেই। গানের সুরে, কিন্তু সাধারণ কথা-বার্তার ভাব-ভঙ্গিতে হাত নেড়ে, নড়েচড়ে পাত্রপাত্রীদের সব কথা বলতে হয়েছিল।

এ ধরনের গীতনাটক তিনি আর লিখলেন না। এর পরে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন' ও 'বৈকুণ্ঠের খাতা' লেখেন কলকাতায় অভিনয়ের জন্যে। এগুলো প্রকৃত থিয়েটারি আদর্শে রচিত নাটক। এতে গান থাকলেও তাকে গৌণভাবে রাখা হয়েছে।

১৯০১ খ্রীস্টাব্দে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপনের পর থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত তিনি কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সুবিধার্থে যে কয়েকটি নাটক রচনা করেন, তার মধ্যে 'শারদোৎসব', 'রাজা', 'অচলায়তন' ও 'ফাল্গুনী' নামে রূপক নাটক-ক'টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই নাটকগুলিতে কথার সঙ্গে গান প্রচুর ও কথার মতনই নাটকে তার মর্যাদা। গান না থাকলে নাটকের মাধুর্য যথেষ্ট কমে যায়। শান্তিনিকেতনে ও কলকাতার রঙ্গমঞ্চে নাটকগুলি অভিনীত হয়। দর্শকরা এ ধরনের নাটকের নূতনত্বে ও গীতমাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছিল। গানগুলি প্রায় সবই অভিনয় করে গাইবার জন্য।

এ ধরনের গীতনাটকের সঙ্গে বাংলাদেশের উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে অধিক প্রচলিত 'যাত্রা'র সাদৃশ্য দেখা যায়। তখনকার দিনের যাত্রা-থিয়েটারের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হলেও তাতে গান ছিল প্রচুর ও তাকে যাত্রার একটি অতিপ্রয়োজনীয় দিক বলেই মনে করা হত।

আমার মনে হয় এই ধরনের গীতনাটক লেখার মধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব আছে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি পড়েছিল—যে কারণে ঐ সময় থেকে গানে বাউল ইত্যাদি বাংলাদেশের সুর ও সেই ভাবের সহজ ভাষা ও ছন্দে জাতীয়-সংগীত লিখেছিলেন। গভীর জাতীয়তাবোধের প্রকাশস্বরূপ বাঙালির নিজস্ব যাত্রাকে পেলাম আর-একভাবে, 'শারদোৎসব'-এর

মধ্যে প্রথম। একে বলা চলে প্রকৃত 'রাবীন্দ্রিক যাত্রা'। এই একই প্রথায় লেখা 'রাজা', 'অচলায়তন' ও 'ফাল্গুনী'। ১৯১২ সালে তিনি 'ডাকঘর' লিখেছিলেন, তাতে গান নেই কিন্তু ১৯১৬ সালে যখন তা কলকাতায় অভিনীত হয়, তখন অনেকগুলি গান তাতে ব্যবহার করেছিলেন, যার মধ্যে 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে' ও 'গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ' গান-দুটির কথা মনে আছে।

১৯১৬ সালে যখন কলকাতায় বিচিত্রা নামে প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করলেন তখন সেখানে ছবি আঁকা, নাটক অভিনয় ইত্যাদির চর্চা হত। মাঝে মাঝে বাইরের থেকে শিল্পীদের এনে নাচগানের জলসা হত। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন, "সে-সময়ে দুই অনুষ্ঠানে 'বিচিত্রা'য় এসে নেচে আর গেয়ে গেলেন স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ বসু। ঐ ঘরে বসেই আর একদিন দেখেছিলুম জাপান থেকে আগত নর্তকীর অপূর্ব নাচ। নাম ডোম্ফায়া। ফুলের মতো সুন্দর এতটুকু মেয়েটি।...নাচ ভালো লেগে-ছিল। নাচটির নাম 'একটি নাকুবা ফুল'।"

১৯২১ সালে বিশ্বভারতী স্থাপিত হল। তখন থেকে গুরুদেব শুধুমাত্র গানের সমষ্টি নিয়ে দর্শকদের সামনে আসর বসাতে শুরু করলেন। বিশেষ করে ঋতুর গানগুলিই হল এ ধরনের জলসার প্রধান অবলম্বন। পূর্বোক্ত গীতনাটকের আদর্শে আর কোনো নাটক তিনি লিখলেন না। ১৯২১ ও ১৯২২ সালে 'বর্ষামঙ্গল' গীতোৎসব দেখলাম শান্তিনিকেতনে ও কলকাতায়।

ঋতুনাটক ও বর্ষামঙ্গলের মতো গানের আসর বসানোর কারণ হল মাঝে মাঝে আশ্রমবাসী সকলকে নিয়ে নির্মল আমোদ করা। তা ছাড়া তিনি শান্তিনিকেতনের শিক্ষার আদর্শে বলেছেন, "একদিন শান্তিনিকেতনে আমি যে শিক্ষাদানের ব্রত নিয়েছিলুম তার সৃষ্টিক্ষেত্র ছিল বিধাতার কার্যক্ষেত্রে— আহ্বান করেছিলুম এখানকার জলস্থল আকাশের সহযোগিতা। জ্ঞানসাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলুম আনন্দের বেদীতে। ঋতুদের আগমনী গানে ছাত্রদের মনকে বিশ্বপ্রকৃতির উৎসব-প্রাঙ্গণে উদ্বোধিত করেছিলুম।"

১৯২১ সালের ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমার রাত্রিতে ফাল্গুনীর গান নিয়ে তিনি একটি উৎসব করেন। তার পরেই বর্ষাকালে শ্রাবণ-পূর্ণিমাতে বর্ষার পুরানো গান নিয়ে আর-একটি জলসা হয়। এই জলসাকেই 'বর্ষামঙ্গল' নাম দিয়ে ১৯২১ সালে কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অনুষ্ঠিত হতে দেখি। কেবলমাত্র গান ও কবিতা আবৃত্তি ছাড়া কোনোরূপ নাটকোচিত পরিবেষ্টন এতে তৈরি করা হয় নি। পরবৎসর আবার বর্ষামঙ্গল হল একই ধরনে। প্রথমে শান্তিনিকেতনে তার পরে কলকাতায়। কিন্তু এবারে বর্ষার গান প্রায় সব নতুন। বর্ষামঙ্গলের কোনোবারেই গানকে অভিনয়ে প্রকাশ করা হয় নি, কেবল গান গাওয়া হয়েছিল। কখনো একলা, কখনো সকলে কখনো দুজনে একসঙ্গে।

গুরুদেবের ঋতুসংগীতকে তিনটি ভাগে ভাগ করলে আমরা পাই শান্তিনিকেতনের পূর্বের, শান্তিনিকেতনের আরম্ভের ও পরের দিকের গান। এই তিনটি ধারার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। প্রথম দিকের গানের মধ্যে প্রকৃতি বিশেষ জায়গা পায়

নি, মধ্যকালে প্রকৃতি কিঞ্চিৎ স্থান লাভ করেছে মাত্র, আর শেষদিকের গানগুলি শুনে মনে হয় বিশ্বপ্রকৃতি যেন নিজেই কথা বলছে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, তৃতীয় যুগের ঋতুসংগীতগুলিই হল তাঁর শ্রেষ্ঠ ঋতুসংগীত। লিরিক্‌কাব্যরূপে সুরের কল্পনায় এই সময়কার গানগুলি প্রকৃত পূর্ণতা লাভ করেছে।

১৯২৩ সালে তিনি বর্ষামঙ্গলের আদর্শে বসন্তঋতুর নতুন একঝাঁক গান নিয়ে 'বসন্ত' নামে একটি সংগীত-আসর বসালেন কলকাতায়। এ নাটকের বৈশিষ্ট্য ছিল। এই সময় রঙ্গমঞ্চে একটি রাজসভা সাজিয়ে রাজা যেন তাঁর রাজকার্যের নীরস জীবনের অবসরে ও নিভৃতে রাজকবিকে ডেকে তাঁর দলবলের দ্বারা অনুষ্ঠিত বসন্তের গান শুনতে বসেছেন। এর গানই সব, কথা গৌণ। কেবল গানগুলিকে সংগীতময় করে তোলাই ছিল কথার লক্ষ্য। এখানে বলে রাখা ভালো এ ধরনের নাটকের গানগুলি তিনি আগে একটানা রচনা করেছিলেন, জলসার সুবিধার জন্য কথাগুলি পরে লেখেন। গানে কখনো একজন, কখনো দুজন ও কখনো অনেকে একসঙ্গে মিলে রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে গানের সঙ্গে অভিনয় করত। দু-একটি গানে নাচ ছিল, কিন্তু সে নাচ আজকালকার মতো কোনোরকমের নৃত্যধারায় শেখানো নাচ নয়। শেষ গানটিতে গুরুদেব স্বয়ং গানের দলের সঙ্গে নাচে রঙ্গমঞ্চকে মাতিয়ে তুলেছিলেন।

১৯২৪ সালে 'অরূপরতন' অভিনীত হল। এটি 'রাজা' নাটকেরই রূপান্তর, বহু নতুন গান এতে সংযোজিত হয়। গীতবহুল যাত্রার আদর্শে এটি গীতনাটকে রূপ নেয়। গানগুলি নাটকের পক্ষে অত্যাবশ্যক বলে গান ছাড়া নাটকটি অসম্পূর্ণ থেকে যেত। গানগুলিকে মূকাভিনয়ে রূপ দেওয়া হয়। দেহভঙ্গিতে কোথাও কোথাও যে একটু নাচের আমেজ দেখা না গিয়েছিল তা নয়। গুরুদেব নাটকে কথার অংশ পাঠ করেছিলেন। গানের দল ছিল পিছনে। এই সময় থেকেই মেয়েদের মধ্যে সামান্য একটু নাচের চর্চা শুরু হয়েছিল কাথিয়াবাড় ও গুজরাতের লোকনৃত্যের আদর্শে। তার সঙ্গে ছিল একটুখানি 'ভাও-বাৎলানো' নৃত্যপদ্ধতি।

শান্তিনিকেতনে গুজরাতের গরবা নাচের প্রথম প্রবর্তন করেন বিশ্বভারতীর ইংরিজিভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভকিলের পত্নী। এঁরা এখানে আসেন ১৯২৪ সালে। শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেন ১৯২৮ সালে। এই যুগে ভকিল-পত্নী ১৫-১৬ জন ছাত্রীকে গরবা নাচ শেখান। গুরুদেবের যে-ক'টি গানের সঙ্গে নাচ শেখানোর কথা আজও মনে পড়ে সেই গান ক'টি হল— 'যদি বারণ কর তবে গাহিব না', 'মোর বীণা ওঠে' ও 'কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে'।

নাচের প্রতি গুরুদেবের স্বাভাবিক একটু ঝোঁক ছিল। 'শারদোৎসব' 'অচলায়তন' ও 'ফাল্গুনী'তে তিনি বালকদের গানের সঙ্গে নাচতে উৎসাহিত করতেন। 'শারদোৎসব'এ 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে', 'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ' ইত্যাদি গানে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত দেখেছি নাচের ভঙ্গিতে কিভাবে তাকে প্রকাশ করতে হবে, তা তিনি দেখিয়ে দিচ্ছেন। ফাল্গুনীতে বাউল হয়ে অনেকগুলি গানে তিনি নাচের ছন্দ ফুটিয়েছিলেন। গানের সঙ্গে সকলে দল বেঁধে আনন্দে নাচত ঐ-সকল নাটকে। তা ছাড়া ১৯১৯ সালে ছাত্র ও শিক্ষকদের শিক্ষার জন্যে আগরতলা থেকে

একজন মণিপুরী শিক্ষককে আনিয়েছিলেন কয়েক মাসের জন্যে।

'অরূপরতন' হয়ে গেলে পর আবার দেখলাম ঋতুর গান নিয়ে তিনি রচনা করলেন 'সুন্দর' ও 'শেষবর্ষণ' নামে দুটি গীত-কাব্য। 'সুন্দর' ১৯২৫ সালে ফাল্গুন মাসে অভিনীত হবার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু তা অসমাপ্ত থেকে যায়। ঐ বৎসরের শ্রাবণ মাসে শান্তিনিকেতনে 'বর্ষামঙ্গল' হল। তাকেই আবার নতুন গানে সাজিয়ে 'শেষবর্ষণ' নাম দিয়ে ভাদ্র মাসে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে জলসার আয়োজন করা হয়। 'শেষবর্ষণ'এ বর্ষার গান ছিল বেশি। শেষের দিকে শরতের গানে সমাপ্তি টানা হয়। এ দুটিকে গানমুখ্য নাটিকা বলা চলে। 'সুন্দর'এ কোনো কথা ছিল না। 'শেষবর্ষণ'এ পূর্বের বসন্তের মতো রাজসভার দৃশ্য রচনা করে রাজা, নটরাজ ইত্যাদি কয়েকটি পাত্র খাড়া করে তাদের মুখে এই ঋতুর গানগুলির মর্মার্থ বোঝান হয়েছিল। এখানেও গানগুলিকে ভাব-ঐক্যে বাঁধবার জন্যে ঐ-সব কথার অবতারণা। গানই প্রধান, কথা উপলক্ষ মাত্র। 'অরূপরতনে'র পর 'শেষবর্ষণ' পর্যন্ত নৃত্যাভিনয়ধারায় বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে নি। মূকাভিনয়, গীতাভিনয় ও দেহভঙ্গিতে একটু ছন্দ লাগিয়ে এই তিনের সাহায্যে অভিনয় করা হত। এর সঙ্গে গুজরাত অঞ্চলের লোকনৃত্যও কিছু কাজ করেছিল।

১৯২১ সালের বর্ষামঙ্গলের পর থেকে এই-সব অনুষ্ঠানে মেয়েরা বিশেষ অংশ গ্রহণ করল। শেষবর্ষণ-এর সব-ক'টি গান তারাই নাচে অভিনয় করেছে। নাচের চর্চায় তারাই বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠল।

১৯২৬ সালে নবকুমার নামে একজন মণিপুরী নর্তক এলেন। মেয়েরা এঁর কাছে নাচ শিখতে শুরু করল এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরনের নৃত্যাভিনয়-প্রথা নিয়মিত শিখতে লাগল। এই ধরনের নাচের উপর নির্ভর করেই নটীর পূজা'র শ্রীমতীর নাচ গড়ে ওঠে। 'পূজারিনী' কবিতাটিকে মূকাভিনয়ে প্রকাশ করবার চেষ্টা থেকেই 'নটীর পূজা'র জন্ম। ১৯২৬ ও ১৯২৭ সালে এটি শান্তিনিকেতনে ও কলকাতায় পর পর অভিনীত হবার পর কলকাতার বাঙালি সমাজে বেশ একটা সাড়া পড়ে যায়। সকলেই নৃত্যের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছিল। 'নটীর পূজা'য় মণিপুরী নাচের সম্ভাবনায় উৎসাহিত হয়ে ১৯২৭ সালে গুরুদেব 'নটরাজ' গীত-কাব্যের আসর বসালেন দোল-পূর্ণিমার দিনে শান্তিনিকেতনে।

'নটরাজ' ছিল ছয়টি ঋতুর গানের সমষ্টিকৃত একটি গীত-কাব্য। 'বসন্ত' বা 'শেষবর্ষণ'-এর মতো কোনো রাজকীয় সভা ও গানের সঙ্গে উপলক্ষ হিসেবে কোনো কথা এই গীত-কাব্যের মধ্যে স্থান পায় নি—তার পরিবর্তে অনেক কবিতা গানের সূত্র ধরিয়ে দেবার কাজ করেছিল। কবিতাগুলি আবৃত্তি করেছিলেন গুরুদেব স্বয়ং। এই বারে প্রথম মণিপুরী নৃত্যাভিনয়-ধারা এই গীত-কাব্যে প্রধান অংশ গ্রহণ করল। একক নৃত্যই ছিল বেশি, সম্মেলক নৃত্য কয়েকটি মাত্র।

একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, এই-সব নাচের ছন্দ ও ভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে গানের উপরেই নির্ভর করে গঠিত। আলাদা করে তালের ছন্দ দেখানোর রেওয়াজ তখনো শুরু হয় নি।

এর পরেই গুরুদেব সদলে রওনা হলেন জাভা ও বলিদ্বীপের উদ্দেশে জুলাই

মাসে। সেখানে ছিলেন মাত্র তিন মাস। তাঁর নাচ গান দেখবার ও শোনবার ব্যবস্থা খুব ভালোভাবেই হয়েছিল। সেদেশের নৃত্যাভিনয় যে তাঁর কাছে কতখানি ভালো লেগেছিল, তা আমরা জানতে পারি তাঁর 'জাভাযাত্রীর পত্র' থেকে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, ১৯২৪ সালে তিনি যখন চীন ও জাপান যান, তখনো সে দেশের প্রাচীন নাচ-গান তাঁর মন আকর্ষণ করেছিল। জাপানের কিয়োটোতে ঐতিহাসিক নাটক দেখে তিনি লিখেছিলেন, "তার ভাবভঙ্গি চলাফেরা সমস্ত নাচের ধরনে, বড়ো আশ্চর্য তার শক্তি।" পিকিং-এর নাট্যশালায় নৃত্যাভিনয় দেখেও তাঁর ভালো লেগেছিল এ কথা তাঁর মুখে বহুবার আলোচনাপ্রসঙ্গে শুনেছি। চীন, জাপান ও জাভার প্রাচীন নৃত্যাভিনয় একই আদর্শে গঠিত ও বহু বিষয়ে এদের মধ্যে মিল পাওয়া যায়। মূলত এরা একই গোষ্ঠীর।

জাভা, বলি ইত্যাদি দ্বীপ পরিদর্শন করে গুরুদেব পূজার ছুটিতে দেশে ফিরলেন ও 'নটরাজ'কে 'ঋতুরঙ্গ' নাম দিয়ে কলকাতায় দেখাবার জন্যে মাস দুয়েকের মধ্যে তৈরি করে ফেললেন। এই সময় দক্ষিণ-ভারতের তামিল দেশের নৃত্যাভিনয়-পদ্ধতিতে নাচল একটি দক্ষিণী ছাত্র। তখনো ছাত্রীদের মধ্যে এ নাচের চর্চা শুরু হয় নি। 'নটরাজ' ও 'ঋতুরঙ্গ' একই বস্তু, কেবল কয়েকটি গান সংযোজিত বা পরিবর্তিত হয়েছিল মাত্র। নূতনত্ব দেখাবার বিশেষ কোনো চেষ্টাই এর মধ্যে দেখা যায় নি। মেয়েরা নটরাজের সময় যে অভিনয়পদ্ধতিতে নেচেছিল, ঋতুরঙ্গে তাকেই রক্ষা করা গেছে। পূর্বের অভিনয়ে গানের দল যেভাবে গান গেয়েছে এখানেও ঠিক সেই ধারাই রক্ষা করা হয়েছিল। যে দক্ষিণী ছাত্রটি এই সময় যোগ দিয়েছিল, তার নাচ কলকাতায় যেমন আনন্দ দিয়েছিল, তেমনি শান্তিনিকেতনে আমাদের মতো একদলের ঐ নাচে মন খুবই আকৃষ্ট হয়। পুরুষের নাচ দেখবার যোগ্য এবং তাও যে মনে আনন্দ দেয় এইবারই প্রথম আমরা তা উপলব্ধি করি।

১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে 'ফাল্গুনী' অভিনয় হল। গুরুদেব নিজেও তাতে যোগ দেন। তাতে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটে নি, তবে অনেকগুলি গানকে মেয়েরা নৃত্যে রূপদান করে। এই বৎসরই জুলাই মাসে প্রথম বৃক্ষরোপণ-উৎসব আরম্ভ হল—সন্ধ্যায় বর্ষামঙ্গল। এই বর্ষামঙ্গলে গান ছিল প্রধান আকর্ষণ। গুরুদেব একটি গল্পও পাঠ করেন।

১৯২৯এ কলকাতায় মাঘোৎসবে গান করতে যাবার পর হঠাৎ স্থির হল জোড়া-সাঁকোয় নাচ-গানের আসর করা হবে টিকিট করে। পূর্বরচিত নানা সময়ের বসন্ত-ঋতুর গান বাছা হল। বিশেষ করে এমন গান রাখা হল যেগুলিতে মেয়েরা পূর্বে নেচেছে। অর্থাৎ নাচগুলি পূর্বের তৈরি। এই অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হল 'সুন্দর'। কিন্তু এই 'সুন্দর' ও ১৯২৫এর 'সুন্দরে'র মধ্যে কোনো মিল ছিল না। অভিনয় হয় দুদিন। শেষদিনে গুরুদেব শান্তিনিকেতন থেকে এসে পড়লেন এবং গানগুলির অদলবদল করে 'রানী' ও তার সখী 'বাসন্তিকা' নামে দুটি চরিত্র এর মধ্যে যোগ করে দিলেন। তাদের কথাবার্তার ভিতর দিয়ে গানগুলির মর্মার্থ বোঝানো হয়েছিল।

জুলাই-এ বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হলে পর দুজন মণিপুরী নর্তক শান্তি-

নিকেতনে আসেন। ১৯২০র পর এতদিন পরে আর-একবার ছাত্ররা এই নাচে যোগ দিল। এর পিছনে শিল্পাচার্য নন্দলালের উৎসাহ ছিল খুব। তিনি তখনকার কলাভবনের ছাত্রদের সকলকেই নাচে যোগ দিতে বলেন। প্রায় সকলেই নাচে যোগ দিল, তবে তাদের উৎসাহ খুব বেশিদিন টেকে নি। এ বৎসরও শ্রাবণ মাসে 'বর্ষামঙ্গল' ও 'বৃক্ষরোপণ' উৎসব একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়। গানের অনুষ্ঠানে গুরুদেব ও শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ উভয়ে পাঠ করেন স্বরচিত লেখা। 'তপতী' অভিনীত হল ভাদ্র মাসে। নাটকের 'বিপাশা' তার সমস্ত গান নাচের ভঙ্গিতে অভিনয় করে।

১৯৩০এর মার্চ মাসে গুরুদেব তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূসহ বিলেত রওনা হলেন। ইংলন্ডের ডেভনশায়ারে তাঁর ভক্ত মিঃ এলমহার্স্ট-প্রতিষ্ঠিত 'ডার্টিংটন হল' বিদ্যালয়ে তাঁরা কিছুদিন বাস করেন। সেখানে তাঁরা Ballet নাচ দেখেন। প্রতিমা দেবী এই বিদ্যালয়ের খ্যাতনামা নৃত্য-পরিচালকের Ballet নৃত্য-পরিকল্পনা, প্রতিদিনের কাজ ও Ballet রচনার করণ-কৌশল অনুশীলন করেন। ১৯৩১এর জানুয়ারিতে তাঁরা দেশে ফিরলেন।

'ঋতুরঙ্গে'র পর 'নবীনে'র আগে পর্যন্ত একক-নৃত্য হত খুব বেশি। দ্বৈত-নৃত্য তার পরে স্থান পেত। দলবদ্ধ নাচ থাকত খুব কম। শান্তিনিকেতনের প্রায় সব অনুষ্ঠানে একমাত্র মেয়েদের নাচই বিশেষ অংশ গ্রহণ করত। নাচ হত গানের দলের সমবেত গানের সঙ্গে। মণিপুরী আদর্শে চালিত নৃত্যাভিনয় এই সময়ের একটা বিশেষ ধারা গ্রহণ করেছিল, যা ঠিক মণিপুরীর অনুকরণ নয়।

এই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে, বিশেষ করে কলকাতায়, শিক্ষিতসমাজের মেয়েদের মধ্যে শান্তিনিকেতনের ঢঙের নাচের প্রসার দেখা দিয়েছিল খুব। কলকাতায় কয়েক-জন মেয়ে নাচে খুবই নাম করেছিল। অবনীন্দ্রনাথের জামাতা মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এই সময় থিয়েটারে যথাসম্ভব শান্তিনিকেতনের আদর্শে নৃত্যাভিনয়কে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তা ছাড়া ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় উদয়শঙ্করের আবির্ভাব ও তাঁর প্রবর্তিত নাচ দেশের যুবকদের মধ্যে বিশেষ আলোড়ন আনে। ১৯৩১ থেকে গুরুসদয় দত্ত শুরু করলেন বাংলার লোকনৃত্যের আন্দোলন। ফেব্রুয়ারিতে বীরভূম জেলার সিউড়ী শহরে রাইবিশে জারি ইত্যাদি নাচের একটি উৎসবের আয়োজন করে তিনি ব্রতচারী আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।

জানুয়ারিতে গুরুদেব দেশে ফিরে মার্চ মাসে বসন্ত উৎসবের জন্য 'নবীন'-এর আয়োজন শুরু করেন। পূর্বের বসন্ত নাটিকার মতনই বসন্তঋতুর নতুন গান তিনি অনেক রচনা করলেন। এর জন্যে কোনো নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করেন নি। রাজা বা রাজসভা ছিল না। গুরুদেব রঙ্গমঞ্চের এক কোণে বসে গানগুলির মর্ম ব্যাখ্যা করেছিলেন নিজকণ্ঠের গানে পাঠে ও আবৃত্তিতে। এই অভিনয়কালে শান্তিনিকেতনের বাঙালি ছাত্ররা নাচে বিশেষ স্থান গ্রহণ করে। 'নবীনে' মণিপুরী নাচের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবাংলার বাউল, রাইবিশে ও ইউরোপের হাঙ্গেরী দেশের লোকনৃত্য ছিল আরো একটি প্রধান বিশেষত্ব। এই-সব নৃত্যপদ্ধতিকে নানা গানে খুব ভালোভাবেই খাপ খাওয়ানো গিয়েছিল।

এই পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের নৃত্যান্দোলনের একটা পর্ব গেল। নৃত্যনাট্য বলতে যাকে আজকাল আমরা বুঝতে শিখেছি, সে ধরনের কোনো নাটক এ পর্যন্ত গুরুদেব রচনা করেন নি। 'বসন্ত' থেকে 'নবীন' পর্যন্ত প্রায় একই আদর্শে গীত-নাটিকা রচনা করেছেন, কোনো পরিবর্তন দেখি নি। সাজপোশাকে বা নানা দেশের নাচের ছবি দেখে হয়তো কোনো বিশেষ বিশেষ ভঙ্গির অনুকরণ করা হয়েছিল, কিন্তু এদেশী নাচের মূল ধারা তার দ্বারা এতটুকু প্রভাবান্বিত হয়েছে বলে মনে করি না। ঐ-সব ছবি-দেখা ভঙ্গি রঙ্গমঞ্চের অলংকরণের দিক থেকে সাহায্য করেছে, গানের অভিনয়ের দিক থেকে বিশেষ সাহায্য করে নি। তার প্রধান কারণ, সেই ছবির ভঙ্গি ঐ-সব দেশের গতিশীল নাচের একটি স্তব্ধ অংশ মাত্র। কোনো বিশেষ একটি অর্থে সেই নাচ তারা ব্যবহার করে, যার সঙ্গে ঐ নাচের স্তব্ধভঙ্গির একটা অর্থ পাওয়া যায়। এখানে সেই ভঙ্গি কোনো অর্থ নির্দেশ করে নি কেবলমাত্র অলংকরণ ছাড়া। রঙ্গমঞ্চ-সজ্জার ব্যাপারে জাভা বলি সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে—বলিতে রামায়ণের নৃত্যনাট্য হয় উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। কোনোপ্রকার দৃশ্যসজ্জা থাকে না। জাভার সুলতানদের প্রাসাদে যে যে নাচ হয় তাতেও কোনো রঙ্গমঞ্চ থাকে না। প্রকাণ্ড রাজকীয় আটচালায় ঢাকা পাথরে-বাঁধানো মেঝের উপর একদিকে রাজপরিবার ও অতিথিরা বসেন, অপর অংশে অভিনেতারা নাচ ও অভিনয় করেন। কখনো কোনো কোনো নৃত্যনাট্যে স্বাভাবিক দৃশ্যসজ্জার চেষ্টা দেখা গেছে, কিন্তু তাকে শান্তি-নিকেতন-প্রচলিত কোনোপ্রকার রঙ্গমঞ্চ-সজ্জার সঙ্গে কোনোদিক থেকে মেলানো মুশকিল। সে একেবারে ভিন্ন জিনিস, প্রায় এ যুগের থিয়েটারের অনুকরণ।

জাভা বলি বা পূর্ব-এশিয়ার সব-ক'টি প্রাচীন নৃত্যাভিনয়ে গানের সঙ্গে বিরাট যন্ত্র-সংগীত অতি আবশ্যক স্থান গ্রহণ করে আছে। এই যন্ত্র-সংগীত না থাকলে নাচ হওয়া অসম্ভব। এবং সমস্ত নাচের ভিত্তি ঐ যন্ত্র-সংগীত। বিদেশী দর্শক যখন তাদের নৃত্যাভিনয় দেখে তখন গানের অর্থ না বুঝলেও বাজনার শব্দ ও ছন্দঝংকারের সঙ্গে মিলিয়ে নাচের মোটামুটি গল্পের ধারাটি ধরতে পারে। আমাদের দেশে কেবল তালবাদ্যের ছন্দে যেমন নাচ হয়, তেমনি আবার কেবল তালবাদ্যের ছন্দে খাঁটি অভিনয়ও হতে দেখেছি। ঐ-সব দেশে ঐ যন্ত্র-সংগীত নাচে ঠিক ঐ কাজই করে। আমাদের প্রাচীন নৃত্যধারা যেমন তালবাদ্য ছাড়া অসাড়, ওদের দেশে নৃত্য-নাট্যও তেমনি যন্ত্র-সংগীত ছাড়া ব্যর্থ।

গুরুদেবের নৃত্যধারায় এই ধরনের কোনো প্রভাব ছিল না। এখানে যন্ত্রসংগীত কোনোদিন প্রাধান্য পায় নি বলেই এর উপরে নাচ গড়ে উঠতে পারে নি। নাচ গড়ে উঠেছে সম্পূর্ণ গানের উপর নির্ভর করে। শান্তিনিকেতনে গানই সেদেশের যন্ত্র-সংগীতের মতো নাচের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদেশে নৃত্যনাট্য গড়ে উঠেছে গল্প গান ও যন্ত্র-সংগীতের একত্র সম্মেলনে। এখানে নাচ গড়ে উঠল কেবলমাত্র গানের উপরে। এমন-কি, 'নবীন' পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় রীতির তালযন্ত্রে বোলের নাচও দেখা দেয় নি। জাভা ও বলির কথা বিশেষ করে তুলতে হল, কেননা কেউ কেউ মনে করেন যে, নৃত্যনাট্যরচনার প্রেরণা গুরুদেব ঐ দেশ থেকেই লাভ করে-ছিলেন।

গুরুদেবের রচিত গানের সঙ্গে দুটি পথে নাচগুলি রচিত হত। প্রথম হল, প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিকে নাচের অভিনয়ে প্রকাশ করে পুরো গানের ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলা। সাধারণত যে গানগুলিতে অভিনয়ের সম্ভাবনা বেশি তাতে এই পদ্ধতি খুব কাজে লেগেছে। অপর পদ্ধতি হল, গানের প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির সঙ্গে নাচগুলিকে অলংকার হিসেবে সাজানো। এখন পর্যন্ত শেষোক্ত পদ্ধতি দলবদ্ধ নৃত্যে ব্যবহার করা হয়।

'নবীন' শেষ করে গরমের ছুটির মধ্যেই দক্ষিণ-ভারতের কথাকলি নাচ অনুশীলনেব উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল এখানকার জনৈক কর্মী। এর মধ্যে বিদেশ অর্থাৎ জার্মানীর আধুনিক নৃত্যবিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনের একজন পুরাতন ছাত্রী। বছরখানেক হল রুশদেশীয় লোকনৃত্যপটু এক মার্কিন দম্পতিও এখানে কর্মী হিসেবে যোগ দিয়েছেন। তা ছাড়া হাঙ্গেরী দেশের একজন নৃত্যপটু শিল্পী মহিলা তো আছেনই।

ভাদ্র মাসের শেষ দিকে কলকাতায় 'শিশুতীর্থ' ও 'গীতোৎসব' হল। এখানে মনে করিয়ে দিতে হবে যে, 'শিশুতীর্থ' আসলে নাটিকা নয়, এটিকে একটি কথিকা বলা যেতে পারে, 'লিপিকা'র গল্পের মতো। 'শিশুতীর্থে'র অভিনয়ের পূবে 'গীতোৎসব' নাম দিয়ে একটি আলাদা নৃত্যগীতের কার্যসূচী ছিল। এর প্রায় সবই গান, তার মধ্যে বেশি হচ্ছে বর্ষার। বাকি কয়টি অন্যান্য বিষয়ের। নাচ ছিল নানা রকমের। এর মধ্যে শান্তিনিকেতনের নৃত্য-ইতিহাসে প্রথম কথাকলি নাচের প্রবর্তন করা হল একজন বাঙালি ছাত্রের দ্বারা। তা ছাড়া ঋতুরঙ্গের মাদ্রাজী নর্তককে আনানো হয়েছিল এই উপলক্ষে—সেও নাচল তার দেশীয় ঢঙে। বিদেশী নৃত্য-পদ্ধতিতে নাচলেন এখানকার একজন প্রাক্তন ছাত্রী। হাঙ্গেরীয়ান শিল্পী-কন্যা নাচলেন তাঁর দেশীয় নাচের পদ্ধতিতে গুরুদেবের গানের সঙ্গে। এবারে বিনা গানে কেবল তালের বোলের সঙ্গে দু-একটি নাচ দেখানো হয়েছিল, তার মধ্যে কথাকলির নাম উল্লেখ করা চলে। কিন্তু সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল গুরুদেবের কণ্ঠে তাঁর কবিতা-আবৃত্তির সঙ্গে নাচ। এ পদ্ধতি ভারতীয় নৃত্যজগতে সম্পূর্ণ নতুন জিনিস এ কথা নিশ্চয় করে বলা চলে। ইউরোপে কবিতা-আবৃত্তির সঙ্গে এইভাবে নাচে অভিনয় হয় কি না আমি জানি না। এর মধ্যে 'ঝুলন' কবিতাটি সকলকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। অপরটি ছিল 'দুঃসময়'। ঝুলনের নাচ ছিল আধুনিক ইউরোপীয় নৃত্যপদ্ধতির উপরে রচিত। 'দুঃসময়' রচিত হয় আমাদের দেশী মণিপুরী নৃত্যপদ্ধতির সাহায্যে। গুরুদেব প্রথম এই পদ্ধতিতে উৎসাহিত হয়েছিলেন আমেরিকায়। শোনা যায় ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে 'রুথ সেণ্ট ডেনিস' নামে একজন বিখ্যাত নর্তকী গুরুদেবের কবিতার সঙ্গে নাচ দেখিয়ে বিশ্বভারতীর জন্যে টাকা তোলার আয়োজন করেছিলেন।

কলকাতার এই নৃত্যানুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশ ছিল 'শিশুতীর্থ' কথিকাটির নৃত্যাভিনয়। 'শিশুতীর্থ' রচনার ইতিহাস হল—পূর্ববর্তী বৎসর গুরুদেবের ইউরোপ-ভ্রমণকালে জার্মানীর বিখ্যাত চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ী উফা কোম্পানি তাঁকে অনুরোধ করে তাদের জন্য একটা গল্প লিখে দিতে। তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা

করতে গিয়ে 'The Child' নামে কথিকাটি লেখেন। এরই বাংলা রূপান্তর 'শিশুতীর্থ'। কিন্তু অভিনয়কালে তার মধ্যে নানাপ্রকার পুরাতন গান যোগ করেন—এর জন্যে নতুন কোনো গান তিনি রচনা করেন নি।

নামে 'শিশুতীর্থ' হলেও 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত 'শিশুতীর্থ'কে এই সময় আর-এক ভাবে লিখতে হয়েছিল। ভাবটি ঠিকই আছে, কিন্তু মূলের সঙ্গে এই নাটিকার যে তফাত ঘটে, তার নমুনাস্বরূপ সবটাই তুলে দিচ্ছি। নাটিকাটি উদ্বোধনবাক্য ছাড়া দশটি সর্গে বিভক্ত। মূল পুস্তকে উদ্বোধনরূপে অতিরিক্ত কিছু নেই—

"দেবতার পরাভব হল, দৈত্যেরা হল জয়ী, ছারখার হয়ে গেল স্বর্গলোক। ঋতুপর্যায় গেল ভেঙে, চন্দ্র সূর্য গেল থেমে. সমস্তই হল উলট পালট।

তখন পিতামহ বললেন, ভয় নেই। স্বর্গকে উদ্ধার করবে নূতন প্রাণ। নবজাত কুমার দেখা দেবেন অভয় বহন করে।

মানুষের সমস্ত প্রত্যাশা নবজীবনের কাছে। শিশু আসে যুগে যুগে 'পরিত্রাণায় সাধুনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।'

আদিকাল থেকে মানব-ইতিহাসের যাত্রা নবজন্মের তীর্থে। বুদ্ধ একদিন শিশুরূপে দেখা দিয়েছিলেন, এনেছিলেন নবজন্ম। মানুষ তাকিয়ে আছে শিশুর দিকে। এই শিশুতীর্থের বিষয়টি নিয়ে নৃত্যাভিনয়।

গান ॥ নমঃ নমঃ নির্দয় অতি করুণা তোমার।

প্রথম সর্গ

অন্ধকার, উচ্ছৃঙ্খলতা, ভয়, লোভ, ক্রোধ, উন্মাদের অট্টহাস্য।

দ্বিতীয় সর্গ

ভক্ত অরুণোদয়ের অপেক্ষা ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। ব'লচেন, ভয় নেই, মানবের মহিমা প্রকাশ পাবে।

গান ॥ কী ভয় অভয় ধামে তুমি মহারাজা

সংশয়াচ্ছন্ন বিভ্রান্তচিত্তের দল তাকে বিশ্বাস করে না। বলে, পশুশক্তিই আদ্যাশক্তি, রক্তপঙ্কের মধ্যে পরিণামে সেই শক্তিরই জয় হবে।

তৃতীয় সর্গ

প্রভাতের আলো দেখা দিল। ভক্ত ব'ললেন, চলো সার্থকতার তীর্থে। তার অর্থ স্পষ্ট ক'রে কেউ বুঝলে না, কিন্তু পারলে না স্থির থাকতে। কণ্ঠে কণ্ঠে এই ধ্বনি জেগে উঠলো—চলো।

গান ॥ আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে

চতুর্থ সর্গ

যাত্রীরা দেশ দেশান্তর থেকে বেরিয়েচে. নানা জাতি নানা বেশে, নানা পথ দিয়ে, সাধু অসাধু জ্ঞানী অজ্ঞানী।

গান ॥ কে যায় অমৃতধামযাত্রী—

পঞ্চম সর্গ

তাদের ক্লান্তি তাদের সংশয়।

ষষ্ঠ সর্গ

জ্বলে উঠলো তাদের ক্রোধ।

গান ॥ যেতে যেতে একলা পথে

বললে মিথ্যাবাদী আমাদের বঞ্চনা করেচে। ভক্তকে মারতে মারতে মেরে ফেললে।

গান ॥ মোর মরণে তোমার হবে জয়

সপ্তম সর্গ

তাদের ভয়, তাদের অনুতাপ, পরস্পরের প্রতি দোষারোপ। প্রশ্ন এই, এখন তাদের পথ দেখাবে কে? পূর্বদেশের বৃদ্ধ বললে, যাকে মেরেচি তার প্রাণ আমাদের সকলের প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে আমাদের পথ দেখাবে। সকলে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, জয় মৃত্যুঞ্জয়ের।

গান ॥ হবে জয় রে ওহে বীর, হে নির্ভয়

অষ্টম সর্গ

আবার সকলে যাত্রা করলে।

গান ॥ আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায় যে

ক্লান্তি নেই, সংশয় নেই। বললে, আমরা জয় করবো ইহলোক, আমর জয় করবো লোকান্তর।

নবম সর্গ

কালজ্ঞ বললেন, আমরা এসেচি। কিন্তু কই প্রাসাদ কই, সোনার খনি কই, শক্তিমন্ত্রের পুঁথি কই? পথের ধারে উৎস। উৎসের পাশে কুটীর। কুটীরের দ্বারে বসে অজানা সিন্ধুতীরের কবি গান গেয়ে গেয়ে বলচে, মাতা, দ্বার খোলো।

গান ॥ ভোর হলো বিভাবরী (সকলের উপবেশন)

—(ধীরে উত্থান)

গান ॥ তিমির দুয়ার খোলো

দশম সর্গ

দ্বার খুললো। মা বসে তৃণ শয্যায়, কোলে তাঁর শিশু—অন্ধকারের পরপার থেকে প্রকাশমান শুকতারার মতো।

কবি গেয়ে উঠলো জয় হোক্ মানুষের, জয় হোক্ নবজাতকের, জয় হোক্ চিরজীবিতের।

যাত্রীরা প্রণাম করলে, দেশ দেশান্তরের কণ্ঠে ধ্বনিত হল সেই জয়গান, যুগে যুগান্তরে তা ব্যাপ্ত হলো।

গান ॥ জয় হোক জয় হোক নব অরুণোদয়।"

অভিনয়ের কার্যসূচীতে 'শিশুতীর্থ' যেভাবে ছাপা ছিল, সেইভাবেই এখানে তুলে দিলাম। যাঁরা 'পুনশ্চ' কাব্যে 'শিশুতীর্থ' কথিকাটি পড়েছেন, তাঁরা বেশ বুঝতে পারবেন যে, এখানকার 'শিশুতীর্থ'টি নাচের আদর্শে পরিকল্পিত হয়েছে। ব্যালে-নাচের পরিচালকরা কোনো একটি গল্পকে এই প্রথায় সাজিয়ে নেন ও পরে তাকে নৃত্যে রূপান্তরিত করবার সময় নর্তক-নর্তকীদের সেইমত নির্দেশ দেন। প্রত্যেক সর্গে সংক্ষেপে গদ্যে যে বিষয়ে লেখা হয়েছে তার বেশির ভাগ অংশ বিদেশে শিক্ষা-

প্রাপ্ত ছাত্রীটি একলাই নাচের দ্বারা অভিনয় করেছিল।

ব্যালে-তে নাচ গড়ে ওঠে সব সময় যন্ত্র-সংগীতের সাহায্যে। কিন্তু এখানে নাচ আবৃত্তি কথা ও গানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। ইউরোপীয় নৃত্য-পদ্ধতি ও দেশী নাচের ঢঙ উভয়েই পাশাপাশি এতে কাজ করেছে। দক্ষিণভারতীয় মণিপুরী ও ইউরোপীয় নাচ জানতেন যাঁরা তাঁরা সকলে একই সঙ্গে যে যার নিজ পদ্ধতি বজায় রেখে একে রূপদান করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই নাটিকায় গুরুদেব মঞ্চের একপাশে বসে কথিকাটির প্রত্যেক সর্গ আবৃত্তি করেছিলেন।

এই বৎসরের শেষে অর্থাৎ ডিসেম্বরে গুরুদেবের ৭০তম জন্মোৎসবের সময় কলকাতায় 'নটীর পূজা' ও 'শাপমোচন' অভিনয় হল। 'শাপমোচন' এই উপলক্ষে তিনি নূতন করে লেখেন। শিশুতীর্থের মতোই রাজা নাটকের ভাব অবলম্বনে এই কথিকাটি রচিত। তাকেই অবলম্বন করে ব্যালে-নাচের আদর্শে এই নৃত্যনাট্যটি গড়ে ওঠে। শিশুতীর্থকে ঠিক যে প্রথায় রূপদান করা হয়েছিল এখানেও তাই ঘটে। আগের মতনই কথা, আবৃত্তি ও গানের সাহায্যে একে রূপ দেওয়া হয়। এর নাচে মণিপুরী ঢঙ ছিল প্রধান, তার পরে কথাকলি কিছুটা, আর ছিল ইউরোপীয় নৃত্য-পদ্ধতি। বিশ্বভারতীর রুশদেশীয় লোকনৃত্য-পারদর্শী একজন মার্কিন কর্মী নাটকে 'রাজা'র অভিনয় করেন গানের সঙ্গে। গুরুদেব কথিকার গদ্য-অংশসমূহ নিজে পাঠ করেন। কোনো কোনো সময় তাঁর সেই গদ্যছন্দের আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যের ছন্দে অভিনয় করতে হয়েছিল ছাত্রছাত্রীদের।

এই দুই নৃত্যনাট্যে লক্ষ্য করবার বিষয় হল এই যে, এই সময় থেকেই শান্তি-নিকেতনের নৃত্যকলা নাটকীয় পরিবেশের মধ্যে গড়ে উঠতে শুরু করে। এতদিন নাচের অভিনয়ে ঋতুর গানগুলিই ছিল মুখ্য—সেগুলি কোনো ঘটনা বা নাটকীয় পরিবেশের কথা ভেবে রচিত নয়। প্রথমে গানগুলির সৃষ্টি আপনা থেকেই, তার পরে তাকে সাজানো হত ভাবসাম্য বজায় রেখে। পরে তাতে ভাব-পারম্পর্য রাখবার জন্য গুরুদেব কথা বসাতেন। এককথায় গানগুলির জন্যেই নাটকীয় পরিবেশ রচিত হয়েছে। 'শিশুতীর্থ' ও 'শাপমোচনে' গল্প বা ঘটনা হল মুখ্য। তাকে নাটকীয় রূপে খাড়া করতে গিয়ে তার সঙ্গে মিলিয়ে গানগুলি বসানো হয়েছে বা কথা বদলাতে হয়েছে। অর্থাৎ গান এসেছে পরে, গল্পের ভাব অনুযায়ী।

কিন্তু একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, গুরুদেব নিজে কখনো নাচকে খুব সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেন নি। তাঁর কাছে নাচ হল সাধারণ অভিনয়েরই একটি উৎকৃষ্ট মধুর সংস্করণ। সাধারণ অভিনয়কে আরো চিত্তাকর্ষক করে তুলতে পারে নাচ। যেমন সাধারণ ভাষায় প্রকাশিত মনের আবেগকে আরো চিত্তাকর্ষক করে তোলে কবিতার ভাষা ও অধিকতর মধুর করে তোলে গানের সুর।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতেই তিনি নাচকে দেখতেন। তিনি মনে করতেন, কথায় যখন অভিনয় করে কোনো ভাব সম্পূর্ণ ব্যক্ত করা যায় না, তখন নাচের অভিনয়ে তা সম্ভব হয়। সেইজন্যে তাঁর নাটকে নানা পদ্ধতির অভিনয়ের শেষ পরীক্ষা তিনি নাচের ছন্দে করে গেছেন। তিনি মনে করতেন যে, গদ্যে পদ্যে ও গানে যখন সাধারণ ভাবে হাত পা নেড়ে অভিনয় করা যায়, তখন সেই তিনটিকে অবলম্বন করে নাচে

অভিনয় কেন সম্ভব হবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গির জোরেই তিনি তাঁর নানা রকমের গীতনাটককে নাচে অভিনয় করাতে সাহসী হয়েছিলেন। আগেই দেখিয়েছি যে, কত বিচিত্র পদ্ধতির নাচ তাঁর নৃত্য-আন্দোলনে স্থান পেল—কিন্তু সব-ক'টি ঢঙকে অভিনয়ের অবলম্বন হিসেবে দেখার দরুন কখনো কোনো নাটকে এত রকমের বিচিত্র ঢঙ বেখাপ্পা মনে হয় নি। এই হল নাচের বৈচিত্র্যকে এক ঐক্যসূত্রে বাঁধবার মূল রহস্য। তিনি তাঁর রচনাকে মুখ্য বলে ধরেছিলেন বলেই নাচের অভিনয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধারা এত সহজে স্থান করে নিতে পেরেছিল।

'শিশুতীর্থ' মাত্র একবার ও 'শাপমোচন' বহুবার অভিনীত হয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে ও সিংহলদ্বীপে। এ কথা বলে রাখা ভালো যে, 'শাপমোচন' প্রথমবার যেভাবে অভিনীত হয়, পরবর্তী অভিনয়ে হুবহু সেই রীতিই যে বজায় ছিল, তা নয়। মূল গল্পের ধারা এবং তার দৃশ্যভাগ ঠিকই ছিল, কিন্তু প্রতিবারেই নৃত্য-ধারার উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে নাচের টেক্‌নিকের বহুল পরিমাণে পরিবর্তন ঘটে। সম্পূর্ণ ভারতীয় নৃত্যধারায় একে রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়—কেবলমাত্র তাল-যন্ত্রের নৃত্যছন্দে নাচ দেখানোর চেষ্টা পরবর্তীকালে 'শাপমোচনে'র অভিনয়ের সময়েই বিশেষভাবে শুরু হয়। মণিপুরী বোলের নাচ দিয়েই তার সূত্রপাত। গানের মাঝে মাঝে ছোটো খোলের বোল দিয়ে অভিনয় থেকে কেবল নাচের ছন্দে দর্শকের মনকে একটু আন্দোলিত করাই হল এর কাজ। এটির সূত্রপাত করে যান 'শাপ-মোচনে'র যুগে (১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে) নবকুমার সিং, যিনি প্রথম 'নটীর পূজা'র যুগে মণিপুরী নাচ শান্তিনিকেতনের মেয়েদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে ঐ সময় 'শাপমোচনে'র অভিনয়ের জন্যে আর-একবার আনা হয়েছিল। গুরুদেবের গানকে নাচের অভিনয়ে রূপ দেবার তাঁর মতো ক্ষমতা আমি আর কোনো নর্তকের মধ্যে দেখি নি। এই সময়ে তাঁর সাহায্যে শান্তিনিকেতনের নৃত্যাভিনয়ের ধারা মণিপুরী পদ্ধতিতে বহুপরিমাণে উন্নতি লাভ করে। শাপমোচনে কথাকলি ও মালাবারের মেয়েদের একপ্রকার নাচও ছিল, কিন্তু তখনো সেই নাচের অভিনয়-পদ্ধতি শান্তিনিকেতন গ্রহণ করতে পারে নি। কেবলমাত্র তার অভিনয়হীন নৃত্য-ভঙ্গিকে অলংকরণ-রীতির দিক থেকে কাজে লাগানো হয়েছে। আর পূর্ব-প্রবর্তিত নানাপ্রকার দেশী-বিদেশী নাচ ছিল প্রচ্ছন্নভাবে সকলের মধ্যে মিশে।

এই শাপমোচনের যুগ চলেছিল ১৯৩১ থেকে ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। কিন্তু এরই মধ্যে ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে গুরুদেব 'তাসের দেশ' ও 'চণ্ডালিকা' সাধারণ নাটকের আদর্শে লিখলেন, বিশেষ করে অভিনয়ের জন্যে। এ দুটিকে শারদোৎসব বা ফাল্গুনীর মতো গীতনাটকও বলা চলে। প্রচুর গান এই নাটকে এবং গানগুলি নাটকের কথার মতনই প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে আছে। কিন্তু এই দুই নাটক রচনার পিছনের ইতিহাসটুকু জানা দরকার।

১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে গুরুদেব ছিলেন দার্জিলিং-এ। তখন একটি নৃত্যগীতের আয়োজন করা হয়, তাতে 'বিদায়-অভিশাপ' নাট্যকাব্যের আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যাভিনয় করা হয়েছিল। অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবিতার সঙ্গে এইপ্রকার অভিনয়ের সম্ভাবনায় উৎসাহিত হয়ে তিনি 'চণ্ডালিকা' নাটকটি লেখেন। 'বিদায়-

অভিশাপে' যিনি অভিনয় করেছিলেন, তিনিই শিশুতীর্থের সময় 'ঝুলন' কবিতায় অভিনয় করে দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন। 'চণ্ডালিকা'র সময় ভারতবর্ষে মহাত্মাজির হরিজন-আন্দোলন খুব জোরে চলেছে—এই আন্দোলনের সমর্থনেই গুরুদেব 'চণ্ডালিকা' নাটক লিখেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল এই নাটকের 'প্রকৃতি'র অভিনয় করবেন পূর্বোক্ত প্রাক্তন ছাত্রীটি আর মায়ের অভিনয় করবে তাঁর দৌহিত্রী। এই নাটকে কথা ও গান পাশাপাশি ছিল। কথা ছিল গদ্যের অংশ গুরুদেব নিজে পাঠ করবেন, গানের অংশ গাইবে গানের দল। আর সমানে গদ্য-আবৃত্তি এবং গানের সঙ্গে তারা দুজনে অভিনয় করবে নাচে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা সম্ভব হয় নি। রঙ্গমঞ্চে গুরুদেব নাটকটি কেবলমাত্র আবৃত্তি করে শোনান। গানগুলি গানের দল গেয়েছিল।

'তাসের দেশ' এই সময়েই রচিত। গল্পগুচ্ছের 'আষাঢ়ে গল্প'টি নিয়ে ব্যালে-র আদর্শে একটি নৃত্যাভিনয় খাড়া করবার চেষ্টা থেকেই এই নাটকের সৃষ্টি। সাধারণ কথাবার্তায় অভিনয়ের মাঝে মাঝে গানগুলি নাচে অভিনয় করতে হয়েছিল।

১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যে রচিত 'চিত্রাঙ্গদা' 'শ্যামা' ও পরবর্তীকালের 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের মূলে ঐ একই ইতিহাস জড়িত। প্রত্যেকবার একই নামের ব্যালে-আদর্শে পরিকল্পিত নৃত্যাভিনয়কে পরিপূর্ণ গীতিনাটকে রূপান্তরিত করে তবে তিনি নিশ্চিন্ত হন।

নৃত্যোপযোগী নাটিকা গুরুদেব রচনা করেছেন এ পর্যন্ত অনেক। নাচের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানা পদ্ধতিতে ঐ-সব রচিত। নাচের দিক থেকে পরীক্ষা করতে করতে শেষপর্যন্ত তিনি বুঝলেন যে, গীতনাট্যই নৃত্যনাট্য হবার পক্ষে সব চেয়ে উপযুক্ত। এই গীতিনাট্য বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রথমজীবনেই হয়েছিল। তা ছাড়া গানকে অভিনয়ে রূপ দেওয়াও যে সম্ভব, সে-কথা তিনি তখন থেকেই ভালো করে জেনেছিলেন। আর জেনেছিলেন যে, অভিনয়ের সর্বাঙ্গসুন্দর বিকাশ নাচের সাহায্যেই সম্ভব। তিনি নিজে কবি ও সুরকার। এই-সব গুণের সমবায় হয়েছিল বলেই শেষ-জীবনে নৃত্যনাট্য লেখায় তিনি উৎসাহিত হন। এ-সব নাটকে আর গদ্যভাষায় কথা বসাবার দরকার তিনি বোধ করলেন না। কারণ গানের সুরে কথাবার্তা কওয়া যে যায়, সে তো তিনি বাল্মীকিপ্রতিভা কালমৃগয়ার যুগেই ভালো করে জেনে গেছেন এবং পরেও জেনেছেন 'শাপমোচন'-এ। 'চিত্রাঙ্গদা' পর্যন্ত গদ্যছন্দের আবৃত্তি আছে, কিন্তু 'শ্যামা' বা 'চণ্ডালিকা'য় তাকেও তিনি বর্জন করে গেছেন।

চিত্রাঙ্গদা ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত মণিপুরী পদ্ধতির উপরেই বিশেষ করে গড়ে উঠেছিল, আর ছিল মালাবার প্রদেশ এবং বাংলা ও অন্যান্য দেশের লোকনৃত্য, কিছুটা কথাকলি ও শান্তিনিকেতনের পূর্বকৃত নানাপ্রকার মিশ্রিত নাচ। কথাকলি অভিনয় তখনো চালু হয় নি। এই নাটকের যুগে গানের মাঝে মাঝে বোলের ছন্দে নাচ আগের চেয়ে একটু বেশি পরিমাণেই ঢোকানো হয়েছিল, যে পদ্ধতি নবকুমার সিং 'শাপমোচন'-এ ধরিয়ে দিয়েছিলেন। নাটকের কোনো কোনো অংশে ছিল বোলের নাচের প্রাধান্য। কয়েকটি স্থলে একমাত্র তালযন্ত্রের ছন্দেই অভিনীত হত। এ ছাড়া গানে অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ছোটো ছোটো বোল

রাখা হয়েছিল। এইরকম অধিকাংশ বোলই কেবলমাত্র নৃত্যছন্দের অলংকার হিসেবে স্থান পেয়েছে।

নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' বিষয়ে দু-একজন সমালোচকের মত যে, কোনো কোনো স্থানে নাটকের গতি সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকে নি, হয় বাধাপ্রাপ্ত, নয় গতি মন্থর হয়েছে। কেন এটি ঘটেছে সে বিষয়ে কয়েকটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। এই নাটকগুলি সব সময়েই নাচের তাগিদে লেখা। অনেক সময় এই-সব নাটকের কতক অংশ কেবলমাত্র নাচের প্রয়োজনে লিখিত, মহড়ার সময় এখানে-সেখানে নতুন কথা সংযোজিত হয়। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সময় বাড়াবার জন্যেও এখানে-সেখানে তিনি গান জুড়েছেন। সাজবদলের জন্যে সময়ের দরকার, তখনো গান বসিয়েছেন। তা ছাড়া 'চিত্রাঙ্গদা'-তে এমন কতকগুলি নাচ আছে, যা এটির বহু পূর্বে রচিত। সেগুলি তখনকার যুগে শান্তিনিকেতনে ভালো নাচ হিসেবে পরিচিত ছিল। কেবলমাত্র ভালো নাচ বলে 'চিত্রাঙ্গদা'য় যখন সেগুলি রাখার কথা হয়, তখন তিনি তাতে আপত্তি করেন নি, কিন্তু নাটকের যে যে জায়গায় সেগুলিকে বসানো হয়েছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে গানের কথা বদলে দিয়েছেন, যাতে ভাবসাম্য থাকে। সুর ও ছন্দ -বদলে তিনি হাত দেন নি। 'চিত্রাঙ্গদা'য় এই-ধরনের গান ও নাচ অনেক বসেছে। কখনো কথার বদল না করে বইয়ে গানের মাথায় গানটি কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন তার উল্লেখ করে দিয়েছেন।

'শ্যামা' নাটকটি প্রথম ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে 'পরিশোধ' নামে রচিত ও নৃত্যে অভিনীত হয়। এই সময় শান্তিনিকেতনের নাচে প্রথম সিংহল দেশের 'ক্যান্ডি' নৃত্য প্রবেশ করল এখানকার অনুসন্ধিৎসু শিল্পীদের উৎসাহে। প্রথমবারের অভিনয়-দিনে আরম্ভে এক ঘন্টার মতো নৃত্য ও গীতের আলাদা একটি অনুষ্ঠান করা হয়। প্রথমবারের অভিনয়ে এই নাটিকায় কতকগুলি অংশ ছিল না। সেগুলি পরের বারে প্রবেশ করেছে। দ্বিতীয়বারের অভিনয়ের সময় 'উত্তীয়' চরিত্র ও ঘাতকের দ্বারা তার হত্যার দৃশ্যটি এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হত্যার দৃশ্যটি সমালোচকদের কারো কারো মতে 'শ্যামা' নাটকের একটি দুর্বল অংশ। গুরুদেবও তাই মনে করতেন, তবুও তিনি ঐ অংশটি নাটক থেকে বাদ দেন নি। হত্যার দৃশ্যটি তালযন্ত্রের বোলের সঙ্গে রেখেছিলেন। এই অংশটা নাটকের মাঝখানে দর্শকের চিত্তকে মৃত্যুর দৃশ্যে ও ঘাতকের প্রচণ্ড তাণ্ডবনৃত্যে রসান্তরে নিয়ে গিয়ে বিশ্রাম দেয় বলেই এটি দুর্বল হলেও দর্শকবৃন্দ এ নিয়ে আপত্তি করে নি। সেজন্যই হয়তো গুরুদেব এ অংশটি বাদ দেন নি।

'শ্যামা' নাটকের অভিনয় অনেকবার হয়েছে। তার মধ্যে ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের 'বর্ষামঙ্গল'-এ সময়কার অভিনয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলে আমি মনে করি।

এই নাটকেই শান্তিনিকেতনের নৃত্য-ইতিহাসে ভারতের তিনটি প্রধান নৃত্যধারার অপূর্ব সম্মিলন হয়েছিল। মণিপুরী কথাকলি ও কথক নৃত্যপদ্ধতি নিজ নিজ পদ্ধতিতে নাটকের গানের সঙ্গে চমৎকার অভিনীত হয়েছিল। 'বজ্রসেনে'র চরিত্র অভিনীত হয়েছিল ভারতনাট্যম্ ও কথাকলি পদ্ধতিতে, 'উত্তীয়' হয়েছিল নিখুঁত কথকের আদর্শে, 'শ্যামা'র অভিনয় হয়েছিল শান্তিনিকেতনে প্রচলিত মণিপুরী

ভঙ্গিতে, আর 'প্রহরী'র নাচ খাঁটি কথাকলির আঙ্গিকে। অভিনেতারা সকলেই ছিলেন ঐ-সব নাচের পাকা শিল্পী।

শান্তিনিকেতনের নৃত্য-ইতিহাসে এইবারেই প্রথম কথক নাচ স্থান পেল, এবং এই নাচ গুরুদেবের নৃত্যাভিনয়ে কৃতকার্য হবার বড়ো কারণ হল, সেই সময় এই নাচের শিল্পী ও তাঁর বিখ্যাত নৃত্যগুরু উভয়েই শান্তিনিকেতনে কিছুদিন এসে বাস করেন।

কিন্তু এ নাচের চর্চার আয়োজন এখানকার ছাত্রছাত্রী-মহলে কোনোদিনই হয় নি। সেইজন্যে এখনো এ নাচের উল্লেখযোগ্য স্থান হল না এখানকার নাচে। এইবারের নাচে প্রত্যেক নৃত্যপদ্ধতির নিজস্ব রীতিতে বহুপ্রকার বোলের নাচ ব্যবহার করা হয়েছিল।

'চিত্রাঙ্গদা'র কবিতা-আবৃত্তিগুলি যেমন মূল ঘটনার যোগসূত্র বা এক নাচের সঙ্গে অন্য নাচের জোড়-মেলানোর কাজ করেছে ও চিত্তকে বিশ্রাম দিয়েছে, এখানেও ঐ-সব তাল-নির্ভর আলংকারিক নাচগানের রসটিকে অব্যাহত রেখে দর্শকের চিত্তকে বিশ্রাম দিয়েছে। ভারতবর্ষের সব প্রাচীন নাচের এই রীতি অতি প্রসিদ্ধ ও অতি প্রচলিত। এ ছাড়া ভারতীয় প্রাচীন নৃত্যনাট্যে দেখেছি রাগিণী ও তালাশ্রিত অভিনয়ের গানের ফাঁকে ফাঁকে এক সুরের আবৃত্তি। প্রাচীন শিল্পীরা একই উদ্দেশ্যে ঐ কাজ করে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া আর-একটি পদ্ধতি দেখেছি, কেবলমাত্র তালবাদ্যের তালের ছন্দে কোনো ঘটনার যোগসূত্র হিসেবে বিনা গানের অভিনয়।

'চিত্রাঙ্গদা'র গদ্যছন্দের আবৃত্তিগুলি ১৯৩৮ পর্যন্ত কখনো নৃত্যভঙ্গিতে আবৃত্তির ছন্দে অভিনীত হয় নি। এই সময় পর্যন্ত সাধারণভাবে এই কবিতাগুলিকে অভিনয় করা হত। কিন্তু ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ঐ কবিতাগুলিও সম্পূর্ণরূপে নৃত্যচ্ছন্দে অভিনীত হতে শুরু হল। এও একপ্রকার নাচে পরিণত হল। এই সময় থেকে অর্জুনের নৃত্য-অভিনয় কথাকলি-পদ্ধতির সাহায্যে খুবই ভালো ফল দিয়েছিল। যদিও এ রকমের পরীক্ষা চিত্রাঙ্গদার আগে অন্যান্য নাটকে হয়ে গেছে, তবু চিত্রাঙ্গদায় ১৯৩৯এর আগে পর্যন্ত এই পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার ছিল না। অনেক সময়ে দেখা গেছে এই পদ্ধতির অভিনয় গানের অভিনয়ের চেয়েও দর্শকদের মন বেশি আকর্ষণ করে। গানের সুরে ও তালে মিশ্রিত অভিনয়ের মাঝে মাঝে এ ধরনের আবৃত্তির অভিনয় দর্শকদের মনের পক্ষে বিশ্রামেরও কাজ করে।

১৯৩৮এর মার্চ মাসে 'চণ্ডালিকা' প্রথম অভিনীত হল। এ নাটকে নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ নেই বললেই চলে। আগের দুটিতে খানিকটা ছিল। এ নাটকের সফলতা নির্ভর করে কেবলমাত্র ভালো নৃত্যাভিনয়ের উপর। নাচের অলংকারের স্থান এতে খুব বেশি নেই। চিত্রাঙ্গদার নাচের আঙ্গিকে অলংকার-বহুলতা খুব, তার পরে 'শ্যামা'। 'চণ্ডালিকা' সেদিক থেকে সকলের চেয়ে নিরাভরণ। কেবলমাত্র সময় বাড়াবার জন্যে এতে মাঝে মাঝে পূর্ব-রচিত নাটকের কয়েকটি গান রাখা হয়েছে, কিন্তু তার খুব বেশি দরকার ছিল না। কখনো কখনো এই নাটিকাটিকে নানাপ্রকার নৃত্য-সমাবেশের দ্বারা 'চিত্রাঙ্গদা'র মতো অলংকার-বহুল করার চেষ্টা করা হলে গুরুদেব এইক'টি কথা জানিয়েছিলেন—

"বাহুল্যে নাচগান বর্জন করা দরকার বোধ হল। সেগুলি স্বতন্ত্র ভাবে যতই ভালো হোক সমগ্রভাবে বাধাজনক।"

এই নাটকের অভিনয়ের ভিত্তি ছিল মূলত মণিপুরী ও কথাকলি আঙ্গিকের উপরে। তার পরে অন্যান্য নাচ। এতে কবিতা-আবৃত্তি ছিল না বটে, কিন্তু কয়েকটি গান ছিল, যাকে রাগিণীর সাহায্যে আবৃত্তির ছন্দে গাইতে হত। তার সঙ্গে যে নৃত্যাভিনয় হয়েছিল তাও সেই একই ছন্দে।

আগেই বলেছি যে, গীতনাট্যকে নৃত্যাভিনয়ের সাহায্যে আরো চিত্তাকর্ষক করার একান্ত আগ্রহ থেকেই এইপ্রকার নৃত্যনাট্যের উৎপত্তি। অবশ্য এর পিছনে সব সময় যে একটি তাগিদ ছিল এ কথা ভুললে চলবে না। বাইরের থেকে যে তাগিদ তিনি পেতেন তা সব সময় তাঁর আদর্শ ও তাঁর রুচির অনুকূল হয়তো হত না। কিন্তু তিনি তাকে অতি সহজেই আপন আদর্শে চালিয়ে নিতেন। এত রকম নাচের উপলক্ষে নাটিকা রচনা করে তাকে অভিনয় করিয়েও নৃত্যনাট্যে বিশেষত 'চণ্ডালিকা'য় তার পরিণতি টানতে পারায়, সে-কথা আরো পরিষ্কার ধরা পড়ে। কতরকম বিদেশী নৃত্যাদর্শ প্রবলভাবে ভিন্নপথে তাঁর আদর্শকে চালিত করতে চেয়েছে, কিন্তু তিনি তাতে কখনো অভিভূত হন নি। নিজের দেশোপযোগী পথকে ঠিক বলে জেনে তাকেই ধরেছিলেন। নাচকে নিছক নাচের দিক থেকে উপভোগ করার মতো স্বভাবও তাঁর ছিল না কোনোদিনই। সেইজন্যে শান্তিনিকেতনে নাচের প্রথম যুগ থেকে অভিনয় দিয়েই নাচের আরম্ভ, আর তারই পরিণতি গীতনাটিকার অভিনয়ে। নাচ দিয়ে আরম্ভ করে তার পরে অভিনয়ের উৎকর্ষের কথা ভাবা হয় নি। এই হল তাঁর নৃত্যান্দোলনের মূল কথা। তাঁর কাছে লিখিত নাটকটিই হল আসল। এক্ষেত্রে সর্বত্রই তাঁর নাটকের ভাবকে নাচে প্রকাশ করাই হল মূল লক্ষ্য।

গুরুদেবের প্রবর্তিত নাচের এই আদর্শটি মূলত ভারতীয়। জাভা ও বলিদ্বীপের নৃত্য এই আদর্শে চালিত। কেননা তারাও ভারতীয় আদর্শে পুষ্ট। এই আদর্শগত মূল ঐক্য ছাড়া জাভা-বলির নাচের সঙ্গে আর কোনো মিল আমি দেখি নি। নানা-প্রকার বাদ্যযন্ত্রের সম্মিলিত সংগীতের ভিত্তিতেই সে দেশের নাচ রচিত। তারা গানের সঙ্গে ভারতীয় প্রথার অভিনয়-পদ্ধতি গ্রহণ করে নি। অন্তত কথাকলির ন্যায় মুদ্রাভিনয়, কথকের মতো অভিনয় তো নয়ই। তাদের অভিনয় যন্ত্র-সংগীতের ছন্দে বাঁধা সমগ্র দেহভঙ্গির অভিনয়। দেহভঙ্গির অভিনয় করতে গিয়ে তারা চোখে-মুখে কোনোপ্রকার ভাবাভিনয় একেবারে করে না। এক দৃষ্টি, এক মুখভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের অভিনয় করতে দেখেছি। এ বিষয়ে পুরুষ বা মেয়েতে কোনো ভেদ নেই। ওদের প্রাচীন নৃত্যনাট্য প্রায় গল্পের মতো। আমাদের আদর্শে তাকে নাটক বলা চলে না। কথোপকথনকে তারা বেশি প্রাধান্য দেয় নি। আমাদের দেশের কথক যে প্রথায় গল্প বলে, ওদের নাচের নাটক ঐ ধরনের। গানের দল কথকদের মতো গানে গল্প বলে যায়। জাভার প্রাচীন নৃত্যনাটকে দেখেছি নৃত্যাভিনেতারা পরস্পরে কথা বলে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দেহে কোনো-প্রকার নৃত্যভঙ্গি দেখি নি। কথাগুলি তারা স্বাভাবিক কথা বলার স্বরে বলে। এই সময়ে গানের দল থাকে চুপ। কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে নয়।

আমার কাছে এইটুকুই মনে হয় যে, গুরুদেব সে দেশে নাচের সাহায্যে নাটককে অভিনয় করার সম্ভাবনার একটা প্রকাশ দেখেছিলেন বলেই তাতে তিনি উৎসাহিত হয়েছিলেন। তা ছাড়া সব চেয়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন সে দেশ নাচকে যে দৃষ্টিতে দেখেছিল সেই দিকটির প্রতি নজর দিয়ে। তারা নানারূপ বাস্তব ঘটনাকে অবলম্বন করে নাটকে নাচে। কিন্তু সেই বাস্তবতা তাদের নাচের ছন্দে প'ড়ে একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করে, যেটি হল তার নৃত্যরূপ। যুদ্ধ, মৃত্যু ইত্যাদি যে-সব অভিনয় আজকাল আমরা এদেশে বা ইয়োরোপে স্বাভাবিকভাবে করতে দেখি, ওরা সেটাকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে রূপ দিয়ে থাকে। সেখানে নাচে মৃত্যু, নাচে যুদ্ধ; সুতরাং তার মধ্যে হুবহু বাস্তবতার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। সেই কারণে তাদের নৃত্যনাট্যে মৃত্যু হলে ও যুদ্ধে পরাজিত হলে পড়ে যাওয়া ইত্যাদি ওরা দেখায় না। আজকালকার সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে নাচে মৃত্যু খেলা করছে। তাঁর নাটকে গুরুদেব এই দিকটাই ধরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

দৃশ্যকাব্যের পূর্ণ রসোপলব্ধি দর্শকের হয় তখন যখন বহু লোকের একত্র সমবায়ে সে কাজটা সম্পন্ন হয়। নাটকের অনুকূল সাজসজ্জা, নৃত্যগীত ও অভিনয়ে যদি অন্যান্যরা রচয়িতাকে সাহায্য না করে তবে তার সুসম্পূর্ণ রূপ ফোটানো অসম্ভব। তার পরে দরকার হয় রচয়িতার শিল্পদৃষ্টির সঙ্গে এই-সব সাহায্যকারীদের শিল্পদৃষ্টির সমতা। এর অভাবে রচয়িতাকে অনেক কিছু বরদাস্ত করতে হয়, যা না করে উপায় নেই। প্রকাশের বেলায় গুরুদেবের নৃত্যনাট্যে অসম্পূর্ণতা যদি কোথাও প্রকাশ পেয়ে থাকে তবে তার জন্যে তাঁরাই দায়ী, যাঁরা তাঁর এই কাজে সহায়ক ছিলেন। তাঁরা যে কেউ গুরুদেবের মতো ক্ষমতাবান ছিলেন না, এ কথার জন্যে কোনোপ্রকার প্রমাণের দরকার হয় না। কিন্তু সেই অসামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও তিনি যে বহু পরিমাণে তাঁর আদর্শকে কাজে পরিণত করতে পেরেছিলেন এবং সাধারণকে তাঁর রুচিবোধের দিকে যে কিছুটা পরিমাণে তিনি নিয়ে যেতে পেরেছিলেন এতেই আমাদের যথেষ্ট উপকার হয়েছে। আমাদের দেশ ধন্য হয়েছে।

দেশের আধুনিক নৃত্যশিল্পীদের অধিকাংশই গুরুদেবের প্রবর্তিত নৃত্যাভিনয়-পদ্ধতিকে স্বীকার করেন নি; তাঁরা প্রাচীন নৃত্য, লোকনৃত্য ইত্যাদির নামে খণ্ডিত-ভাবের নাচ দর্শকদের কাছে ধরেন একই আসরে। সে নৃত্য সাজসজ্জায়, আকারে প্রকারে দেশী হয়েছে কিন্তু তাতে ভারতীয় উচ্চ-শ্রেণীর নৃত্যাভিনয়ের আদর্শ বা রীতি ব্যাহত হয়েছে। আজ অনেকে কেবলমাত্র নানা যন্ত্রের ছন্দ-বহুল ধ্বনিকে অবলম্বন করেছেন এই-সব নাচের আসরে। গানের স্থান নেই সেখানে। ইয়োরোপের আদর্শে ব্যালে-নৃত্যের সঙ্গে জড়িত যন্ত্র-সংগীতের প্রভাবে আমরা গান বাদ দিয়ে যেভাবে নাচের জন্যে যন্ত্রসংগীত রচনা করছি, সে কাজে এখন পর্যন্ত খুব উঁচুদরের ক্ষমতার বিকাশ দেখা যায় নি। যন্ত্র-সংগীতের সাহায্যে কেবলমাত্র নৃত্যাভিনয়-প্রথা আমরা পেয়েছি সম্পূর্ণরূপে এই শতাব্দীর পাশ্চাত্য নৃত্যকলার প্রভাবে। আমরা বহিরঙ্গে ভারতীয় হলেও আমাদের মনকে আবৃত করে রেখেছে ইয়োরোপের নৃত্যাদর্শ।

ইয়োরোপে নৃত্যের আয়োজন হয়, সাধারণত নৃত্যকরের নৃত্যপটুত্বের প্রতি

লক্ষ রেখে, নানাপ্রকার নাচের সমাবেশে আমরা সেই বিশেষ ব্যক্তিকেই সমস্ত কার্য-সূচীর কেন্দ্রে দেখি। আমাদের দেশেও সেই আবহাওয়াই প্রবল। কিন্তু গুরুদেবের নৃত্যাভিনয়ে কাহিনীর ভাব ও তার রস প্রধান হওয়াতে তাঁর রচনা কোনো বিশেষ নৃত্যশিল্পীকে লক্ষ্য করে রচিত হয় নি; প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যাভিনয়ের আদর্শও ঠিক এই পথেই চলে এসেছে।

গুরুদেব একদিকে প্রাচীন আদর্শে ভারতীয় নৃত্যে যুগ-প্রবর্তক, অপর দিকে তিনিই এক্ষেত্রে সকলের চেয়ে অতি আধুনিক। তাঁর শেষজীবনের নৃত্যনাট্যগুলি যে আগামী কালের নৃত্য-আন্দোলনকে প্রেরণা দেবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর নৃত্যনাট্যের মধ্যে আমরা আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক সমাজের চিত্র পাই না, সামাজিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টাও দেখি না। তাঁর রচনা চেয়েছে সমগ্রকালের মানবলোকের চিরন্তন সমস্যাকে সুন্দর ভাবে দর্শকের সামনে ফুটিয়ে তুলে তাঁদের চিত্তকে উন্নততর রসলোকে উত্তীর্ণ করতে, যা কোনোদিনই কারো কাছে অবান্তর মনে হবে না।

আঙ্গিকের দিক থেকে অতি প্রাচীন নৃত্য-পদ্ধতির অবিকল অনুকরণও তিনি নাটকের অভিনয়ে করান নি, আবার ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে যেখানে পাশ্চাত্য পদ্ধতি বৈচিত্র্য-দানে সহায়তা করেছে, খাপ খেয়েছে, সেখানে তাকে অনায়াসে স্থান দিয়েছেন।

গীতনাট্য ও নৃত্যনাট্য

আমাদের দেশে গীতনাট্য নামে কয়েকপ্রকার নাটকের প্রচলন অনেককাল থেকেই চলে আসছে। যে নাটকে পাত্রপাত্রীর কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর গান থাকে সে হল এক রকমের গীতনাট্য। এর নমুনা আমরা পাই অনেকগুলি প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের মধ্যে, দক্ষিণভারতের কর্ণাটপ্রদেশে প্রচলিত একপ্রকার নৃত্যাভিনয়ে, বাংলা-দেশে প্রচলিত যাত্রাভিনয়ে এবং গুরুদেবের রচিত শারদোৎসব, ফাল্গুনী, অচলায়তন, তাসের দেশ প্রভৃতি গীতনাট্যের মধ্যে। এই নাটকের গান শুনে বেশ বোঝা যায় যে, নাটকে কেবল সুরমাধুর্য বিস্তারের জন্যে গানগুলি বসানো হয় নি, নাটকের সাধারণ ভাষায় যে ভাব প্রকাশ করা গেল না, গান দিয়েই যেন তাকে পূরণ করা হচ্ছে।

আর-এক রকমের গীতনাট্য হল, যাতে পাত্রপাত্রী সাধারণ ভাষায় কথা বলে না। একজন সূত্রধার কথার ভাষায় নাটকের ঘটনা ও বিষয়বস্তুকে দর্শকের সামনে খুলে ধরে। কেবল গানের অংশ অভিনেতারা অভিনয় করে যায়। অনেক সময় দেখা গেছে সূত্রধারই একাধারে নাচে গানে বক্তৃতায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে, অন্যান্য অভিনেতা উপলক্ষ মাত্র। এ ধরনের গীতনাট্যের সঙ্গে আসামের বৈষ্ণবদের 'অংকীয়া-নাট' নাটকে, বাংলার 'কালীয়দমন' নামে প্রাচীন যাত্রাগানে, দক্ষিণভারতের অন্ধ্রদেশে প্রচলিত প্রাচীন নৃত্যাভিনয়ে এবং গুরুদেবের 'শাপমোচন' ও 'শিশুতীর্থ' প্রভৃতি গীতনাট্যে মিল পাওয়া যায়।

গুরুদেবের রচিত 'বসন্ত' 'শ্রাবণ-গাথা' 'ঋতুরঙ্গ' কিন্তু এ ধরনের গীতনাট্য নয়। এগুলি দেখে মনে হয় যেন গানের জন্যেই নাটকের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। গানগুলিকে একটি মূল ভাবসূত্রে গেঁথে দর্শকদের সামনে ধরবার ইচ্ছা থেকেই এই-সব নাটকীয় আয়োজন।

এক ধরনের গীতনাট্য আছে, যার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কথাবার্তা সুরে রচিত। ইয়োরোপে এই নাটকের প্রভাব খুব বেশি। তাদের ভাষায় একে বলে 'অপেরা'। নেপালে প্রচলিত প্রাচীন বাংলা গীতনাট্যও যে এই ধরনের ছিল, প্রাচীন পুঁথিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেশে পূর্ণাঙ্গ গীতনাট্য দক্ষিণভারতের কেরলপ্রদেশে ও তামিলনাদে আজও প্রচলিত আছে। গুরুদেব স্বয়ং এই ধরনের গীতনাট্য রচনা করেছিলেন ছয়টি। সে ক'টির নাম হল— বাল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া, মায়ার খেলা, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা ও চণ্ডালিকা।

আমাদের দেশের প্রচলিত ধারা অনুসারে সব রকমের গীতনাট্যে নাচ বা নাচের অভিনয় ছিল অতি আবশ্যক। নাচ ছাড়া গীতনাট্য অভিনীত হতে পারে, এ যেন আমাদের পূর্বপুরুষরা ভাবতেই পারতেন না। সেই কারণেই আমাদের দেশের প্রাচীন সব রকমের গীতনাট্যের গান মাত্রেই নাচে অভিনীত হত এবং আজও হয়। বোধ হয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা এইজন্যেই সংগীতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, একাধারে নাচ গান ও বাজনা যাতে মিশেছে তাকেই বলা হবে সংগীত।

প্রাচীন ভারতে গান ও নাচকে গীতনাট্যে এত বড়ো স্থান দেওয়া হল কেন, তা ভাববার বিষয়।

হৃদয়াবেগকে আমরা সাধারণ কথায় যত না সুন্দর করে ফোটাতে পারি, তার চেয়ে বেশি সুন্দর হয়ে ওঠে তা কবিতার ছন্দে—আরো মর্মস্পর্শী হয় রাগিণীতে মিশে সে যখন গানে রূপ নেয়। নাটকে সাধারণ কথার অভিনয় ভালো লাগে বটে, কিন্তু তার চেয়েও ভালো লাগে তাকে সুরের ভিতর দিয়ে যখন আমরা পাই। সব চেয়ে বেশি মন আকর্ষণ করে যখন দেহছন্দের নৃত্যভঙ্গিতে তা রূপ নেয়।

এই কথা ভেবেই বোধ হয় আমাদের পূর্বপুরুষেরা গানে ও নাচে নাটককে পূর্ণ করে নানা প্রকারের গীতনাট্যে তাকে রূপান্তরিত করতেন। ভারতীয় আদর্শে গান ছাড়া নাটক নেই, আবার গান যেখানে আছে সেখানে নাচ থাকবেই।

গুরুদেবের জীবনের প্রথম দিকে রচিত কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ গীতনাটক বাল্মীকি-প্রতিভা, কালমৃগয়া ও মায়ার খেলা ছাড়া আর সবগুলিতেই নাচের চেষ্টা করা হয়েছিল। সেগুলি সবই নাচের ভঙ্গিতে অভিনয় করবার উপযোগী। শারদোৎসব থেকে শুরু করে চণ্ডালিকা পর্যন্ত তাঁর জীবনের শেষার্ধের সব-ক'টি গীতনাট্যের অভিনয়কালে গানগুলিকে কোনো-না-কোনো ভাবে নাচের ভাষায় অভিনয় করা হয়েছিল। নাচের ভাষাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে চিত্রাঙ্গদা শ্যামা ও চণ্ডালিকার অভিনয় হয়েছিল বলেই তিনি এ ক'টির আলাদা নামকরণ করে বললেন 'নৃত্যনাট্য'।

ইয়োরোপের গীতনাট্য-অপেরাকে নৃত্যনাট্য বলা চলে না। কারণ, অপেরা কেবল গানে অভিনয় করবার জন্যেই রচিত, নাচের জন্যে নয়। সুগায়কের গানের উপরেই অপেরার ভালোমন্দ নির্ভর করে। নৃত্যপটু নটনটীর জন্যে এ নয়। সেদিক থেকে গুরুদেবের প্রথমজীবনের বাল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া ও মায়ার খেলার সঙ্গে বিদেশী অপেরার মিল বিশেষ লক্ষ্য করি। এর গানগুলি এমনভাবে রচিত যে, মনে হয় সাধারণভাবে অভিনয় করবার পক্ষেই তা উপযুক্ত।

এই গীতনাট্যগুলির সঙ্গে পাশ্চাত্য প্রথার মিল পাবার কারণটা কি তার উত্তর পেতে হলে আমাদের বাংলাদেশের সংগীত-ইতিহাসের আর-এক দিকে একটু নজর দিতে হবে; সেটা হচ্ছে গুরুদেবের জন্মকাল ও তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া।

তাঁর জন্ম কলকাতা শহরে ইংরেজি ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে, সিপাহীবিদ্রোহের কয়েক বৎসর পরে। এই যুগটি বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি স্মরণীয় যুগ; যে কারণে গুরুদেব এই সময়টিকে স্মরণ করে বলেছেন বর্তমান আধুনিক যুগের আরম্ভ।

উনিশ শতকের গোড়া থেকে সিপাহীবিদ্রোহের সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে বিদেশী সভ্যতার প্রভাবে দেশের শিক্ষা সমাজ ধর্ম ও রাজনীতিতে যে আন্দোলন চলেছিল, তার মধ্যে ছিল বিলেতি সভ্যতার প্রতি অনুকরণের ঝোঁক। সে সভ্যতার ভালোটিকে গ্রহণ করবার প্রতি যেমন একটি আন্দোলন দেশে ছিল, তেমনি সেদেশ থেকে পাওয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা ও চিন্তাস্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার দিকেও দেশের একদল শিক্ষিতদের মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। প্রথম দলে ছিলেন রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয় দত্ত, রাজনারায়ণ বসু ইত্যাদি; দ্বিতীয় দলে ছিলেন হিন্দু কলেজের একদল মেধাবী ছাত্র। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ধারণা হয়েছিল যে, যা-কিছু ভারতীয় তাই বর্জনীয়, আর ইয়োরোপের সব-কিছুই গ্রহণীয়। রাম-

মোহন ও তাঁর পরবর্তীদের আন্দোলনের মধ্যে দেখা গেল ইয়োরোপের যা ভালো তাকে নিজের দেশী সাজে সাজানোর ও যাতে দেশের আবহাওয়ায় তা খাপ খায় তার চেষ্টা। এর একটি বড়ো উদাহরণ হল ব্রাহ্মসমাজ— তার চিন্তা ও কর্ম-আন্দোলন। এই সমাজের প্রচলিত সামাজিক বহু রকমের করণীয় প্রথার মধ্যে ইয়োরোপীয় সমাজের রীতিনীতির প্রভাব বেশ বোঝা যায়। এইভাবে শিক্ষায় জ্ঞানে ধর্মে সাহিত্যে সমাজে ও রাজনীতিতে ইয়োরোপ অনুকরণের বিষয় হয়ে ওঠে। সিপাহীবিদ্রোহের পরই এই অনুকরণের মনোভাবের মধ্যে একটা বড়োরকমের পরিবর্তন আসে। তখন থেকেই দেখা গেল নিজের স্বভাবের সঙ্গে মিলিয়ে এই প্রভাবকে রূপ দেবার চেষ্টা। পূর্বে দুই ভিন্নমুখী প্রভাবে সমাজে যে সংঘর্ষ দেখা দিয়েছিল, এতদিনে তা শান্ত হয়ে সুন্দর একটি সমন্বয়ের সূচনা করল এবং দেশী ও বিলেতি উভয় সভ্যতার ভালোমন্দের একটা যাচাই হয়ে গিয়ে যা গ্রহণীয় তাকে যেন এইবার স্বীকার করা হল।

দেশের সংগীত এবং অভিনয়কলাও এই আন্দোলনের মধ্যে নির্লিপ্ত থাকতে পারে নি। তাতেও পরিবর্তন দেখা গেল। প্রথম যুগের এই সংগীত-আন্দোলনে অনুকরণের ইচ্ছাটাই প্রকাশ পেয়েছে কলকাতাবাসী একদল সংগীতানুরাগীর মধ্যে। কিন্তু নিজের দেশের উচ্চশ্রেণীর সংগীতকে একেবারে বর্জন করার কথা কেউ ভাবে নি। ভাবে নি বিলেতি সংগীতই একমাত্র সংগীত— নিজের দেশেরটি কিছুই নয়।

আজকাল আমরা গ্রামে গ্রামে যে যাত্রাভিনয় দেখি এরও সূচনা হয়েছিল বিদেশী সভ্যতাকে গ্রহণ করবার প্রথম যুগে। আঠারো শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত কলকাতাবাসী ইংরেজরা নিজভাষায় নাটকের অভিনয় প্রায়ই করতেন। সেই নাটকের অভিনয় দেখা তখনকার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত ছিল। তখনকার হিন্দু কলেজের ও অন্যান্য ছাত্রমহলে বিলেতি নাটকের অভিনয় দেখা ও সেই আদর্শে বিদ্যালয়ে ইংরেজিভাষায় অভিনয় ও আবৃত্তি করা শিক্ষার একটা বিশেষ অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই আবহাওয়ার মধ্যে বাংলাভাষায় বিলেতি অনুকরণে একপ্রকার যাত্রার উদয় হল, কলকাতার ধনীদের উৎসাহে ও অর্থসাহায্যে। তার নাম দেওয়া হল 'সখের যাত্রা'। এর ফলে প্রাচীন প্রচলিত গীতনাট্যের প্রতি আদর ধীরে ধীরে কমতে লাগল। এই নতুন যাত্রার গঠনভঙ্গি হল থিয়েটারের মতো। সাধারণ কথা প্রাধান্য পেল সিপাহীবিদ্রোহের পরে যখন পুরো বিলেতি আদর্শে বাংলাভাষায় নাটকরচনার ব্যাপক আন্দোলন দেখা দিল— যাকে বলা চলে এ যুগের থিয়েটারের আরম্ভ— তখন সেই থিয়েটারী নাটকের দেখাদেখি দেশী যাত্রার আর-একবার পরিবর্তন ঘটল। সেই পরিবর্তিত যাত্রার নমুনা আজও আমরা দেখছি। উনিশ শতকের গোড়ায় নতুন সখের যাত্রার উদ্ভব হলেও সিপাহীবিদ্রোহের আগে পর্যন্ত প্রাচীন পদ্ধতির যাত্রাভিনয়ের প্রভাব তখনো যথেষ্ট দেখা গেছে। কিন্তু এ যুগে থিয়েটারী যাত্রার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তার আদর কমতে থাকে। এখন আর সেই প্রাচীন যাত্রা দেখাই যায় না, আমরা আজ তার কথা ভুলে গেছি। কিন্তু এই নতুন যাত্রা বিলেতি থিয়েটারের আদর্শে পরিচালিত হয়েও গানকে বাদ দিতে পারে নি। যাত্রার কথা ও গানকে প্রায় সমান সমান স্থান দিতে হয়েছে। প্রাচীন যাত্রার

গানের সঙ্গে যে নাচের চলন ছিল এই নতুন যাত্রা তাকে বহু পরিমাণে রাখতে বাধ্য হল। এমন-কি, থিয়েটারেও গান ও নাচের প্রভাব দেখলাম। তবে দেশী থিয়েটারের প্রচলিত নাচের ঢঙ বিলেতি নাটক থেকে এসেছিল কি না এ সংবাদ সঠিক দেওয়া সম্ভব নয়। কেবল এটুকু বলা চলে যে, যে নাচের ভঙ্গি ছিল দেশী, তাকে বিলেতি নাচের আদর্শে সাজানো হত। বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের শেষেও ঐ জাতীয় দেশী-বিদেশী-মিশ্রিত থিয়েটারী নাচের প্রভাব রঙ্গালয়ে খুবই দেখেছি। আজও তার কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে মুসলমানযুগ থেকে আরম্ভ করে উৎসবে নহবতের বাজনা বাজত। নানারূপ পূজায় এবং শোভাযাত্রায় বিচিত্র আকারের ঢাকঢোল শিঙা কাঁসি ইত্যাদি তালযন্ত্রের বাজনার দল এই-সব অনুষ্ঠানকে বাজনার শব্দে মাতিয়ে রাখত। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই ধনীদের উৎসাহে সমাজে দেশী বাজনা ত্যাগ করে বিলেতি ব্যান্ড বাজনার চলন হল। তাঁরা বিবাহে ভোজে এই বাজনাকে উৎসাহিত করতে লাগলেন। এই সময় মফস্বলের ধনী জমিদারদের মধ্যে, বিশেষ করে কৃষ্ণ-নগরের রাজপরিবারে, কলকাতা থেকে লোক নিয়ে দেশী বাজিয়েদের দিয়ে বিলেতি ব্যান্ডের দল তৈরি করা হল। আজও আমরা ধনীদের বিবাহের শোভাযাত্রায়, বড়ো বড়ো উৎসবে, পূজার আমোদে, জাতীয় উৎসবদিনে, খেলার প্রাঙ্গণে ঐ প্রকার ব্যান্ড বাজনার নমুনা দেখি। এখনকার শিক্ষিত যুবকমহলে এই বাজনা এতদূর প্রভাব বিস্তার করেছে যে, বিলেতি বাজিয়েদের সাজপোশাকে ও সেই ঢঙে ব্যান্ডের বাজনায় তারা দেশের স্মরণীয় নেতাদের জন্মোৎসব করে, স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করে, সরস্বতী পূজার প্রতিমা ভাসাতে যায়। নিজের দেশের ঢাক ঢোল কাড়ানাকাড়া শিঙা কাঁসি ইত্যাদি বাজাতে বা সেই বাজনা শিখতে তাদের উৎসাহ হয় না, বরং যেন লজ্জা বোধ হয়।

বাংলার প্রাচীন গীতনাট্য ইত্যাদিতে সাধারণত বাজত ঢোলক তম্বুরা মোচঙ্গ, মন্দিরায় 'সাজবাজনা' অথবা বহু জোড়া খোল ও করতালের একসঙ্গে সংগত। উনিশ শতকের আরম্ভ থেকে তবলা ও বেহালা এর মধ্যে স্থান পায়। কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের পরে যখন বিলেতি থিয়েটারের আদর্শে অভিনয়ের প্রারম্ভে ও নানা দৃশ্যের মাঝে মাঝে দেশী ঐকতান বাজনার সৃষ্টি হল, তখন তারও প্রভাব দেশী যাত্রা বা গীতিনাট্য এড়াতে পারল না। পুরানো প্রথাকে তুলে দিয়ে নতুন প্রথাকে গ্রহণ করতে লোকে দ্বিধা বোধ করল না। সেই প্রভাবের বিসদৃশ নমুনা হল আজ-কালকার যাত্রার কনসার্ট বাজনা। কিছুদিন আগেও গ্রামের যাত্রায় বেহালা বাজতে শুনেছি, আজ সেই বাজনাটিও সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে। আজকালকার যাত্রায় বিকট শব্দের কয়েকটি বিলেতি যন্ত্রেরই প্রাধান্য দেখা যায়। সঙ্গে থাকে ঢোল তবলা ও করতাল।

বিলেতি সংগীতের অনুসরণে নিজের দেশের সংগীতকে অবজ্ঞা বা অবহেলা না করে দুই দেশের সংগীতের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে, নতুন পথে দেশের সংগীত ও অভিনয়কে পরিচালিত করবার প্রথম দায়িত্ব নিয়েছিলেন সে যুগের বিখ্যাত ধনী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও তাঁর দাদা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। শৌরীন্দ্রমোহন উচ্চশ্রেণীর

ভারতীয় সংগীতের উন্নতি ও প্রসারে যেরকম চেষ্টা করেছিলেন তা ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে চিরদিনের মতো স্বীকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু বিলেতি সংগীতে তাঁর কিরকম আগ্রহ এবং উৎসাহ ছিল সেদিকটিও আমাদের জানা দরকার।

ইনি ইয়োরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতীয় সংগীতকে ভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গিতে দেখতে শিখেছিলেন। ভারতীয় সংগীতকে বুদ্ধিবিচারের দ্বারা বোঝবার ও বোঝাবার চেষ্টা ইনি সেই যুগে প্রথম চালু করেন। সংস্কৃত পুঁথির সাহায্যে প্রাচীন সংগীত-বিষয়ে আলোচনার আগ্রহে তিনি তাঁর দরবারে অনেক পণ্ডিত নিযুক্ত করেন। এই উৎসাহের ফলেই তাঁর বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় আলোচনার বই আজও আমরা দেখতে পাই। ইয়োরোপীয় সংগীতের জন্যে তিনি জার্মানদেশীয় একজন সংগীতজ্ঞকে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেছিলেন। এঁদেরই বাড়ির বড়োছেলে প্রমোদকুমার ছিলেন পাকা ইয়োরোপীয়ান মিউজিশিয়ান। দৌহিত্র গুরুদাসও ছিলেন ভালো পিয়ানো-বাজিয়ে। এঁরা দুজনে বিদেশী আদর্শে দেশী সংগীতকে 'হার্মনাইজ' করবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রমোদকুমার সেযুগে ভারতীয় রাগিণীর সাহায্যে পিয়ানো বাজনার উপযোগী সংগীত রচনা করবার চেষ্টা করেছিলেন। এর কতগুলি তিনি ইংলণ্ডের কোনো প্রকাশকের দ্বারা ইংরেজি স্বরলিপি-সহ বই আকারে ছাপান। তার একটির নাম হল—First thought on Indian Music or Twenty Indian Melodies composed for Pianoforte'। এই বইটি প্রকাশিত ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন থেকে। দাম ছিল ৬ টাকা। ভূমিকায় প্রমোদকুমার জানাচ্ছেন—

"This is an attempt on My Part, a Native of India, to compose tunes on Indian themes and to arrange them according to European music for the pianoforte.

As hitherto no Indian Music has been written for the Piano, I think my attempt is the first of its kind and I hope, as this the first work from my pen, its shortcomings will be overlooked by the Public."

দেশী রাগিণীগুলি ছিল, ভূপালী খাম্বাজ সুরট ইমনকল্যাণ গৌড়সারঙ্গ সারঙ্গ বেহাগ বিভাস পিলু ভৈরবী পূরবী গৌরী ছায়ানট ভূপবিভাস কালাংড়া শংকরা কেদারা ঝিঁঝিট ও ভূপকল্যাণ।

দ্বিতীয় বইটির নাম জানা যায়—'Lady Dufferin Valse on Indian Melodies'। তাতে ঝিঁঝিট ইমনকল্যাণ পিলু ও বিভাস এই চারটি রাগিণীকে ব্যবহার করেন। তৃতীয় বই 'Souvenir De Calcutta Valse,' আর চতুর্থ বইয়ের নাম হল, 'Grand march for Indian Empire'।

শৌরীন্দ্রমোহনের দাদা যতীন্দ্রমোহন বিষ্ণুপুরে বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর সাহায্যে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে দেশী রাগ-রাগিণীর গৎ দিয়ে বিলেতি থিয়েটারের আদর্শে বাংলা থিয়েটারের জন্যে প্রথম দেশী যন্ত্রে ঐকতানসংগীতের চলন করেন। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এঁরা আরো কতগুলি নাটকের জন্যে এই একই প্রথায় ঐকতানসংগীত রচনা করিয়েছিলেন। এই সময়টা কলকাতা শহরে

সখের থিয়েটারের যুগ। এঁদের দেখাদেখি সব থিয়েটারেই নূতন পদ্ধতির ঐকতান-সংগীত বাজানোর একটা রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেল। ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি এঁরা সংগীতের আলোচনার্থে একটি সম্মিলনীর আয়োজন করেছিলেন। ইচ্ছা ছিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের খ্যাতনামা গায়কদের মধ্যে সংগীতে যে মতভেদ আছে এখানে তার একটা মীমাংসা করবেন। জানা যায় 'সংগীত-সমালোচনী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল ঠাকুর ভ্রাতৃদ্বয়ের উৎসাহে। নিজেই ছিলেন তার সম্পাদক। মাস ছয়েক চলেছিল। প্রথম প্রকাশ পায় ১২৭১ (১৮৬৪) বাংলা সালের আশ্বিন মাসে। অনুমান করি, এইটিই বোধ হয় ভারতবর্ষের প্রথম সংগীত-পত্রিকা। বিলেতি সংগীতের স্বরলিপিপ্রথার উপকারিতা লক্ষ্য করে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে ঐকতানসংগীত বাজানোর সুবিধার্থে গতের লিখনপ্রণালীর উদ্ভাবন করেন। বাজনার দল সেই লিখিত খাতা দেখেই গৎ বাজাত। এই গৎলিখনপদ্ধতিই পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ পায় 'সংগীতসার' (১৮৬৮) ও 'ঐকতানিক স্বরলিপি' (১৮৬৭), পুস্তকে। ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে এঁদেরই নাটকের দলের কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গৈকতান' নামে একখানি স্বরলিপিপুস্তক প্রকাশ করেন, কিন্তু সেই স্বরলিপি-পদ্ধতি ছিল বিলেতি। তবে তাঁর দাবি এই ছিল যে, ঐ বইটিতে 'হিন্দু সংগীতের প্রথম স্বরলিপি' প্রকাশিত হল। এই সময়েই (১৮৬৮) *'Hindusthani Air arranged for Pianoforte'* ও 'ইংরেজি স্বরলিপিপদ্ধতি' (১৮৬৮) নামে দুখানি বই প্রকাশিত হয় শৌরীন্দ্রমোহন ও ক্ষেত্রমোহনের উৎসাহে ও প্রেরণায়, তাঁদেরই এক গুণী শিষ্যের দ্বারা। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দ থেকেই অর্কেস্ট্রা বা ঐকতান-সংগীত বাজনার জন্যে দেশী বাজিয়েরা বিলেতি যন্ত্র ব্যবহারের জন্যে গুরুতর পরিশ্রম করছেন। তখন থেকেই বাঙালিদের মধ্যে পিয়ানো হারমোনিয়ম কন্‌সার্টিনা সিক্‌লে-ফ্লুট ও ফ্ল্যাটফ্লুট ইত্যাদি নানাপ্রকার বিদেশী যন্ত্র বাজানো শুরু হয়ে গেছে। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে কোনো কোনো থিয়েটারের ঐকতানে বিলেতি গৎ বাজানোর চেষ্টা হয়েছে। থিয়েটারে বাজানোর জন্যে ঐকতান ও গৎরচনার সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপিপ্রথার প্রবর্তনার মূলে বিলেতি সংগীতের প্রভাব সুস্পষ্ট।

সংগীতবিষয়ে জনসভায় বক্তৃতার প্রথম প্রচলন করেন শৌরীন্দ্রমোহন ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে, হিন্দুমেলার উৎসবে। তিনি দাবি করেন, বাংলাভাষায় এই বিষয়ে তিনিই পথপ্রদর্শক। বক্তৃতার ছাপা পুস্তিকায় তিনি বলেছেন, "ইহা আমার প্রথম উদ্যম। এই ভারতবর্ষে সংগীতের বিষয়ে বঙ্গভাষায় কেহ এরূপ বক্তৃতা প্রকাশ্য সভায় করিয়াছেন কি না সন্দেহ।" তাঁর এই পুস্তিকাটি ও অন্যান্য সংগীতবিষয়ের বইগুলি পড়লে বেশ বোঝা যায় যে, তিনি বিলেতি সংগীতে নানাদিক থেকে গভীর জ্ঞানলাভ করেছিলেন এবং কি করে সংগীতকে আলোচনার বস্তু করে তুলতে হয় তাও জেনেছেন ঐ সংগীতের আলোচনাকালে। এ ছাড়া তখনকার শিক্ষিত সংগীতজ্ঞমহলে বিলেতি সংগীতের আলোচনা কতখানি গভীর ও ব্যাপক হয়েছিল, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই 'গীতসূত্রসার' (১৮৮৫) তার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বিলেতি সংগীতের গভীর জ্ঞান ছাড়া ঐ ধরনের বই লেখা কখনো সম্ভব হত না। বিলেতি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন এঁরা। কিন্তু ওস্তাদী গায়কমহলকেও এই আন্দোলন বেশ ভাবিয়ে

তুলেছিল। তাই বরোদানিবাসী বিখ্যাত ওস্তাদ মৌলাবক্স ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু-মেলার উৎসবে বলেছিলেন, তিনি "ইংরেজদের ন্যায় পঞ্চাশ হাজার লোককে এক-সঙ্গে গান করাইতে পারেন। ইংরেজদের রীতি এবং আমাদের দেশের রীতি একত্র করিয়া সংগীতশাস্ত্র প্রস্তুত করিলে ঐকতান গান অনায়াসে প্রচলিত হইতে পারে।" এই যুগেই, ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে, শৌরীন্দ্রমোহন ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী জনসাধারণের সুবিধার্থে একটি সংগীতবিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় সেদিনের বহু সংগীতপিপাসুদের বিশেষ কাজে লেগেছিল। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র দক্ষিণাচরণ সেন 'Blue Ribbon Orchestra' নামে একটি দল তৈরি করে বিখ্যাত হন। তিনি ঐ বিদ্যালয়ে শৌরীন্দ্রমোহনের পুত্র প্রমোদকুমারের কাছেও পুস্তকপাঠে বিলেতি হারমনি-সংগীতের চর্চা করেছিলেন। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে কেবল বেহালাযন্ত্রের সাহায্যেই তিনি ইয়োরোপীয় প্রথায় বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ঐকতানসংগীত রচনা করেন। তখনকার দিনের 'কোহিনুর' ও 'স্টার' থিয়েটারে তিনি ঐ বাজনা বাজাতেন। প্রমোদকুমার ঠাকুর এই দলের জন্যে বিলেতি প্রথায় ঐকতান রচনা করে দিতেন। তাঁর রচিত 'Lady Dufferin Valse' নামে একটি নাচের বাজনা সেকালে বিশেষ পরিচিত ছিল। ১৯১২ সাল পর্যন্ত এই দলের কার্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়। ইংলন্ডেশ্বরের এদেশে আগমন উপলক্ষে বিলেতি প্রথায় দেশীযন্ত্রের ঐকতান বাজনায় এই দল প্রশংসা অর্জন করে।

এই ক'টি বিচ্ছিন্ন ঘটনার ভিতর দিয়েও ঐ যুগের শিক্ষিতদের মধ্যে বিলেতি সংগীতের আন্দোলন কিরকম জেগেছিল তার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বেশ বোঝা যায় যে, বাংলাদেশ চালচলনে ধর্মে রাজনীতিতে শিল্পে সাহিত্যে ও কাব্যের বেলাই কেবল বিলেতি আদর্শে অনুপ্রাণিত হয় নি, সংগীত ও নাটকেও তার প্রভাব যথেষ্ট পড়েছিল। আজ 'জাতীয়-সংগীত'এর যে আদর আমরা করতে শিখেছি, সেও হল ঐ যুগের পাশ্চাত্য আদর্শের দান। এইভাবে বিদেশী আদর্শে অনুপ্রাণিত থিয়েটার গান ঐকতান স্বরলিপি সংগীতবিদ্যালয় সংগীতপুস্তক সংগীতসভা ব্যান্ড ইত্যাদি আমাদের শিক্ষিত সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু পেশাদারী দল, ইটালিয়ান অপেরা ও সেক্সপীয়রের নাটকের সঙ্গে কলকাতাবাসীদের সাক্ষাৎ-পরিচয় করায় ১৮৬৮-৬৯ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে। নাট্যকার অমৃতলাল বসু তাঁর স্মৃতিকথায় অপেরার বিষয়ে আলোচনাকালে বলেছেন যে, সে যুগের কলকাতাবাসী সাহেবরা "প্রায় লাখটাকার কাছাকাছি চাঁদা তুলে...উপরি উপরি পাঁচ-ছয় বছর গ্যারাণ্টি দিয়ে ইটালিয়ান অপেরা সম্প্রদায়কে কলকাতায় আনাতেন ও এই লিন্ড্‌সে স্ট্রীটস্থ অপেরা হাউসে অভিনয় করাতেন।" কলকাতাবাসী শিক্ষিতেরা সেই অপেরা ও নাটকের অভিনয় বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে দেখেছেন এবং তার অনুকরণেই কলকাতায় পেশাদারী থিয়েটার স্থাপনের সূচনা হয়। এমন-কি, বিলেতি থিয়েটারের দৃশ্যসজ্জা ও অভিনয়পদ্ধতি পর্যন্ত অনুকরণযোগ্য বলে তখনকার দিনের উৎসাহী যুবকরা মনে করেছিলেন।

সংগীত ও অভিনয়ের এই আন্দোলনের ঢেউ গুরুদেবের পরিবারেও এসে লেগেছিল। এই পরিবারে বিলেতি সংগীতকে জানবার ও শেখবার আগ্রহও দেখা

দিয়েছিল খুব। তাঁদের কার্যকলাপে দেখি তাঁরা সে যুগের বিলেতি সংগীতের আন্দোলনকে সম্পূর্ণ সমর্থন করতেন। এ'দের বাড়ির উপাসনার গানে পুরাতন সারেঙ্গীওয়ালার বাজনা বন্ধ হয়ে গিয়ে শুরু হল অর্গানের সংগত। প্রথমে বাজাতে শুরু করলেন সত্যেন্দ্রনাথ, পরে দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং শেষকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। সে সময়কার নতুন সখের থিয়েটারের ঝোঁক এ'দের পরিবারেও দেখা গেল, যার ফলে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে 'নবনাটক' বিখ্যাত হয়ে ওঠে ও পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যান্য ঐতিহাসিক নাটকগুলির দেখা পাওয়া যায়। নবনাটকে সেই যুগের প্রচলিত প্রথায় ঐকতান-সংগীত বাজানো হয়েছিল, যার গৎরচনা করতেন খ্যাতনামা গায়ক ও ঠাকুর-পরিবারের গীতশিক্ষক বিষ্ণু। এই বাজনার দলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হারমনিয়ম বাজাতেন। আর বাজত দুইখানি বেহালা ক্ল্যারিওনেট পিক্‌লু বড়-বাস্‌বেহালা (violin cello) করতাল ঢোল বাঁয়াতবলা এবং মন্দিরা। দ্বিজেন্দ্রনাথ বিলেতি বাঁশিতে ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত সুরবিজ্ঞানপথে নানা রাগিণীর সুর মাপতেন। সংগীতবিজ্ঞানের আলোচনাও তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট ছিল। ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকে দুটি গান পাই—তার সুর ছিল বিলেতি। গান-দুটির প্রথম পঙ্‌ক্তি হল 'দ্যাখরে্‌ জগত মেলিয়ে নয়ন' ও 'প্রেমের কথা আর বোলো না'। তিনি শেষোক্ত গানটির রাগিণীর নাম দিয়েছিলেন ইটালিয়ান ঝিঁঝিট। এ'দেরই উৎসাহে ১৮৭৫ সালে আদিব্রাহ্মসমাজমন্দিরে সংগীতবিদ্যালয় শুরু হয়। বিখ্যাত সংগীতবিৎ যদুনাথ ভট্ট এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী যে বৎসর 'সংগীতসার' বই প্রকাশ করেন, সেই বৎসরেই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় নূতন পদ্ধতিতে লেখা একটি স্বরলিপি-প্রথা প্রকাশ করেন কয়েকটি গান-সহ। সেই স্বরলিপিপদ্ধতিই কয়েকবার সংশোধিত ও পরিবর্তিত হয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-কৃত আকারমাত্রিক স্বরলিপিতে রূপ নিয়ে আজ বাংলাদেশে সুপরিচিত। ,

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিয়ানোযন্ত্রের সাহায্যে কিভাবে গুরুদেবকে সুরের ঝংকারে অনুপ্রাণিত করতেন 'জীবনস্মৃতি' পুস্তকে তার বর্ণনা আছে। তা ছাড়া গুরুদেব নিজেও প্রথমবার বিদেশবাসের সময় কিছু বিলেতি গান কণ্ঠে আয়ত্ত করেছিলেন। সেদেশী আবহাওয়ার মধ্যে থেকে গান শেখার দরুন তাঁর শব্দোচ্চারণে বিলেতি প্রভাব দেখা দেওয়ায় আত্মীয়বন্ধুরা যে বিস্মিত হয়েছিলেন, সে কথা তিনি নিজেই উল্লেখ করে গেছেন। শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবী নিজের বাল্যস্মৃতিতে সেই-সব বিদেশী গানের মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করেছেন, সেগুলি গুরুদেবের মুখে তিনি অল্পবয়সে প্রায়ই শুনতেন এবং অনেক সময়ে তাঁকে সেই গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজাতে হত। গানগুলি এই—

'Won't you tell me, Mollie darling'
'Darling, you are growing old'
'Come into the garden, Maud'
'Goodnight, goodnight, beloved'
Good-bye, sweetheart, good-bye'

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে গুরুদেব দ্বিতীয়বার বিলেত যান। তবে মাসখানেকের বেশি সেখানে থাকতে পারেন নি। কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যে তাঁর বিলিতি গানের চর্চা কতদূর এগিয়েছিল তা ধরা পড়ে তাঁর ঐ সময়কার কতগুলি লেখা চিঠি থেকে। কয়েকটি চিঠির অংশ-বিশেষ এখানে তুলে দিচ্ছি—

"সন্ধের সময় আর একবার গান বাজনা নিয়ে বসা গেল। Walter Mull বেশ Piano বাজায়। Miss Mull-এ আমায় মিলে অনেকগুলো গান গেয়েছি। এরা আমার গানের অনেক তারিফ করচে। Mull বল্‌ছিল আমি যদি গলার চর্চা করি তাহলে St. James Hall Concert-এ গাইতে পারি—আমার রীতিমত উচ্চশ্রেণীর গলা আছে।"

অন্যত্র লিখছেন—

"Miss Mull গান শেখালে।"

"কতগুলো নতুন গান কিনে এনেচি—সেগুলো গেয়ে দেখা গেল।"

"Tennis খেলে Oswald-এর ওখানে গান গেয়ে এবং গান বাজনা শুনে বাড়ি এসে খেয়ে পুনশ্চ গান বাজনা করে শোবার ঘরে এসেচি।"

"Miss Mull আমাকে সব গানগুলো গাওয়ালে। Remember me বলে একটা গানের পর সে আস্তে আস্তে আমাকে বল্লে T, I shall remember you।"

"(জাহাজে ফেরবার পথে) Concert-এ আমাকে গান গাওয়ালে। বিস্তর বাহবা পাওয়া গেল।...Gounodর Serenade এবং If গেয়েছিলুম।"

"আজ রাত্তিরেও আমাকে গান গাইতে হল।...ইংরিজি গান গেয়ে গেয়ে শ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলুম হঠাৎ দিশি গানে প্রাণ আকুল হয়ে গেল—যত দিন যাচ্ছে ততই আবিষ্কার করচি আমি বাস্তবিক আন্তরিক দিশি।"

"Mrs. Moeller আমাকে গান গাইতে অনুরোধ করলে—সে আমার সঙ্গে পিয়ানো বাজালে। Mrs. Moeller বল্লে, It is a treat to hear you sing। Webb এসে বল্লে, What would we do without you Tagore— there's nobody on board who sings so well।"

"যা হোক জাহাজে এসে আমার গান বেশ appreciated হচ্চে। আসল কথা হচ্চে এর আগে আমি যে ইংরিজি গানগুলো গাইতুম কোনটাই Tenor pitch-এ ছিল না—তাই আমার গলা খুলত না—এবারে সমস্ত উঁচু pitch-এর music কিনেচি—তাই এত প্রশংসা পাওয়া যাচ্চে।"

"একজন জার্মান সহযাত্রী আমাকে বল্‌ছিল তুমি যদি তোমার গলার রীতিমত চর্চা কর তাহলে আশ্চর্য উন্নতি হতে পারে। You have a music of wealth in your voice। প্রথমবারে যখন ইংলন্ডে ছিলুম তখন যদি এই কাজ করতুম তাহলে মন্দ হত না।"

উপরোক্ত বর্ণনাগুলি থেকে এটুকু বেশ বোঝা গেল যে, বিলিতি সংগীতের স্বরলিপি কিনে তাকে পড়তে পারা ও গান গাওয়ায় তিনি বেশ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন। বিদেশী কণ্ঠসংগীত তাঁর ভালো ভাবেই আয়ত্ত ছিল।

প্রথমবার বিলেত থেকে ফিরে বাড়ির সংগীতে ছেলেমেয়েদের নেতা হলেন

গুরুদেব। এর পূর্বে বাড়ির অভিনয় ও গানের উৎসবে বড়োদের মধ্যে অল্পবয়সের অন্যান্য যে-সব ছেলেমেয়েদের স্থান ছিল না গুরুদেব তাঁদের সকলকে টেনে নিলেন। সরলাদেবী তাঁর আত্মকথায় বলেছেন, "আগে ১১ই মাঘের গানের অভ্যাস বড়োমামা (দ্বিজেন্দ্রনাথ), নতুন মামা (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) বা বোম্বাইপ্রবাসপ্রত্যাগত মেজমামা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহনেতৃত্বাধীন থাকত। রবিমামা বিলেত থেকে ফেরার পর তিনিই নেতা হলেন। দাদাদের সঙ্গে নিজেও নতুন নতুন ব্রহ্মসংগীত রচনা করা, ওস্তাদদের কাছ থেকে সুর নিয়ে সুর ভাঙা, নিজের মৌলিক ধারার সুর তখন থেকেই তৈরি করা ও শেখানো—এ সবের কর্তা হলেন রবিমামা। বাড়ির সব গাইয়ে-ছেলেমেয়েদের ডাকও এই সময় থেকে পড়ল।...এখন থেকে কত ভাবের গানে বাড়ি সদাগুঞ্জরিত হতে থাকল। বাড়িতে শেখা দেশী গানবাজনায় শুধু নয়, মেমেদের কাছে শেখা য়ুরোপীয় সংগীতচর্চায়ও আমাদের উৎসাহদাতা ছিলেন রবিমামা।" তাই স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর কন্যা সরলাদেবীকে পিয়ানো শেখাবার জন্যে একটি মেম শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেছিলেন ও রোজ এক ঘণ্টা করে মেয়েকে সেই বাজনা অভ্যাস করাতেন। পিয়ানোবাজনায় পারদর্শী এই বাড়ির ছেলেমেয়েদের গুরুদেব একবার তাঁর লেখা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটিকে বাজনায় ফুটিয়ে তুলতে বলে-ছিলেন। গুরুদেবের শিক্ষকতায় সরলাদেবী সেই রচনায় হাতও দিয়েছিলেন। ইনি অল্পবয়সে গুরুদেবের অন্যান্য গানে বিলেতিমতে কর্ড দেওয়ার বা হার্মনি করার চেষ্টা করতেন। 'সকাতরে ঐ কাঁদিছে' ও 'আমি চিনি গো চিনি' গানের হার্মনি-যুক্ত সুরও তিনি রচনা করেন। পরে তাঁরা এই রকমে আরো কিছু গানকে রূপান্তরিত করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যে-কয়টি গানের কথা মনে পড়ে তা হল 'সুখে আছি সুখে আছি, সখা, আপন-মনে', 'এসো এসো বসন্ত, ধরাতলে', 'শান্ত হ' রে মম চিত্ত নিরাকুল'।

গুরুদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভাদেবীর সংগীতজ্ঞানের পরিচয় লিখতে গিয়ে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় হবার চার-পাঁচ মাস পরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং অভিজ্ঞার বড়দিদি শ্রীমতী প্রতিভাদেবীর সঙ্গে দাদার বিবাহ হয়। তিনি ছিলেন একরকম হাফ-ওস্তাদ। এবং নিত্য গান অভ্যাস করতেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি বেশির ভাগ গাইতেন হিন্দী গান। তিনি পিয়ানোর সঙ্গে গান গাওয়া অভ্যাস করেছিলেন, তাই তাঁর গাওয়ার ঢঙ ছিল একটু কাটাকাটা। মীড় তাঁর গলায় ছিল না... তিনি পিয়ানোয় বাজাতেন ওস্তাদী বিলেতী বাজনা। বেঠোভেনের 'Funeral March' ও 'Moonlight Sonata' আমি অন্তত হাজারবার শুনেছি। তাই থেকে আমার বিলেতি গান-বাজনার উপর যে-অশ্রদ্ধা ছিল, তা কমে যায়।" এই বাড়িতে বিলেতি সংগীতের কিরকম চর্চা হত শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবীর মধ্যে তার পরিচয় পেয়েছি। ইনি একাধারে কণ্ঠ ও যন্ত্র-সংগীত, উভয়েরই চর্চা করেছিলেন। তাঁর দাদা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর অল্পবয়সে বিলেতি সংগীতের যে চর্চা করেছিলেন তার পরিচয় আমরা পাই 'রাগ ও মেলডি' শীর্ষক তাঁর একটি সংগীতবিষয়ক প্রবন্ধে। এঁদের বাড়ির প্রায় প্রত্যেক ছেলেমেয়েই এইভাবে দেশী সংগীতের সঙ্গে কিছু পরিমাণে বিলেতি সংগীতের চর্চা করেছেন।

এঁদের পরিবারে বিদেশী সংগীতের অনুকরণটাই বড়ো হয়ে দেখা দিল না। দেশী ও বিলেতি সুরের সংমিশ্রণের ফলে আমরা একটা নতুন জিনিস পেলাম যা বাংলা সংগীতে সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে। সে পথে গুরুদেবের ক্ষমতাই বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল। তাঁর দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন এর পথপ্রদর্শক।

এইরকম দেশী ও বিদেশী সংগীতের আবহাওয়ার মধ্যে ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে প্রথম সৃষ্টি হয় গীতনাট্য 'বাল্মীকিপ্রতিভা', তার পর-বৎসরে 'কালমৃগয়া' এবং আরো কয়েক বৎসর পরে 'মায়ার খেলা'।

'বাল্মীকিপ্রতিভা' গুরুদেবের রচিত প্রথম গীতনাটক এবং প্রথম অভিনীতও বটে। এই নাটকরচনায় যে কী আনন্দ ও প্রেরণা ছিল, অল্প দুটি কথায় তিনি তা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন। সেই দিনটিকে স্মরণ করে তিনি বলেছেন, "বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমৃগয়া যে-উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে-উৎসাহে আর-কিছু রচনা করি নাই। ওই দুটি গ্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সংগীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে।"

তৎকালে প্রচলিত অনুরূপ দেশী বা বিদেশী কোনো গীতনাট্য থেকে এই 'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচনার কল্পনা তাঁর মনে এসেছিল কি না, সে কথা নিশ্চিত করে বলার মতো কোনো তথ্য আমাদের সামনে নেই। কিন্তু আমরা জানি, ঐ নাটকরচনার পূর্বে গুরুদেবের বাড়িতে বিদ্বজ্জন-সমাগম-উৎসব উপলক্ষে 'মানময়ী' নামে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত একখানি পূর্ণাঙ্গ গীতনাটক অভিনীত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজে, গুরুদেব ও পরিবারের আরো অনেকেই এই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অভিনয়ের সঠিক তারিখ জানা নেই, কিন্তু ছোটো পুস্তিকা আকারে বইটির ছাপা তারিখ হল ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ। গুরুদেব বিলেত থেকে ফিরে আসার পরই এই নাটকে অংশগ্রহণ করেন এবং সর্বশেষ গানটি তাঁর রচনা। এই শেষ গানটি হল 'আয় তবে সহচরী, হাতে হাতে ধরি ধরি'। স্বর্গের ইন্দ্র-উর্বশী মদন-রতি ইত্যাদি দেবদেবীর মধ্যে প্রেমের ঘটনা নিয়ে এটি একটি হালকাধরনের হাসির নাটক। সবটাই সুরে-তালে গীত হয়েছিল বলে জানা যায়।

'মানময়ী' রচনার আগে তাঁদের পরিবারে আরো একটি পূর্ণ গীত-নাটকের খবর পাই। নাটকটির নাম 'বসন্ত-উৎসব', রচয়িতা গুরুদেবের দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী।

সংক্ষেপে 'বসন্ত-উৎসবে'র গল্পটি হল এই—

শোভার প্রণয়ী হচ্ছে কুমার, আর লীলার প্রণয়ী হচ্ছে কিরণ। শোভার সঙ্গে কুমারের বিয়ে বসন্ত-উৎসবের দিনে হবে ঠিক হয়ে গেছে। শোভা চায় তার সখী লীলার ও কিরণের ঐ একই দিনে বিয়ে হোক। কিন্তু কিরণ লীলাকে ভালোবাসে না বরং তাচ্ছিল্য করে। দুই সখীতে এর উপায় স্থির করবার জন্যে মায়াদেবীর মন্দিরে উদাসিনী নামে এক যোগিনীর শরণাপন্ন হল। যোগিনী ধ্যানযোগে লীলার অবস্থা জেনে সংগীত কবিতা মদন বসন্ত ও রতির সাহায্যে মন্ত্রপূত একটি মালা রচনা করে লীলাকে পরিয়ে দিলেন, আর সেইসঙ্গে কপালে পরিয়ে দিলেন একটি মন্ত্রপূত টিপ, যা তৈরি ফুলের রস দিয়ে। এর গুণ হল এই যে, এটি যে নারী অঙ্গে ধারণ করবে, তাকে দেখে পুরুষমাত্রই তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারবে না।

কিন্তু এক বিপদ ঘটল। বাগানে একই সময়ে কুমার ও কিরণ লীলাকে মন্ত্রপূত সাজে দেখে উভয়েই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। শোভা তার প্রণয়ী কুমারকে লীলার কাছে প্রেম নিবেদন করতে দেখে লজ্জায় ও দুঃখে আবার উদাসিনীর শরণ নিল। উদাসিনী ধ্যানে সব জেনে শোভার চোখে একটি মন্ত্রপূত অঞ্জন লাগিয়ে বললে, এর সাহায্যে কুমারের ভ্রান্তি দূর হবে এবং সে কেবল তার প্রতিই আকৃষ্ট থাকবে। এদিকে লীলাকে উপলক্ষ করে কুমার ও কিরণে অসিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এই অবস্থায় নতুন সাজে শোভাকে আসতে দেখে কুমারের মোহ ভাঙল, শোভার কাছে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা চাইল এবং শোভা কুমার লীলা কিরণ ও অন্যান্য সখীগণ এই মিলনের উৎসবে আনন্দে মেতে উঠল।

পুস্তকাকারে প্রকাশিত এই নাটকের তারিখ হল ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দ। কিন্তু ঠিক কবে কোথায় কাদের নিয়ে অভিনীত হয়েছিল তার কোনো খোঁজ ঐতিহাসিকরা দেন নি। তবে সরলাদেবী এইটুকুমাত্র জানিয়ে গেছেন যে, "রবীন্দ্রনাথের বিলেতনিবাস-কালেই আমার মায়ের রচিত 'বসন্ত-উৎসব' গীতিনাট্যের অভিনয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল।" এই নাটকটি অপেরা-জাতীয় গীতনাট্যের ছাঁদে লেখা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গীতনাটকের সাহায্যে অভিনয় করার চল গুরুদেবের পরিবারে বাল্মীকিপ্রতিভা রচনার অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে। সব তথ্য জানা না থাকায় এই নাটকটির সৃষ্টি ঠিক কার উৎসাহে হয়েছিল বলা কঠিন, কিন্তু বিদ্বজ্জনসমাগমের বিষয় বলে অনুমান করি; এবং এই নাটকরচনায় জ্যোতিবাবুর হাত ছিল।

বিদ্বজ্জনসমাগমের একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জ্যোতিবাবু, এবং তাঁকে এই সভার জন্যে অনেক কিছু করতে হত এবং ভাবতে হত, সমাগত অতিথিবৃন্দের মনোরঞ্জনার্থে। এই সময় গানে অভিনয়ে তিনি প্রত্যেকবারেই নতুন কিছু দেখাবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করতেন এবং বাড়ির সকলকে সেই পথে চালিত করবারও তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ছিল। 'বসন্ত-উৎসব' ও 'মানময়ী'র মতো গীতনাটক রচনার কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে উদয় হবার কারণ এইটিই অনুমান করা যায় যে, তিনি পূর্বে কোনো বিদেশী অপেরা হয়তো দেখেছিলেন। কিংবা ঐ প্রকার কোনো গীত-নাটিকার কথা স্মরণ করে স্বর্ণকুমারী দেবীর দ্বারা 'বসন্ত-উৎসব' লিখিয়েছিলেন। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' গুরুদেব জ্যোতিবাবুর উৎসাহেই রচনা করেছিলেন। এই সময় পর্যন্ত গুরুদেব তাঁর ইচ্ছাতেই চালিত হতেন। গান রচনার ক্ষেত্রে জ্যোতি-বাবুর মধ্যে উঁচুদরের শিল্পপ্রতিভার পরিচয় যে নেই এ কথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করবেন। বাংলা গানের ক্ষেত্রে তাঁর সেই অভাবটা গুরুদেবের মধ্য দিয়ে তিনি পূরণ করেছেন। গানের ক্ষেত্রে জ্যোতিবাবুর অনেক-কিছু পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার আজ আমরা কোনো পরিচয়ই পেতাম না যদি-না গুরুদেব সঙ্গীরূপে তাঁর পাশে থাকতেন। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচনা পর্যন্ত সংগীতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গুরুদেবের মনে গানরচনার যে পথ ও আদর্শ নির্দেশ করেছিলেন পরবর্তী জীবনে তা গুরু-দেবের বিশেষ কাজে লেগেছিল।

কিন্তু এই বিলেতি প্রভাবের নজির হিসেবে আমরা যদি কেবল খুঁজতে চেষ্টা

করি যে গুরুদেব ক'টা গান বিলেতি সুরে ও ঢঙে রচনা করেছেন, তা হলে তাঁকে ভুল বিচার করা হবে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের প্রভাব সামান্য কয়েকটি মাত্র গানেই আমরা দেখি। সেই গানক'টি নিয়ে আলোচনা করবার বিশেষ কিছু নেই। এ-সব গান শুনে মনে হবে যেন বিদেশী সুর ও ঢঙ বাংলা কথার সঙ্গে কেমন খাপ খায় তাই তিনি দেখতে চেয়েছেন।

উদাহরণ স্বরূপ এই ধরনের গানের কয়েকটি নমুনা তুলে দিচ্ছি—

'এনেছি মোরা এনেছি মোরা'
'কালী কালী বলো রে আজ'
'তবে আয় সবে আয়'
'তোমার হল শুরু'
'সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি'
'আমার সকল রসের ধারা'
'মোর মরণে তোমার হবে জয়'
'আমাদের শান্তিনিকেতন'
'হারে রে রে রে রে আমায় ছেড়ে দে রে দে রে'
'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে'
'নয় নয় নয় এ মধুর খেলা'
'আলো আমার আলো ওগো'

এর মধ্যে অনেকগুলি গানের সুরকে দেশী রাগ-রাগিণীর নিয়মে ফেলে নামকরণ করা যায়। যেমন কেউ কেউ বলেন, 'সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি' গানটি ইমন-ভূপালীতে তৈরি। কিন্তু এই সুরের চলন বা রূপের সঙ্গে প্রচলিত রাগ-রাগিণীর বিশেষ মিল আছে বলে মনে হয় না। 'তোমার হল শুরু' ও 'আমার সকল রসের ধারা' গানদুটিতে বিলেতি চার্চ-সংগীতের প্রভাব লক্ষ করা যায়। চার্চ-সংগীতের ধীর গাম্ভীর্য এতে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে তিনি ইয়োরোপের কাছে কোন্ দিক দিয়ে ঋণী তা বুঝতে হলে আগে সেদেশী সংগীতপ্রকৃতিটিকে এবং আমাদের সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায় তা জানা দরকার। তিনি মনে করতেন আমাদের সংগীত সাধারণত একটিমাত্র সংক্ষিপ্ত স্থায়ীভাব অবলম্বন ক'রে আত্মপ্রকাশ করে। এ সংগীত বিরাট নির্জন প্রকৃতির অনির্দিষ্ট অনির্বচনীয় বিষাদগম্ভীর সংগীত। বড়ো বড়ো রাগিণীর মধ্যে যে গাম্ভীর্য এবং কাতরতা আছে সে যেন কোনো ব্যক্তি-বিশেষের নয়—সে যেন অকূল অসীমের প্রান্তবর্তী এই সঙ্গীহীন বিশ্বজগতের। এ সংগীত আমাদের সুখদুঃখকে অতিক্রম করে চলে যায়। ডাক দেয় একলার দিকে। এ একের গান, একলার গান; কিন্তু তা কোণের এক নয়, তা বিশ্বব্যাপী এক। সেইজন্যেই আমাদের কালোয়াতি গানটা ঠিক যেন মানুষের গান নয়, সে যেন সমস্ত জগতের। তার বৈরাগ্য, তার শান্তি, তার গাম্ভীর্য সমস্ত সংকীর্ণ উত্তেজনাকে নষ্ট করে দেবার জন্যেই।

আর ইয়োরোপের সংগীত যেন মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত। এ সংগীত মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করে প্রকাশ

করছে। এ সংগীত প্রবল ও প্রকাণ্ড। সেইজন্যেই দেখি এমন বিষয় নেই যাকে নিয়ে ইয়োরোপ গান রচনা না করেছে। বিষয়বৈচিত্র্যে ইয়োরোপ অনেকখানি অগ্রসর।

কেবলমাত্র সংগীতের ক্ষেত্রেই যে এই রকমের পার্থক্য ঘটেছে তা নয়, অন্যান্য শিল্পকলার ক্ষেত্রেও দেখি সেই একই পার্থক্য। এরিক নিউটন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পকলার তুলনাকালে লিখেছেন—

"The idea of serenity has never been quite so intensely caught and held by any European sculpture as it has been by countless of the cross-legged Buddhas of Ceylon. Nor has the idea of sinuous movement as expressed in Indian carvings of dancers ever been equalled in the West.

"The bulk of Oriental art by its very calmness and detachment leaves me cold. It is too exquisite, too inhuman. . . . I cannot be content with an art that leaves my more material appetites unsatisfied."

আমাদের সংগীতে অভাব ছিল মানবিক বৈচিত্র্যের। ইয়োরোপীয় সভ্যতার সংস্রবে আমাদের মনোজগতের পরিবর্তন হল, আমরা একটিমাত্র স্থায়ী ভাবের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাইলাম না। আমরা সংগীতের ভিতর দিয়ে ব্যক্তিগত ছোটোখাটো সুখদুঃখ ও নানা হৃদয়াবেগকে গানে ফোটাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। তারই ফলস্বরূপ আরো এগিয়ে গিয়ে আমরা বাংলা গানে জাতীয়সংগীত, উদ্দীপক সংগীত, যুদ্ধসংগীত, হাসির গান, মৃত্যুর গান, বিয়ের গান, অভ্যর্থনার গান, জন্মদিনের গান, নানা উৎসবের গান, চাষকরার গান, ধানকাটার গান, নলকূপের গান, চায়ের গান, চলার গান, খেলার গান ইত্যাদি আরো কত কি পেলাম। এইরূপ বিষয়বৈচিত্র্যে গুরুদেবের গান দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এইটিই হল আমাদের সংগীতে ইয়োরোপের একটি বিশেষ দান।

সংগীতকে মানুষের বৈচিত্র্যময় বাইরের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নেবার যে মূল উপায়গুলি ইয়োরোপের জ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছিলেন, সেগুলি গুরুদেবও জেনেছিলেন।

ইয়োরোপের এই চিন্তাধারার সঙ্গে তিনি পরিচিত হন হার্বার্ট স্পেন্সরের লেখা পড়ে। স্পেন্সর তখনকার দিনের শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে ইয়োরোপের একজন উচ্চশ্রেণীর চিন্তাশীল জ্ঞানীরূপে পরিচিত ছিলেন। এঁর লেখা সেকালে চিন্তাশীল বাঙালিমাত্রেই পড়তেন।

সংগীতের উৎপত্তি বিষয়ে স্পেন্সর লিখেছেন—

". . . .there is a physiological relation common to men and all animals, between feeling and muscular action; that, as vocal sounds are produced by muscular action, there is a consequent physiological relation between feeling and vocal sound; that all the modifications of voice, expressive of feeling, are the direct

results of this physiological relation; that music, adopting all these modifications, intensifies them more and more, as it ascends to its higher forms and becomes music in virtue of thus intensifying them. . . ."

স্পেন্সরের সংগীতবিষয়ের এই চিন্তার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার মিল লক্ষ্য করার বিষয়। ১২৮০ সনে বঙ্গদর্শনে সংগীতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

"গীত মনুষ্যের একপ্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু কণ্ঠভঙ্গিতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। 'আঃ' এই শব্দ কণ্ঠভঙ্গির গুণে দুঃখবোধক হইতে পারে, বিরক্তিবাচক হইতে পারে এবং ব্যাঙ্গোক্তিও হইতে পারে। 'তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিলাম'—ইহা শুধু বলিলে দুঃখ বুঝাইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত স্বরভঙ্গির সহিত বলিলে দুঃখ শতগুণ অধিক বুঝাইবে। এই স্বরবৈচিত্র্যের পরিণামই সংগীত। সুতরাং মনের বেগ প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয্য-প্রযুক্ত মনুষ্য সংগীতপ্রিয় এবং তৎসাধনে স্বভাবতঃ যত্নশীল।"

গুরুদেবও ১২৮৮ সনে 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা'-শীর্ষক প্রবন্ধে হার্বার্ট স্পেন্সরের চিন্তাধারাকে সমর্থন করে বলেছেন, "স্পেন্সরের...'The Origin and Function of Music' নামক প্রবন্ধে যেসকল মত অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা আমার মতের সমর্থন করে, এবং অনেকস্থলে উভয়ের কথা এক হইয়া গিয়াছে।"

সুরযোজনা বিষয়ে স্পেন্সর বলেছেন—

". . .music is but an idealization of the natural language of emotion; and that consequently, music must be good or bad according as it conforms to the laws of this natural language. The various inflections of voice which accompany feelings of different kinds and intensities, are the germs out of which music is developed. It is demonstrable that these inflections and cadences are not accidental or arbitrary; but that they are determined by certain general principles of vital actions; and that their expressiveness depends on this. Whence it follows that musical phrases and the melodies built of them, can be effective only when they are in harmony with these general principles. . . .the swarms of worthless ballads that infest drawing-rooms, as compositions which science would forbid. They sin against science by setting to music, ideas that are not emotional enough to prompt musical expression; and they also sin against science by using musical phrases that have no natural relations to the ideas expressed: even where these are emotional. They are bad because they are untrue. And to say they are untrue, is to say they are unscientific."

গুরুদেবও এই চিন্তাধারার সঙ্গে এক মত হয়ে বলেছেন—

"আমাদের দেশে সংগীত এমনি শাস্ত্রগত, ব্যাকরণগত, অনুষ্ঠানগত, হইয়া পড়িয়াছে, স্বাভাবিকতা হইতে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, অনুভাবের [স্বরভঙ্গি বা sign of feeling] সহিত সংগীতের বিচ্ছেদ হইয়াছে, কেবল কতকগুলা সুর-সমষ্টির কর্দম এবং রাগ-রাগিণীর ছাঁচ ও কাঠামো অবশিষ্ট রহিয়াছে; সংগীত একটি মৃত্তিকাময়ী প্রতিমা হইয়া পড়িয়াছে—তাহাতে হৃদয় নাই, প্রাণ নাই।"

এই বৈজ্ঞানিক উপায়গুলি যে কি, তারই কয়েকটি উদাহরণ স্পেন্সরের লেখা থেকে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তিনি লিখছেন—

"...the *staccato*, appropriate to energetic passages—to passages expressive of exhilaration, of resolution, of confidence.

"...slurred intervals are expressive of gentle and less active feelings;... The difference of effect resulting from difference of *time* in music, is also attributable to the same law.

"...more frequent changes of pitch which ordinarily result from passion, are imitated and developed in song;...

"The slowest movements, *largo* and *adagio*, are used where such depressing emotions as grief, or such unexciting emotions as reverence, are to be portrayed; while the more rapid movements, *andante*, *allegro*, *presto*, represent successively increasing degrees of mental vivacity;..."

গুরুদেব এই মতের সমর্থনে লিখছেন—

"আমরা যখন রোদন করি তখন দুইটি পাশাপাশি সুরের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্পই থাকে, রোদনে স্বর প্রত্যেক কোমল সুরের উপর দিয়া গড়াইয়া যায়, সুর অত্যন্ত টানা হয়। আমরা যখন হাসি—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, কোমল সুর একটিও লাগে না, টানা সুর একটিও নাই, পাশাপাশি সুরের মধ্যে দূর ব্যবধান, আর তালের ঝোঁকে ঝোঁকে সুর লাগে। দুঃখের রাগিণী দুঃখের রজনীর ন্যায় অতি ধীরে ধীরে চলে, তাহাকে প্রতি কোমল সুরের উপর দিয়া যাইতে হয়। আর সুখের রাগিণী সুখের দিবসের ন্যায়, অতি দ্রুত পদক্ষেপে চলে, দুই তিনটা করিয়া সুর ডিঙাইয়া যায়।...উচ্ছ্বাসময় উল্লাসের সুরই অত্যন্ত সহসা ওঠে। আমরা সহসা হাসিয়া উঠি, কোথা হইতে আরম্ভ করি কোথায় শেষ করি তাহার ঠিকানা নাই, রোদনের ন্যায় তাহা ক্রমশ মিলাইয়া আসে না।

"...দ্রুত তাল সুখের ভাব প্রকাশের একটা অঙ্গ বটে।...ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তালও দ্রুত ও বিলম্বিত করা আবশ্যক—সর্বত্রই যে তাল সমান রাখিতেই হইবে তাহা নয়।

"...গীতিনাট্যে, যাহা আদ্যোপান্ত সুরে অভিনয় করিতে হয় তাহাতে, স্থান-বিশেষে তাল না থাকা বিশেষ আবশ্যক। নহিলে অভিনয়ের স্ফূর্তি হওয়া অসম্ভব।"

জীবনের শেষার্ধে এসেও তিনি বলেছিলেন—

"বিলিতির সঙ্গে এই দিশি গানের ছাঁদের তফাতটা কোন্‌খানে? প্রধান তফাত সেই অতিসূক্ষ্ম সুরগুলি নিয়ে যাকে বলি শ্রুতি।...এরি যোগে এক সুর কেবল যে আরেক সুরের পাশাপাশি থাকে তা নয় তাদের মধ্যে নাড়ির সম্বন্ধ ঘটে। এই নাড়ির সম্বন্ধ ছিন্ন করলে রাগ-রাগিণী যদি বা টেঁকে তাদের ছাঁদটা বদল হয়ে যায়। কিছুকাল পূর্বে যে কন্সর্টের প্রচলন ছিল তার গৎগুলি তার প্রমাণ। এই গতের সুরগুলি কাটা-কাটা নৃত্য করতে থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে সেই বেদনার সম্বন্ধ থাকে না যা নিয়ে সংগীতের গভীরতা। এই-সব কাটা সুরগুলিকে নিয়ে নানা প্রকারে খেলানো যায়—উত্তেজনা বলো, উল্লাস বলো, পরিহাস বলো, মানুষের বিশেষ বিশেষ হৃদয়াবেগ বলো, নানাভাবে তাদের ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু যেখানে রাগ-রাগিণী আপনার সুসম্পূর্ণতার গাম্ভীর্যে নির্বিকারভাবে বিরাজ করছে সেখানে এরা লজ্জিত।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই রকমের এক চিন্তা সামনে রেখে, 'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচনার যুগে, ভারতীয় রাগ-রাগিণীকে নিয়ে যখন নানাভাবে পরীক্ষা করতেন তখন গুরুদেব থাকতেন তাঁর সঙ্গে। পিয়ানো-যন্ত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই পরীক্ষার বিষয়ে গুরুদেব বলেছেন, "জ্যোতিদাদা তখন প্রত্যহই প্রায় সমস্ত দিন ওস্তাদি গানগুলোকে পিয়ানো-যন্ত্রের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন।...যে-সকল সুর বাঁধা-নিয়মের মধ্যে মন্দগতিতে দস্তুর রাখিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দৌড় করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নূতন নূতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বদা বিচলিত করিয়া তুলিত। সুরগুলো যেন নানা প্রকার কথা কহিতেছে এইরূপ আমরা স্পষ্ট শুনিতে পাইতাম।"

'বাল্মীকিপ্রতিভা' রচনাকালে স্পেন্সরের মতবাদ যে কাজে লেগেছিল এ কথা স্বীকার করে গুরুদেব বলেছেন—

"স্পেন্সরের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল। ভবিয়াছিলাম এই মত অনুসারে আগাগোড়া সুর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন?"

এই নাটকের অধিকাংশ সুরেই দেশী রাগ-রাগিণী অবলম্বনে গঠিত।

"...কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া আনা হইয়াছে; উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড় করাইবার কাজে লাগানো গিয়াছে।...সংগীতকে এইরূপ নাট্যকার্যে নিযুক্ত করাটা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই। বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত্ব। সংগীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসংকোচে সকল প্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল।"

এক কথায় দেশী রাগিণী-সংগীতকে তিনি নানা ভাবের বাহনরূপে খাড়া করবার পরীক্ষা করলেন এই গীতনাট্যের সাহায্যে। এবং যথার্থ বৈচিত্র্যও দান করলেন। উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি গান তুলে দিচ্ছি—'বাল্মীকিপ্রতিভা'য় ক্রোধের গান 'অহো! আস্পর্ধা একি তোদের নরাধম', কান্নার গান 'হায় কী দশা হল আমার', উল্লাসের

গান 'এই বেলা সবে মিলে চলো হো' ও বিস্ময়ের গান 'একী এ স্থির চপলা'। এই পদ্ধতিতেই সমস্ত নাটকটি গানে রচিত। শোনার বিষয়কে লিখে বোঝানো নিরর্থক মনে করে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হলাম না।

গুরুদেব বলেছেন এ নাটকটি অপেরা নয়—"ইহা সুরে নাটিকা; অর্থাৎ সংগীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে সুর করিয়া অভিনয় করা হয় মাত্র—স্বতন্ত্র সংগীতের মাধুর্য ইহার অতি অল্পস্থলেই আছে।" এ কথাগুলি নিয়ে একটু ভাববার আছে।

ইয়োরোপে অপেরা ছিল সুরপ্রধান নাটক; রচয়িতারা অপেরার কথা বা নাটকীয় বিষয়বস্তুর দিকে বিশেষ নজর দিতেন না। এই প্রথার পরিবর্তন আনেন জার্মানদেশীয় বিখ্যাত সুরকার কবি ভাগ্‌নার, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। গানে বা অপেরায় সুরযোজনা বিষয়ে তিনি কতগুলি বিশেষ আদর্শ মেনে চলতেন। এবং তাতে করেই ইয়োরোপের অপেরাজগতে যুগান্তর আনতে পেরেছিলেন বলে আজও তিনি সম্মানিত। ইয়োরোপের জনৈক সমালোচক তাই তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—

"He did give the world a new and perfect form of musical drama. He broke completely with older conceptions according to which an opera had been merely an opportunity for a few strong-lunged singers to show how they could juggle their high C's while paying absolutely no attention to the text."

এইজন্যেই এই বিশেষ পদ্ধতির অপেরাকে সেদেশীয় সমালোচকরা নূতন নামকরণ করে বলেছেন, 'Music Drama'। ভাগ্‌নারের Music Drama-য় সুরযোজনার মূল তত্ত্ব ক'টি এখানে সেদেশের সংগীতবিশেষজ্ঞদের ভাষা থেকে তুলে দিচ্ছি। তাতে দেখা যাবে যে, হার্বার্ট স্পেন্সর যে মতবাদ প্রচার করেছিলেন তা ভাগ্‌নারের মতবাদের সঙ্গে প্রায় এক—

"The abolition of a set form (that is, ending as one began), and the use of any shape that the poem suggested.

Absolute unity of the entire work. No division into songs, duets, choruses, with applause between and some times even encores. Continuity from beginning to end.

The music is always to interpret the poetry. Its entire character is to be dictated by words : . . . .

'In the wedding of the arts Poetry is the man, Music the woman' ; 'Poetry must lead, Music must follow' ; 'Music is the handmaid of poetry' ; are a few of Wagner's apothegms.

Abolition of mere tune and the substitution of a melodic recitative, called the 'Melos'.

Excellence of libretto. No book is fit to be used for the text of an opera unless it would make a successful drama by itself.

He apparently made music express everything of which it is capable, when united with poetical and dramatical literature."

গুরুদেব যাকে 'সুরে নাটিকা' বলেছেন ভাগ্‌নারের 'Music Drama' বলতে ঠিক তাই বোঝায়। 'কালমৃগয়া'ও ঠিক এই পদ্ধতির রচনা। 'মায়ার খেলা'র বিষয়ে তিনি বলেছেন যে, তাতে নাট্য মুখ্য নয়, গীতই মুখ্য। 'মায়ার খেলা' তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। তিনি বলেছেন, "মায়ার খেলা যখন লিখিয়াছিলাম তখন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়া ছিল।" এই গীতনাটিকাটিকে বরঞ্চ ইটালিয়ান অপেরার মতো বলা যেতে পারে। শুনলেই বোঝা যায় যে, গানরচনার দিকেই দৃষ্টি ছিল বেশি। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া'র গান নানা জাতীয়, নানা ঢঙের ও নানা রসের অন্য গানের সুর নিয়ে রচিত কিন্তু সেই রাগ-রাগিণীগুলি অভিনয়ের ছন্দে লয়ে ভঙ্গিতে গাওয়ার দরুন বাংলা গীতনাটকের দিক থেকে আশ্চর্য রকমের এক আদর্শ খাড়া করেছে।

১৩৪৫ সনে 'মায়ার খেলা' যখন শান্তিনিকেতনের ছাত্রীদের দিয়ে নৃত্যে অভিনয় করবার কথা হল, তখন গুরুদেব এই নাটকটির আমূল পরিবর্তন করেন। বহু গান তিনি নতুন করে রচনা করেন। এই নতুন 'মায়ার খেলা'র রচনা সম্পূর্ণ হয় নি বা তা সম্পূর্ণ অভিনীতও হয় নি। কিন্তু গুরুদেব কী লক্ষ্য নিয়ে 'মায়ার খেলা'র রূপান্তরে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সে সম্পর্কে পূর্বেই কিছু আলোচনা করেছি।

শেষজীবনে তিনি রূপান্তরিত 'মায়ার খেলা'র গানগুলি রচনা করেছিলেন প্রথম যুগের 'মায়ার খেলা'র আদর্শে। তাই দেখি এর প্রায় প্রত্যেকটি গানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ গানরূপেই তিনি রচনা করবার চেষ্টা করেছেন, এবং এর বহু গানকে নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েও সেগুলি গাইতে পারা যায়।

আগেই বলেছি, স্পেন্সরের ও ভাগ্‌নারের মত হল, গানরচনায় কবিতা যা করতে বলবে সুর যেন তা মেনে চলে। গুরুদেবও এই মতের সমর্থনে প্রথম-জীবনে বলেছিলেন, "গানের কথাকেই গানের সুরের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তোলা সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য।"

"আমি গানের কথাগুলিকে সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই।...আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।"

কিন্তু বিলেতি আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েও সে সময়ে তাঁর গানের সুরযোজনায় তিনি যে পথ গ্রহণ করেছিলেন, সেটি তাঁর নিজস্ব পথ।

পাশ্চাত্য সংগীতরচয়িতাদের সঙ্গে গুরুদেবের এক জায়গায় বিশেষ তফাত দেখি। গুরুদেব পেয়েছিলেন আমাদের দেশের নানা রাগ-রাগিণী ও তার গায়কী ঢঙ, এবং তাকেই গীতনাট্যের ভাবানুযায়ী ব্যবহার করেছেন। ইয়োরোপীয় সংগীতে অনেক দিন থেকেই রাগ-রাগিণী জাতীয় কোনো সংগীতপদ্ধতির চলন নেই। তারা কেবল স্বরগুলিকে নানা রূপে ও নানা ছন্দে সাজিয়ে তার থেকে বিভিন্ন ভাব প্রকাশের চেষ্টা করে।

ভারতীয় সংগীতের রাগ-রাগিণীর জগৎ ও তার নানাপ্রকার গীতপ্রকরণ নানা রস প্রকাশের দিক থেকে বিশেষ মূল্যবান সম্পদ। নানা রাগিণী নানা ঢঙে গাইবার

সময় যে বিচিত্র রসের সৃষ্টি হয়, সেটি গানরচনার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমাদের রাগ-রাগিণী-সংগীত মনের এমন এক স্তরের প্রকাশ যে তাকে বাহ্যিক জগতের কাজে লাগানো সম্ভব নয় বলেই মনে হত। এ সংগীত যে শান্তরসের সাধনা করে তা বড়ো গভীর অনুভূতিসাপেক্ষ রসের সাধনা। ইয়োরোপ ও-ধরনের সাধনার পক্ষপাতী কি না তা আমার জানা নেই, তবে এটুকু জানি যে, তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখরাগদ্বেষপূর্ণ ক্ষণিক রসের মধ্যেই আনন্দ চায়। অন্তত মনে হয় এইটিই হল সে দেশের সংগীতের মূল বক্তব্য। গুরুদেব আমাদের সংগীতকে এই পথে আনতে চেয়েছিলেন বলেই স্পেন্সরের মতকে গ্রহণীয় মনে করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ঐ মত গ্রহণ করতে পারেন নি—পরবর্তী জীবনে যখন ভারতীয় সংগীতের ভিতরকার রসের সন্ধান পেলেন। সেদিক থেকে আমি বলব 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র যুগ তাঁর শিক্ষানবিশীর যুগ, রসানুভূতির যুগে তিনি তখনো পৌঁছতে পারেন নি। তাই উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত কাজে, লেখায়, যে মতবাদকে তিনি সমর্থন করেছিলেন, পঞ্চাশ বৎসরের কাছাকাছি সময়ে রসানুভূতির জগতে এসে বললেন, "যে-মতটিকে তখন এত স্পর্ধার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিলাম সে-মতটি যে সত্য নয়, সে কথা আজ স্বীকার করিব।"

কিন্তু সুরযোজনার এই বিলেতি আদর্শ তাঁর লিরিক্‌ধর্মী কবিতায় তিনি আর-এক ভাবে গ্রহণ করেছিলেন বলেই সুর ও কথায় মিলনের মাধুর্য আমরা একবাক্যে স্বীকার করি। ভারতীয় রাগ-রাগিণী-সংগীতকে লিরিক্‌ধর্মী হৃদয়াবেগের বাহন হিসেবেই আমরা দেখি। গুরুদেব বলেন, কবিতা যেমন ভাবের ভাষা সংগীতও তেমনি ভাবের ভাষা। সুতরাং লিরিক্‌ধর্মী ভাব প্রকাশের এই দুইটি ভাষাকে যদি একসঙ্গে মেলাতে পার তা হলে গানের মাধুর্য অনেক বাড়ে। কেবল পাঠ করে মনে যে আনন্দ পাই সুরে মিলে সে আনন্দ আরো গভীরভাবে মনকে আকর্ষণ করে। কারণ সুরের আবেদন কথা ও ছন্দের আবেদনের চেয়ে জোরালো। এই পথে গানকে চালনা করার দরুন কথা সুরের উপর প্রভুত্ব করবে ও সুর থাকবে অনুচরের মতো, এ ধরনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না, বরঞ্চ দুটিতে এক হয়ে গিয়ে সমগ্রভাবে যে রসের সন্ধান দেয় তার তুলনা নেই।

আরম্ভে গুরুদেবের আরো অন্য রকমের গীতনাট্যের নাম উল্লেখ করেছিলাম। কিন্তু সে নাটকের গানগুলি নিয়ে 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র গানের মতো আলোচনা করবার কিছু নেই। সেখানে গানগুলিকে অনায়াসে নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েও তার রস উপভোগ করা যায়। এই-সব গানের সুর নিয়ে আলোচনা অন্যান্য গানের মতোই হওয়া উচিত। তাতেই তার প্রকৃত রূপ প্রকাশ পাবে।

কিন্তু তাঁর জীবনে 'চিত্রাঙ্গদা' 'শ্যামা' 'চণ্ডালিকা' গীতনাট্য ক'টি এই দলে পড়বে না। এগুলি 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র মতো পূর্ণাঙ্গ গীতনাট্য বটে কিন্তু 'বাল্মীকি-প্রতিভা'র মতো 'সুরে নাটিকা' বা 'মায়ার খেলা'র মতো কেবল গীতমুখ্য নাটিকাও নয়। এগুলো হল নৃত্যনাট্য, নাচের কথা চিন্তা করে লেখা। নাচের দরুন, এই নাটকের গানে বাঁধা-ছন্দের দোলার দিকে নজর রাখতে হয়েছে। অর্থাৎ বেশির ভাগ অংশেই বাঁধা-ছন্দে গানগুলিকে গাইতে হয়। সাধারণ উত্তর-প্রত্যুত্তরের অংশগুলিও

এইরূপে বাঁধা-ছন্দের বাঁধনে পড়ে গেছে। এর মধ্যেও তিনি যে বৈচিত্র্য এনেছেন তা হল এই যে, নাটকের পাত্রপাত্রীর সম্পূর্ণ একটি বক্তব্যের ভিতর দিয়ে যে ভাব প্রকাশ পাচ্ছে, রাগিণী ও তালের গতি তাকেই লক্ষ্য করে চলেছে। বাঁধা-ছন্দ হলেও গুরুদেব ছন্দের গতি ভাবের অনুকূল করার চেষ্টা করেছেন। এক কথায় রাগ-রাগিণীতে গাঁথা এই নাটকের কথা নাচের উদ্দেশ্যে ছন্দে বা তালে বাঁধা হয়েও 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র মতো 'সুরে নাটিকা'র মর্যাদা পেয়েছে। তবুও এই-সব নাটিকায় কথার ছন্দকে তিনি সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেন নি, কোথাও কোথাও এই পদ্ধতিকে রাখতে হয়েছে।

ভারতীয় রাগ-রাগিণীর অন্তর্নিহিত রস-রূপটি গুরুদেবের মনে প্রাচীন ভারতের অন্যান্য গীতসাধকদের মতো কিরকম সুন্দর ধরা পড়েছিল গুরুদেবের গীতনাটকের সুরেই তার বড়ো প্রমাণ মেলে। গতানুগতিক অভ্যাসমতো রাগ-রাগিণীর ভাব-রূপটি আমাদের কাছে যেভাবে প্রকাশ পায় গুরুদেবের হাতে পড়ে তা অনেক ক্ষেত্রে আর-এক রূপ গ্রহণ করেছে এ-সব গীতনাট্যে। এবং গীতনাট্যেই তার বিকাশ আরো পরিস্ফুট। গীতনাট্যের গানগুলি হিন্দী রাগ-রাগিণীকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে। কেবল কোনো একটা অসম্ভব মিশ্রণ দ্বারাই যে এ রচনা সার্থক হয়েছে তা নয়, এই-সব নাটকে তিনি রাগিণী বা সুর ও কথাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন। নিপুণ শিল্পীর মতো সুর ও কথা নিয়ে আশ্চর্য রকম কারিগরি করেছেন, তাকে নানাভাবে নানা বিচিত্র ঢঙে সাজিয়েছেন। জাপানে আছে ফুল-সাজানো শিক্ষা। ফুলের গাছ থেকে ফুলসমেত ডাল কেটে এনে সেদেশের নিপুণ শিল্পীরা বহু যত্নের সঙ্গে নানা ছন্দে নানা ভঙ্গিতে ফুলদানিতে ফুল সাজায়। এ নাটকের গানগুলিতে নানা রাগ-রাগিণী সেইভাবেই বসেছে। কথার সঙ্গে কোন্ রাগ-রাগিণী কিভাবে সাজালে সত্যিকার সুন্দর হয়ে উঠতে পারে তারই প্রকাশ এতে দেখি।

এই গীতনাটকের গানের তালে বা ছন্দেও তিনি তাঁর প্রতিভাকে কিছুমাত্র খর্ব করেন নি। যে ছন্দ যে ভাবের কথার সঙ্গে খাপ খাবে সেই ছন্দটিকেই তিনি নিখুঁত-ভাবে বসিয়েছেন। কারণ ছন্দেরও নিজস্ব একটা ভাবময় রূপ আছে। অর্থহীনভাবে যেখানে-সেখানে ছন্দকে তিনি ব্যবহার করেন নি। ছন্দের বেগের সঙ্গে মানুষের মনের উত্থানপতনের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সেই যোগসূত্র গীতরচয়িতাদের কাছে সুস্পষ্ট না হলে গানরচনা কখনো সার্থক হয় না। ছন্দের এই তত্ত্বে গুরুদেবের অভিজ্ঞতা খুব গভীর বলেই নিপুণ শিল্পীর মতো তিনি গীতনাট্যে তাকে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।

গীতনাট্যবিষয়ে যা বলেছি, গানের উদাহরণের সঙ্গে তাকে না দেখাতে পারলে এ-সব কথার অর্ধেকই লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। যাঁরা এই-সব গীতনাট্যের গানগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আছেন, তাঁরাই এ-সব কথার তাৎপর্য সহজে বুঝতে পারবেন। এর গান একবার আরম্ভ করে নানা সুরে তালে ও ভাবের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়ে শেষ হয়, আরম্ভ করলে থামা মুশকিল। সাধারণ গানের মতো করে গাইলে এর সব মাটি। যখনই যে কথায় যে ভাব প্রকাশ পাচ্ছে, সে ভাবটিকে সুরের সাহায্যে গলায় ফুটিয়ে তুলতে হবে।

এইক'টি গীতনাট্যের মধ্যে 'চিত্রাঙ্গদা'র যে অংশগুলি গানের সুরহীন আবৃত্তির

সঙ্গে নৃত্যভঙ্গিতে অভিনয় করতে হয় সে অংশগুলিও উল্লেখযোগ্য। আবৃত্তির ছন্দ আর গানের ছন্দ যে এক নিয়মে চলে না তা সকলেই জানেন, কিন্তু আবৃত্তির ছন্দে অভিনয় করা যে ভালো নাচিয়েদের পক্ষে সম্ভব এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। ইয়োরোপে এ চেষ্টা নাচিয়েরা করেছেন। গুরুদেবের 'ঝুলন' কবিতার আবৃত্তির সঙ্গে নৃত্যাভিনয় ভারতীয় নৃত্যজগতের একটি উল্লেখযোগ্য নূতন পরীক্ষা। আবৃত্তিপদ্ধতি বা 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র গায়কী-পদ্ধতি মূলত এক। কিন্তু 'চিত্রাঙ্গদা'র আবৃত্তি-অংশে রাগ-রাগিণী রইল না, নাচ হল, আর 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় সুরে আবৃত্তি হল, নাচ হল না। এই ভাবে আবৃত্তির ছন্দে নাচে অভিনয় করা সম্ভব দেখে কয়েক বৎসর পূর্বে আমরা 'বাল্মীকিপ্রতিভা'কে নৃত্যাভিনয়ে রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলাম এবং এই নাটিকার গায়কী না বদলেও যে তার সঙ্গে নাচে অভিনয় করা যায় সে পরীক্ষাতে আমরা কৃতকার্য হয়েছি।

আমার বিশ্বাস, 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' গীতনাট্যকে যদি নাচের সাহায্যে সম্পূর্ণ অভিনয়যোগ্য করে তোলা যায়, তবে ভারতীয় নৃত্যজগতের একটি নতুন দিক খুলে যাবে। এর ভিতর দিয়ে নৃত্যনাট্য বা গীতনাট্যের যে রূপ প্রকাশ পাবে সেইটাই হবে পূর্ব ও পশ্চিমের প্রকৃত মিলনের রূপ, প্রকৃত নতুন সৃষ্টি। এর প্রারম্ভিক কাজ গুরুদেব শুরু করেছিলেন। তিনি আমাদের মধ্যে কাজের ধারা ধরিয়ে দিয়ে গেছেন। ভারতীয় গীতনাট্য বা নৃত্যনাট্যের জগতে যুগোপযোগী সৃষ্টি করতে হলে গুরুদেবের নির্দেশিত পন্থা অবলম্বন করেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে—এই পথেই ভারতীয় নৃত্যের নব নব বিকাশের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

গীতনাট্যের বৈচিত্র্য

প্রাচীনেরা নাটককে বলতেন 'দৃশ্যকাব্য' অর্থাৎ চোখে দেখার কাব্য, আর-এক নাম ছিল 'রূপক'। বর্তমানে 'রূপক' কথাটাকে আমরা যে অর্থে ব্যবহার করি তাঁরা তা করতেন না। গঠনের তারতম্য অনুসারে এই রূপককে দুই ভাগে ভাগ ক'রে একটিকে বললেন 'রূপক' অপরটিকে বললেন 'উপরূপক'। 'রূপক' ও 'উপরূপক'ও তাঁরা ভাগ ক'রে বললেন—'রূপক' হল ১০ রকমের আর 'উপরূপক' হল ১৮ রকমের। এই ১৮ রকমের উপরূপকের মধ্যে কতকগুলি এযুগে যাকে আমরা গীতনাট্য বা নৃত্যনাট্য বলি—তাই। 'রূপক' ও 'উপরূপকে'র ব্যাপক বিকাশ মুসলমান-পূর্ব যুগেই বেশী হয়। মুসলমান যুগে তার অবনতি হ'তে থাকে এবং ইংরেজ যুগের সঙ্গে সঙ্গে এ-সবের ব্যবহারও আমরা একেবারে ভুলতে লাগলাম। তাই সেই-সব 'রূপক' ও 'উপরূপকে'র হুবহু নমুনা আজ ভারতে প্রচলিত নেই বলেই আমাদের ধারণা। কিন্তু সব রকম না থাকলেও কিছু কিছু যে এখনো বিভিন্ন প্রদেশে আত্মগোপন ক'রে আছে তা হয়তো বলা যায়।

এখানে একটা কথা ব'লে রাখা দরকার যে, গীতনাট্য বলতে আমি গান-বহুল নাটকের কথাই বলছি, লিরিক নাট্য নয়।

দৃশ্যকাব্য অর্থাৎ 'রূপক ও উপরূপকে'-র ভালো ক'রে আলোচনা-কালে এটুকু বোঝা যায় যে, যতরকম পদ্ধতিতে নাটকের অভিনয় হতে পারে, সেদিক থেকে কোনো রকমের চেষ্টার ত্রুটি প্রাচীনদের মধ্যে ছিল না। প্রাচীন নিয়ম অনুসারে সব রকমের উপরূপকে নাচ বা নাচের অভিনয়ের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। নাচ ছাড়া উপরূপক অভিনীত হবে এ যেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা ভাবতেই পারতেন না। সেই কারণেই আমাদের দেশের প্রাচীন সব রকমের উপরূপক বা গীতনাট্যের গানমাত্রেই নাচে অভিনীত হত—যা আজও হয়। বোধহয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা এইজন্যেই সংগীতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, একাধারে নাচ গান ও বাজনা যাতে মিশেছে তাকেই বলা হবে 'সংগীত'।

প্রাচীন ভারতে গান ও নাচকে গীতনাট্যে এত বড়ো স্থান দেওয়া হল কেন তা ভাববার বিষয়। হৃদয়াবেগকে আমরা সাধারণ কথায় যত সুন্দর করে ফোটাতে পারি কবিতার ছন্দে তা আরো বেশি সুন্দর হয়ে ওঠে, আরো মর্মস্পর্শী হয় রাগিণীতে মিশে সে যখন গানে রূপ নেয়। নাটকে সাধারণ কথায় অভিনয় ভালো লাগে বটে, কিন্তু তার চেয়েও ভালো লাগে তাকে সুরের ভিতর দিয়ে যখন আমরা পাই। সব চেয়ে বেশি মন আকর্ষণ করে, দেহছন্দের নৃত্যভঙ্গিতে যখন তা রূপ নেয়। এইজন্যেই ভারতীয় আদর্শে গান ছাড়া নাটক নেই, আবার গান যেখানে আছে সেখানে নাচ থাকবেই। বর্তমানে দেশে উপরূপক বা গীতনাট্য কিভাবে আছে এবার তার পরিচয় দেওয়া যাক।

যে নাটকে পাত্রপাত্রীর কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর গান থাকে সে হল এক-রকমের গীতনাট্য। দক্ষিণ-ভারতের কর্ণাটপ্রদেশে প্রচলিত 'যক্ষগণ' নামে প্রাচীন নৃত্যাভিনয়ে তার পরিচয় পাই। বাংলাদেশের গতযুগের যাত্রাভিনয়ে এবং গুরুদেবের

রচিত 'শারদোৎসব' 'ফাল্গুনী' 'অচলায়তন' 'তাসের দেশ' প্রভৃতি গীতনাট্য ঠিক যক্ষগণের মতো না হলেও তাতে গানেরই প্রাধান্য। এই-সব নাটকের গান শুনে বেশ বোঝা যায় যে, নাটকে কেবল সুরমাধুর্য বিস্তারের জন্যে গানগুলি বসানো হয় নি, নাটকের সাধারণ ভাষায় যে ভাব পরিষ্কার করে প্রকাশ পেল না, গান দিয়েই যেন তাকে পূরণ করা হচ্ছে। প্রাচীনের সঙ্গে অবশ্য অভিনয়পদ্ধতিতে যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে এ কথা বলা বাহুল্য।

আর-এক রকমের গীতনাট্য হল, যাতে পাত্রপাত্রী সাধারণ ভাষায় কথা বলে না। একজন সূত্রধার কথার ভাষায় নাটকের ঘটনা ও বিষয়বস্তুকে দর্শকের সামনে খুলে ধরে, কেবল গানের অংশ অভিনেতারা অভিনয় করে। এক সময় ছিল সূত্রধারই একাধারে নাচে গানে বক্তৃতায় প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে। সূত্রধার পরিচালিত গীত-নাট্যের সঙ্গে আসামের বৈষ্ণবদের 'অংকীয়ানাট' নাটকে, বাংলার প্রাচীন ও অধুনা-অপ্রচলিত 'কালীয় দমন' যাত্রাগানে, দক্ষিণ-ভারতের অন্ধ্রদেশে প্রচলিত 'কুচিপুড়ি' ব্রাহ্মণদের অভিনয়ে এবং গুরুদেবের 'শাপমোচন' ও 'শিশুতীর্থ' গীতনাট্যের পদ্ধতির অনেকটা মিল আছে।

গুরুদেব-রচিত 'বসন্ত' 'ঋতুরঙ্গ' 'নবীন' ও 'শ্রাবণগাথা' আর-এক ধরনের গীত-নাট্য। কতগুলি পূর্ণাঙ্গ গানের কথা ভেবেই নাটকের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে। গানগুলিকে একটি মূলভাবসূত্রে গেঁথে দর্শকদের সামনে ধরবার ইচ্ছা থেকেই এই-সব নাটকীয় আয়োজন। এখানে গল্পের জন্যে নাটক নয়, গানগুলিকে সাজানোর জন্যেই নাটক।

এক ধরনের গীতনাট্য আছে যার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কথাবার্তা রাগিণীতে বাঁধা। ইয়োরোপে এই নাটকের প্রচলন খুব বেশি। তাদের ভাষায় একে বলে 'অপেরা'। এই ধরনের পূর্ণাঙ্গ গীতনাট্য দক্ষিণ-ভারতের কেরল ও তামিলদের মধ্যে আজও প্রচলিত। গুরুদেব স্বয়ং এ ধরনের গীতনাট্য রচনা করেছিলেন মোট ছয়টি। প্রথমজীবনে তিনটি, জীবনের শেষ দশ বছরে বাকি তিনটি। অর্থাৎ তাঁর জীবনে নাটকের আরম্ভ হয় গীতনাট্য দিয়ে এবং নাটক রচনা শেষও করেন গীতনাট্য দিয়ে। নাটকগুলির নাম হল 'বাল্মীকি-প্রতিভা' 'কালমৃগয়া' 'মায়ার খেলা' 'চিত্রাঙ্গদা' 'শ্যামা' ও 'চণ্ডালিকা'।

তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, গুরুদেব সব-সমেত ছয় রকমের গীতনাট্য রচনা করেছিলেন, যেমন প্রথম দলে হল 'বাল্মীকি-প্রতিভা' 'কালমৃগয়া' ও 'মায়ার খেলা'। দ্বিতীয় দলে হল 'অচলায়তন' 'শারদোৎসব' 'ফাল্গুনী' 'অরূপরতন' ও 'তাসের দেশ'। 'বসন্ত' 'শ্রাবণগাথা' হল তৃতীয় দলের। 'ঋতুরঙ্গ' 'সুন্দর' ও 'নবীন' হল চতুর্থ দলের গীতনাট্য। পঞ্চম দলে 'শিশুতীর্থ' ও 'শাপমোচন'। আর শেষ অথবা ষষ্ঠ দলের গীতনাট্য হল 'চিত্রাঙ্গদা' 'শ্যামা' ও 'চণ্ডালিকা'।

প্রথম দলের গীতনাট্য ক'টি অপেরার আদর্শে রচিত। শারদোৎসব প্রভৃতি নাটক ক'টি রচনা করেছিলেন প্রচলিত যাত্রার আদর্শে। 'বসন্ত' 'শ্রাবণগাথা' পূর্ণ গীতনাট্য হলেও এর ধরনটা আগের গীতনাট্যের মতো একেবারেই নয়। বসন্ত বা বর্ষা-ঋতুর কতকগুলি লিরিক গানকে একটি মূলভাবসূত্রে সাজিয়ে নিয়ে গানগুলিকে কখনো

সাধারণ অভিনয়ভঙ্গিতে, কখনো নাচের ভঙ্গিতে রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়। একটির পর একটি গানের সঙ্গে ভাবগত যোগ রক্ষা করবার জন্যে নাটকীয় পরিবেশ রচনা করা হয় রাজসভা সাজিয়ে। রাজা পাত্রমিত্র সমেত যেন ঋতু-উৎসবের আসরে বসেছেন। রাজা রাজকবি নটরাজ ইত্যাদির পরস্পর কথাবার্তার মধ্য দিয়ে এক গান থেকে আর-এক গানের সঙ্গে যোগ রক্ষা করা হয়েছিল। 'ঋতুরঙ্গ' ও 'নবীন' প্রায় একই জিনিস, ঋতুর গানগুলিই এইখানে মুখ্য, কিন্তু রাজসভা এতে নেই। গুরুদেব স্বয়ং গানে আবৃত্তিতে পাঠে প্রাচীন নাটকের সূত্রধারের মতো এক গানের সঙ্গে অপর গানের যোগসূত্রটি রচনা করে গিয়েছিলেন। এর পিছনে কোনো গল্প নেই। 'শিশুতীর্থ' ও 'শাপমোচন' গীতনাট্য দুটি কিন্তু উপরোক্ত কোনো গীতনাটকের মতো নয়। এই দুই নাটকের গল্পকে আগে ঠিক করে তার সঙ্গে ভাবে মেলে এ ধরনের পূর্ব-রচিত অনেকগুলি গানকে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছিল, গল্পটিকে ঠিক রাখবার জন্যে বা গল্পের গতি অব্যাহত রাখবার জন্যে। সাধারণ ভাষায় গুরুদেব গল্পটি মাঝে মাঝে পড়ে শোনাতেন প্রাচীন সূত্রধারের মতো। শেষের গীতনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' 'শ্যামা' ও 'চণ্ডালিকা' পূর্ণাঙ্গ গীতনাটক, গানের সুরেই সব কথাবার্তা কওয়া হয়। তবে অভিনেতারা গান গায় না, তারা নাচের ভঙ্গিতে অভিনয় করে চলে। গান গায় গানের দল— রঙ্গ-মঞ্চের পিছনে। তবে 'চিত্রাঙ্গদা'য় কয়েকটি আবৃত্তি আছে যা গল্পের একটি ভাবের সঙ্গে পরবর্তী ভাবের মধ্যে যোগরক্ষার কাজ করছে।

গুরুদেবের জীবনে কয়েকটি শিল্প ছিল স্বতউৎসারিত। তারা যখন খুশি এসেছে আবার যখন খুশি বন্ধ হয়েছে। তারা যেন গুরুদেবের অন্তরতর অন্য কোনো মানুষের সৃষ্টি, গুরুদেব ছিলেন উপলক্ষের মতো। সে ক'টি শিল্প হল কবিতা গান ও ছবি। তাঁর আর সব সৃষ্টি এইরকম স্বতউৎসারিত নয়, বাইরের তাগিদের উৎসাহে রচিত। সবক'টি গীতনাট্য বা নৃত্যনাট্য সেই রকমের বাইরের তাগিদেই রচিত।

প্রথম যুগে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'বিদ্বজ্জনসমাগম' সভার প্রয়োজনে লিখলেন, 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া'। 'সখী-সমিতি'র প্রয়োজনে লিখতে হল 'মায়ার খেলা'। শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার সহায় হিসেবে 'শারদোৎসব' থেকে সুরু করে লিখলেন গীতনাট্য ও নৃত্যনাট্যগুলি। 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা'-র যুগে নাচ ছিল না, তাই নৃত্যের সাহায্যে অভিনয় করার চেষ্টা করা হয় নি। সে যুগে সাধারণ ভঙ্গিতে অভিনয় করাই ছিল প্রথা, তাই গান গেয়ে অভিনয় করেছেন। 'শারদোৎসব' থেকে 'ফাল্গুনী' পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে বালকদের যুগ। তাই নারীবর্জিত গীতনাট্যই তখন লিখেছেন। এর গানগুলিতে সহজ ছন্দের অঙ্গভঙ্গি ছিল, তাকে পাকাপোক্ত নাচ বলা যায় না। যখন থেকে শান্তিনিকেতনে মেয়েদের স্থান হল এবং নাচ শেখানোও শুরু হল, তখন দেখা গেল গানের সঙ্গে নাচে অভিনয়ের চেষ্টা। সেই নাচ যখন আরো উন্নত হল তখন পূর্ণাঙ্গ গীতনাট্যগুলি উপযুক্ত মনে হওয়ায় নৃত্যনাট্যে রূপ নিল। মূলত তিনি প্রথমজীবনে গীতনাট্য রচনায় যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন সেই গীতনাট্যই নানা অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে নাচের যুগে এসে নৃত্যনাট্যে পরিণত হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ গীত-

নাট্য রচনার উৎসাহ তিনি প্রথমে পেয়েছিলেন অপেরা-সংগীতের কাছ থেকে। শান্তিনিকেতনের জীবনে গীতিনাট্যগুলি রচিত হল নিজস্ব স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে। শেষজীবনে নৃত্যনাট্য তিনি রচনা করেছেন পূর্বজীবনের গীতিনাট্য রচনার সব অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে এবং এখানকার নৃত্যচর্চার সুবিধার জন্যে।

গুরুদেবের পূর্ণাঙ্গ গীত- বা নৃত্যনাট্যগুলি তাঁর সংগীত-প্রতিভার একটি বড়ো দিক। এই পথে তিনি বাংলায় অদ্বিতীয়। গুরুদেবের জীবিতকালে বাংলাদেশের আর কোনো সংগীতকারকে এ দিকে হাত দিতে দেখা যায় নি। হয়তো গীতিনাট্য রচনার মধ্যে যে সৃষ্টিক্ষমতার দরকার তা আর কারো ছিল না। গুরুদেব যদি অন্য রকমের গান না লিখে, কেবল এই ক'টি গীতিনাট্যই রচনা করে যেতেন, তা হলেও সুরস্রষ্টা হিসেবে বাংলাদেশে তিনি শ্রেষ্ঠের আসন পেতেন। এই গীতিনাট্যগুলি বাংলার এযুগের সংগীত-জগতে যুগান্তকারী সৃষ্টি।

নৃত্যনাট্যের অভিনয়

গুরুদেবের নৃত্যনাট্যের উপর ইংরেজি ভাষায় লিখিত একটি প্রবন্ধ আমার চোখে পড়ল। লেখিকা নিজে একজন গুণী নৃত্যশিল্পী এবং গুরুদেবের আশীর্বাদও তিনি পেয়েছেন। কিন্তু দেখছি গুরুদেবের নৃত্যনাট্য বিষয়ে তাঁর লিখিত মত গুরুদেবের চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। তাঁর সেই লেখাটি নিয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করছি। লেখিকা লিখছেন—

"In Chitrangada, the Manipuri technique appeared at its best."

শ্যামা নৃত্যনাট্য সম্পর্কে তাঁর মত হল :

"Apart from the group dances which are generally in the Manipuri style, we find Bajrasena dancing in Bharat-Natyam and Kathakali style, the watchman rendering their part in Kathakali technique while Uttiya exhibited his proficiency in the Kathaka style. To some, this exhibition of the three technique in one play is a great achievement. For me, however, they seem to be artificialy pushed in, disturbing the atmosphere of Tagore's play. Imagine the dance of the guards jumping and dancing all over the stage preparing to kill Uttiya, who is silently waiting for the last moment of his life. Then again, imagine the character of Uttiya—a dreamer, a sensitive youth filled with the youthful joy of his love for Shyama dancing in the technicalities of Kathak styles. . . .to me Tagore's dramas and characters—the whole atmosphere of his plays—have an aesthetic appear and cannot form a platform for exhibition of the various technique."

এখানে তিনি তাঁর নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রকাশ্যে গুরুদেবের চিন্তাধারা বা কর্মপদ্ধতিকে যে অস্বীকার করেছেন, সেটি তিনি হয়তো বুঝতে পারেন নি।

প্রথমেই বলে দেওয়া দরকার যে, গুরুদেবের নৃত্যনাট্যগুলি যদিও নাচের আঙ্গিকে অভিনয় করবার জন্যে কিন্তু এই-সব নাটকের মধ্য দিয়ে যে রসটিকে তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, সেইটিই হল তার মুখ্য দিক। নৃত্যের সাহায্যে যাঁরা তাঁর অভিনয় করবেন, তাঁদের প্রধান কাজ হবে সেই নাটকীয় রসকে দর্শকের কাছে কতটা পরিস্ফুট করা যায়, তার চেষ্টা করা। এই-সব নাটকের নাচিয়েরা ব্যক্তিগতভাবে কত বড়ো নাচিয়ে বা নৃত্যাভিনয়ে কতখানি দক্ষ সেটি বড়ো জিনিস নয়। এখানে একমাত্র দেখবার বিষয় হবে, বড়ো ছোটো সকলে মিলে সমগ্র নাটকের রসটিকে ঠিকমত ফোটাতে পারল কিনা।

এইরূপ একটি আদর্শ সামনে রেখেই গুরুদেবের সব নাটকের কাজ প্রথম থেকে চলে এসেছে। নৃত্যনাট্যের বেলায়ও দেখা গিয়েছে যে, গুরুদেব তাঁর নৃত্যনাট্যের

জন্যে বা তাঁর গানের সঙ্গে নাচের জন্যে প্রয়োজনমত যখন যে পদ্ধতির নাচের ছেলেমেয়ে বা নর্তক-নর্তকী পেয়েছেন, তাকেই তিনি তাঁর নৃত্যনাট্যে বা তাঁর গানের নাচের জন্যে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সর্বদাই তাঁর লক্ষ্য থাকত, নাচ যে টেক্‌নিকেরই হোক-না কেন, নৃত্যনাট্যের বা গানের যে রসটি প্রকাশের ভার তাদের উপর পড়েছে, সেটি ঠিকমত প্রকাশিত হচ্ছে কিনা।

১৯২৬ সালে নটীর পূজার শ্রীমতীর নাচ মণিপুরী ঢঙে রচিত হয়। সেই নাচ তখন প্রত্যেক দর্শকেরই মন আকর্ষণ করে। কিন্তু ১৯৩১ সালে গুরুদেবের ৭০ তম জন্মোৎসবের সময় আবার যখন নটীর পূজা অভিনয় করার কথা হল, তখন গুরুদেব নির্দেশ দিলেন যে, সম্পূর্ণরূপে নতুন করেই শ্রীমতীর নাচটি রচনা করতে। এইবারেই মণিপুরীর সঙ্গে কথাকলি নাচের সর্বপ্রথম মিলন ঘটে। সেই নতুন রচিত নাচ গুরুদেবের সমর্থন পায় এবং কলকাতার রঙ্গমঞ্চেও সেই নাচই দেখানো হয়। নাচটি নতুন পদ্ধতিতে গঠিত হলেও গানের ভাবের সঙ্গে মানিয়েছিল বলেই গুরুদেব নাচটির সমর্থন করেন। নতুন টেকনিকে রচিত হলেও তা ভাবের অনুগত ছিল।

ঠিক একই সময়ে শাপমোচন অভিনীত হল কলকাতায়। রাজার অংশে নৃত্যে অভিনয় করেছিলেন একজন বিদেশী রুশদেশীয় লোকনৃত্যবিশারদ। রুশী লোক-নৃত্য-পদ্ধতিতেই তিনি অভিনয় করেছিলেন এবং তা সম্ভব হয়েছিল গুরুদেবেরই আগ্রহে। সেই পদ্ধতিতে শাপমোচনের রাজার অভিনয় কারো কাছে বেমানান মনে হয় নি। কারণ তিনি নাটকের রসটি ফোটাতে পেরেছিলেন। কিন্তু তার পর থেকে এই শাপমোচন নৃত্যনাট্যটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ও সিংহলে বহুবার অভিনীত হয়েছে। রাজার ভূমিকায় তখন তাঁরা অভিনয় করেছিলেন সম্পূর্ণ দেশীধারার নৃত্য-পদ্ধতিতে। কিন্তু গুরুদেবের কাছে তাঁদের অভিনয়ও প্রশংসা পেয়েছে। তিনি যা চেয়েছিলেন, তা পেয়েছিলেন সেই নৃত্যপদ্ধতির ভিতর দিয়ে।

১৯৩১ সালে 'ঝুলন' নামে একটি কবিতার আবৃত্তির সঙ্গে প্রথম নাচ দেখালেন শ্রীমতী ঠাকুর। গুরুদেব স্বয়ং সে নাচের সঙ্গে আবৃত্তি করেন। নাচটি রচিত হয়েছিল ইয়োরোপের নতুন ধারার ইম্‌প্রেশনিস্ট নাচের পদ্ধতিতে। কবিতার আবৃত্তির সঙ্গে এই ধরনের নাচ বাংলাদেশে এই প্রথম হল। সকলেই এই নাচ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালে কলকাতার রঙ্গমঞ্চে 'ঝুলন' কবিতার আবৃত্তির সঙ্গে আর একবার নৃত্যাভিনয় হয়। সেবারেও গুরুদেব নিজে আবৃত্তি করেছিলেন। যে বাঙালি শিল্পী নেচেছিলেন, গুরুদেব বহুদিন ধরে তাঁর সঙ্গে আবৃত্তি করে তাঁকে তৈরি করে নিয়েছিলেন। সে নাচটি তৈরি হয়েছিল সিংহল দেশের ক্যান্ডী নাচের পদ্ধতিতে: সামান্য কিছু ভারতীয়, যথা মণিপুরী ও কথাকলি তাতে ছিল। গুরুদেব সে নাচে খুশিই হয়েছিলেন এইজন্যে যে, কবিতার ভাবের সঙ্গে নাচের সামঞ্জস্য ছিল।

১৯৩৮ সালে শ্যামা নৃত্যনাট্যে প্রথমবার কথক নৃত্যের পদ্ধতি প্রবেশ করল। আশা ওঝা নামে কথক নৃত্যে পটু একটি অবাঙালি ছাত্রী তখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। গুরুদেব তাঁর নাচ দেখে খুশি হন এবং গুরুদেবেরই ইচ্ছায় তাঁকে উত্তীয়ের ভূমিকায় অভিনয় করতে বলা হয়। ছাত্রীটি উত্তীয়ের চরিত্র কথক নৃত্য পদ্ধতিতে অভিনয়ের দ্বারা সকলকেই মুগ্ধ করেছিলেন। গুরুদেব স্বয়ং তাঁর নৃত্য ও অভিনয়ে

খুবই খুশি হয়েছিলেন। কথক নৃত্যে ঐ ধরনের উপযুক্ত শিল্পী শান্তিনিকেতনে তাঁর পরে আর কেউ ছিল না বলে এই নৃত্য পরে আর গুরুদেবের নৃত্যধারায় ব্যবহার করা গেল না।

চিত্রাঙ্গদা ১৯৩৬ সালে প্রথম যেবার অভিনীত হয়, তখন তাতে মণিপুরী পদ্ধতি ছিল প্রধান। তার সঙ্গে সামান্য কিছু কথাকলি ও লোকনৃত্য ভঙ্গি মেশানো ছিল। কিন্তু কথাকলির উপযুক্ত শিক্ষক পরে পাওয়া যাবার পর অর্জুনের অভিনয়ে কথাকলি নৃত্যপদ্ধতি বেশ খানিকটা প্রাধান্য পেল অন্যান্য নাচের সঙ্গে। অন্যান্য নারীচরিত্রের অনেকাংশে সেই পদ্ধতির প্রভাব বেশ খানিকটা বেড়ে গেল। এই-সব পরিবর্তন গুরুদেবের সম্মতিক্রমেই ঘটেছে বহুবার। এরকমের আরো অনেক নিদর্শন আছে কিন্তু তার উল্লেখের আর প্রয়োজন নেই। উপরের এই কয়টি ঘটনার থেকে এ কথাটি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, কোনো নাচের টেকনিকই গুরুদেবের নৃত্যনাট্যের পক্ষে অশোভন নয়, যদি সে নাচের মধ্যে ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা থাকে। এই হল গুরুদেবের মত। ছন্দোবদ্ধ নানা নৃত্যও তাতে স্থান পায়, কিন্তু তা ভাবানুযায়ী হওয়া চাই। শুধুই নৃত্যছন্দের পারদর্শিতা দেখাবার জন্যে ভাবের বিপরীত কোনো নৃত্যভঙ্গিই তাঁর নৃত্যনাট্যে স্থান পায় নি কখনো। অনেক সময় দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, ভাবহীন নৃত্যছন্দের পারদর্শিতা দেখাবার চেষ্টা অন্যান্য ক্লাসিক্যাল নাচের মতো গুরুদেবের নৃত্যনাট্যে থাকে না বলে অনেকেই সেটিকে গুরুদেবের নৃত্যনাট্যের একটি বড়ো অভাব বলে মনে করেন।

১৩৬৫

মন্ত্রগান

সুরের রাজ্যে বিচরণ-ক্ষমতা গুরুদেবের কিরকম সহজ ছিল, সংস্কৃত মন্ত্র বা বৈদিক মন্ত্রে সুরযোজনা করে তিনি তার আর-একটি প্রমাণ দিয়েছেন। সংস্কৃত মন্ত্র কাশীর পণ্ডিতরা যেভাবে আবৃত্তি করেন তা অনেকেই শুনে থাকবেন। গুরুদেব নিজেও আবৃত্তিকালে সেই প্রথাই অবলম্বন করতেন। এই আবৃত্তি কেবল তিনটি সুরের উপর যাতায়াত করে। এই সুরকে কোনো রাগিণীতে ফেলা যায় না। কথকতার সময় কথকরা সংস্কৃত-মন্ত্র সুরে আওড়ান, তারও পরিধি অল্প। বড়ো হিন্দুস্থানী গাইয়েদের মুখে ধ্রুপদের রাগিণী ও তালে সংস্কৃত-মন্ত্র গাইতে শুনেছি। কীর্তনেও এ ধারা লক্ষ্য করি। সামবেদের প্রাচীন প্রথায় মন্ত্রগানের নিয়ম দক্ষিণ-ভারতে এখনো চলিত আছে।

গুরুদেব সামাজিক উপাসনায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই প্রথমে নিম্নলিখিত কয়েকটি বেদমন্ত্রে সুরযোজনা করেছিলেন; পূর্বে তাঁর পিতা ও অপরেও মন্ত্রকে গানে রূপ দিয়েছিলেন—

'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং', 'যদেমি প্রস্ফুরন্নিব ধৃতির্নধ্মাতো', 'য আত্মদা বলদা যস্যাবিশ্ব', 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ', 'সংগচ্ছধ্বম্ সংবদধ্বম্' ও 'উষো বাজেণ বাজিনি প্রচেতা'।

এই মন্ত্রের প্রথম পাঁচটিতে গুরুদেব ইমন-ভূপালী মেশানো রাগিণী বসিয়ে-ছিলেন, শেষটিতে ভৈরবী। কিন্তু গানের মতো তালে এদের বেঁধে এদের গতির স্বাধীনতা খর্ব করেন নি। এই-সব মন্ত্রের হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের নিয়ম মেনে নিয়ে, মন্ত্রপাঠকালে যে ছন্দ উৎপন্ন হয়, সেই ছন্দের সঙ্গে রাগিণী মিশিয়েছেন। শুনতে কতকটা হিন্দীগানের আলাপের মতো হয়তো লাগবে। কিন্তু সুরের গঠনের মধ্যে বিদেশী চার্চ-সংগীতের প্রভাব খুবই অনুভব করা যায়।

এর পরে 'নটীর পূজা' ও 'চণ্ডালিকা' নাটকের জন্য পাঁচটি মন্ত্র তিনি সুরে বাঁধেন—

ভৈরবী

ওঁ নমো বুদ্ধায় গুরবে
নমো ধর্মায় তারিণে
নমঃ সংঘায় মহত্তমায় নম।

বেহাগ

নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়
নমো নমো গোতম চন্দিমায়
নমো নমো নন্ত গুণন্নবায়
নমো নমো সাকিয় নন্দনায়।

কাফি

উত্তমঙ্গেন বন্দেহং পাদপংসু-বরুত্তমং
বুদ্ধে যো খলিতো দোসো বুদ্ধো খমতু তং মম ॥

মিশ্র রামকেলি

নত্থিমে সরণং অঞ্ঞং বুদ্ধো মে সরণং বরং
এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে জয় মঙ্গলং ॥

মিশ্র রামকেলি

বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণা মহান্নবো
যো চন্ত সুদ্ধব্বরঞ্ঞান লোচনো
লোকসস্ পাপুপকিলেস ঘাতকো
বন্দামি বুদ্ধম্ অহমাদরেণ তং ॥

এই মন্ত্রগুলিতে যেভাবে সুরযোজনা করা হয়েছে তাতে পূর্বোক্ত মন্ত্রগুলির মতো ধীর গাম্ভীর্য নেই, এতে ফুটে উঠেছে আবেগময় কোমল করুণতা। বুদ্ধের বন্দনাগান হিসেবে মন্ত্রগুলি অতিশয় প্রাণস্পর্শী হয়েছে। তিনি শেষবার সংস্কৃত-মন্ত্রে সুরযোজনা করেছিলেন, বেদের বিখ্যাত উষার স্তবটিতে। এ গানটির বিষয় অন্যত্র লিখেছি।

প্রথমে যে বৈদিক মন্ত্রগুলির উল্লেখ করেছি, সেগুলি কলকাতার সকল ব্রাহ্ম সমাজেই বিশেষ প্রচলিত—কোথাও গানের সুরে, আবার কোথাও সাধারণ মন্ত্রের মতো পাঠ হয়। সুরে গাইবার সময় গায়ক প্রায়ই সাধারণ গানের তালে এতে ছন্দ ফুটিয়ে তোলেন। গুরুদেব নিজে এই পদ্ধতি অনুমোদন করতেন না। তিনি শান্তিনিকেতনে কখনো বৈদিক মন্ত্র বা পালিমন্ত্র এভাবে গাওয়ান নি। তিনি মনে করতেন মন্ত্রের নিজস্ব ছন্দের যে গতি আছে, তাকে নষ্ট করে মন্ত্রপাঠ করলে বা গাইলে তাকে প্রাণহীন করে ফেলা হয়।

শেষজীবনে গুরুদেবের ইচ্ছা ছিল, কালিদাসের শকুন্তলাকে নৃত্যনাট্যে পরিণত করবেন এবং যথাসম্ভব সংস্কৃত শ্লোকগুলি রেখে তাতে সুরযোজনা করবেন, যেভাবে 'চণ্ডালিকা'র গান রচনা করেছেন। অসুস্থতার জন্য তাঁর ইচ্ছা অসম্পূর্ণই রয়ে গেছে। আজ মনে হয়, যদি সে রচনা শেষ করে যেতে পারতেন তবে হয়তো আমরা ভারতীয় সংগীতজগতে আর-একটা অতি দুঃসাহসিক পরীক্ষার পরিচয় পেতাম।

কয়েকটি তথ্য

গুরুদেবের রচনা ও জীবন সম্বন্ধে, তাঁর দিনচর্যা সম্বন্ধে সামান্য তথ্য জানতেও দেশবাসীর কৌতূহলের সীমা নেই। তাঁর গানরচনা সম্বন্ধেও বহু লোকের এইরূপ কৌতূহলের পরিচয় পেয়েছি। কোন্ গান কী ভেবে কোন্ উপলক্ষে রচিত হয়েছে. এ-সম্বন্ধে অনেকেই জানতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেন।

কোন্ গান তিনি কী ভেবে লিখেছেন, এই প্রশ্নের উত্তর সব গানের বেলা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কাব্যসৃষ্টির গভীর উৎস কোথায় তাও এই আলোচনার বহির্ভূত। তবে তাঁর অনেক গান কোনো ঘটনাকে উপলক্ষ করে রচিত; অনেক গান অভিনয়ের প্রয়োজনে লেখা: সে বিবরণও রবীন্দ্র-সংগীতানুরাগীদের পক্ষে কৌতূহলোদ্দীপক হতে পারে।

'নটরাজ' গীতাভিনয়ে অর্ধেকের বেশি গান তিনি রচনা করেছেন গীতাভিনয়ের প্রয়োজনে, প্রত্যেক ঋতুর রূপ অভিনয়ে ফুটিয়ে তোলবার ইচ্ছায়। একদিনে পাঁচ-ছয়টি গানও রচনা করেছেন অভিনয়ের তাড়ায়। নাচের মহড়া দিতে গিয়ে হয়তো মনে হয়েছে দুটো নাচের মাঝখানে একটু অবসর দরকার, তখনি ছোটো একটি গান লিখে দিলেন। 'নটরাজে'র সব নমস্কারের গান প্রায় ঐজন্যে তৈরি। 'নবীন' নাটকের অনেক গানও এইভাবে রচনা। নৃত্যনাট্যেও দেখেছি অভিনয়ের জন্যে বা নাচের সুবিধার জন্যে তিনি অনেক গান রচনা করেছেন। বর্ষামঙ্গল বা বসন্তোৎসবে তাঁকে জানানো হয়েছে যে. আমাদের কী রকমের গান প্রয়োজন, অমনি তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়ে গান রচনা করে দিয়েছেন; বহু নাটকের বেলায়ও তাই ঘটেছে। তবে সাময়িক প্রয়োজনে গানরচনায় হাত দিলেও গানগুলি তাকে অতিক্রম করে সর্বকালের উপযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছে। গানের পিছনে যে ইতিহাস আছে, তা না জেনেও পরবর্তী যুগের শ্রোতাদের কাছে সে গান সময়ের অনুপযোগী মনে হবে না। এইরূপ কয়েকটি গান রচনার ইতিহাস এখানে লিপিবদ্ধ করা গেল—

১৩৩৬ সালে যখন যতীন দাস লাহোর জেলে অনশন ব্রত অবলম্বন করেন, সে কথা সকলেরই স্মরণ আছে: তাঁর মৃত্যুপণের সংকল্প ভারতবাসীর চিত্তে খুব আলোড়ন এনেছিল। সেই বেদনাদায়ক আবহাওয়ার মধ্যে 'তপতী' লেখা হয়। আশ্রমবাসীদের নিয়ে গুরুদেব তার মহড়া দিচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত যতীন দাসের মৃত্যু হল। সেই সংবাদ যখন শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছল, সেইদিন গুরুদেব মনে যে বেদনা পেয়েছিলেন তা ভুলবার নয়। সন্ধ্যায় 'তপতী' অভিনয়ের মহড়া বন্ধ না রাখার কথা হল। কিন্তু বার বার তিনি তাঁর পাঠের খেই হারাতে লাগলেন, বহু বার চেষ্টা করেও কিছুতেই ঠিক রাখতে পারছিলেন না, অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন। শেষ পর্যন্ত মহড়া বন্ধ করে দিলেন। সেই রাত্রেই লিখলেন 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ' গানটি। 'তপতী' নাটকে এটিকে পরে জুড়ে দিলেন। এ গানটি যে তাঁর অন্তরের কী তীব্র বেদনার প্রকাশ. আজ সে কথা হয়তো অনেকেই জানেন না: জানা থাকলে এ গানটি সকলের কাছে আরো সত্য হয়ে উঠবে।

১৩২৯ সালে কলকাতায় বিশ্বভারতীর তরফ থেকে 'বর্ষামঙ্গলে'র আয়োজন

উপলক্ষে অনেক নতুন বর্ষার গান রচিত হয়েছিল। আমরা সব গানের দল কলকাতায় কিছুদিন পূর্বেই জড়ো হয়েছি। খুব জোর মহড়া চলেছিল, জোড়াসাঁকোর বাড়ি সরগরম হয়ে উঠেছিল। এর মধ্যে একদিন হঠাৎ ঠান্ডায় গুরুদেবের গলা গেল বসে বর্ষামঙ্গলে তাঁর আবৃত্তি ইত্যাদি ছিল প্রধান আকর্ষণ, ভাঙা গলা নিয়ে মহা ভাবনায় পড়লেন—নানাপ্রকার ওষুধ পাঁচন নিজে খাচ্ছেন, আমাদেরও খাওয়াচ্ছেন, আমাদেরও গলা যাতে না ভাঙে। সেই ভাঙা গলায় একটি গান রচনা করে দিনেন্দ্রনাথ ও আমাদের সকলকে ডেকে শিখিয়ে দিলেন সন্ধ্যায় গাইবার জন্য। গানটি হল 'আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে।'

এই বছরের প্রথমদিকে শান্তিনিকেতনে নলকূপের সাহায্যে জল সরবরাহের ইচ্ছায় একটি নলকূপ-খননের কাজ শুরু হয়। সেই কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার ইচ্ছায় অধিক রাত পর্যন্ত তার কাজ চলত। অনেক সময় দেখেছি গ্রীষ্মের ছুটিতে শান্তি-নিকেতনের অনেক অধ্যাপক মহাশয়েরা এই কূপখননের কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, দিনের পর দিন তাঁরা কুলীদের জলে কাদায় কাজে সাহায্য করছেন। গুরুদেব প্রায়ই সেইখানে উপস্থিত থাকতেন, তাতে সকলেই প্রেরণা পেতেন। এই উৎসাহকে আরো বর্ধিত করার জন্য ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ 'এসো এসো হে তৃষ্ণার জল' গানটি তিনি রচনা করলেন।

দ্বিতীয়বার যখন নলকূপের জল সরবরাহের ব্যবস্থা সফল হল, সে সময় কাজের দায়িত্ব যে বাঙালি ব্যবসায়ীটি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁকে অভিনন্দিত করবার ব্যবস্থা হয়। সেই সভায় প্রায় দু-ঘণ্টা পূর্বে নলকূপের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে গুরুদেব গান বেঁধে দিলেন 'হে আকাশবিহারী নীরদবাহন জল'।

১৯৩৭ সালে গুরুদেব শেষবার কলকাতায় 'বর্ষামঙ্গলে'র অনুষ্ঠান করেন। সেবার শান্তিনিকেতনে অনেকগুলি বর্ষার গান রচিত হয়। শান্তিনিকেতনের বর্ষা মঙ্গল অনুষ্ঠান সুন্দর হওয়ায় অনেকে গুরুদেবকে অনুরোধ করেন কলকাতায় বর্ষামঙ্গলের আয়োজন করতে। গুরুদেব সম্মত হয়ে আমাকে শান্তিনিকেতনের মহড়ার কাজ চালিয়ে যাবার দায়িত্ব দিয়ে নিজে কলকাতায় চলে গেলেন কোনো কাজে এবং সেখানে একদল গায়িকাকে সংগ্রহ করে তাঁদেরও গান শেখাতে লাগলেন। সেখানকার মেয়েদের গলা ছিল মিষ্টি, কিন্তু তাঁদের কণ্ঠস্বর ছিল ক্ষীণ তাই প্রথম রাত্রিতে একক কণ্ঠের গান প্রেক্ষাগৃহের শেষ অবধি পৌঁছল না। এই কারণে গুরুদেব বিষণ্ন হয়ে পড়েন। রাত্রে বাড়ি ফিরে বললেন, "এত খাটুনি সব ব্যর্থ হল"। তার পরের কথাবার্তায় মনে হল তাঁর মনে ধারণা হয়েছে যে, এবারের গানগুলি রচনার দিক থেকে তেমন ভালো হয় নি, তাই শ্রোতারা তেমন উপভোগ করতে পারল না। গানের দোষে নয়, গাইয়েদের দোষে এমন হয়েছে এ কথা বোঝানোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও বলতে লাগলেন, "ঢিমা লয়ের টানা টানা সুরের গানই রচনা করেছি বেশি, জোরাল গান দরকার"। সেই রাত্রেই একটি গান রচনা করে সকলকে ডেকে একসঙ্গে শিখিয়ে তবে বিশ্রাম করতে গেলেন। গানটির প্রথম লাইন হল, 'থামাও রিমিকি-ঝিমিকি বরিষন, ঝিল্লিঝনক-ঝন-নন'। গানটির ভিতর দিয়ে তাঁর তখনকার মনের অবস্থাটা বেশ পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে।

'মরণসাগর পারে তোমরা অমর' গানটি সাধারণভাবে সব মহাপুরুষদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হলেও এটি রচিত হয় গুরুদেবের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যু উপলক্ষে। এই গানটির কথা মনে না করতে পারলে তিনি "দাদার মৃত্যুর পর লেখা গানটি" বলতেন। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা যেতে পারে 'কে যায় অমৃতধামযাত্রী' ধর্মসংগীতটি রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিবসের কথা ভেবে লিখেছিলেন বহুদিন পূর্বে।

অনেকেরই ধারণা 'ফাল্গুনী' নাটকের সব গানগুলি নাটকের কথা মনে করেই লিখেছিলেন, কিন্তু তা ঠিক নয়। সেই ফাল্গুনমাসে ট্রেনে কোথাও গিয়েছিলেন, ট্রেনের সেই দ্রুত গতি তাঁর মনে একটা বিশেষ আবেগের সৃষ্টি করে, সেই আবেগ থেকেই পেলাম দুটি গান—প্রথমটি হল 'চলি গো চলি গো যাই গো চলে', দ্বিতীয়টি হল 'ওগো নদী, আপন বেগে পাগল-পারা'। অথচ ফাল্গুনীতে এই গান-দুটি যেভাবে স্থান পেয়েছে তাতে এ কথা ধরাই যাবে না।

১৩২৯ সালে গুরুদেব সিন্ধু কাথিয়াবাড় ভ্রমণ শেষ করে যখন শান্তিনিকেতনে ফিরলেন, তখন সঙ্গে করে এনেছিলেন কাথিয়াবাড়ের একটি চাষী পরিবারকে। তাদের একটি বারো-তেরো বৎসরের মেয়ে দুই হাতে দুই জোড়া মন্দিরা নিয়ে খুব সুন্দর নাচত। তাঁর ইচ্ছা, সেই নাচটি শান্তিনিকেতনের মেয়েদের মধ্যে প্রচার করা। আশ্রমবাসী সকলকে দেখাবার জন্যে চৈত্রমাসের শেষে আম্রকুঞ্জে মেয়েটির নাচের আসর বসে। এই নাচ দেখার পর গুরুদেব লিখেছিলেন 'কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে' গানটি।

প্রায় ষোল বৎসর পূর্বে, তখন শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা নন্দিনী অতি শিশু, গুরুদেবের কাছে সে নানা প্রকার গল্প শুনতে ভালোবাসত এবং নিজেও আপন মনে শিশুসুলভ নানা কথা গুরুদেবকে শোনাত। গুরুদেবের কাছে সব সময় সব কথা স্পষ্ট হত না, কিন্তু খুব উপভোগ করতেন তার সেই বাক্যালাপ। সেই সময় তার কথা ভেবেই গান লিখেছিলেন, 'অনেক কথা যাও যে বলে কোনো কথা না বলি, তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি'।

'তুমি উষার সোনার বিন্দু প্রাণের সিন্ধুকূলে' গানটিও নন্দিনীর কথা মনে করে রচনা করেছিলেন।

১৩৩৩ সালে, প্রবাসী পত্রিকার পঁচিশ বৎসর পূর্তিতে আশীর্বাদস্বরূপ গুরু-দেব একটি বড়ো কবিতা লিখেছিলেন—'পরবাসী, চলে এসো ঘরে, অনুকূল সমীরণ-ভরে'। এই কবিতার প্রথম অংশ ও মধ্যের অংশটিকে আলাদা করে নিয়ে, কিছু কথার অদলবদল করে দুটি গান তৈরি করেন। প্রথম গানটি হল ইমন-কল্যাণ রাগে, 'পরবাসী চলে এসো ঘরে', আর দ্বিতীয় অংশটিতে সুরযোজনা করলেন মিশ্র রাম-কেলীতে, তার প্রথম লাইন হল, 'এসো এসো এসো প্রাণের উৎসবে, দক্ষিণবায়ুর বেণুরবে'।

১৩২৪ সালে দিনেন্দ্রনাথের একটি পোষা হরিণ হঠাৎ শান্তিনিকেতন থেকে পালিয়ে যায়, পরে দূরবর্তী এক গ্রামে সাঁওতালরা তাকে মেরে ফেলে। এই সংবাদে দিনেন্দ্রনাথের পত্নী শ্রীযুক্তা কমলাদেবী অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েন। এই সময় তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য 'সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে' গানটি রচনা করেন।

জানা যায়, বুদ্ধগয়া-ভ্রমণে গিয়ে সেখানে একদিন প্রাতঃকালে 'এদিন আজি কোন্ ঘরে গো খুলে দিল দ্বার' গানটি লিখেছিলেন। হয়তো সে সময়ে ভগবান বুদ্ধের কথাই মনে ভেবেছিলেন।

চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার মহাশয়ের একটি ছবি দেখে গুরুদেব গান বেঁধেছিলেন, 'একলা বসে একে একে অন্যমনে' এবং তাঁর 'অগ্নিবীণা'-কোলে সরস্বতীর ছবি উপলক্ষ করে 'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে' গানটির উদ্ভব।

'নিভৃতপ্রাণের দেবতা' গানটি শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু মহাশয়ের একটি ছবি দেখে লেখা।

ব্যক্তিগত অনুভূতি কিভাবে তাঁর রচনায় নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠে গান ছাড়া কাব্য ও নাটকেও তার বহু উদাহরণ মেলে, এইরকম একটি উদাহরণ তাঁর একটি নাটকের আলোচনাপ্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করছি এই ভেবে যে, বিষয়টা অনেকের কাছেই নতুন ঠেকবে। নাটকটি হল 'ডাকঘর'। এর রচনার উৎস কোথায় তা আলোচনার যোগ্য। ১৩৪৬ সালে তিনি একবার তিন-চার মাস ধরে এই নাটকের মহড়া দিয়েছিলেন, সেই সময় অধুনা বিখ্যাত 'সমুখে শান্তি-পারাবার' গানটি রচিত হয়। সেই সময় একদিন বলেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর তো আর বেশি দেরি নেই, এটি যদিও অমলের মৃত্যুর গান কিন্তু এ গানটি তাঁরও মৃত্যুতে আমরা কাজে লাগাতে পারব।

বস্তুত পুরো 'ডাকঘর' নাটকটিই তাঁর নিজের মৃত্যুকল্পনা অবলম্বন করে লেখা। ১৩২২ সালের পৌষমাসে গুরুদেব আশ্রমবাসী সকলের কাছে তাঁর নাটকের বিষয়ে ধারাবাহিক কতগুলি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ৪ পৌষের বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ডাকঘর'। সেই বক্তৃতাগুলি তখন আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ মহাশয় তাঁর দিনলিপি পুস্তকে লিখে রেখেছিলেন, এখানে তার থেকে খানিকটা উদ্ধৃত করি। গুরুদেব বলেছিলেন—

"'ডাকঘর' যখন লিখি তখন হঠাৎ আমার অন্তরের মধ্যে আবেগের তরঙ্গ জেগে উঠেছিল। তোমাদের ঋতু-উৎসবের জন্য লিখি নি। শান্তিনিকেতনের ছাদের উপর মাদুর পেতে পড়ে থাকতুম। প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে। চল চল বাইরে, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে হবে—সেখানকার মানুষের সুখ-দুঃখের উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেতে হবে। সে সময় বিদ্যালয়ের কাজে বেশ ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কি হল। রাত দুটো-তিনটের সময় অন্ধকার ছাদে এসে মনটা পাখা বিস্তার করল। যাই যাই এমন একটা বেদনা মনে জেগে উঠল। পূর্বে আমার দু'একটি বেদনা এসেছিল। আমার মনে হচ্ছিল একটা কিছু ঘটবে, হয়ত মৃত্যু। স্টেশনে যেন তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠতে হবে সেই রকমের একটা আনন্দ আমার মনে জাগছিল। যেন এখান হতে যাচ্ছি। বেঁচে গেলুম। এমন করে যখন ডাকছেন তখন আমার দায় নেই। কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয় মিলে, খুব একটা আবেগে সেই চঞ্চলতাকে ভাষাতে 'ডাকঘরে' কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম। মনের আবেগকে একটা বাণীতে বলার দ্বারা প্রকাশ করতে হল। মনের মধ্যে যা অব্যক্ত অথচ চঞ্চল

তাকে কোনো রূপ দিতে পারলে শান্তি আসে। ভিতরের প্রেরণায় লিখলুম। এর মধ্যে গল্প নেই। এ গদ্য-লিরিক। আলংকারিদের মতানুযায়ী নাটক নয়, আখ্যায়িকা। এটা বস্তুত কি? এটা সেই সময়ে আমার মনের ভিতর যে অকারণ চাঞ্চল্য দূরের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, দূরের যাত্রায় যিনি দূরে থেকে ডাকছিলেন, তাঁকে দৌড়ে গিয়ে ধরবার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা। সেই দূরে যাওয়ার মধ্যে রমণীয়তা আছে। যাওয়ার মধ্যে একটা বেদনা আছে, কিন্তু আমার মনের মধ্যে বিচ্ছেদের বেদনা ততটা ছিল না। চলে যাওয়ার মধ্যে যে বিচিত্র আনন্দ তা আমাকে ডাক দিয়েছিল—বহুদূরে সে অজানা রয়েছে, তার পরিচয়ের ভিতর দিয়ে সে অজানার ডাক, দূর সেখানে মুগ্ধ করেছে, যাত্রা সেখানে রমণীয় বহু বিস্মৃতি অপরিচিতের মধ্যে যে আনন্দ। সেই যখন অন্তরালে বাঁশি বাজিয়ে ডাক দিল সে ভাবটি প্রকাশ করলুম। থাকব না থাকব না, যাব যাব, সবাই আনন্দে যাচ্ছে। সবাই ডাকতে ডাকতে যাচ্ছে আর আমি কিনা বসে রইলুম। এই দুঃখকে ব্যাকুলতাকে ব্যক্ত করতে হবে। এই ভাব যদি কারুর সম্পূর্ণ অপরিচিত হয় তবে হেঁয়ালি বলতে পারো। এই বেদনা যদি কারো মধ্যে থাকে তবে সে বুঝতে পারবে এর মর্মটা কী।"

এ-লোক থেকে সুদূরে এক অপরিচিত লোকে যাবার প্রেরণাই তাঁকে শেষ-জীবনে আবার 'ডাকঘর' অভিনয়ে উৎসাহ জোগায়।

'ডাকঘরে'র উৎস কোথায় তা শ্রীযুক্তা নির্ঝরিণী সরকারকে লেখা একটি চিঠি পড়েও জানা যায়। চিঠিটা এই নাটক রচনার সমসাময়িক, ১৩১৮ সনের ২২ আশ্বিন তারিখে লেখা—

"মা, আমি দূরদেশে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আমার সেখানে অন্য কোনো প্রয়োজন নাই, কেবল কিছু দিন থেকে আমার মন এই বলচে যে, যে পৃথিবীতে জন্মেছি সেই পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে নিয়ে তবে তার কাছ থেকে বিদায় নেব। এর পরে আর ত সময় হবে না। সমস্ত পৃথিবীর নদী গিরি সমুদ্র এবং লোকালয় আমাকে ডাক দিচ্ছে—আমার চারিদিকে ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্য মন উৎসুক হয়ে পড়েছে। যেখানে দীর্ঘকাল থেকে কাজ করি সেখানে আমাদের কর্ম ও সংস্কারের আবর্জনা দিনে দিনে জমে উঠে চারিদিকে একটা বেড়া তৈরি করে তোলে। আমরা চিরজীবন আমাদের নিজের সেই বেড়ার মধ্যেই থাকি, জগতের মধ্যে থাকি নে। অন্তত মাঝে মাঝে সেই বেড়া ভেঙে বৃহৎ জগৎটাকে দেখে এলে বুঝতে পারি আমাদের জন্মভূমিটি কত বড়ো—বুঝতে পারি জেলখানাতেই আমাদের জন্ম নয়। তাই আমার সকলের চেয়ে বড়ো যাত্রার পূর্বে এই ছোটো যাত্রা দিয়ে তার ভূমিকা করতে চাচ্ছি—এখন থেকে একটি একটি করে বেড়ি ভাঙতে হবে, তারই আয়োজন।"

এই ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ বাইরে লেখার ভিতর দিয়ে এমনভাবে রূপ নিল যে, তখন আর গুরুদেবের সঙ্গে এর কোনো ব্যক্তিগত যোগ ধরবার উপায় রইল না।

এখানে বলে রাখা যেতে পারে 'কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস' গানটি তাঁর পিতার মৃত্যু উপলক্ষে লেখা এবং 'কেন রে এই দুয়ারটুকু

পার হতে সংশয়' গানটি তাঁর বড়ো মেয়ের মৃত্যুর সময় লেখা, ১৩২৫ সনে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর 'আছে দুঃখ আছে মৃত্যু' গানটি লিখেছিলেন বলে অনেকের বিশ্বাস।

১৩২৯ সনে শান্তিনিকেতনে বর্তমান শ্রীভবনের গোড়াপত্তন হয়, তখন ছাত্রীদের দিয়ে 'গার্ল গাইড' তৈরি করবার ইচ্ছায় কলকাতা থেকে একজন ইংরেজ মহিলাকে আনানো হয়েছিল, তিনি একটি গার্ল গাইড দল তৈরি করে দিয়ে যান। এই দলের জন্যে গানের প্রয়োজন হল, 'অগ্নিশিখা, এসো এসো' গানটি লিখে তাদের প্রয়োজন মেটালেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে গার্ল গাইডের বাংলা নামকরণ প্রথমে করে-ছিলেন 'গৃহদীপ', পরে বদলে করেন 'সহায়িকা'। সেই দল কিছুদিন পরে ভেঙে যায়। আজকাল গানটি শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসবে প্রদর্শনীর উদ্বোধনে প্রদীপ জ্বালানোর সময় গাওয়া হয়ে থাকে। ১৩৩২ সাল থেকে এটি 'গৃহপ্রবেশ' নাটকের গান হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৩৩৭ সালে গুরুদেব জাপানী যুযুৎসু-পালোয়ান টাকাগাকীকে শান্তি-নিকেতনে আনিয়ে যুযুৎসুশিক্ষার প্রবর্তন করেন। এ বিষয়ে দেশবাসীকে উৎসাহিত করবার জন্যে নানা স্থানে প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করিয়েছিলেন। এই-সব প্রদর্শনীরই উদ্বোধন-সংগীতরূপে রচিত হয় 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান'; গানটি প্রথম গাওয়া হয় ১৩৩৮ সালে কলকাতার 'নিউ এম্পায়ার' রঙ্গমঞ্চে। এখন এটি 'চিত্রাঙ্গদা'র গান বা জাতীয়-সংগীতের দলে স্থান পেয়েছে।

১৩৩১ সালে দোলপূর্ণিমায় শান্তিনিকেতনে বরাবরকার মতো উৎসব করবার কথা ছিল; গুরুদেব এই উপলক্ষে প্রায় দশ-এগারটি নতুন গান রচনা করেছিলেন এবং 'সুন্দর' নাম দিয়ে নৃত্যাভিনয় সম্পন্ন হবে এই রকম ঠিক ছিল। সেদিন বিকেলে যখন আয়োজন প্রায় সব শেষ, তখন এল তুমুল ঝড়-বৃষ্টি; শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর মহাশয় কর্তৃক বিচিত্র সাজে সজ্জিত আম্রকুঞ্জ একেবারে ওলটপালট হয়ে গেল। সেই ঝড়ের সময় লিখলেন 'রুদ্রবেশে কেমন খেলা, কালো মেঘের ভ্রূকুটি' গানটি। অনেক রাত্রে বর্তমান পুস্তকাগারের উপরতলার লম্বা ঘরে গানের মজলিস হল বৃষ্টির পরে। সেখানে গুরুদেব এই নতুন গানটি একলা গেয়ে-ছিলেন। সেই বৎসরে চৈত্রসংক্রান্তির দিনে 'সুন্দর' আড়ম্বরের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য রচিত 'আমাদের শান্তিনিকেতন' গানটির মতো, শ্রীনিকেতনের গোড়াপত্তনের সময় কর্মী ও ছাত্রদের একত্রে গাইবার উপযুক্ত গানের প্রয়োজনে 'ফিরে চল মাটির টানে' গানটি গুরুদেব রচনা করেন। গানটির রচনার তারিখ ২৩ ফাল্গুন ১৩২৮।

শান্তিনিকেতনের জনৈক প্রাক্তন ছাত্রের দ্বারা বর্ণিত আরো দুটি গানের কথা এখানে তুলে দিচ্ছি—"মনে পড়ে বসন্তোৎসবের কথা (১৩২৮)। দিনুবাবুর বাড়িতে সকালবেলা মহড়া চলেছে। এমন সময় এলেন মঞ্জুশ্রী দেবী [সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা]। কবি তাঁকে দেখেই বলে উঠলেন, 'দিনু, এই যে আমের মঞ্জরী এসেছে; তাহলে আমের বোলের গানটা মঞ্জুই গাইবে, কি বলিস্?' উত্তরে দিনুবাবু বললেন, 'তা আমাদের পালায় ত আমের মঞ্জরী নেই।' সহসা কবির ভুল ভাঙলো, বললেন, 'তা কি আর হয়েছে, নাতনীর সঙ্গে নয় একটু পরিহাস করলুম।' কিন্তু এই নেহাত

ব্যক্তিগত পরিহাসকে কেন্দ্র করেই কবি বিকেলবেলা লিখে নিয়ে এলেন—'ও মঞ্জরী, ও মঞ্জরী, আমের মঞ্জরী।'

"নন-কোঅপারেশনের পরের কথা। কলকাতায় খুব ধরপাকড় চলেছে। আশ্রমে খবর এল বাসন্তী দেবীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অনুরূপ দুর্দৈবে কবি চিরকালই অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করতেন।...একখানি বেনামী চিঠি এল কবির নামে, তাতে লেখা আছে—'দেশে আগুন লেগেছে, আর আপনি গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন?'—আমাদের তখন গানের ক্লাস চলছিল। সংগীত-অধ্যাপক (প্রাক্তন) পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রীকে কবি এসে বললেন, 'পণ্ডিতজী, এই দেখুন, আমার নামে অভিযোগ এসেছে আমি গান গাই কেন? তা আমার ত আর কোনো গুণ নেই'...তাঁর সেই আক্ষেপই পরে মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর অননুকরণীয় ভাষায়—

'সময় কারো যে নাই, ওরা চলে দলে দলে
গান হায় ডুবে যায় কোন্ কোলাহলে।'"

১৩২৮ বঙ্গাব্দের, ১৮ কার্তিকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি তখনকার ঐ মনোভাবের পরিচয় দিয়ে লিখেছেন—"আমাকে জানিয়েচে দেশে যখন আগুন লেগেছে তখন বর্ষামঙ্গলের গান করা অকর্তব্য এবং যে মেয়েরা সেদিন গানের সভায় সেজে এসেছিল তারা এই অগ্নিকাণ্ডে আহুতি দিয়েছে।"

'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল আজ হে' গানটি অনেকেরই পরিচিত। এর প্রথম রূপটি 'বেঙ্গল ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনে' বরোদারাজ গায়কোবাড়ের অভ্যর্থনার উপলক্ষে রচিত হয়েছিল, সেটি উদ্ধৃত হল—

রাগিণী ভূপালি - তাল তেওড়া[1]
বঙ্গজননী-মন্দিরাঙ্গন মঙ্গলোজ্জ্বল আজ হে!
জয় বরোদারাজ হে!
শঙ্খ, বাজহ, বাজ হে—
জয় নৃপোত্তম পুরুষসত্তম
জয় বরোদারাজ হে।
ভাষিছে শুন বঙ্গবাণী
রাজদর্শন পুণ্য মানি—
এস হে, নৃপ, এস হে,
ধন্য কর এ দেশ হে!
এস মঙ্গল, এস গৌরব,
এস অক্ষয়কীর্তিসৌরভ,
এস তেজঃ সূর্য উজ্জ্বল
নাশ ভারত লাজ হে!

---

১ সর্বত্র দীর্ঘহ্রস্ব রক্ষা করিয়া পড়িতে হইবে।

রাজধর্মে পুণ্য কর্মে
লোকহৃদয়ে রাজ' হে!
শঙ্খ, বাজহ, বাজ হে—
জয় নৃপোত্তম পুরুষসত্তম
জয় বরোদারাজ হে![২]

বসু বিজ্ঞানমন্দিরের উদ্বোধন-উৎসব উপলক্ষে গীত হয় এই গানের রূপান্তর 'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন'; এটি সুপরিচিত বলে উদ্ধৃত করলাম না। বিখ্যাত ইতালীয় পণ্ডিত কার্লো ফরমিকি যখন শান্তিনিকেতনের অতিথি হয়ে এলেন, তখন তাঁকে আম্রকাননে অভ্যর্থনা করা হল। গানটি তখন দাঁড়াল—

শান্তিমন্দির পুণ্য অঙ্গন
হোক সুমঙ্গল আজ হে
প্রিয় সুহৃৎপ্রবর বিরাজ হে
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে।
চির সমুৎসুক তব প্রতীক্ষা সফল কর, লহ প্রেমদীক্ষা,
মাল্যচন্দনে সাজ হে, শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে।
জয় জয় বুধোত্তম অতিথিসত্তম
জ্ঞানতাপসরাজ হে ॥ জয় হে।
এস আম্রনিকুঞ্জভবনে
শিশিরসিঞ্চিত স্নিগ্ধ পবনে,
হউক সুন্দর শুভ আতিথ্য,
হোক প্রসন্ন তোমার চিত্ত,
তব সমাগম পুলক দীপ্ত
আজি বন্ধুসমাজ হে।

১৩৪৭ সালের আগস্ট মাসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গুরুদেবকে উপাধি-দান-অনুষ্ঠানে শান্তিনিকেতনে সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীকে সম্বর্ধনা করবার জন্য গানটি আর-একবার পরিবর্তিত হল—

বিশ্ববিদ্যাতীর্থ-প্রাঙ্গণ করো মহোজ্জ্বল আজ হে
বরপুত্রসংঘ বিরাজ হে।

২ এই গানটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে আমার এক বন্ধু জানান যে, গানটি ১৩১১ সালের অগ্রহায়ণ মাসের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল। বঙ্গদর্শন থেকে গানটি এখানে উদ্ধৃত হল; গানটির পাঠ, সুর, রচনার উপলক্ষ ও কবিতা-হিসাবে পাঠের রীতিসম্বন্ধে নির্দেশ বঙ্গদর্শনে যেরূপ দেওয়া আছে তাই মুদ্রিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম সম্প্রতি এই গানটির একটি প্রতিলিপি আমাকে পাঠিয়েছেন; তাতে 'এস মঙ্গল' স্থানে 'এস বিক্রম' এবং 'রাজধর্মে'র পরিবর্তে 'জ্ঞানধর্মে' পাঠ আছে।

ঘন তিমিররাত্রির চিরপ্রতীক্ষা
পূর্ণ করো, লহ জ্যোতিদীক্ষা
যাত্রীদল সব সাজ হে।
এসো কর্মী এসো জ্ঞানী এসো জনকল্যাণধ্যানী
এসো তাপসরাজ হে।
এসো হে ধীশক্তি সম্পদ মুক্ত বন্ধ সমাজ হে।

'সাত ভাই চম্পা' নাম দিয়ে গগনেন্দ্রনাথের ছবিকে অবলম্বন করে গুরুদেব ১৩৩১ সালে একটি বিবাহের উপহারোপযোগী কবিতা লেখেন ছবিটির সঙ্গে। সেই কবিতাটিকে সুর দিয়ে গানে পরিণত করেন ১৩৪০ সালের চৈত্র মাসে, পূর্বের কথারও সামান্য পরিবর্তন করেন। আগে কবিতাটি ছিল—

ওগো বধূ সুন্দরী
নব মধু মঞ্জরী
সাত ভাই চম্পার লহ অভিনন্দন—
পর্ণের পাত্রে
ফাল্গুনরাত্রে
স্বর্ণের বর্ণের ছন্দের বন্ধন।

মিশ্র ভৈঁরো রাগের সাহায্যে যখন কবিতাটি গীতরূপ নিল তখন তার কথা-বদলে গিয়ে দাঁড়াল—

ওগো বধূ সুন্দরী
তুমি মধু মঞ্জরী
পুলকিত চম্পার লহ অভিনন্দন—
পর্ণের পাত্রে
ফাল্গুনরাত্রে
মুকুলিত মল্লিকামাল্যের বন্ধন।

দক্ষিণভারতীয় একটি লোকনৃত্যের ভঙ্গির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে শান্তিনিকেতনের মেয়েদের জন্যে এই গানটির সঙ্গে একটি দলবন্ধ নৃত্য তৈরি হয়। নাচটি ছিল বেশ জমাট। ১৩৪১ সনে সিংহলদ্বীপে 'শাপমোচন' অভিনয় হয়, তখন সেই নাচটিকে ইন্দ্রসভায় অপ্সরীদের নাচ হিসেবে রাখা হল। পূর্বের কথা নাটকের এই দৃশ্যে খাপ খায় না বলে ছন্দ ঠিক রেখে কথা বদলে ইন্দ্রের বন্দনাগান লিখলেন—'নমো নমো শচীচিতরঞ্জন সন্তাপভঞ্জন', তার সঙ্গেই মেয়েরা তাদের আগের নাচটি নাচল। এই বন্দনাগানটির সুর ইমনকল্যাণে রচিত। সেই বৎসরে 'বর্ষামঙ্গল' উৎসবে যখন এই নাচটি কার্যসূচীর মধ্যে রাখা স্থির হল, তখন দেখা গেল গানের কথা আর-একবার বদল না করলে চলে না। অথচ গানটির সঙ্গে নাচের ভঙ্গি এমন মিলে গিয়েছে যে, সে ভঙ্গি অন্য গানের ছন্দে এরকম ভালো খাপ খাবে না। তখন সেই ছন্দে আবার লিখলেন একটি বর্ষার গান, তার প্রথম লাইন হল, 'এসো নিখিলের পিপাসাভঞ্জন এসো গম্ভীর কান্তি ঘননীল অঞ্জন'। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যখন দেখা গেল নাচের সঙ্গে ঠিক মিলছে না, তখন আবার বদল করে লিখলেন—

তুমি সন্তাপে শান্তি
তুমি সুন্দর কান্তি
তুমি এলে নিখিলের পিপাসাভঞ্জন।
এ'কে দিলে ধরাবক্ষে
দিক্‌রমণীর চক্ষে
সুশীতল সুকোমল শ্যামরসরঞ্জন।

রাগিণী বদলে গিয়ে হল বেহাগ। দুদিন পরে এটিকেই আবার পরিবর্তন করলেন—

তুমি তৃষ্ণার শান্তি
সুন্দর কান্তি।
তুমি এলে নিখিলের সন্তাপভঞ্জন।
আঁকো ধরাবক্ষে
দিক্‌বধূ চক্ষে
সুশীতল সুকোমল শ্যামরসরঞ্জন।

একই নাচের জন্যে উপরের গানটি আর-একবার নূতন রূপ ধারণ করল। 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের শেষদিকে সেই গানটিকে রাখা হয়েছে—

তৃষ্ণার শান্তি সুন্দর কান্তি
তুমি এসো বিরহের সন্তাপভঞ্জন।
দোলা দাও বক্ষে
এ'কে দাও চক্ষে
স্বপনের তুলি দিয়ে মাধুরীর অঞ্জন।
এনে দাও চিত্তে
রক্তের নৃত্যে
বকুল নিকুঞ্জের মধুকর গুঞ্জন।
উদ্বেল উতরোল
যমুনার কল্লোল
কম্পিত বেণুবনে মলয়ের চুম্বন;
আনো নব পল্লবে
নর্তন উল্লোল
অশোকের শাখা ঘেরি বল্লরীবন্ধন।

নাচের উদ্দেশ্যে আরো কত গানের কথা বদল হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ দিই : 'হৃদয় আমার ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড়' গানটি বদলে হল বসন্তের গান হৃদয় আমার ওই বুঝি তোর ফাল্গুনী ঢেউ'; 'দেখো দেখো দেখো, শুকতারা আঁখি মেলি চায়' গানটির কথা বদলে করলেন 'চলে ছলছল নদীধারা নিবিড় ছায়ায়'; 'বাকি আমি রাখব না' গানের কথা বদলে হল 'আমার এই রিক্ত ডালি'; 'দেখা না-দেখায় মেশা হে বিদ্যুৎলতা' হল 'স্বপ্নমদির নেশায় মেশা'; 'বসন্তে ফুল গাঁথল'কে পাই 'অশান্তি আজ হানল' রূপে; 'বঁধু কোন্ মায়া লাগল চোখে' গানের 'মায়া' কথাটি বদলে করা হল 'বঁধু, কোন্ আলো লাগল চোখে'। 'ওরে চিত্ররেখাডোরে' গানটি

রচিত হয় 'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা' গানটির ছন্দ লক্ষ্য করে, নাচের সুবিধার জন্যে। পূর্বে 'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা' গানটিতে একটি নাচ তৈরি ছিল তারই ছন্দে 'শাপ-মোচন'এর এই অভিনয়-নৃত্যটি তৈরি হল।

এই সব-কটি পরিবর্তনে সুর ছন্দ অবিকল এক, কেবল কথার পরিবর্তনের দ্বারা অর্থের পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে—কোনো-কোনোটিতে তিনি সব কথারই পরিবর্তন করেছিলেন, আবার কয়েকটি গানে সব কথা বদলাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি, দু-একটি শব্দ বদলেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে।

এবারে কয়েকটি গানের কথা লিখি যেগুলি পরিবর্তিত হয়ে বিবাহসংগীতে পরিণত হয়েছিল। নববর্ষের উপাসনা উপলক্ষে রচিত 'হে চিরনূতন, আজি এ দিনের প্রথম গানে, জীবন আমার উঠুক বিকাশি তোমার পানে' গানটির 'জীবন আমার' কথাটিকে 'জীবন দোঁহার' করে তিনি বিবাহ-অনুষ্ঠানে ব্যবহার করেছিলেন। ১৩৩০ সালের 'নটীর পূজা'র 'ওরে কী শুনেছিস ঘুমের ঘোরে' গানটিকে বিয়ের গান করতে গিয়ে এইভাবে তার কথাগুলি বদলেছিলেন—

ওরে কি অপরূপ রূপ দেখ রে
নয়ন এল জলে ভরে।
এতদিনে তোমায় বুঝি
আঁধার ঘরে পেল খুঁজি,
বন্ধু তোমার খুলল দুয়ার
নিল তোমায় আপন করে।
তোর দুখের শিখায় জ্বাল্ রে প্রদীপ জ্বাল্ রে
তোর সকল দিয়ে ভরিস পূজার থাল রে।
যেন জীবন মরণ একটি ধারায়
তাঁর চরণে আপনা হারায়
সেই পরশে মোহের বাঁধন
রূপ যেন পায় প্রেমের ডোরে।

'সার্থক কর সাধন' গানটির কথা বিয়ের জন্যে কিরকম পরিবর্তন করা হল, তারও নমুনা দেখাই—

সার্থক হল সাধন।
তৃপ্তি লভিল তৃষিত চিত্ত শান্ত বিরহ-কাঁদন,
প্রাণভবন দৈন্যহরণ অক্ষয় করুণা-ধন।
বিকশিত হল কলিকা,
মম কানন করিল রচন নব কুসুমাঞ্জলিকা,
হল সুন্দর গীত-মুখর নীরব আরাধন ॥
চরণ-পরশ-হরষে
লজ্জিত বনবীথি ধূলি সজ্জিত কর কর হে,
মোচন কর অন্তরতর হিম-জড়িমা-বাঁধন ॥

'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের গান 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা' অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার

যুগ্মনৃত্যের গান। এ গানটি রচিত হয় 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে' গানটির ছন্দ লক্ষ্য করে। 'চিত্রাঙ্গদা' রচিত হবার কয়েক বৎসর পূর্বে 'সেদিন দুজনে' গানের সঙ্গে একটি যুগ্মনৃত্য রচনা করা হয়। গানের সঙ্গে নাচটি বেশ মানিয়েছিল। এই নাচটি 'চিত্রাঙ্গদা'য় রাখবার জন্যে যখন প্রস্তাব এল, তখন গুরুদেব 'চিত্রাঙ্গদা'র সঙ্গে কথা মিলিয়ে একই ছন্দে 'কেটেছে একেলা' গানটি লিখলেন।

১৩০২ সালের আশ্বিন মাসে 'আহা জাগি পোহাল বিভাবরী' গানটির সঙ্গে ১৩২৬ সালে প্রকাশিত 'গীতপঞ্চাশিকা'র 'পোহাল পোহাল বিভাবরী' গানটির সুর ও ভাবের মিল অনেকেই লক্ষ করেছেন। বস্তুত দুটি একই গান। 'আহা জাগি পোহাল বিভাবরী' শিলাইদহের নদীপথে বাসকালে রচিত। সঙ্গে সহযাত্রী বলেন্দ্রনাথ। ১৪ আশ্বিনের রাত্রি নদীর উপর ঝড়-বৃষ্টিতে তাঁদের কাটাতে হয়েছিল। পরদিন সকালে যখন ঝড় থামল ও আকাশ পরিষ্কার হয়ে রোদ দেখা গেল তখন এই গানটি গুরুদেব লিখেছিলেন।

'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে' গানটি ১৩০২ সালে মারাঠি পদ-এর অনুকরণে রচিত। এটিকে ঋতু-সংগীত হিসাবেই দেখি, কিন্তু 'বিশ্ব-রাজালয়ে বিশ্ববীণা বাজিছে' এইভাবে নানা কথা বদলে একে পরে উপাসনা-সংগীত করা হয়েছিল।

এবারে গানের সুরবদলের কয়েকটি নমুনা দেওয়া যাক। নতুন গান শেখবার সময় যদি কখনো মনোযোগ কম দিয়েছি অমনি গুরুদেব মনে করেছেন সুরটা হয়তো মনে সাড়া দেয় নি, নতুন সুর দিতে চেয়েছেন। অনেক সময় গান রচনা হয়ে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন গানটি কেমন হল, সংকোচবশত মতামত না দিলে ভেবেছেন হয়তো ভালো হয় নি, অন্য সুর দিতে উদ্যত হয়েছেন, বারণ করলে বরং বলেছেন পুরাতনের প্রতি অহেতুক একটা অনুরাগ আছে। সুর পুনর্যোজনার পর দেখেছি গানটি অনেক সুন্দর হয়েছে। 'বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা' গানটি যখন প্রথম রচিত হয় তখন তার রাগিণী ছিল বাহার, তাল ছিল জলদ-তেওড়া। অনেক দিন পরে বাহার রাগিণী বদল করে তাতে চতুর্মাত্রিক তালে সারিগানের সুর লাগালেন, গানটি আরো প্রাণস্পর্শী হয়ে উঠল। বাহার সুরে ও তেওড়া তালে গানটিতে একটা উল্লাসের ভাব ফুটে উঠেছিল, সারিগানের সুরে এসেছে একটা উদাস ভাব।

'আমি যখন ছিলেম অন্ধ' গানটি গুরুদেব ১৩৪০ সালে 'রাজা' নাটকে ব্যবহার করেন। গানটি লেখা আরো আগে। প্রথমে এ গানের রাগিণী ছিল কেদারা। ১৩৪২ সালে 'রাজা' অভিনয়ের সময় বদল হয়ে হল কীর্তনাঙ্গ সুর এবং এর ছন্দের ঝোঁক ও সুরের গঠনেও অনেক পার্থক্য দেখা দিল। কেদারা সুরের কাটা কাটা গতিতে গানের ভিতর জোরের প্রকাশ খুব বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল, কীর্তনাঙ্গ সুরে সেটি বদলে গিয়ে বেদনার আভাস বড়ো হয়ে উঠেছে। 'শাপমোচন'এর গান 'হে সখা বারতা পেয়েছি মনে মনে' গানটি ছিল মিশ্র বসন্ত রাগে, তাকে তিনি বদল করলেন বেহাগে আজকাল উভয় সুরই চলতি আছে, 'বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক' গানটিতে 'নবীন' রচনাকালে এক সুর দিয়েছিলেন, তাকে বদলে পরে সুর দিলেন মিশ্র রামকেলিতে, এ সুরটি অধিকতর চিত্তাকর্ষক। কিন্তু উভয় গানের ছন্দের পরিবর্তন ঘটেছে। এই ভাবের আরো অনেক গানই দুই সুরে রচিত হয়েছে।

প্রযোজনা

পৃথিবীতে নাটক রচনা করে গেছেন অনেকেই, কিন্তু নিজের নাটকের প্রযোজকরূপে তাঁদের খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। গুরুদেবকে আমরা যেমন পাচ্ছি নাট্যকাররূপে, তেমনি তাঁকে পাচ্ছি তাঁর নাটকের বিশিষ্ট অভিনেতা ও প্রযোজকরূপে। তিনি নিজেই তাঁর নাটকের গান রচনা করেছেন, আবার নিজেই সেই নাটকের সমস্ত পাত্রপাত্রীকে তৈরি করেছেন।

গুরুদেব শান্তিনিকেতনের নানা উৎসব উপলক্ষে অভিনয় করবার জন্যে অনেক নাটক রচনা করেছেন, কলকাতায়ও তাঁর বহু নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি স্বয়ং প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সে-সব অভিনয় দেখে দর্শকেরা গভীর তৃপ্তি পেয়েছেন, কিন্তু তাঁদের পক্ষে কল্পনা করাও দুরূহ যে, এর পিছনে কেবল একজন মানুষের প্রচণ্ড প্রচেষ্টা কাজ করেছে বলেই এ সম্ভব হয়েছে। অভিনেতৃবর্গকে তৈরি করতে তাঁকে প্রাণপণে দিনের পর দিন খাটতে হয়েছে। তিনি কখনো কোনো পেশাদার অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে নিয়ে এ কাজে নামেন নি। যে-সব ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক ও কর্মী শান্তিনিকেতনে এসে সমবেত হয়েছেন, যাঁরা কখনো অভিনয় করবার কল্পনাও করেন নি, তাঁদের নিয়েই তিনি অভিনয় সার্থক করে তুলেছেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় একা তিনি শিখিয়েছেন পাখি-পড়ানোর মতো। প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে কোথায় কিভাবে ঝোঁক দিতে হবে, কিভাবে স্বরের বৈচিত্র্য আনতে হবে, সবই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়ে দিয়েছেন। এক সময় এমন ব্যক্তিকেও তৈরি করেছেন যাকে দেখে অভিনয়ের পূর্বে কেউ মনে করতে পারে নি যে, তার মুখ দিয়ে কথা ফুটতে পারে। অভিনেতার চালচলনে হাবভাবে অভিনয়কালে পাছে কোনোপ্রকার জড়তা বা আড়ষ্টতা প্রকাশ পায় সেই কারণে প্রতি পদক্ষেপে, ওঠা বসার, হাতের ও দেহের ভঙ্গি কিরকম হলে অভিনয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকবে সেদিকেও তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না।

সাধারণত আমরা মনে করি গুরুদেবকে বোধহয় 'ফাল্গুনী'র অন্ধ বাউল, 'শারদোৎসব'এর সন্ন্যাসী, 'ডাকঘর'এর ঠাকুরদা, 'বিসর্জন'এর জয়সিংহ বা রঘুপতি, 'তপতী'র মহারাজ বিক্রম বা 'অরূপরতন'এর ঠাকুরদা ইত্যাদি অভিনয়েই মানায়. তাই তিনি কেবল এইরকম দুরূহ চরিত্রের অভিনয় করেছেন। কিন্তু অন্য কোনো চরিত্রের অভিনয়ে নামলেও তিনি আশ্চর্য সফলতা লাভ করতে পারতেন। কারণ এই-সব নাটকের যে-কোনো গ্রাম্য চরিত্র বা নারী-চরিত্রের অভিনয়ে তাঁর শক্তি ছিল অসাধারণ। অভিনয় শিক্ষাদানকালে বিভিন্ন চরিত্রে তাঁর অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই এই কথার তাৎপর্য অনুভব করতে পারবেন।

কোনো কাজ হাতে নিয়ে তা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মনে তাঁর কী অস্বস্তি ও উদ্‌বেগ। তাই তিনি নিজে নাটকের জন্যে লোক বেছেছেন, শিখিয়েছেন এবং বিচিত্র চরিত্রের অভিনয় একসঙ্গে শেখানো সম্ভব হত না বলে দিনের নানা ভাগে এক-একজনকে আলাদা করে শিখিয়েছেন। একসঙ্গে প্রতিদিনই অভিনয়ের মহড়া দিয়েছেন অভিনয়ের দিন পর্যন্ত। এর মধ্যে মধ্যে গান রচনা করেছেন এবং

শিখিয়েছেন। নাটকের মধ্যে প্রায়ই কিছু-না কিছু পরিবর্তন করতেন। কখনো দেখি নি কোনো নাটক আরম্ভে যেভাবে লিখেছিলেন অভিনয়ের দিনে ঠিক সেইভাবেই অভিনয় করিয়েছেন।

ঘন ঘন পাঠপরিবর্তনের জন্য অভিনেতৃবর্গের হত বিপদ। একবার যা তারা বহু কষ্টে শিখত, তা ভুলে নতুন করে মুখস্থ করার ভয়ে তাদের তটস্থ থাকতে হত। কারণ যতক্ষণ না সে ভূমিকাটি সর্বাঙ্গসুন্দর হত ততক্ষণ তাঁকে খুশি করা অসম্ভব ছিল। এর জন্যে গুরুদেবের দৈনন্দিন নিয়মের ব্যাঘাত হত, খাটুনিও বাড়ত খুব। তাঁর শরীরের প্রতি লক্ষ রেখে সকলেই তাঁকে পরিবর্তনে বিরত করতে চেষ্টা করতেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হত না। মনে সম্পূর্ণতার যে চিত্র একবার এঁকেছেন বাইরে তার সুষ্ঠু প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কিছুতেই স্থির থাকতে পারেন নি। কতবার দেখেছি যেদিন অভিনয়, সেদিন সকালে নাটকে একটি নতুন অংশ যোজনা করেছেন। অনেক সময় বেশ বড়ো অংশও জুড়েছেন। এই নতুন অংশ রচনাকালে তিনি একটুকুও ভাবেন নি যাদের দিয়ে তিনি এটি অভিনয় করাবেন, তাদের সে সামর্থ্য আছে কি না, এই অল্পসময়ের মধ্যে সবটা অভিনয়োপযোগী করে তারা দর্শকের কাছে প্রকাশ করতে পারবে কি না। নিজের প্রতি যে বিশ্বাস তাঁর ছিল তার জোরে তিনি অন্যকেও সেই ভাবেই দেখতে চাইতেন। তাঁর চেয়ে বয়সে কনিষ্ঠরাও তাঁর কর্মশক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, অথচ তাঁর কাছে ক্লান্তি বলে কিছুই ছিল না।

শান্তিনিকেতনে যখন নৃত্যাভিনয়ের যুগ এল তখন তাঁকে রচনা করতে হয়েছে একসঙ্গে গানের পর গান। একদিনে একটানা বহু গান রচনা করা যে কী কষ্টকর ব্যাপার, যাঁরা সংগীতরচয়িতা তাঁরাই কেবল তা অনুভব করতে পারবেন। কিন্তু গুরুদেবের কাছে তা ছিল অতি সহজ, খেলার মতো। এমনও দেখেছি, যখন তাঁর শরীর সুস্থ নেই, রাত্রে যখন শান্তিনিকেতনের অধিবাসীরা নিদ্রায় মগ্ন, তখন আমার ডাক পড়েছে। তার কারণ হল, তাঁর চোখে ঘুম নেই পরের দিনের নৃত্যাভিনয়ের নতুন অংশটা তৈরি না হলে অভিনয়ের কাজে বাধা পড়বে, সেই কথা ভেবে। শুরু হল একটা সুর যোজনার পালা। মাঝে মাঝে অসুস্থ শরীরে সারাদিনের কর্মের ক্লান্তিতে তাঁর চোখে ঘুমের জড়তা দেখা দিত। নানাভাবে বুঝিয়েছি এই পর্যন্ত থাকুক, কিন্তু ফল হয় নি। শেষ করে তবে তিনি শান্তি পেয়েছেন। অনেক রাত্রে ফেরবার সময় তাঁকে বলেছিলাম গানরচনায় ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই, কারণ নাচের কাজ এগোতে অনেক সময় নেবে। কিন্তু পরের দিন তাঁর ভৃত্য এসে আমার হাতে এই চিঠিটি দিল—

"শান্তি, বিশেষ জরুরী কাজ না থাকলে চলে আসবি। আমার কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ।"

চিঠি পেয়ে বুঝলাম আমাদের সুবিধার জন্যে তাঁর সৃষ্টির উৎস বন্ধ রাখতে বলা অন্যায়। কিন্তু বিপদ হত যখন তিনি চাইতেন আজকের রচনাকে আজকেই ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা নৃত্যে অভিনয় করাতে। যদি তা সম্ভব না হত খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হতেন। তিনি ভাবতেই পারতেন না যে, তাঁর কাছে যা সম্ভব, অন্যের কাছে তা সম্ভব

নয় কেন। প্রতি সন্ধ্যায় তিনি উপস্থিত থাকতেন নৃত্যাভিনয়ের মহড়ায়। পাছে ঠিক সময়ে উপস্থিত না হলে তাঁর অনুপস্থিতিতে মহড়া ঠিকমত না হয় তার জন্যে তাঁর অস্থিরতার অন্ত ছিল না। 'চণ্ডালিকা'র গান রচনা ও মহড়া যখন চলছে, তখন তাঁর শারীরিক অসুস্থতার জন্য আমি ঠিক করলাম কয়েকদিন নিজেদের মধ্যে গানের সঙ্গে নাচকে খাড়া করে নিয়ে তার পরে তাঁর সামনে মহড়া দেব। প্রতিদিন তাঁকে জানিয়ে এসেছি যে, কাজ কতখানি এগোলো এবং কিভাবে কাজ চলেছে। কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন নি, কয়েক দিন পরেই একটি চিঠি এল—

"শান্তি, এখনো রিহার্সেল আরম্ভ হল না। সময় সংকীর্ণ। প্রথম থেকেই কি আমার সম্মুখে তালিম দেওয়া দরকার। বোধহয় তাহলে বিলম্বের আশঙ্কা দূর হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৯।৮।৩৮"

পড়েই বুঝলাম তাঁর সামনে যতক্ষণ না মহড়া দেব ততক্ষণ তিনি শান্ত হবেন না। অসুস্থ শরীর, ঝড়বৃষ্টি, গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপ তাঁকে বাধা দিতে পারে নি। কতদিন জ্বরগায়ে সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করে এসে উপস্থিত হয়েছেন। কোনো ছাত্রছাত্রী অনুপস্থিত হলে তারা অসুস্থ হয়েছে ভেবে অস্থির হয়ে উঠতেন, কিন্তু নিজের বেলা এতটুকু মমতাও দেখি নি। নাচিয়েদের প্রত্যেকের দোষত্রুটি দেখিয়ে দিতেন, কিরকমের নাচ হলে জিনিসটা আরো ভালো হতে পারে সেই উপদেশ সব সময় দিতেন। গান রচনা করে কিরকমের নাচ হলে গানটির সঙ্গে মানায়, কার নৃত্যের মধ্যে তার ব্যঞ্জনা সুন্দর ভাবে ফুটে উঠতে পারে, সে উপদেশও তিনি দিয়েছেন। দক্ষিণী মণিপুরী বা অন্যান্য দেশের নাচের সঙ্গে কিরকমের অভিনয় বা কিপ্রকার গানের ভাব খাপ খায় সে বিষয়ে তাঁর নির্দেশ আমাদের বিশেষ সহায়তা করেছে।

কয়েক বৎসর আগে শান্তিনিকেতনের কোনো বিশেষ উৎসব-উপলক্ষে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের মহড়া শুরু হবার কয়েকদিন পরে তিনি মহড়ায় যোগ দেন, এবং সেই দিন সকালে শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীকে লিখে পাঠান—

"বৌমা, কাল ক্লান্ত শরীরে নাচের বাহুল্য ক্লেশকর হয়েছিল। মণিপুরীকে না ছাঁটলে সভা ছেড়ে পালাতে হবে। সমস্ত জিনিসটি বেশ দ্রুত এবং সুঠাম হলে ভাল হয়। এ নাটকটি লিরিক্যালের চেয়ে ড্রামাটিক বেশি।"

শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর কাছ থেকে চিঠিটা পেয়ে তখনই তাঁদের উভয়ের সঙ্গে পরামর্শের পর নানাভাবে গানের সঙ্গে নাচের অদল-বদল করে দিলাম।

'শ্যামা' নাটকের মহড়ার সময় আমাকে একদিন লিখে পাঠালেন—

"প্রথম নাচটা তেওড়া তালে জোরের লয়ে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করবার জন্যে তৈরি হতে পারবে কি?"

তাঁর ইচ্ছা যেন সন্ধ্যায় তাঁর আদেশমত নাচিয়েদের তৈরি করে তাঁর সামনে খাড়া করি। তখনই নাচের শিক্ষকদের ডাকিয়ে, তাঁর আদেশমত নাচ তৈরি করিয়ে, ছাত্রীদের দিয়ে সন্ধ্যায় তাঁকে দেখিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হয়েছি। দ্বিতীয়বার 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা' অভিনয়কালে, গানের একটু অদল-বদল করা হয়েছিল। পুস্তকের প্রথম গানটি সেইবারের রচনা। গানটি সকালে তাঁর কাছে শিখে এসে বাড়িতে পা দেওয়া মাত্রই তাঁর ভৃত্য চিঠি নিয়ে এসে হাজির। লিখেছেন—

শান্তি

বিশেষ জরুরী কাজ না থাকলে চলে আসছি। তোমার কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ

ওঁ

শান্তি এখনো

বিহ্বলভাব তোমার ঘোচেনা। সময় সংকীর্ণ। প্রথম থেকেই কি আমার সুমুখে তালিম দেওয়া দরকার। সেই হয় তাহলে বিলম্বের আশঙ্কা দূর হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১/৮/৩৮

কৌশল, কাল ক্লান্ত শরীরে নাচের বাহুল্য ক্লেশকর হয়েছিল। মালঞ্চীকে না ছুঁইলে সভা ছেড়ে পালাতে হবে। সমস্ত জিনিষটি বেশ দ্রুত এবং সুঠাম হলে ভালো হয়। এ নাটকটি লিরিক্যালের চেয়ে ড্রামাটিক বেশি।

প্রথম
নাচের
ভঙ্গী তোলে
কারুর পায়ে
বসন্তের
স্বচ্ছ উচ্ছ্বাস
প্রকাশ করবার
সাধ্য তোর
হতে পারবে কি?

এই নতুন গানে মমতার ফুলবিক্রির ভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে সুনীতা আর হাসি এসে যেন ওর কাছ থেকে ফুল নিয়ে কানে পরতে খোঁপায় পরাতে ভঙ্গী করে তবে ভাল হয় তখনি ওরা চলে যাবে

"এই নতুন গানে, মমতার ফুল বিক্রির ভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে অনিতা আর হাসি এসে যেন ওর কাছ থেকে ফুল নিয়ে কানে পরচে খোঁপায় পরচে ভঙ্গি করে তবে ভালো হয়। তখনি ওরা চলে যাবে।"

এই চিঠি পাবার আগে পর্যন্ত নিশ্চিন্ত ছিলাম এই ভেবে যে, গানটি প্রথম সকলকে শিখিয়ে তার পরে নাচের কথা ভাবা যাবে। কিন্তু এর পরে আর নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব হল না। গানগুলি গাইবার দোষে নাচের সঙ্গে সামঞ্জস্য না রাখতে পারলে গুরুদেব অস্থির হয়ে উঠতেন। কিভাবে গাইতে হবে, কোথায় জোর দিতে হবে, সব রকমের আলোচনা তাঁকে করতে হয়েছে; নিজে গেয়ে তা বুঝিয়েছেন। দেখেছি তাঁর নাটকের অভিনয় যখন পূর্ণতার দিকে এগিয়েছে তখন কী গভীর তৃপ্তির আনন্দ তাঁর মুখে; যদি কখনো ভালো না হল অমনি উদ্‌বেগ জেগেছে তাঁর মনে।

তাঁর রচিত 'শারদোৎসব', 'ফাল্গুনী', 'নটরাজ', 'নবীন', 'শ্রাবণ-গাথা' জাতীয় গীতনাট্যগুলি ও নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা' এ যুগের বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন। এই ধরনের গীতনাট্যের রসোপলব্ধি করা সাধারণের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। আমাদের দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতি যত ব্যাপক হবে ও উচ্চস্তরে উঠবে ততই এ-সবের প্রকৃত রস ও সৌন্দর্য আমরা অনুভব করতে পারব। বিশেষ করে গীতনাট্যের সঙ্গে নৃত্যের দ্বারা যে অভিনয়-পদ্ধতির প্রচলন তিনি করলেন সেও একালের পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন। এ পুরাতনের হুবহু নকল নয় অথচ পুরাতনের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে নতুন যুগের সূচনা করেছে।

এই-সব নাটকের সাজসজ্জা রূপ ও রঙের দিক থেকেও অনেক ভাববার আছে। তাঁর সব নাটকেরই মূল কথা হল রচনার মূল রসটিকে অন্তরে উপলব্ধি করা। সেই কারণে রসিকদের কাছে নাটকের সাজসজ্জা আড়ম্বর বা চাকচিক্য অত্যন্ত অবান্তর। গীতিকাব্যের মতো, সহজ সৌন্দর্যের আবেগকে অনুভব করানোই হল এর কাজ। সুতরাং এ-সব নাটকের রূপসজ্জাকেও সেই দিক ভেবে চলতে হবে। তাই তাঁর নাটকে রূপ ও রঙের কোনো আড়ম্বরের চেষ্টা নেই, নেই তাতে চোখ ঝলসাবার প্রচেষ্টা, আছে কয়েকটি রঙের বিন্যাসে স্নিগ্ধ শান্তি। অভিনেতাদের সাজসজ্জায়ও তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা হয়েছে। সব মিলিয়ে চোখে লাগবে ফুলের মতো একটি সহজ অথচ মধুর সৌন্দর্য, যাকে অনুভব করতে পারি, যার ঠিক তুলনা করা চলে না। এই দিক থেকে রঙ্গমঞ্চের প্রগতির পথে গুরুদেবের নাটকের দান অপরিসীম।

নেপথ্যের কথা

"অন্তরে অন্তরে একটা কিছু সৃষ্টি হচ্ছে। তাকে সব সময় জানি না। গাছের একদিক পাতা, বাইরের ছাল ইত্যাদি নিয়ে। পাতা বাইরের আকাশ থেকে কার্বন ইত্যাদি ভিতরে সঞ্চারিত করে দিচ্ছে। নতুন পত্রপুষ্পে বিকাশের একটি ধারা চলছে। কিন্তু গাছের মজ্জায় মজ্জায় একটা গভীর ক্রিয়া আছে। পাতা তার খবর জানে না। আমাদের ভিতরেও এই দ্বৈতরূপ আছে। গাছের পুষ্প-পল্লবের মতো আমাদেরও একটা পরিবর্তন চলছে। এই যে পাতা ঝরছে আর গজাচ্ছে, এরা জানে না, মজ্জার বিষয়টা আরো স্থায়ী। আমাদের মধ্যে একটা সত্তা আছে, তা অনেক কিছুকে বাদ দিচ্ছে, বাইরের জিনিস অনেক সময় তার প্রতিকূলতা করছে।

"আমি অনেক সময় যা বলেছি তা সব সময় চেতন-পুরুষের কথা নয়। বলতে গিয়ে আমি লাভ করেছি। অন্তরের গুহায় যে মানুষ আছে, তার কাছ থেকেই অনেক কথা শিখেছি। এমন কোনো কবি নেই যাঁর কবিতা-রচনাটা অন্তরে যে সত্য আছে তার বেরবার পথ খোলসা করছে না। অন্তরবাসী পুরুষ তার গোচরে অগোচরে তাকে নিজেকে ব্যক্ত করার পথ হিসেবে পেয়েছে। মাটির নীচ দিয়ে জলের স্রোত বয়ে আসছে। কিন্তু প্রস্রবণ হয় সেখানে, যেখানে উপরের দিকে বেরবার পথ পায়। বিশ্বব্যাপী রস, জ্ঞান, ভাবের একটি ধারা আছে। সে ধারার জন্ম বাইরে; কিন্তু ভিতরের দিকে গিয়ে তা জমা হচ্ছে। আবার অনুকূল অবস্থায় তা বাইরে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। উপরের সেই আবরণটি ক্ষয় হলেই ভিতরের ধারাটি বাহির হবার পথ পায়। যার ক্ষেত্রে এই ধারা উৎসারিত হচ্ছে, সে এর জন্য লাভবান হচ্ছে। যে কবিতা কবি রচনা করেন তা তাঁর অগোচরে থাকে। স্বতঃউৎসারিত কবিতা পূর্বে কবির পরিচিত থাকে না। 'অন্তর্যামী' কবিতায় তা প্রকাশ করেছি বলে নিন্দিত হয়েছি।

"তোমাদের কাছে বসন্ত-উৎসব লিখবার ভার নিই। বৌদ্ধ গল্প পেলুম। এই গল্পে নাটকের উপকরণ আছে। শিলাইদহের নদীতীরে বসন্ত এসেছে, আম্রমুকুলে ভ্রমর গুঞ্জন করছে। দিনু সুর দিচ্ছেন। আমার নাটক লেখা চলল। গান লিখছি। কি করে? যে মুহূর্তে লিখতে বসলুম, আমার চেতন-পুরুষ যে লিখতে বসেছিল তার হাত থেকে কলম কেড়ে নিয়ে আমার ভিতরের মানুষ হুহু করে লিখে চলল।

"নাটক পড়ে অনেকে মনে করল যে আমি পাগলামি করছি। এটা কি হল! আমাকেও পাঠকের মতো ওর মধ্যে বিশ্লেষণ করে প্রবেশ করতে হবে। এই নাটকের সাহায্যে ঋতু-উৎসবের উপলক্ষে তোমাদের মধ্যে ঋতুর আনন্দকে জাগ্রত করে দেব আমি, তোমাদের মনের সঙ্গে বিশ্বের যোগ হয় এই ইচ্ছে ছিল। এই ইচ্ছেও কাজ করছিল যে বসন্তের আনন্দ ও তাৎপর্য এই নাটকের ছলে তোমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হবে। আর্ট হিসেবে মন্দ হয় নি।

"বসন্তের আইডিয়া এর মধ্যে এই। বসন্ত এল। দেখতে দেখতে আমের বোল, কিশলয় এল। চারি দিকে পুলককম্পন, প্রাণের আন্দোলন দেখতে দেখতে ছেয়ে গেল। ধর, সুদর্শনার স্বামী বসন্ত! গাছের মজ্জায়, ধরণীর ধুলোয় রসসঞ্চার করে দিচ্ছে যে আনন্দ তার সঙ্গে প্রত্যক্ষপরিচয় করতে হলে কি করে দেখব। আমি

বসন্তকে বললুম—তুমি আস নিতিনিতি, তোমাকে আশেপাশে ইঙ্গিতে পাই, কিন্তু তোমাকে ধরব আমি। বসন্ত বলল—বেশ, আমি সব জায়গায় আছি, আমাকে ধরো। যে ফুল ঝরল, যে পাতা গজাল, সব জায়গাতেই বসন্ত। এখানে বসন্তঋতুর সঙ্গে রাজার প্যারালেল আছে। ফুল পাতা ফল আকাশ এই-সব বিচিত্রতার মধ্যে বসন্ত। আমি যদি বলি বসন্তের আনন্দ শুধু একস্থানে পেতে চাই, যদি বলি শুধু আমের বোলের মধ্যে বসন্তকে চাই—তা পাব না। বোলকে চটকাতে পারি কিন্তু তার মধ্যে তাকে পাই না। ঝরাফুল ফোটাফুল সকলের মধ্যে, যিনি বিচিত্রের মধ্যে প্রকাশ করছেন আপনাকে, তাঁকে ছিন্ন করে এক জায়গায় কনফাইন করে দেখতে পারি না। ঠাকুরদাদা সকলের মধ্যে বসন্তের আনন্দকে পেয়েছে। সে 'লালে লাল হল' এ কথা বলেছে। সে সব জায়গায় বসন্তের উৎসবে যথার্থ যোগ দিয়েছে—তার চরিত্র এইজন্য রাখা গেল।

"সুদর্শনা অন্ধকার ঘরে আভাস পায়। অন্তরাত্মার মধ্যে আমরা তাঁর একপ্রকার অসীমের অনুভূতি পাই। কত পূর্ণিমারাত্রে নদীতে মাঝিদের গান ওঠে, পাড়ার লোকেরা গান গেয়ে ওঠে। জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে শুভ্র অঙ্গুলির স্পর্শ পড়ল অসীমের। অসীম—কেমন করে তার পরিচয় হল। তাই এই গান। এইরূপে শেফালি শিশিরের ভিতরে শারদলক্ষ্মীর স্পর্শ পায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধ তার মধ্যেও অসীমের প্রশ্ন। বাউল বলে—অচিন পাখি কেমনে আসে যায়, প্রাণের মধ্যে কেমনে আসে যায়। সুদর্শনা অনুভব করে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তিনি আসেন। কিন্তু আভাস দেখে তৃপ্তি হয় না। অনুমান বলে ভ্রম হয়। সাবজেক্টিভ অন্তরের স্বপ্ন মনে হয়। সুদর্শনা দেয়ালের মতো স্পষ্ট করে দেখতে চায়।

"সব মানুষই বলছে ভূমাতেই সুখ। আমি তাঁকেই চাই। আমি টাকার থলির মধ্যে তাঁকে পেতে চাই। টাকশালে যেন তার জন্ম। ভূমার স্পর্শ অন্তরে আছে। কেউ টাকা জায়গা জমির মধ্যে তাকে পেতে চায়। সুদর্শনা সেরকম তাঁকে বাইরে পেতে চায়। সুরঙ্গমা মাথা হেঁট করে রইল। বাইরে দেখতে চাইল না, কারণ সে বাইরে আঘাত পেয়েছিল পাপের মধ্যে। তাই প্রভু বললেন—তুমি নিজের মধ্যে সমাহিত হয়ে এইখানে আমার সেবা করো। এইখানেই তার খুশি, অন্ধকারে পায়ের শব্দ শুনে সুরঙ্গমার চঞ্চলতা নেই। সুদর্শনা চঞ্চল। মনে করে—আমার কত আদর তাঁর কাছে। তাই অহংকার। সে বিশেষ করে খুঁজে নিতে গেল। চোখে যা খুব জমকাল বোধ হল, তা ভণ্ডরাজ সুবর্ণ, কিংশুক ফুল, লোকজন, হট্টগোল ইত্যাদি। এই মোহ ও মত্ততার মধ্যে সুদর্শনা ভিতরে ভিতরে একটু বুঝেছিল যে ঠিক হল না। ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্যধীরা—এই সকলের মধ্যে দেখার বাধা হচ্ছে আমার কামনা বাসনা অভিমান ইত্যাদি। সকলে যেখানে মিলেছে আমি সেখানে সহযাত্রী হতে পারি। নিজের অভিমান চূর্ণ হলেই সর্বত্র তাকে পাওয়া যায়।

"রানী অহংকার ঘুচিয়ে বিশ্বযাত্রী পথিকের সঙ্গে যখন জুটল তখন রাজা বললেন—এখন বাইরের আলোয় আমাকে দেখ। সব অভিমান চূর্ণ হলে তবে অসতো মা সদ্‌গময়—অন্ধকার থেকে বাইরে যাওয়ার অধিকারী হল। সুরঙ্গমাকেও রাজা বাইরে আসতে অনুমতি দিলেন। সুদর্শনার সঙ্গে সঙ্গে এই যে সে চলল, পরকে

সেবা করতে করতে, সেই সঙ্গে মুক্তি পেল।

"ভিতরে আর বাইরে দুজায়গায় তাঁকে পেতে হবে। বাইরে পাওয়ার মধ্যে অনেক দুঃখ আছে। অনেক দুঃখ পেতে হবে। প্রতি পদক্ষেপে বাইরের পরিচয় হয় দুঃখের ভিতর দিয়ে এলে—তবেই অন্ধকারের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। 'ভোর হল বিভাবরী।'

"ঋতুর দিক দিয়েও তাৎপর্য আছে—বসন্তকে বিশেষ করে দেখা যায় না। আমার যখন অনুভূতি হয় বসন্তের আনন্দের, তখন বাইরের সর্বত্র, পাখির গানে, আকাশের ধূলিকণায় সেই আনন্দ।

"বসন্ত আমার মধ্যে ব্যক্ত, বাইরের এই গাছপালায়ও ব্যক্ত। অন্তরে বসন্ত, বাইরে বসন্ত। যে অসীম অন্তরে বীণা বাজান, সে অসীম আকাশে তারায় তারায় সর্বত্র বীণা বাজাচ্ছেন। সে আনন্দম্‌ আকাশে, সে আনন্দম্‌ অন্তরে। চোখ বুজে অন্তরেতে যদি তাঁকে পেতে চাও তবে বিশ্ব কি ফাঁকি? তবে তোমার মধ্যে যে ফাঁকি নেই, বিশ্বাস কি!

"সত্য তখনই পেয়েছি, যখন তাকে অন্তরে বাইরে পাই। সব জায়গায় এই আনন্দ রয়েছে। নইলে আমার মধ্যে থাকত না। বিশেষ কোনো স্থানে নয়, তীর্থে নয়, সব জায়গায় তিনি আছেন—এ কথা যে বলতে পারল, সে বলল, হয়েছে, তাঁকে পূর্ণ পাওয়া হল।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩রা পৌষ ১৩২২

গুরুদেবের নাটক নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করতে গিয়ে মনে হয়, তাঁর অধিকাংশ অভিনয়োপযোগী নাটকই তিনি প্রথম রচনায় হাত দেন বাইরের অনুরোধে বা বাইরের প্রয়োজনের তাগিদে। আর সেইসঙ্গে দেখেছি যাঁদের দিয়ে অভিনয় করাবেন তাঁদের কথাও রচনার সময় তাঁকে ভাবতে হয়েছে এবং সেই অনুসারে বহু সময়ে তাঁকে নাটকে বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক ক্ষমতার গুণে প্রয়োজনের তাগিদে লেখা নাটকই প্রয়োজনকে ছাপিয়ে শেষ পর্যন্ত সৃষ্টির পর্যায়ে উঠতে পেরেছে।

তাঁর প্রথমজীবনে অভিনীত নাটক বাল্মীকিপ্রতিভা, কালমৃগয়া, মায়ার খেলা গীতনাট্য কটি লিখেছিলেন বাড়ির আত্মীয়স্বজনের তাগাদায় বা বন্ধুপত্নীদের অনুরোধে। অভিনয় ও গানের যোগ্যতা বিবেচনা করা হয়েছিল এই নাটকগুলিতে প্রথম যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের কথা ভেবে, এইরকমই অনুমান করি।

এর পরে রাজা ও রানী, বিসর্জন ও বৈকুণ্ঠের খাতা রচনা করলেন। এর শেষ দুটি নাটক বাড়ির ছেলেদের আগ্রহ ও কলকাতার সংগীতসমাজের অনুরোধে লিখতে উৎসাহী হন। কেবল রাজা ও রানী কারো অনুরোধে লিখেছিলেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু সুদূর সোলাপুরে মেজদাদার কাছে বেড়াতে গিয়ে নাটকটি লেখেন এবং কলকাতায় ফিরে এসেই অভিনয় করান—এই ঘটনায় মনে হয় কারো অনুরোধ এই রচনার প্রেরণার কাজ করেছে।

এ পর্যন্ত রচিত নাটকগুলিতে বাড়ির ছেলেমেয়েরা, আত্মীয়বন্ধুরা সর্বদাই অংশ গ্রহণ করেছেন। অভিনয়ও দেখানো হত আত্মীয়বন্ধু ও বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত অতিথিদের। তাই নারী ও পুরুষ সব চরিত্রই সমানভাবে নাটকগুলিতে স্থান পেয়েছে।

এর পরে এল ১৯০১ সালে তাঁর শান্তিনিকেতন-বাসের যুগ। শান্তিনিকেতনের পরিবেশ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আশ্রমে তখন তিনি আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত নন, বাংলার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের একদল ছাত্র ও শিক্ষক নিয়ে বাস করছেন শান্তিনিকেতন-যুগের প্রথম ১৫।১৬ বছরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাটক হচ্ছে শারদোৎসব, মুকুট, অচলায়তন, ফাল্গুনী ও ডাকঘর। এই কটি নাটকে স্ত্রীচরিত্র একেবারেই নেই। কেবল ডাকঘরে ছোটো একটি বালিকা আছে, অল্পসময়ের জন্য। এই ধরনের নারীচরিত্রবর্জিত এতগুলি নাটক তাঁকে লিখতে হয়েছিল সে যুগের শান্তিনিকেতনের কথা ভেবে। তখন এখনকার মতো ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীদের পড়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এ ছাড়া সে সময়ে মেয়েরা প্রকাশ্যে ছেলেদের সঙ্গে একত্র অভিনয় করবে, শান্তিনিকেতনের সমাজও তা মেনে নেয় নি। এই অসুবিধার কথা ভেবেই নারীচরিত্রবর্জিত নাটক লিখতে হয়েছে।

শান্তিনিকেতনের এই যুগে দুটি মাত্র নাটক পাই যা স্ত্রীচরিত্রবর্জিত নয়। রাজা ও প্রায়শ্চিত্ত। ঐ যুগে হঠাৎ এ দুটি নাটক কেন লিখলেন জানি না। রাজা নাটকও শান্তিনিকেতনের বাইরের কারো প্রয়োজনে এবং অনুরোধে লিখিত হতে পারে। প্রায়শ্চিত্ত কলকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রযোজকদের অনুরোধে রচিত বলেই খবর পাওয়া যায়। এবং নাটকটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চোপযোগী বাংলা নাটকের রীতিতে লেখা, তাই এতে স্ত্রীচরিত্র রাখার কারণ পাওয়া যায়। যাই হোক, ১৯২২ সাল পর্যন্ত নারীচরিত্রবর্জিত নাটক লিখলেন সংখ্যায় বেশি। এ পর্যায়ের শেষ নাটক হল মুক্ত-ধারা। একটি মাত্র অর্ধপাগল স্ত্রীচরিত্র খুব অল্প জায়গা জুড়ে এতে রয়েছে। নাটকটির অভিনয় শান্তিনিকেতনে গুরুদেব করান নি।

জীবনের শেষ কুড়ি বছরে গুরুদেব যত নাটক লিখলেন তারও অধিকাংশই শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে লেখা। বাকি কটি পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের অনুরোধে। প্রথম দলের নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে বসন্ত, নটীর পূজা, রক্তকরবী, ঋতুরঙ্গ, তপতী, নবীন, শাপমোচন, হাস্যকৌতুক, কালের যাত্রা, চণ্ডালিকা, তাসের দেশ, শ্রাবণগাথা, চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামা। এই সময়ে শান্তিনিকেতনে নাচের চর্চা ভালো করে শুরু হয়েছে, এবং ক্রমশ তার উন্নতি হয়েছে। তাই নাচ এই সময়ের নাটকের একটি প্রধান অঙ্গ হয়ে আছে। এর পরিণতি নৃত্যনাট্যে। এই সময়েই রচিত শিশু-তীর্থ একটি বিদেশী সিনেমা কোম্পানির অনুরোধে প্রথমে ইংরেজীতে রচিত হয়। পরে শান্তিনিকেতনে এর নৃত্যাভিনয় হয়েছে। বসন্ত, নবীন, ঋতুরঙ্গ, শ্রাবণগাথা হল এক ধরনের গীতবহুল নাটিকা। নটীর পূজা, রক্তকরবী, তপতী, চণ্ডালিকা, তাসের দেশ, কালের যাত্রা প্রায় সাধারণ নাটকের মতো। নটীর পূজা ও চণ্ডালিকা প্রথমে রচিত হয় সম্পূর্ণভাবে পুরুষচরিত্র বাদ দিয়ে।

১৯২০ সালের কিছু আগে থেকে শান্তিনিকেতনের কর্মীদের বাড়ির মেয়েরা

অনেকেই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে পড়াশোনায় যোগ দিয়েছেন। এখানকার মহিলা-দেরও স্বাধীনতা আগের চেয়ে বেড়েছে। ১৯২০ সালে বাইরের মেয়েদের শান্তি-নিকেতনে পড়ার সুবিধার জন্য, শ্রীভবনের গোড়াপত্তন হল। ১৯২১ সালে কলকাতায় যে বর্ষামঙ্গল হল মেয়েদের অনেকেই তাতে যোগ দিলেন ছাত্রদের সঙ্গে। ১৯২২ সালে বসন্ত গীতনাট্যে মেয়েরা গানের সঙ্গে মূকাভিনয় করলেন। এই সময় থেকে মেয়েরা ছেলেদের সমান স্থান পেলেন গানে, অভিনয়ে। নাচের চর্চা এই সময়ে সামান্যভাবে মাত্র আরম্ভ হয়েছে। নটীর পূজার অভিনয়ের পর থেকে, সেই চর্চা আরো বাড়ল। তাই এ যুগের নাটকে নাচ যুক্ত হল নাটকের গান অবলম্বন করে। এ কথা আগেই বলা হয়েছে। মেয়েরা এই-সব অভিনয়ের নাচে গানে বিশেষ অংশ নেন।

এ যুগেই দুটি নাটক রচিত হল, যাদের প্রথম রচনায় একেবারেই পুরুষ চরিত্র বাদ দেওয়া হয়েছিল। নটীর পূজা এবং চণ্ডালিকা। নটীর পূজা রচনার আগে বিদ্যালয়ের একদল ছাত্রী শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবীর সাহায্যে কথা ও কাহিনীর পূজারিণী কবিতাটির মূকাভিনয় করবেন ঠিক করেছিলেন। গুরুদেব তাঁদের উৎসাহ দেখে অতি অল্পসময়ের মধ্যে নটীর পূজা নাটকটি লিখে দেন সম্পূর্ণভাবে ঐ ছাত্রীদের কথা ভেবে এবং নিজেই তাঁদের অভিনয় শেখান। চণ্ডালিকার বেলায় তিনি চেয়ে-ছিলেন শ্রীমতী দেবী ও নন্দিতা দেবীকে দিয়ে ঐ নাটকটি কথা ও নাচে অভিনয় করাবেন। এঁদের দুজনের কথা ভেবে লেখা বলে প্রথম রচনায় কোনো পুরুষচরিত্র ছিল না। শেষ পর্যন্ত নাটকটি অভিনীত হয় নি। কয়েক বছর পরে নৃত্যনাট্যের যুগে নাটকটি সম্পূর্ণ বদল করে নৃত্যনাট্যে পরিণত করলেন। এই পর্বের একমাত্র কালের যাত্রায় কোনো গান বা নাচের সুযোগ নেই।

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের অনুরোধে এই সময়ে চিরকুমার-সভা, শোধবোধ, শেষরক্ষা ও পরিত্রাণ রচিত হয়। এ নাটকগুলি গুরুদেব নিজে কখনো শান্তিনিকেতনে অভিনয় করান নি।

এইসঙ্গে আরেকটি কথা বলা দরকার যে, যদিও সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে এই-সব বিভিন্ন ধরনের নাটক গুরুদেব রচনা করেছেন তবুও দেখা গেছে যে সর্বদাই চেষ্টা করেছেন নাটকের জন্মকালে তাঁর মনের কোনো বিশেষ চিন্তাকে নাটকে রূপ দিতে। প্রাচীন গল্প অবলম্বনে তিনি নাটক লিখেছেন, কিন্তু সেই গল্প নিজের চিন্তার অনুকূলে সাজিয়ে নিয়েছেন। নয়তো এমন গল্প বেছেছেন যা তাঁর সে সময়ের হৃদয়াবেগ প্রকাশের পক্ষে অনুকূল।

এবার অরূপরতন নাটকটির একটু বিস্তৃত আলোচনা করব, কারণ এর পরি-বর্তনের ইতিহাস নানাভাবে কৌতূহলোদ্দীপক। এর প্রথম রূপ হল রাজা। রাজা নাটকটি শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের নাটকের মধ্যে একটি ব্যতিক্রম, এ কথা পূর্বে বলেছি। এর মধ্যে অনেকগুলি নারীচরিত্র আছে। সুদর্শনা ও সুরঙ্গমাই তাদের মধ্যে প্রধান। নাটকটি প্রথম লেখা হয় ১৩১৭ সালের আশ্বিনে, সেই বছরই পৌষে মুদ্রিত হয় এবং প্রথম অভিনীত হয় শান্তিনিকেতনে ৫ চৈত্র। ১৩১৮ সালের ২৪ বৈশাখে গুরুদেবের জন্মোৎসব-উপলক্ষে নাটকটি পুনরভিনীত হয়, সেবার ছুটি হয়েছিল তার পরে। এই সময়েও মেয়েদের অভিনয়ে অংশ গ্রহণের অধিকার ছিল না।

রাজা রচনার ইতিহাস এবং রাজা রচনার সময়ে গুরুদেবের মনে কী চিন্তা কাজ করছিল আমার পিতৃদেবের অনুলিখন থেকে সেই অংশ এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে সংকলিত হল।

রাজা নাটকে গুরুদেব ঠাকুরদার ভূমিকা গ্রহণ করেন। তখনো তাঁর গাইবার ক্ষমতা ছিল, তাই বহু গান তাঁকেই গাইতে হয়। বাউল, পাগল, বালকদল সৃষ্টি করে অনেক গান তাদের দিয়েও গাওয়ানো হয়েছে। এই চরিত্রগুলি রচনার উদ্দেশ্য হল, অনেক গাইয়ে ছাত্র ও কর্মীদের নাটকের মধ্যে টেনে নেওয়া।

১৩২৬ সালে রাজা নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ একটি হল। তার নামও পরিবর্তিত হয়ে হল অরূপরতন। সুদর্শনা এবং সুরঙ্গমা ছাড়া অন্য-সব নারীচরিত্র বাদ গেল। তখনো ছেলেমেয়েদের একত্র অভিনয়ে অনেকের আপত্তি ছিল। সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা বাদ গেলে নাটকের কিছুই থাকে না, তাই তাদের কোনো পরিবর্তন হয় নি। গানের দলে'র গান হিসেবে চব্বিশটির বেশি গান এই ক্ষুদ্র নাটকে জোড়া হয়েছিল। সুরঙ্গমার গান কমে গিয়ে মাত্র একটিতে দাঁড়াল। নব-সংযোজিত 'গানের দল' তার অনেক গান গ্রহণ করল। এ ছাড়া, ঠাকুরদা, বাউল, বালকদের গান রয়েছে। শান্তিনিকেতনে তখনো অভিনয়ে, গানে ছেলেদের দলের প্রাধান্য বেশি। এর প্রভাব রয়েছে এই পরিবর্তনে। নারীচরিত্রে ছেলেরা অভিনয় করেন।

১৩৩১ সালে কলকাতায় ১৩২৬ সালের অরূপরতন অবলম্বন করে একটি মূকাভিনয় করা হয়। এই অভিনয়ে বিদ্যালয়ের মেয়েরাই অংশগ্রহণ করেন। পিছন থেকে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে গান গেয়েছিলেন। কিন্তু গান অনেক কমে যায়, গুরুদেব কেবল আবৃত্তি করেছিলেন।

১৩৩৮ সালে গুরুদেবের ৭০ বছরের জন্মোৎসব-উপলক্ষে অরূপরতনের খুব বড়ো পরিবর্তন হল। নতুন দৃশ্য, নতুন গান অনেক এল—নাম দিলেন শাপমোচন। প্রথম দিকে ইন্দ্রসভার দৃশ্য আছে। শেষ দিকে আছে অন্ধকারের রাজা, রাণী ও তার সখী। ঘটনার প্রবাহ ঠিক রাখবার জন্যে গুরুদেব মাঝে মাঝে আবৃত্তি করলেন, গদ্যের ভাষায়। তার সঙ্গে মূকাভিনয় হল। গানের সঙ্গে হল নৃত্যাভিনয়। গান গাইল আলাদা গানের দল। এ সময়ে প্রকাশ্যে ছেলেদের সঙ্গে নাচ গান অভিনয় করার অধিকার মেয়েরা পেয়েছিলেন। এই নৃত্যনাট্যটি বহুবার অভিনীত হয়। এবং প্রতি-বারই গায়ক, গায়িকা, নর্তক, নর্তকীদের দক্ষতা অনুযায়ী তাঁকে গানের অদলবদল করতে হয়েছে। এরকম সর্বদাই করতেন। শান্তিনিকেতনে জীবনের শেষ দিকে একবার ডাকঘর অভিনয়ের সময় মাধব দত্তের ভূমিকায় উপযুক্ত অভিনেতা পাচ্ছিলেন না। তখন আশ্রমের কোনো একজন মহিলার অভিনয়-নৈপুণ্যের কথা তাঁকে জানানো হয়, তার ফলে মাধব দত্তের সঙ্গে তার স্ত্রীকে নাটকে ঢোকালেন। মাধব দত্তের কথা প্রায় কিছুই রাখলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এভাবে নাটকটির অভিনয় হয় নি।

১৩৪২ সালে কলকাতায় শেষবার গুরুদেব অরূপরতনের অভিনয় করালেন। নিজে ঠাকুরদার অংশ গ্রহণ করলেন। তখন তাঁর বয়স ৭৪ বছর। এই বয়সে কণ্ঠে আগের মতো আর শক্তি না থাকায় ঠাকুরদার কতগুলি গান তিনি আমাকে গাইতে

নির্দেশ দেন। ঠিক হল আমি ঠাকুরদার চেলা সেজে সব সময় তাঁর পিছনে রঙ্গমঞ্চে ঘুরব, গানের সময় তাঁর সঙ্গে গান গাইব। এইভাবেই কয়েকটি গান আমি গেয়েছিলাম। এইবারে অরূপরতনে আরো পরিবর্তন করা হয়। অনেক নতুন গান রচিত হল, অনেক পুরানো গান বাদ পড়ল। এবারে সুরঙ্গমার গান অনেক বাড়ল। কারণ নাচের যুগ এখন। গানের ভাব নৃত্যে প্রকাশ করা আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়েছে। শ্রীমতী অমিতা ঠাকুর ও শ্রীমতী নন্দিতা দেবী যথাক্রমে সুদর্শনা ও সুরঙ্গমার ভূমিকা গ্রহণ করলেন। নন্দিতা দেবী তখন শান্তিনিকেতনে ছাত্রীদের মধ্যে নৃত্যে অন্যতম প্রধান। নৃত্যে অভিনয় করার অসুবিধা নেই দেখে, সুরঙ্গমার গান বাড়ানো হল। কিছু নারীচরিত্র আবার নতুন করে স্থান পেল। আগেকার 'গানের দল' আর রইল না। তার প্রয়োজন তখন ফুরিয়েছে।

মৃত্যুর বছর খানেক আগে ঠিক হল পয়লা বৈশাখে অরূপরতনের অভিনয় হবে। গুরুদেব নিজে সেবারে কোনো অংশ নিলেন না। তাঁর শরীর তখন খুব দুর্বল ও অসুস্থ। তবে তাঁর সামনেই মহড়ার ব্যবস্থা হয়। যাঁরা উৎসাহ করে এ কাজে হাত দিয়েছিলেন, তাঁরা শেষ পর্যন্ত নাটকটি দাঁড় করাতে না পারায়, গুরুদেব ঠিক করলেন পয়লা বৈশাখে আমবাগানে সকালের অনুষ্ঠানে নিজে নাটকটি পড়বেন। আর আমরা গানের দল কেবল গানগুলি গেয়ে শোনাব। সেই ভাবেই নাটকটি সেবার পড়া হয়।

কবিতা, গল্প, উপন্যাসের লেখক সম্পূর্ণ নিজের মতো করে লিখতে পারেন। তাঁর স্বাধীনতা অনেক। কিন্তু নাটকের বেলা লেখকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে না। কাদের দিয়ে নাটক করানো হবে, কোথায় নাটকটি হবে, দেখবে কারা—এই-সব নাট্যকারকে ভেবে দেখতে হয়। প্রযোজনার নানা সুবিধা-অসুবিধা বিচার করে নাটক রচনা করতে হয়। অমন যে হ্যামলেট, তার সৃষ্টির পিছনেও নাকি আছে শেক্সপীয়রের সমসাময়িক অভিনেতা রিচার্ড বারবেজের চরিত্র। তাঁর অভিনয়ের বিশেষ ধারায় দক্ষতা, যে ধরনের কথা আবৃত্তি করতে তিনি ভালোবাসতেন এবং অঙ্গভঙ্গি দেখাতে ভালোবাসতেন—এ-সবের অসামান্য প্রভাব রয়েছে হ্যামলেটের ব্যক্তিত্বে। কিন্তু তবুও বারবেজের আধারটি ছাপিয়ে হ্যামলেট অনেক ঊর্ধ্বে উঠেছে। গুরুদেবের বেলাতেও সেই প্রয়োজনের 'প্রান্ত হতে অমর্ত্যের পেয়েছি সন্ধান'।

রবীন্দ্র-জীবনের শেষ বৎসর

গুরুদেবের জীবনের শেষ বৎসরটিকে নানা জনে নানা দিক থেকে দেখেছেন, এবং লোকসমক্ষে তাঁর এই দিনগুলির বিবরণ প্রকাশ করে দেখিয়েছেন। জীবনের আরম্ভ থেকেই গুরুদেবকে আমরা পেয়েছি সব সময় আমাদের মধ্যে, কিন্তু তখন খুব নিকট থেকে তাঁকে বোঝবার শক্তি হয় নি। যখন বড়ো হয়ে উঠলাম, তখন থেকেই তাঁর সাহচর্য পেতে লাগলাম। আমাকে তৈরি করতে লাগলেন তাঁর বহুবিধ কর্মজীবনের একদিকে আমাকে চালনা করবার ইচ্ছায়। তাঁর সৃষ্টি নাচগান অভিনয় উৎসবের কাজে তিনি আমাকে লাগিয়েছেন। এ দিক থেকে তাঁর জীবনের শেষ বৎসরটি কিভাবে কেটেছিল তারই একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করব।

তিনি ছিলেন চিরকাল গানে পাগল, গান গেয়েছেন, রচনা করেছেন, সকলকে গাইয়েছেন। কিন্তু শেষদিককার অসুস্থতার সময় তাঁর শ্রবণশক্তি কমে এসেছিল বলে গান শুনতেও বাধা হত; গান-রচনা করতে আর উৎসাহ পেতেন না, কিন্তু শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে থাকতেন। ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে প্রায়ই সন্ধ্যার অবসরে তাঁকে গান শোনাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, নিজেও গেয়েছি, সব সময় আনন্দ দিতে পেরেছি কি না জানি নে।

নিজে থেকে গান শোনবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে তিনি সংকোচ বোধ করতেন। তাঁর চিরকালেরই স্বভাব ছিল নিজের সুবিধার জন্যে অপরের সাহায্য না নেওয়া। নিজের দৈহিক সেবার জন্যে সুস্থশরীরে অপরের সাহায্য গ্রহণ করা গুরুদেবের পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমাদের শিশুবয়সে তাঁকে দেখেছি নিজের কাজ প্রায় নিজে করেছেন; তখন তাঁর সেবায় নিযুক্ত থাকত মাত্র একটি ভৃত্য। পাছে নিয়মিত গান শোনাবার দায়িত্বে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি এ আশঙ্কায় তিনি বলতেন, "তোদের যখন সুবিধা হয় আসিস।" আমরা তখন তাঁর ইচ্ছামত হয়তো তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারি নি, নানাপ্রকার বাধা পড়েছে তাতে— তাঁর ইচ্ছার প্রতি তখন গুরুত্ব দিই নি। তাঁর মৃত্যুর পরে সে ভুল বুঝেছি।

তাঁর কাছে গাইবার জন্যে ফরমাশ পেতুম তাঁর যৌবনে রচিত গানগুলি থেকে, সেইগুলিই তখন ছিল তাঁর খুব প্রিয় গান। তারই কয়েকটি গানের উল্লেখ এখানে করি : 'আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে', 'মরি লো মরি', 'তোমার গোপন কথাটি' 'কাঙাল আমারে কাঙাল করেছ', 'হেলাফেলা সারা বেলা', 'আমার পরান লয়ে কী খেলা খেলাবে', 'বড়ো বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে', 'আমার মন মানে না' ইত্যাদি। প্রায়ই বলেছেন, এই সময়ের গানগুলি তাঁর মনে যেভাবে চিহ্ন রেখে গেছে এমনটি জীবনের পরবর্তী কালে রচিত গানে হয় নি। ইদানীংকার গান আমাদের মুখে শুনে তাঁর অনেক সময় নতুন ঠেকত, পরিহাস করে বলতেন, "এ কি আমারই রচনা, আমি তো মনেই করতে পারি না যে কবে আমি এ গান রচনা করেছি। তবে শুনে মনে হচ্ছে যেন আমারই।" পুরোনো গানগুলির প্রসঙ্গে প্রথম-যৌবনের সেই-সব দিনের বর্ণনা করতেন। বলতেন, কিরকম ক্ষ্যাপার মতো এ-সব গান গেয়ে তাঁর সময় কাটত। সেদিনের কলকাতা এত শব্দমুখর ছিল না, বিজলী-বাতির রোশনাইও তখন

জ্যোৎস্নাকে আচ্ছন্ন করে নি। এই রকমের পূর্ণিমারাত্রে, পাতলা একখানি উড়ানি গায়ে, গ্রীষ্মের দক্ষিণ বাতাসে তেতালার ছাদে পায়চারি করেছেন, একলা অনেক রাত পর্যন্ত— চারি দিকে শুভ্র জ্যোৎস্না, চাদরের এক কোণে বাঁধা থাকত বেলফুলের কুঁড়ি। তখন গান গেয়েছেন প্রাণ খুলে, সমস্ত পাড়া সেই গানে গমগম করে উঠত। তিনি বলতেন, সেই গলা একবার পেয়ে আবার হারানোর মতো দুঃখ আর কিছু হতে পারে না।

রোগশয্যায় গান শোনাবার সময় নানা বিষয়ে অল্পবিস্তর আলাপ-আলোচনা হত তাঁর সঙ্গে। ছোটোবেলাকার কতরকমের গান গেয়ে শোনাতেন, তাঁর গুরু বিষ্ণুর শেখানো গ্রাম্য ছড়ার গান, তারই দু-একটি তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁর 'ছেলেবেলা'য়। আলোচনাপ্রসঙ্গে এটুকু বুঝেছি যে, তিনিও মনে করতেন তাঁর সাহিত্য নিয়ে যতখানি আলোচনা হয়েছে তাঁর গান নিয়ে ততখানি আলোচনা এখনো হয় নি। তাঁর গানে যে আলোচনা করবার বিষয় আছে সেটা তিনি অনুভব করতেন, কিন্তু নিজের রচনার সম্বন্ধে স্বাভাবিক সংকোচবশত নিজের গানের বিষয় নিয়ে খুলে আলোচনা করেন নি একেবারেই। তাঁর গান ভারতীয় সংগীতে কতখানি নূতনত্ব বা বৈশিষ্ট্য এনেছে খুঁটিয়ে তা তিনি ভাবেন নি, কিন্তু এটুকু জানতেন যে, সব মিলিয়ে তাঁর গানে এমন কিছু তৈরি হয়েছে যার থেকে বর্তমান রচয়িতারা যেভাবে সাহায্য পাচ্ছে ভবিষ্যৎ যুগেও তা পাবে। বিস্তারিত আলোচনা হলে এর শক্তি কতদূর, এর স্থান কোথায় সে কথা বোঝা যাবে, এইজন্যেই তিনি আলোচনা হোক তাই চাইতেন।

যে-কারণেই হোক তাঁর মনে ধারণা হয়েছিল যে, গানবাজনায় আগেকার মতো মাথা তাঁর খোলে না। গানরচনার কথা উঠলেই বলতেন, "তুই তো বলিস, কিন্তু সে শক্তি কি আর আমার আছে, গলা দিয়ে সুর বেরতে চায় না।" এই রকম মানসিক অবসাদের ভিতরেও তিনি গানরচনার উৎসাহ সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ করে রাখতে পারেন নি। কয়েকটি গান রচিত হয়েছিল, কিন্তু পূর্বের মতো গানের সে প্রবাহ আর দেখা দেয় নি। সুরযোজনা করা ও সেই সুর মনে করে শেখানোতে যে পরিশ্রম হয় তার অর্ধেক পরিশ্রম কবিতারচনায় তাঁর হত না। তাই কবিতার স্রোত শেষ পর্যন্ত অবারিত ছিল। রোগশয্যায় যখন নিজের হাতে লিখতে পারতেন না তখন প্রায়ই অতি প্রত্যুষে ঘুম ভাঙত তাঁর নূতন কবিতা-আবৃত্তির সঙ্গে, সেবক-সেবিকারা প্রস্তুত হয়ে থাকতেন সে কবিতা লিখে রাখবার জন্যে।

যদিও তিনি বলতেন তাঁর গানের বুদ্ধি হারিয়েছে, কিন্তু সেই বৎসর পৌষ মাসে যে-কয়টি গান রচনা করেছিলেন, তার ভিতরে সুরযোজনা-ক্ষমতার কিছু অভাব ঘটেছিল বলে আমার মনে হয় না। বলেছেন— গলায় সুর খেলে না, অথচ গানে সুর যে-পর্যন্ত ওঠানামা করেছে তাতে আগের দিনের গানের তুলনায় অকৃতকার্যতার পরিচয় নেই। 'উর্বশী' কবিতাটি অগ্রহায়ণ মাসের শেষের দিকে একটি সুন্দর গানে পরিণত হল। গানে সুরযোজনা করতে তাঁর কষ্ট হত বুঝতাম, যখন দেখতাম উঁচুতে সুর তুলে মাঝে মাঝে দুর্বলতার জন্য তাঁর কণ্ঠ অকৃতকার্য হত। জানি না আমারই ভ্রম কি না। মনে হত যেন সেই না-পারার বেদনা তিনি বিশেষভাবে গোপন করতে চাইছেন। কখনো বলে উঠতেন, "সুরটা বুঝতে পেরেছিস তো, ঠিক করে নিস।"

তখন ভেবেছি, যিনি সমস্ত জীবন এত গাইলেন, এত রচনা করলেন, যাঁর কণ্ঠের গান শোনবার জন্যে এক সময় কত লোকেই না পাগল হয়েছে, আজ সেই মহাপুরুষের এ কি বিড়ম্বনা, অন্তরে গানের প্রেরণা সতেজ, কিন্তু কণ্ঠে নেই সেই সুর, সেই শক্তি। এইজন্যেই আগেকার মতো গানরচনা করার কথা বলে তাঁকে দুঃখ দিতে কণ্টবোধ হত, তাঁকে গান শোনাতে গিয়ে বিশেষ ভাবনা হত যখন তিনি আনন্দে নিজেই গান গেয়ে উঠতেন। অলপক্ষণ গেয়ে বার্ধক্যকম্পিত রোগদুর্বল কণ্ঠ শ্রান্ত হয়ে পড়ত। যেদিন শরীর ও মন অপেক্ষাকৃত সবল থাকত সেদিন হয়তো আরো বেশিক্ষণ আপন মনে সেই-সব আগেকার দিনের গান গেয়েছেন—কখনো ব্রহ্ম-সংগীত, কখনো হিন্দী গানের কয়েকটা লাইন, কখনো বিনা কথায় কেবল সুর ভেঁজেছেন, আবার কখনো নিজের রচিত পুরোনো গান গেয়েছেন, শুনে বোঝা যেত আজকে তাঁর শরীরমন সুস্থ আছে। পরিহাসচ্ছলে দৌহিত্রী শ্রীমতী নন্দিতা দেবীকে দেখিয়ে বলতেন, "গাইতে লজ্জা হয়, পাছে ওরা সব আড়ালে হাসে, আমার বেসুরো গলার গান শুনে।"

অসুস্থ শরীরে অভিনয় ও নাচগানের মহড়ায় তিনি যোগ দিতে পারতেন না, কিন্তু মন তাঁর সব সময় থাকত সেইদিকে। ১৩৪৭ সালের পৌষ মাসে 'শাপমোচন' অভিনীত হল, সেই অসুস্থতার মধ্যে নাটকের অদলবদল করে, নতুন কথা বসিয়ে, গানরচনা করে, তবে নিশ্চিন্ত হলেন। মহড়ার সময় পাশের ঘর থেকে শুনতে চেণ্টা করতেন কি রকম হচ্ছে গানবাজনা। সেখানে এসে আমাদের মধ্যে বসে সেই মহড়ায় যোগ দিতে না পারায় তাঁর মনে অস্বস্তি হত খুব। অভিনয়ের চেয়ে প্রতিদিনের মহড়াতেই তিনি বেশি আনন্দ পেতেন। ধীরে ধীরে একটা সৃষ্টি কেমন করে চোখের সামনে গড়ে উঠছে তা দেখে তিনি আনন্দ পেতেন। কোনোদিন হয়তো নিজেই এসে উপস্থিত হতেন রিহার্সালের আসরে। অভিনয়ের দিন তাঁকে আগেই বলে রাখা হত, এতটুকু ক্লান্তি বোধ করলেই যেন বলেন তাঁকে ঘরে নিয়ে যেতে, কিন্তু সম্ভব হত না। দেহের শক্তিতে না কুলোলেও জোর করে বসে থাকতে চাইতেন শেষ পর্যন্ত।

১৩৪৮ সালের নববর্ষে আমরা নাচ-গান ইত্যাদির আয়োজনে ব্যস্ত, কারণ গত কয়েক বৎসর ধরে নববর্ষে গুরুদেবের জন্মতিথি পালিত হচ্ছে ও সেই উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করা হচ্ছে। দিন তিন-চার পূর্বে সন্ধ্যায় তাঁর কাছে গিয়েছি, বারান্দায় বসে তাঁকে কিছু গান শোনানোর পর শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তী এলেন। তাঁকে দেখে নববর্ষের অভিভাষণ 'সভ্যতার সংকট'এর বিষয়বস্তুটি গুরুদেব মুখে বর্ণনা করে গেলেন। অমিয়বাবুকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে। লেখাটি কয়েকদিন আগেই শেষ হয়েছিল, বক্তব্য আরম্ভের পূর্বে বললেন যে, হয়তো আর বেশি দিন তাঁর এ কথা বলবার সামর্থ্য থাকবে না, এমন-কি, আর হয়তো বলবার সুযোগও হবে না, সুতরাং এবারেই তাঁর শেষ বক্তব্য দেশের কাছে বলে চুকিয়ে দেবেন। সমস্ত বক্তব্য-বিষয়টি ধীরে ধীরে বলে গেলেন, আমরা স্তব্ধ হয়ে শুনলাম শেষ পর্যন্ত।

আমার মনে হয় তিনি তাঁর অন্তরের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন অদূর ভবিষ্যতে দেশে কী আসছে, আগামী নববর্ষের বাণীর ভিতর দিয়ে সেই কথাই বলে গেলেন। শুনেছি,

এই দ্রষ্টা মহামনীষীর মনে অনেক সময় আগামী কালে যা ঘটবে তা ছায়াপাত করে যেত; তিনি উল্লেখ করেছেন যে, বিগত মহাযুদ্ধের পূর্বেই এই জগদ্‌ব্যাপী হিংসা ও রক্তপাতের আভাস তাঁর মনে বেদনা জাগিয়েছিল।[১]

মনে ভাবলুম গুরুদেব লিখে দেশকে নববর্ষের বাণী পাঠাচ্ছেন অথচ গানে কোনো বাণী দেবেন না তা হতে পারে না। পরের দিন গিয়ে বললাম, 'নববর্ষের প্রভাতে বৈতালিকের জন্য একটি নতুন গান রচনা করতে কি আপনার কষ্ট হবে?' প্রথমে আপত্তি করলেন, কিন্তু আমার আগ্রহ দেখে তা বন্ধ রাখতে পারলেন না। বললেন, "সৌম্য[২] আমাকে বলেছে মানবের জয়গান গেয়ে একটা কবিতা লিখতে। সে বলে আমি যন্ত্রের জয়গান গেয়েছি, মানবের জয়গান করি নি। তাই একটা কবিতা রচনা করেছি, সেটাই হবে নববর্ষের গান।" কাছে ছিলেন শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবী, তিনি গুরুদেবের খাতা খুলে কবিতাটি কপি করে আমাকে দিলেন। কবিতাটি ছিল একটু বড়ো, দেখে ভাবলাম এত বড়ো কবিতায় সুরযোজনা করতে বলা মানে তাঁকে কষ্ট দেওয়া। সুর দেবার একটু চেষ্টা করে সেদিন আর পারলেন না, বললেন, "কালকে হবে।" পরের দিন সেই কবিতাটি সংক্ষেপ করতে করতে শেষপর্যন্ত, বর্তমানে "ওই মহামানব আসে" গানটি যে আকারে আছে, সেই আকারে তাকে পেলাম। এই গানটির আরম্ভের রূপ দুটি আমি যে ভাবে পেয়েছিলাম এখানে তা তুলে দিচ্ছি—

১. ঐ মানব আসে
মহামানব আসে
দিকে দিগন্তে রোমাঞ্চ লাগে
সারা ধরণীর ঘাসে ঘাসে।
আজিকে বাতাসে ঘোষণা উঠিল
মহাজন্মের লগ্ন
অমাবস্যার নিবিড় আঁধারে
আকাশ আজিকে মগ্ন।

---

[১] ব্যক্তিগত জীবনেও অনেক সময় ভবিষ্যৎ দিনের আভাস তিনি পেয়েছেন, ও তার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আমার পিতৃদেবের একটি চিঠি (১৯১৩) উদ্‌ধৃত করি। এই সময় গুরুদেব বিলাতে পিতৃদেবও সেখানে এক কলেজের ছাত্র। চিঠিতে লেখা আছে—গুরুদেব সমুদ্রের উপর নববর্ষের উৎসব করলেন। খুব ভালো হয়েছিল। তিনি খুব অনুপ্রাণিত হয়ে সেদিন কথা বলছিলেন, "প্রতি নববর্ষে আমি সমগ্র বৎসরের একটা আভাস পাই। রথীর মার যে বৎসর [৭ অগ্রহায়ণ, ১৩০৯] মৃত্যু হয়, সেবারে নববর্ষে উৎসব জমেছিল। কিন্তু আমার মনে কেমন একটা ভাব হল। আমি বুঝলাম যেন এ বৎসরে একটা মৃত্যু আছে। আমি রথীর মাকে ঘরে নিয়ে বললুম যে, এ বৎসর একটা মৃত্যু আসছে। একটা মৃত্যুর চেহারা সম্মুখে রেখে আমাদের চলতে হবে, প্রস্তুত হতে হবে। তার পর তাঁর মৃত্যুর কিছু পূর্বে শিলাইদহ থেকে তাঁকে যে পত্র লিখেছিলুম, পড়ে দেখি সেই পত্রেও মৃত্যুর আভাস তাঁকে জানিয়েছিলুম। আমি নববর্ষটাকে সেই বিশেষ ভাবে দেখি। এবার সমুদ্র দেখলুম—সম্মুখের নববর্ষে আমার সেই বিশালের মধ্যে যাত্রা, নিজেকে সম্পূর্ণ ভাসিয়ে দিয়ে।"

[২] শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দানবপক্ষী অম্বরপথে
চালনা করিছে পক্ষ
মৃত্যুর বীজে কৃষির ক্ষেত্রে ভরি দিবে ছিল লক্ষ্য।
আজি জন্মের দিন,
স্বর্গলোকের বিজয়পতাকা
ঐ হল উড্ডীন।
থর থর করি ধরণী যখন
কাঁপিয়া উঠিল ত্রাসে
উঠিয়াছে রব মাভৈঃ মাভৈঃ
মহামানব আসে।
মন্ত্রমুগ্ধ যন্ত্রের দল
তার চরণের কাছে
মহামানব আসে
তিমির ভেদিয়া বিজয়পতাকা
উড্ডীন মহাকাশে।
কোথায় বাজিল শঙ্খ
কোথায় বাজিল ডঙ্ক।
জয় মানবের জয় মানবের
বাজে কণ্ঠে অসংখ্য ॥

ঐ মহামানব আসে আসে রে
ঐ মহামানব আসে।
দিকে দিগন্তে রোমাঞ্চ লাগিল
ধরণীর ঘাসে ঘাসে।
বাতাসে বাতাসে ঘোষণা উঠিল
এল মহাজন্মের লগ্ন
আকাশ আজিকে মগ্ন
মৃত্যুর বাহন দানবপক্ষী
পক্ষ হয়েছে আজ ভগ্ন
এল শুভজন্মের দিন
দিব্যলোকের আজি জয়যাত্রার পথে কিরণপতাকা উড্ডীন
উদয়শিখরপথে মাভৈঃ মাভৈঃ রব ঐ মহামানব আসে
দ্যুলোক ভূলোক আজি জ্যোতিবিভাসিত
নবজীবনের আশ্বাসে
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নরলোকে বেজে ওঠে ডঙ্ক

জয় জয় মানবের জয় মহামানবের
বেজে ওঠে কণ্ঠে অসংখ্য ॥

১৩৪৮ সালের ২৫ বৈশাখে গুরুদেবের জন্মোৎসব নিয়ে সমস্ত বাংলাদেশ যখন মেতে উঠল, সেই উপলক্ষে কলকাতার একটি কর্তব্য সেরে এসে আমার চট্টগ্রামে আর-একটি কর্তব্য সম্পাদনের জন্য রওনা হবার কথা। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে গেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, পঁচিশে বৈশাখের দিন এখানে কী হবে। কথাবার্তায় বুঝলাম সেই জন্মদিন উপলক্ষ করে নৃত্যগীত ইত্যাদির আয়োজন হোক এই তাঁর ইচ্ছা। জন্মদিনের আগে একদিন সন্ধ্যায় প্রশ্ন করি, "উৎসবের সময় 'আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আসি ফিরে' গানটি কি গাইব।" তাঁর জন্মদিনের গানের কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে আপত্তি করে বললেন, "তুই বেছে নে, আমার জন্মদিনের গান আমি বেছে দেব কেন।" একটু পরে উপরের গানটির প্রসঙ্গে অনেক কথা বলে গেলেন। কথার ভাবে বুঝেছিলাম যে, দেশ তাঁকে সম্পূর্ণ চিনল না এই অভিমান তখনো তাঁর মনে রয়েছে। বলেছিলেন, "আমি যখন চলে যাব তখন বুঝবে দেশের জন্য কী করেছি।" খানিকক্ষণ নীরব হয়ে থেকে 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে' গানটি প্রাণের আবেগে গেয়ে উঠলেন। বুঝলাম দেশ তাঁকে বুঝতে পারে নি এ অভিমান যতই থাকুক-না কেন, দেশের প্রতি ভালোবাসা তাঁর কোনোদিন কমতে পারে না।

পরের দিন সকালে তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, "আপনি নিজের জন্মদিন উপলক্ষে কবিতা লিখেছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন, অথচ একটা গান রচনা করলেন না এটা ঠিক মনে হয় না। এবারের পঁচিশে বৈশাখে সমস্ত দেশ আপনার জন্মোৎসব করবে, এই দিনকে উপলক্ষ করে একটি গান রচনা না হলে জন্মদিনের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয় না।"

শুনে বললেন, "তুই আবার এক অদ্ভুত ফরমাশ এনে হাজির করলি। আমি নিজের জন্মদিনের গান নিজে রচনা করব, লোকে আমাকে বলবে কি। দেশের লোক এত নির্বোধ নয়, ঠিক ধরে ফেলবে যে, আমি নিজেকে নিজেই প্রচার করছি। তুই চেষ্টা কর এখানে যাঁরা বড়ো বড়ো কবি আছেন, তাঁদের দিয়ে গান লেখাতে।" বলেই তাঁদের নাম বলতে শুরু করলেন। আমি হাসতে লাগলাম, তিনি বললেন, "কেন তাঁরা কি কবিতা লিখতে পারেন না মনে করিস?" উত্তরে বললাম, "আপনি থাকতে অন্যদের কাছে চাইবার কি প্রয়োজন—যখন জন্মদিনের কবিতা লিখেছিলেন, তখন কি কেউ আপনাকে দোষী করেছিল? রাজী হয়ে জন্মদিনের কবিতাগুলি সব খুঁজে আনতে বললেন দপ্তর থেকে। 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাটির 'হে নূতন দেখা দিক আরবার' অংশটি একটু অদলবদল করে সুর যোজনা করলেন। সেদিন ২৩ বৈশাখ। পরের দিন সকালে পুনরায় গানটি আমার গলায় শুনে বললেন, "হাঁ, এবার হয়েছে।"

সেদিন এ কথা ঘুণাক্ষরেও মনে হয় নি এই তাঁর জীবনের সর্বশেষ গান।

এই বৎসরে যে কয়টি গান সব সমেত রচিত হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছাড়া সবকটিতেই তিনি ভৈরবী রাগিণী ব্যবহার করেছেন। এরকম কেন হল সেই প্রশ্নই বার বার মনে জাগে।

এই জন্মোৎসবের রাত্রে সর্বক্ষণ তিনি নাচগান-অভিনয়ে আনন্দের সঙ্গেই যোগ দিয়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত বসে ছিলেন।

এখানকার জন্মোৎসব শেষ করে পূর্ববঙ্গের নানা স্থানে ঘুরে এসে শুনলুম গুরুদেব আমার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তিনি চান যত তাড়াতাড়ি হোক সংক্ষেপে বর্ষামঙ্গলের আয়োজন করি, কারণ এ অঞ্চলে বর্ষা এ বছর ইতিমধ্যেই বিপুল সমারোহে দেখা দিয়েছিল, তাঁর মনও তাই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। শান্তিনিকেতনে সকলে জড়ো হবার আগেই বর্ষামঙ্গল করবার অসুবিধা ছিল, তাই মনে করেছিলাম কয়েকদিন অপেক্ষা করে আয়োজন করা যাবে। এর মধ্যেই একদিন সন্ধ্যায় বর্ষার ঘনঘটায় গুরুদেবের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তাই কিছু বর্ষার গান তাঁকে শোনালাম। বর্ষার সঙ্গে তাঁর মনের যে কী যোগ ছিল জানি না, কিন্তু বার বার দেখেছি, বর্ষার দিনে তিনি যেরকম চঞ্চল হয়ে উঠতেন সাধারণ মানুষের মধ্যে তা বিরল।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বর্ষার গান রচনা করতে তাঁর ইচ্ছা করে কি না। বলেছিলেন, "ইচ্ছা থাকলেও পেরে উঠব না, গলায় সে শক্তি নেই, ভাবতে পারি না।" এই সময় থেকে তাঁর অসুস্থতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল। তবু এত শীঘ্র যে তিনি লোকান্তরিত হবেন আমরা অনেকেই তা কল্পনাও করি নি। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল কলকাতায়, আর ফিরলেন না। তখন মনে হল, হয়তো এইজন্যেই তিনি বর্ষামঙ্গল করবার জন্যে এত চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। অন্তরে মৃত্যুর ডাক শুনেছিলেন নিশ্চয়ই, বুঝেছিলেন এমন বর্ষার ঋতু এবার তাঁর কাছে বৃথাই যাবে যদি না সত্বর আয়োজন হয়— আমরা তাঁর সে ইঙ্গিত ধরতে পারি নি। তাঁর তিরোধানের মাসখানেক পরে যখন বর্ষামঙ্গলের আয়োজন করলাম, তখন কেবল এই কথাই মনে করেছি, তাঁর ইচ্ছা তখন পূরণ করতে পারি নি, আজ তিনি যে লোকেই থাকুন যেন আমাদের মধ্যে এসে এই বর্ষামঙ্গলের আনন্দে যোগ দেন, এ উৎসব আমরা তাঁর উদ্দেশেই করছি— যদি উৎসব সার্থক হয় বুঝব তিনি ছিলেন আমাদের মধ্যে, আমাদের অর্ঘ্য তিনি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

সংগীতের শিক্ষায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ

কলাবিদ্যার চর্চা যে মানুষের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ এ কথাটা যে-কোনো কারণেই হোক ইংরেজদের শাসনের যুগে ভারতবাসী বুঝতে পারে নি। সেই কারণেই সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চাঙ্গ শিক্ষাক্রমের মধ্যে ঐ যুগে সংগীত ও চিত্রকলার কোনো স্থান ছিল না, এবং ঐ যুগের শিক্ষাবিদ্‌দের মধ্যে এমন আর কাউকেই দেখা যায় নি যিনি সাহসের সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন যে, কলাবিদ্যার চর্চা বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে সম্মানজনক স্থান পাক। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথই প্রথম এ-বিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন, এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে কার্যকরী ভাবে তাঁর ঐ চিন্তাকে রূপদানের কাজে উৎসাহের সঙ্গে নেমে পড়েন। পরে দেশবাসীকে তাঁর লেখার দ্বারা তাঁর বক্তৃতার দ্বারা বারে বারে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, কেন তিনি বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে কলাবিদ্যার চর্চাকে রাখতে চান। এ বিষয়ে আলোচনা করার আগে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বা আদর্শ বলতে গুরুদেব নিজে কি ভাবতেন সেইটিই আমাদের প্রথম জানতে হবে। এ-বিষয়ে গুরুদেব বলেন—

"বিদ্যাশিক্ষার নিম্নতর লক্ষ্য ব্যবহারিক সুযোগ-লাভ অথবা উচ্চতর লক্ষ্য মানবজীবনের পূর্ণতাসাধন।"

"How to live a complete life is, according to me, the purpose of education."

Complete life কথাটিকে ভালো করে বোঝাতে গিয়ে বললেন—

"Our education should be in full touch with our complete life, economical, intellectual, aesthetic, social and spiritual."

বিশ্বভারতীর পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার রূপটি অনেকে দেখতে পান না বলে গুরুদেব দুঃখ করে এক জায়গায় বলেছেন যে—

"বাইরে থেকে এখানে যাঁরা আসেন তাঁরা আশ্রমের এই বিপুল সমগ্রতার রূপটি দেখতে পান না।"

"আমাদের অনেক ছাত্র আশ্রমের সম্পূর্ণ রূপটি না দেখে চলে গিয়েছে। অবশ্য এ অপরিহার্য, সকলের শক্তি সমান নয়। আমি যখনি উপলক্ষ পেয়েছি তখনি জীবনের এই পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, জীবনের কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে চেষ্টাকে নিবদ্ধ করি নি।" এইরূপ "পূর্ণতার আবির্ভাব মানুষ যেখানে দেখেছে কথায়, সুরে, রেখায়, বর্ণে, ছন্দে, মানবসম্বন্ধের মাধুর্যে, বীর্যে সেইখানেই সে আপন আনন্দের সাক্ষ্যকে অমরবাণীতে স্বাক্ষরিত করেছে।"

গুরুদেবের মতে, মানুষের সমগ্র জীবনের প্রকাশ চেষ্টার অঙ্গ হিসেবেই কলা-বিদ্যার উৎপত্তি, এবং যে জাত সংগীত ও ললিতকলার বিদ্যা থেকে বঞ্চিত তারা চিরমৌন থেকে যায়, সুতরাং তারা অপূর্ণ।

শিক্ষাক্ষেত্রে এইরূপ চিন্তার অভাব ছিল বলেই বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পূর্বে তিনি বলেছিলেন, "শিক্ষার এইরূপ সংকীর্ণতার মধ্যে আমাদের জীবন ক্রমে বিকলাঙ্গ

হয়ে পড়ছে। অতঃপর একে প্রশ্রয় দেওয়া কোনোমতেই আর উচিত হবে না। আমরা এই যে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনার প্রস্তাব করছি সেখানে সংগীত এবং ললিতকলাকে সম্মানের আসন দিতে হবে।" কিম্বা "বিশ্বভারতী যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারতীয় সংগীত ও চিত্রকলা শিক্ষা তাহার প্রধান অঙ্গ হইবে—এই আমাদের সংকল্প হউক।"

আমরা জানি কলাবিদ্যার চর্চার ব্যবস্থা শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই তিনি করেছিলেন। তখন দেশের শিক্ষিতদের সামনে এতখানি জোরের সঙ্গে ঐ কথাগুলি বলতে পারেন নি তাঁর ঐ কাজের সমর্থনে। কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে একজন শিক্ষককে সংগীতের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যে কথা বিদেশ থেকে চিঠিতে লিখেছিলেন তাতেও তাঁর চিন্তা যে কী আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল পরিষ্কারভাবে তা বুঝতে পারি। তাতে লিখছেন—"আমাদের বিদ্যালয়ে আজকাল গানের চর্চাটা বোধহয় কমে এসেছে, সেটা ঠিক হবে না, ওটাকে জাগিয়ে রেখো। আমাদের বিদ্যালয়ের সাধনায় নিঃসন্দেহ ওটা একটা প্রধান অঙ্গ। শান্তিনিকেতনে বাইরের প্রান্তরশ্রী যেমন অগোচরে ছেলেদের মনকে তৈরি করে তোলে তেমনি গানও জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলবার একটা প্রধান উপাদান।...ওরা যে সকলে গাইয়ে হয়ে উঠবে—তা নয়, কিন্তু ওদের আনন্দের একটা শক্তি বেড়ে যাবে, সেটাতে মানুষের কম লাভ নয়।"

গুরুদেব নিজে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় স্থাপনার পূর্বে সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-পদ্ধতির কোনো ধারার সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত ছিলেন বলে জানা যায় না। কাজ আরম্ভ করে, কাজের সুবিধা-অসুবিধার দিক বিবেচনা করে ধীরে ধীরে তাঁর মনে বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-পদ্ধতি বিষয়ে একটা সঠিক মতামত গড়ে ওঠে। তাঁর শিক্ষণ-পদ্ধতির মূল কথা হল, ছাত্রছাত্রীদের সামনে শিক্ষণীয় বিষয়ের এমন একটা পরিবেশ বা আবহাওয়া রচনা করতে হবে যে, তার দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের মন আপনা থেকেই সেদিকে আকৃষ্ট হয়। প্রতিদিন রুটিন-মতো ক্লাসে পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক শিক্ষককে ভাবতে হবে যে, সেই-সব শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি ছাত্রছাত্রীর মন কি করে আকৃষ্ট করা যায়। যে বিষয়ে শিক্ষকের কাছ থেকে ছাত্ররা শিখবে সে বিষয়টির প্রতি শিক্ষকের অনুরাগ যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশ পাওয়া দরকার। এটি হল পরিবেশ বা আবহাওয়া-রচনার একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় দিক। এ ছাড়া রচনা করতে হবে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিদিনকার ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার মতো পরিবেশ। এ দুটিই হল গুরুদেবের শিক্ষাপদ্ধতির মূলকথা। এই পদ্ধতিতে তাঁর বিশ্বাস যে কতখানি দৃঢ়তা লাভ করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নোক্ত উক্তি-ক'টি থেকে। তিনি লিখছেন—

"In education, the most important factor must be the inspiring atmosphere of creative activity." ছাত্রদের শেখানোর সময় "The atmosphere is a great deal more important than rules and methods, building appliances, class teaching and text books." সেই কারণে বলছেন —I tried to create an atmosphere in my institution, giving it the principal place in our programme of teaching" এবং এই পরীক্ষায় সফল

হয়ে বললেন, "An atmosphere was created, and what was important, this atmosphere provided the students with a natural impulse to live in a harmony with it."

অনুকূল পরিবেশই যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষার আদর্শপথ এ বিষয় স্থির-নিশ্চয় হয়ে তিনি শান্তিনিকেতনের শিক্ষায় সংগীতকে কিভাবে একই আদর্শে পরিচালিত করেছিলেন এবারে আমরা সেই দিক নিয়ে আলোচনা করব। প্রথমে আমরা দেখব যে, এ পথে কাজের দ্বারা গুরুদেবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের কী জানাচ্ছে। এ-বিষয়ে প্রথম তাঁর লিখিত উক্তিটির সাহায্যে যা জানতে পাই তা আছে ১৯১৬ সালের "My School" নামে তাঁর একটি প্রবন্ধে। সেখানে তিনি লিখছেন—

"When I first started my school my boys had no evident love for music. The consequence was that at the beginning I did not employ a music teacher and did not force the boys to take music lessons. I merely created opportunities when those of us who had gift could exercise their musical culture. It had the effect of unconsciously training the ear of the boys. And when gradually most of them showed a strong inclination and love for music, I saw that they would be willing to subject themselves to formal teaching and it was then that I secured a music teacher."

কিন্তু শিক্ষক নিযুক্ত করেও কেবলমাত্র ক্লাসের দ্বারা গান শেখানোর পদ্ধতিতে ভালো ফল পাওয়া যায় না বলেই আবার বলছেন, "I tried to educate them through play-acting, through listening to music in a natural manner, and not merely by class teaching. And this was my method. I knew the children's mind.

"I had musical evenings—not merely music classes, and those boys who at first did not have any special love of music would, out of curiosity, listen to our songs from outside, and gradually they too were drawn in to the room and their taste for music developed."

এই আবহাওয়া সৃষ্টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে তিনি আরো একটি উপায় স্থির করে দিয়েছিলেন। সেটি হল ছাত্র-ছাত্রীদের মনে গান গাইবার উৎসাহ জাগানোর জন্যে উপলক্ষের সৃষ্টি। তিনি দেখলেন গান গাইবার উপলক্ষটিকে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে রাখলে তখন তারা যে উৎসাহে গান শেখে সেইরূপ উৎসাহ গানের ক্লাসের শিক্ষায় তারা প্রকাশ করে না। তাই শান্তিনিকেতনে নানাপ্রকার উৎসব-অনুষ্ঠান, সভা-সমিতিতে গানকে করলেন কর্মসূচীর একটি প্রধান অঙ্গ। গান ছাড়া এর কোনোটিই যে সম্পূর্ণ হবে না—এ ধরনের একটা মনোভাব এখানকার সকলের মধ্যেই তিনি ধীরে ধীরে জাগিয়েছিলেন। এই উপলক্ষগুলিকেই সামনে রেখে এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা নানা বিষয়ের ও ঢঙের বহু শত গান ক্রমাগত শুনছে

এবং শিখছে। এ শিক্ষা সম্পূর্ণ আনন্দের আবেষ্টনের শিক্ষা, এর পিছনে কোনোপ্রকার জোরজবরদস্তি নেই। এ-সব গান তারা শেখে নিজেদের প্রেরণায়। তারা জানে, এই-সব উপলক্ষে গান গাইতে না পারার দ্বারা যে অসম্পূর্ণতা ঘটে, এর জন্যে লজ্জা যদি পেতে হয় তবে তা পেতে হবে তাদেরই।

শান্তিনিকেতনের সংগীতের শিক্ষাকে সহজ ও আনন্দময় করে তোলার জন্যে এই ভাবের কতরকমের উপলক্ষ যে এখানে গড়ে তোলা হয়েছে, তার একটি তালিকা দিই। তাতেই বুঝতে পারা যাবে যে, এর প্রয়োজনে কত বিচিত্র বিষয়ের গান এখানকার ছাত্রছাত্রীদের গাইতে হয়। যেমন—প্রতিদিন সকালে ক্লাসের আরম্ভের আগে সমবেত উপাসনা। প্রতি বুধবারে মন্দিরে উপাসনা। বর্ষশেষ, নববর্ষের উপাসনা ও সভা। স্মরণীয় ব্যক্তি ও মহাপুরুষদের জন্মদিন ও মৃত্যুদিনের উৎসব ও উপাসনা। নানা-প্রকার ঋতু-উৎসব, যেমন বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, দোল-উৎসব। প্রতিষ্ঠাদিবস ও সমাবর্তনদিবসের অনুষ্ঠান। গৃহপ্রবেশ ও ভিত্তিস্থাপন। নানাপ্রকার সভা, সমিতি, সম্মেলন। এ ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা পরিচালিত নিয়মিত সাহিত্যসভা ও জলসা-গুলি। গুরুদেবের গীতবহুল নানাপ্রকার নাটকের অভিনয়। স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান ইত্যাদি আরো কত কী। এ-সবের প্রয়োজনে সারা বছরে বেশ কয়েক শত গান সকলকে শুনতে হয় ও গাইতে হয়।

শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা আরম্ভে নিচু শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে নিয়মিত ঐ-সব অনুষ্ঠানের গানে যদি যোগ দেয় তা হলে দেখা যাবে যে, নয় বৎসর পরে, প্রবেশিকা পরীক্ষার সময়ের মধ্যে সহজে, অন্য-সব শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে, বহু গান শিখে নিয়েছে। এর মধ্যে পাবে বিষয়বৈচিত্র্য, রাগ-রাগিণী-বৈচিত্র্য, আর ছন্দ বা তাল -বৈচিত্র্যপূর্ণ নানারকমের গান। আমি আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, ঐ-সব উপলক্ষকে সামনে রেখে আমাদের ছাত্রজীবনে আমরা সবচেয়ে বেশি গান শিখেছি। শিশুবয়সের উপযোগী নয় এমন-সব রাগিণী তাল ও ভাবের গান আমরা তখন থেকেই শুনেছি এবং আমাদের তা গাইতেও হয়েছে। কিন্তু কোনো সময়েই আমরা মনে করি নি যে, গানটা কঠিন বা আমাদের উপযোগী নয়। গানের অর্থ আমরা বুঝতে চেষ্টা করি নি। বোঝাবার চেষ্টা করলেও যে সেই শিশুবয়সে তার এক বর্ণ আমাদের হৃদয়ঙ্গম হত তা মনে করি না। আমাদের কাছে যে তার কোনো প্রয়োজন আছে তাও আমরা বোধ করি নি। আমরা মোটামুটি ভাবে বুঝতে চেষ্টা করতাম যে, কী উপলক্ষে গানগুলি আমাদের গাইতে হবে। তাই, তাকে জড়িয়ে গানের মোটামুটি একটা অর্থ আমরা ভেবে নিতাম। গানের প্রকৃত অর্থ, রাগ-রাগিণীর পরিচয় না জেনেও গানগুলি আমাদের কাছে সর্বদাই আনন্দের জিনিস ছিল।

আজও মনে পড়ে, শারদোৎসবের অভিনয়ের শেষে যখন গুরুদেবের সঙ্গে আমরা শিশুদল একসঙ্গে 'আমার নয়ন ভুলানো এলে' গাইতে গাইতে মঞ্চ প্রদক্ষিণ করে বেরিয়ে যাচ্ছি তখন গুরুদেবের কথায় গানে নাটকটির শেষ অংশে এমন-একটা বেদনার আবহাওয়ার সৃষ্টি করত যে, আমাদের মতো চঞ্চলমতি শিশুরাও তাতে অভিভূত না হয়ে পারতাম না। মনের মধ্যে একটা অকারণ বেদনার বোধ জাগত।

এইভাবে আমাদের মনে প্রায় সব গানই কোনো-না-কোনো রসের সৃষ্টি করেছে। বর্ষার দিনে, ভিজতে বেরিয়ে, বড়োদের সঙ্গে কতরকমের বর্ষার উল্লাসের গান গেয়েছি। পূর্ণিমা-রাত্রে চাঁদের আলোয় গান, অতি প্রত্যূষে সকালের রাগিণীতে বৈতালিক গান, ঋতু-উৎসবের সময়ে ঋতু উপযোগী গান, নানারকমের উপাসনার উপযোগী গান সর্বদাই শুনেছি ও গেয়েছি। এই গানের অর্থ নিয়ে প্রশ্ন করলে তার সঠিক উত্তর দিতে না পারলেও আমাদের মনের গভীরে সে-সব গান যে রেখাপাত করত আজ এ কথা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি।

গুরুদেব শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের মনে আনন্দের খোরাক যোগাবার জন্য গান নাটক ইত্যাদি প্রচুর রচনা করেছিলেন। কিন্তু কখনো শিশুসুলভ রচনা বলতে আজকাল আমরা সাধারণত যে গান বা নাটককে বুঝি এ ধরনের কিছুই তিনি লেখেন নি। রচনার সময় তিনি সর্বদা নিজের কথাই ভেবেছেন। এরও একটা কারণ ছিল। সেই কারণটিকে তিনি নিজেই পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন। সে বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে হলে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্য বিষয়ে গুরুদেব কিভাবে চিন্তা করতেন তারও ধারণা থাকা দরকার। তা হলে শিশুদের উপযোগী গান কিভাবে রচিত হওয়া উচিত, সে বিষয়ে মনে কোনো সংশয় থাকবে না। এ-বিষয়ে গুরুদেবের মত হল—"শিক্ষাপ্রণালী এমন হওয়া উচিত, যাহাতে ছাত্ররা পদে পদে দুরূহতা অনুভব করে, অথচ তাহা অতিক্রম করিতে পারে। ইহাতে তাহাদের মনোযোগ সর্বদাই খাটিতে থাকে এবং সিদ্ধিলাভের আনন্দে তাহা ক্লান্ত হইতে পারে না।" অন্যত্র বলেছেন, "শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা—বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া। সেই আঘাতে ভিতরে যে জিনিসটা বাজিয়া উঠে যদি কোনো বালককে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হয় তবে সে যাহা বলিবে, সেটা নিতান্তই একটা ছেলে-মানুষি কিছু। কিন্তু যাহা সে মুখে বলিতে পারে তাহার চেয়ে তাহার মনের মধ্যে বাজে অনেক বেশি; যাহারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়া কেবল পরীক্ষার দ্বারাই সকল ফল নির্ণয় করিতে চান, তাঁহারা এই জিনিসটার কোনো খবর রাখেন না।"

এমন-কি, বর্তমান যুগের শিক্ষায় যে বিপুল শিশুসাহিত্যের আবির্ভাব দেখি সে বিষয়েও গুরুদেবের সুচিন্তিত মত হল, "শিশুদের আমরা অশ্রদ্ধা করি বলেই শিশুসাহিত্যের রচনাভার গোঁয়ার সাহিত্যিকদের উপর। তারা ছেলেমানুষির ন্যাকামি করাকেই ছেলেদের সাহিত্য বলে মনে করে। আমি ছেলেদের শ্রদ্ধা করি, এইজন্যে আমি আমাদের বিদ্যালয়ে যখন ছেলেদের পড়াই তখন তাদের জন্যে যথার্থ সাহিত্যেরই আয়োজন করি—এমন সাহিত্য যা আমাদের সকলেরই ভোগের বস্তু।"

গানের ক্ষেত্রে তিনি যে একই আদর্শের পক্ষপাতী তা তাঁর শান্তিনিকেতনের জীবনে রচিত গান থেকে যেমন পরিষ্কার ধরা পড়ে তেমনি ধরা পড়ে তাঁর লিখিত স্বীকৃতি থেকে। তিনি লিখছেন—

"Songs are composed, not specially made to order for juvenile minds. They are songs that a poet writes for his own pleasure. In fact, most of my "Gitanjali" songs were written here. These, when fresh in their first bloom, are sung to the boys and they

come in crowds to learn them. They sing them in their leisure hours, sitting in groups, under the open sky on moon-lit nights, in the shadows of the impending rain of July. All my latter-day plays have been written here, and the boys have taken part in their performance. Lyrical dramas have been written for their season festivals. They have ready access to the room where I read to the teachers any new things that I write in prose or in verse, whatever the subject may be. And this they utilize without the least pressure put upon them, feeling aggrieved when not invited."

"They knew when I was employed in writing a drama, and they took an intense interest as it went on and developed, in the process of their rehearsals they acquired a real taste for literature more than they could through formal lessons in grammar and class teaching."

এর কারণ হল—"Their sub-conscious mind is more active than the conscious one, and therefore the important thing is to surround them with all kinds of activities which could stimulate their minds and gradually arouse their interests."

লেখকের ছাত্রজীবন ও গত ত্রিশ বৎসরের শিক্ষকতার জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে গুরুদেবের উপরোক্ত চিন্তা যে কতখানি সত্যি তা অন্তরে অন্তরে অনুভব করি, এবং এই চিন্তাকে অনুসরণ করে যখন বাংলাদেশের শহর গ্রামের বালক-বালিকাদের গানের কথা ভাবি তখনো গুরুদেবের চিন্তার সমর্থন পাই।

আমি যখন বয়সে অত্যন্ত শিশু তখন গুরুদেব ও দিনেন্দ্রনাথের সংগীতের আসরে অনেকের সঙ্গে বসেছি, গান শিখেছি, গান গেয়েছি। আমার মতো অল্পবয়সী শিশু আরো অনেকেই ঐ দলে ছিল। সেই আসরে আমাদের কথা ভেবে গুরুদেব বা দিনেন্দ্রনাথ কোনোদিনই গান বাছেন নি। অথচ আমাদের মতো শিশুদলের সেই-সব গান গাইবার মধ্যে যে কী আনন্দ ছিল তা বলতে পারি না। আমাদের জীবনে অধিকাংশ গানই আমরা ঐরকমের একটি প্রাণবান আবহাওয়ার মধ্যে আয়ত্ত করে-ছিলাম। ক্লাসে যা শিখেছি তা সংখ্যায় এর তুলনায় অনেক কম। এবং আজ এ কথা স্পষ্টভাবে বলতে পারি যে, ক্লাসের আবহাওয়ায় গান শিখতে গিয়ে সে আনন্দ আমরা কোনোদিনই পাই নি।

শেখাবার সময়ও দেখেছি যে, ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে গান শেখানোর পরিবর্তে নানা-প্রকার উৎসব-অনুষ্ঠানের, সাহিত্যসভার বা নাটকাদির অভিনয়ের মহড়ার সময় উৎসাহের সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি গান শেখে সে উৎসাহ ক্লাসের সময় একেবারেই দেখা দেয় না। ক্লাসের সময় তাদের মনে কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ এ ধরনের প্রশ্ন প্রায়ই দেখা দেয়। এবং অনেক রকমের মতামতের উদয় হয়। কিন্তু কোনো উপলক্ষের

জন্যে গানের মহড়ার সময় এ ধরনের কোনো প্রশ্নই তারা করে না। ক্লাসে শেখার সময় ছন্দের বা তালের দুরূহতা, রাগ-রাগিণীর দুরূহতার কথা অনেক শিক্ষকদের মনে উদয় হয়। কিন্তু উৎসব-অনুষ্ঠানের কথা ভেবে ঐ-সব গান শেখাবার সময় আমি কোনোদিনই খুব অসুবিধা বোধ করি নি। লক্ষ করেছি, ছন্দের মধ্যে যদি জোর থাকে এবং তা যদি স্পষ্ট হয়, আর গানের রাগিণীও যদি সেইভাবে ছন্দের সঙ্গে মিশে থাকে তবে সে গান শেখাতে কষ্ট পেতে হয় না।

বাংলাদেশের গ্রামে ও শহরে আজকাল শিশুদের মুখে সর্বদাই নানাপ্রকার গান শোনা যায়, এবং সকলেই হয়তো লক্ষ করে থাকবেন যে, সেই-সব শিশুরা যেরকম গানের পরিবেশের মধ্যে লালিত ও বর্ধিত সেই গান তারা অতি সহজেই গাইতে পারে। গ্রামের ছেলেরা সর্বদাই গায় তাদের সামনে বড়োরা যে গান গায়, সেই গান। তাদের কথা ভেবে গ্রামে কখনো গান রচিত হয়েছে বলে শোনা যায় না। শহরের শিশুরা যে অবলীলাক্রমে বড়োদের জন্যে রচিত নানাপ্রকার আধুনিক গান, সিনেমার গান গাইছে তার পরিচয় আজ সর্বত্র। এর ভাষা বা ভাব কোনোমতেই শিশুদের মনের উপযোগী নয়। শিশুরা তার অর্থও ভালো করে বোঝে না। সুতরাং গানের ক্ষেত্রে শিশুদের এই মনস্তত্ত্বের প্রতি যদি সকলে একটু গভীরভাবে মনোযোগ দিই তা হলে দেখব সাহিত্যের বেলায় গুরুদেব যে কথা বলেছিলেন গানের বেলায়ও সে কথা খাটে। কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার আদর্শে রচিত গান যে, শিশুদের পক্ষে ক্ষতি-কর, তাদের মনের গতির পক্ষে বাধাস্বরূপ, গুরুদেবের চিন্তাকে যদি বিশ্বাস করি, তবে তা মানতেই হবে।

১৩৬৬

পরিশিষ্ট

একটি গান

গুরুদেব রচিত 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' গানটির কথা প্রথম আমি জানতে পারি "শনিবারের চিঠি"তে। এ গানটি আমার শান্তিনিকেতনের এই একটানা ৩২ বৎসরের জীবনে কখনো শুনি নি। সুতরাং "শনিবারের চিঠি" যখন প্রকাশ করে বলল গানটি গুরুদেবের তখন খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম এবং রবীন্দ্রনাথের কোনো সংগীত-সংগ্রহ পুস্তকে ছাপা না থাকায় আমারও মনে সন্দেহ জাগে। এইরূপ সন্দেহগ্রস্ত মন নিয়ে একদিন গুরুদেবের কাছে উপস্থিত হই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করি সত্যই গানটি তাঁর রচিত কি না। তিনি বলেছিলেন গানটি তাঁরই রচনা। "শনিবারের চিঠি" এ খবর ছাপিয়েছিল ১৩৪৬ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। তখনো কবি জীবিত। তাঁর হাতে এই পত্রিকা তখন নিয়মিত যেত, তিনি নিশ্চয়ই প্রসঙ্গটি পড়েছিলেন; এবং সে সময় রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী ও রবীন্দ্রতথ্যানুসন্ধানী সকলেই সে পত্রিকার মন্তব্য সাদরে সংগ্রহ করেছিলেন। কোনো প্রতিবাদ কোনো দিক থেকে ওঠে নি। "শনিবারের চিঠি"র শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রবাবুরাও রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেই গানটির রচয়িতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন।

এ গানটি যদিও ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে বইয়ে প্রকাশিত তবুও রচিত নিশ্চয় তার অনেক আগে, অন্তত ১৮৭৭ কিংবা ১৮৭৮ খৃস্টাব্দের প্রথমেই। এ গানটি কেন কোনো বইয়ে ছাপা হয় নি, এবার তার কারণ খুঁজতে চেষ্টা করা যাক। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে "রবিচ্ছায়া" বইয়ে গানটি ছাপা হয় নি। রবিচ্ছায়া বইটি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা দেখবেন যে, সে বইয়ে ১৮৮১ খৃস্টাব্দে রচিত বাল্মীকি-প্রতিভার কোনো গানই স্থান পায় নি। এমন-কি, পরবর্তী দ্বিতীয় সংস্করণেও কোনো গান তাতে নেই। এই নাটকে বাল্মীকি—যখন প্রথম প্রবেশ করল, তখন বাল্মীকি সমেত দস্যুদের একটি সমবেতসংগীত আছে, তার প্রথম পঙ্‌ক্তি 'একডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে'। এই গানটি দস্যুদের জাতীয় সংগীত হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি দুটি গান শুনলে দেখব উভয় গানের মূল ভাবার্থ এক, কেবল ভিন্ন আবেষ্টনের উপযোগী করতে গিয়ে তার রূপের খানিকটা বদল হয়েছে। উভয়েরই সুর এক। আমার মনে হয় "একসূত্রে" গানখানি এইভাবে "বাল্মীকি-প্রতিভা"য় আত্মগোপন করে ছিল। এবং সেখান থেকে আলাদা করে পূর্বের মতো গানে স্থান দেবার প্রশ্ন তখন রচয়িতাদের মনে জাগে নি, তাই রবিচ্ছায়াতে বা অন্য কোনো বইয়ে স্থান পায় নি। এরকম দুর্ভাগ্য আরো অনেক গানের ভাগ্যেও ঘটেছে—সুতরাং রবিচ্ছায়ায় স্থান পেল না বলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। রবিচ্ছায়াতে 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' গানটিও স্থান পায় নি, এমন-কি, এ পর্যন্ত গুরুদেবের কোনো গীতসংগ্রহ পুস্তকেও তার স্থান হয় নি। সম্প্রতি আরো দুটি গান গুরুদেবের বলে জানা যাচ্ছে। সে দুটিও জাতীয় সংগীত। কিন্তু রবিচ্ছায়া থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত গুরুদেবের কোনো গানের বইয়েই তাদের নাম নেই। ১৩১২ সালে রচিত বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'ওদের বাঁধন যতই' 'বিধির বাঁধন কাটবে' দুটি ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত কোনো গানের বইয়ে ছাপা হয় নি।

সম্প্রতি ১৩১২ সালের প্রকাশিত সংগীত-প্রকাশিকা পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় এই গানের স্বরলিপি দেখা গেছে। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগেও তা সংরক্ষিত। এই অগ্রহায়ণ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় গানটি কথা ও স্বরলিপি-সহ প্রকাশিত। গানের নীচেই রচয়িতা হিসেবে গুরুদেবের নাম খুব স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত। ঐ পত্রিকার সম্পাদক স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পূর্ণ তাঁরই আগ্রহে ও চেষ্টায় এই পত্রিকাটি ১৩০৮ সাল থেকে ১৩১৬ পর্যন্ত নির্বিবাদে প্রকাশিত হয়েছে। যদি কোনোক্রমে ভুলভ্রান্তি ঘটত তবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই তার সংশোধন করতেন।

'একসূত্রে বাঁধিয়াছি' গানটির যে স্বরলিপি "সংগীত-প্রকাশিকা" পত্রিকায় দেখেছি—তার প্রত্যেক কলিতেই "বন্দেমাতরম্" কথাটি যুক্ত। এই "বন্দেমাতরম্" শব্দ থাকায় কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেন যে ও কথাটি কী করে এ গানে আসতে পারে। আমার বিশ্বাস স্বদেশী যুগেই এই শব্দটি ও গানে স্থান পেয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুমোদনে। কারণ পত্রিকাটি তাঁদেরই পরিচালনায় ছাপা এবং প্রকাশিত।

এই প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবী-রচিত "স্নেহলতা" উপন্যাসের কথা উল্লেখ করা যায়। এই উপন্যাসে চারু নামে একটি চরিত্র আছে। চারু তরুণ কবি, তার রচিত একটি গীত উক্ত বইতে আছে। এই গীতের প্রথম পঙ্‌ক্তি 'এক সূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন।'

নীচে "স্নেহলতা" উপন্যাস থেকে অষ্টাদশ অধ্যায়টি তুলে দিচ্ছি,—"চারু এখন ষোড়শ বর্ষীয় বালক। কিন্তু সে আর আপনাকে বালক মনে করে না।

একদিন তাহার এক সমপাঠী তাহার পকেটে পেনসিল খুঁজিতে গিয়া একটুকরা কাগজ লাভ করিয়াছিল—কাগজখানি আর কিছু নহে, একটি ক্ষুদ্র কবিতা। সমপাঠী ছুটির ঘণ্টার সময় সমস্ত বালকদের সমক্ষে মহা রহস্যে যখন পড়িল—

এমন চাঁদিনী নিশি
পুলক-কম্পিত দিশি
এমনি বিজন উপবনে,
মুখেতে চাঁদের আলো—
দীপ্ত আঁখির তারা কালো
চেয়েছিল নয়নে নয়নে।

ছেলেদের মধ্যে তখন ভারি হাসি পড়িয়া গেল।

বিদ্রূপকারী বালকদিগের এই সামান্য কল্পনার অভাব দেখিয়া তাহার নিতান্তই ঘৃণা উপস্থিত হইল। এইরূপ চলিতেছে, এমন সময় আর একজন ছাত্র আগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—'ব্যাপার কি?' সকলে বলিল—'আরে মশায় আমাদের চারুবাবু কবি। শুনবেন—এমনি চাঁদিনী নিশি পুলক-কম্পিত দিশি—'

নবাগত ব্যক্তি তখন তাহার হাত হইতে কাগজখানি টানিয়া লইয়া নিজে পড়িতে আরম্ভ করিল, শেষ করিয়া বলিল—'বাঃ বেশ হয়েছে—অতিসুন্দর'। চারুর আহ্লাদে মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিশোরীর মতো সমজদার বুদ্ধিমান বিজ্ঞ ব্যক্তির প্রশংসা পাইলে কাহার না আহ্লাদ হয়।...কিশোরীর কথায় অন্য ছাত্রদিগেরও হঠাৎ সে কবিতা

সম্বন্ধে মত পরিবর্তিত হইয়া গেল—সকলেই ইহার পর প্রশংসা দৃষ্টিতে চারুর দিকে চাহিল।...

কিশোরীই তাহাকে তাহাদের সভার মেম্বার করিয়াছে—সেখানকার সে Poet Laureate।

আজ রবিবার। জগৎবাবুর চন্দননগরের বাগানে উক্ত সভার অধিবেশন। বেলা দুইটা হইতে বাগানবাটির একতল গৃহের এক রুদ্ধ দ্বারের বহির্দেশে দুইজন ছাত্র দণ্ডায়মান। আশেপাশে গাছপালা—এবং মাথায় গাড়ি-বারান্দার আচ্ছাদন সত্ত্বেও প্রথম আশ্বিনের প্রখর রৌদ্রের ঝাঁজে তাহারা পুড়িয়া উঠিতেছে—তবুও তাহাদের পদ নিশ্চল। মনের অধীরতায় তাহাদের দৃষ্টি ক্রমাগত একদিক হইতে অপর দিকে নিক্ষিপ্ত হইতেছে আর বিরক্তিসূচক বাক্যগুলা অভিধান ঝাড়া করিয়া তুলিয়াও তাহাদের আশ মিটিতেছে না।

এইরূপে যখন তিনটা বাজিয়া গেল—তখন গেটের মধ্যে দুইজন লোক প্রবেশ করিল, ক্রমে তাহাদের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। ইহাদের জন্যই উল্লিখিত ছাত্র দুইজন এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিল। নবাগতদিগের সহিত দুই একটা কথা কহিবার পরেই উহারা তাহাদের চোখ বাঁধিয়া দ্বারে আঘাত করিল। দ্বার মুক্ত হইলে তাহাদিগের হাত ধরিয়া ছাত্র দুইজন যেমন ভিতরে প্রবেশ করিল—অমনি পুনর্বার দ্বার বন্ধ হইল আর সকলে সমস্বরে গাহিয়া উঠিল—

আজি হতে একসূত্রে গাঁথিনু জীবন
জীবনে মরণে রব শপথ বন্ধন।

বহু কণ্ঠের সমস্বর গীতে রুদ্ধ গৃহ সহসা ঝটিকা তরঙ্গিত হইয়া উঠিল—অন্ধ নবাগত দুইজনের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, কি না-জানি ভয়ংকর গোপনীয় ব্যাপার গৃহ মধ্যে চলিতেছে।...

গান থামিবামাত্র সভাপতি নিকটবর্তী হইয়া পদ্মবিদ্ধ দুইখানি খড়্গ তাহাদের দুইজনের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন—

'এই পদ্ম ভারতের চিহ্নস্বরূপ—এই খড়্গ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার চিহ্নস্বরূপ। ইহা ধারণা করিয়া শপথ কর—'

এইবার একসঙ্গে সুগম্ভীর স্বর উঠিল, ইহা ধারণ করিয়া শপথ কর—

সভাপতি।—আজ হইতে তুমি ভারতের মঙ্গলকার্যে প্রাণ পণ করিলে—আজ হইতে আমাদের সহিত ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হইলে?

আবার সকলে। ইহা ধারণ করিয়া শপথ কর—

সভাপতি। কোন কারণে সভা কর্তৃক পরিত্যক্ত কিম্বা সভা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও ইহার কার্যকলাপ প্রকাশ করিবে না—আজিকার বিশ্বাসভঙ্গ করিবে না—

সকলে—জীবনে মরণে এই বিশ্বাস পালন করিব?

নবাগতগণ কি শুনিতেছিল কি বলিতেছিল যেন বুঝিল না কেবল কম্পিতকণ্ঠে তাহা আবৃত্তি করিয়া গেল মাত্র। তখন তাহাদের চক্ষুর বন্ধন উন্মোচন হইল; এবং একে একে প্রত্যেক সভ্য তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া আর একবার সমস্বরে সকলে গান করিল—

একসূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন
জীবন মরণে রব শপথ বন্ধন
ভারত মাতার তরে সঁপিনু এ প্রাণ
সাক্ষী পুণ্য তরবারি সাক্ষী ভগবান
প্রাণ খুলে আনন্দেতে গাও জয় গান
সহায় আছেন ধর্ম কারে আর ভয়।

ইহা চারুর রচনা—যখন সকলে একসঙ্গে ইহা গাহিয়া উঠিল, চারুর আপনাকে সেকস্‌পিয়রের সমকক্ষ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।"

(অষ্টাদশ অধ্যায়। ভারতী ও বালক, কার্তিক, ১২৯৬। পৃ ৩৬২)

চারু Poet Laureate-কল্প কবি, তার বয়স ১৬ বৎসর মাত্র। 'একসূত্রে গাঁথিলাম' গানটি সকলে সমস্বরে গাইলে পরে—'চারু' নিজেকে তার রচয়িতা মনে ক'রে গর্ব অনুভব করে, সেকস্‌পিয়রের মতো নাট্যকাররূপে নয়, সেকস্‌পিয়রের মতো কবিরূপে।

আমরা জানি সঞ্জীবনী সভার সময় গুরুদেবের বয়স ছিল ষোলোর কাছাকাছি, জ্যোতিরিন্দ্রের বয়স তখন প্রায় আটাশের মতো। "স্নেহলতা" উপন্যাসের চারুর সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোনোই মিল নেই, বস্তুত 'চারু'র সঙ্গে গুরুদেবের মিল দেখি নানা দিক থেকে।

আর-একটি বিষয়ে সাহিত্যানুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আমি মনে করি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অশ্রুমতী, পুরুবিক্রম, সরোজিনী ও স্বপ্নময়ী নাটকের কোনোটিতে তাঁর নিজের রচিত একটিও জাতীয়তা-উদ্দীপক গান নেই। যে-কয়টি গান আছে তার সবকয়টির রচয়িতা সত্যেন্দ্রনাথ ও গুরুদেব। গান কটি হল 'মিলে সবে ভারত সন্তান', 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি' ও 'দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখগান গাহিয়ে।'

'একসূত্রে বাঁধিয়াছি' গানটির অনুসরণে বাল্মীকি-প্রতিভায়, 'এক ডোরে বাঁধা আছি' গানটি গুরুদেবের রচনা। সে গানটি দলপতি-বেষ্টিত দস্যুদলের সম্মেলক সংগীত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পুরুবিক্রমের দ্বিতীয় সংস্করণে 'একসূত্রে' গানটি পুরুরাজবেষ্টিত সৈন্যগণের গান হিসেবে আছে। আবার ঐ গানটি সঞ্জীবনী সভায় সভাপতি-সহ সভ্যদের সকলের মিলিত গান।

ঐ গানটি সঞ্জীবনী সভা উপলক্ষে রচিত বলেই পুরুবিক্রম দ্বিতীয় সংস্করণে স্থান পেয়েছে। কারণ, সঞ্জীবনী সভা ১৮৭৬ বা ৭৭ সালের ব্যাপার, আর পুরু-বিক্রম দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ সালে। ১৩০৭ সালের সংস্করণে গানটি নেই।

উপরোক্ত চারিটি নাটক রচনাকালে জ্যোতিবাবু যে কারণেই হোক নাটকে জাতীয়তা-উদ্দীপক গানের প্রয়োজনে অন্যের সাহায্য নিয়েছেন দেখা যায়। তা ছাড়া ঐ সময়ের মধ্যে নিজে কোনোপ্রকার জাতীয় সংগীত লিখেছেন কিনা জানি না। ১৪।১৫ বৎসর বয়সে গুরুদেব যদি 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা' 'হিন্দুমেলার উপহার' ও 'কিসের তরে গো ভারতের আজি' ইত্যাদি গান ও কবিতা লিখতে পারেন তবে তাঁর পক্ষে 'একসূত্রে' গানটি লেখা কিছুই অসম্ভব নয়। 'তোমারি তরে, মা, সঁপিনু এ

দেহ' গানটি সঞ্জীবনী সভার সময়ে লেখা। আমার মনে হয়, 'একসূত্রে' গানটি সঞ্জীবনী সভার জন্য প্রথম রচিত গান।

সবশেষে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, ঐ গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তারও সঠিক কোনো প্রমাণ নেই। বরঞ্চ ঐ গানটি গুরুদেবের রচিত বলে বহুতর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর মৌখিক স্বীকৃতি ও সংগীত-প্রকাশিকায় নামসহ ছাপা গানটি তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরুবিক্রম দ্বিতীয় সংস্করণে গানটি প্রথম পাওয়া গেছে বলেই তাকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা বলে মানতে হবে, অন্তত এ ক্ষেত্রে তা বললে চলবে না। কারণ, আমরা সকলেই জানি নিজের রচিত প্রায় প্রত্যেক নাটকেই গুরু-দেবের বহু গান ও কবিতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন, অথচ রচয়িতা হিসেবে বইয়ের কোথাও তিনি গুরুদেবের নাম উল্লেখ করেন নি।

১৩৫১

রবীন্দ্রসংগীতের আলোচনা

সম্প্রতি কিছুদিন থেকে গুরুদেবের গানের যেমন প্রসার বেড়েছে সেইসঙ্গে গুরুদেবের গান নিয়ে আলোচনাও কিছু কিছু শুরু হয়েছে। এই আলোচনার মধ্যে সবচেয়ে বেশি করে আমার চোখে পড়েছে যে বিষয়টা তা হল, উচ্চাঙ্গের হিন্দী সংগীতে রবীন্দ্রসংগীতের স্থান। হিন্দী উচ্চাঙ্গ সংগীতের পন্ডিত থেকে শুরু করে সাধারণ গাইয়ে, সাহিত্যিক ইত্যাদি অনেকেই সম্প্রতি কিছুদিন থেকে বারে বারে এই কথাটাই বোঝাতে চাচ্ছেন যে, উচ্চাঙ্গ সংগীতের সমপর্যায়ে রবীন্দ্রসংগীতকে স্থান দেওয়া উচিত। যুক্তি স্বরূপ যে কথাগুলি তাঁরা বলছেন তা হল, গুরুদেব হিন্দীভাঙা বহু বাংলা গান রচনা করেছেন, এবং তাঁর গানে নানা রাগ-রাগিণী আছে।

এই ধরনের আলোচনার আমি সমর্থক নই। গুরুদেবের গান বাংলা দেশের এবং বাংলা ভাষার গান। সংগীতে বাংলাদেশের নিজস্ব যে একটি ধারা চলে এসেছে গুরুদেব এযুগে সেই ধারারই একজন যুগান্তকারী বাহক। সেই ধারাটি হল কথা ও সুরের মিলনে যে গান-রূপ, তাই। এখানে সুরও প্রধান নয়, কথাও প্রধান নয়, উভয়ের অঙ্গাঙ্গী মিলনে যা প্রকাশ পায়, তাই। যতক্ষণ কথা আছে ততক্ষণ সুর আছে, কথা ছাড়া সুর এক পাও নিজেকে এগিয়ে নিতে সাহস করে না। উচ্চাঙ্গের হিন্দী সংগীতে কথা ও সুরের মিলনে ঠিক এই আদর্শটি গ্রহণ করা হয় নি। তার আদর্শ হল, কথার সঙ্গে সুরের মিলন হলেও, কথা থামলেই সুর কেন থামবে? সুর স্বাধীনভাবে নিজেকে ব্যক্ত করে চলুক, চেষ্টা করুক গানের মূল রসটিকে কথা-নিরপেক্ষ কেবল সুরের দ্বারা ব্যক্ত করতে। উভয় সংগীতের এই মূল বৈশিষ্ট্যটি গুরুদেবের গানের আলোচনাকালে আমাদের সব সময়েই মনে রাখা দরকার। উচ্চাঙ্গের হিন্দী গান সুরের দিক থেকে এই স্বাধীনতা পেয়ে কতপ্রকার অলংকারে গানকে যে সাজাল তা শুনে অবাক হতে হয়।

উচ্চাঙ্গ হিন্দী সংগীতের আদর্শে বাংলা ভাষায়ও গান রচিত হয়েছে; যেমন বাংলা ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী ইত্যাদি, কিন্তু এ কথা ঠিক যে হুবহু উচ্চাঙ্গ হিন্দী গানের আদর্শে বাঙালি কোনোদিনই বাংলা গানে সুরবিহারে সুবিধা করতে পারে নি। নিজেকে অনেকখানি সংকুচিত করে নিতে হয়েছে।

কতকগুলি স্বরকে বিশেষভাবে সাজানোর দ্বারা শ্রুতিমধুর যে রূপ কানে ধরা পড়ে তাকেই আমরা বলি রাগ বা রাগিণী। পৃথিবীর যে-কোনো দেশের উচ্চাঙ্গের গান থেকে শুরু করে সাধারণ গানের যাবতীয় সুরকেই সে দিক থেকে রাগিণী রূপে নামকরণ করা যায়। তেমনি আমাদের দেশের গ্রামের গানের সুরকেও এক-একটি রাগিণী বলা চলে। যখনি ভাব ও রসে পূর্ণ হয়ে কোনো সুর রচিত হল তখনি তা হল একটি রাগিণী। গুরুদেবের বহু গান হিন্দী উচ্চাঙ্গ সংগীতের বহু রাগ-রাগিণীকে অনুকরণ করেছে এ কথা সকলেই জানেন। তারই সাহায্যে বা তাকে ভিত্তি করে নতুন রূপও অনেক ফুটেছে এই গানে। এ ছাড়া আরো নানাপ্রকার সুরের উদ্ভব হয়েছে অন্য নানা উপায়ে। এ দিক থেকে সব দেশই এক পথের পথিক। অর্থাৎ রাগ-রাগিণী সব দেশেই আছে। কেবল কোথাও নামকরণ হয় নি, ভারতে উচ্চাঙ্গ সংগীতে

বহুপরিমাণে তা হয়েছে।

হিন্দী গানের বৈশিষ্ট্য কেবল রাগ-রাগিণীর গঠনে নয়, রাগ-রাগিণীর বিকশিত রূপে। অর্থাৎ এই রাগ-রাগিণীর চলমান রূপেই তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পায়।

গুরুদেবের রচিত কতগুলি গানের রাগ-রাগিণী প্রাচীন মতে বিশুদ্ধ বা কত-গুলিতে তিনি বহু রাগ-রাগিণীর সম্মিলিত রূপ ফুটিয়েছেন, এইরূপ যুক্তির দ্বারা উচ্চাঙ্গ সংগীতের মধ্যে স্থান পাবার চেষ্টার কোনো অর্থ হয় না। তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা উভয় সংগীতকে এক পর্যায়ে আনার চেষ্টা না করে, যে গানের যা বৈশিষ্ট্য তাকে সেই দিক থেকে আলোচনা করাই উচিত। সব গাছই গাছ, তাই বলে বটগাছকে তালগাছ বলে প্রমাণ করতে যাওয়া বৃথা চেষ্টা। যেমন আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা। অতি সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যবান এ ভাষা। ভারতের প্রায় সব প্রাদেশিক ভাষাই এর কাছে বিশেষভাবে ঋণী, কারণ এর কাছ থেকেই বহু পরিমাণে তাদের সাহায্য নিতে হয়েছে, নিজেকে পুষ্ট করবার জন্যে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাদেশিক ভাষার নিজের যে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে, সংস্কৃতের সঙ্গে তার সমান স্থান হল না বলে কেউ দুঃখিত হয় না। সংস্কৃতের পাশে সমান মর্যাদা গ্রহণ করবার উৎসাহে যদি বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দ, অলংকার, বিন্যাসভঙ্গির নজির তুলে চীৎকার করি যে, এ ভাষার সংস্কৃতের তুল্য মর্যাদা পাওয়া উচিত, তা হলে ভাষাজ্ঞানী প্রত্যেক ব্যক্তি পাগল বলে হাসবে। গুরুদেবের গানও তাই। হিন্দী উচ্চাঙ্গ সংগীত যেমন সম্পূর্ণ একটি স্বতন্ত্র জগৎ, গুরুদেবের গানও বাংলা সংগীতের জগতে তেমনি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আলাদা জগৎ। একজন আর-একজনের কাছে বহু পরিমাণে ঋণী হয়েও যে উভয়ে এক জিনিস নয় এ কথাটা মানতেই হবে।

গুরুদেবের গানকে স্বতন্ত্রভাবে দেখার দ্বারা তার মর্যাদা কখনো ক্ষুণ্ণ হতে পারে না। সেখানে এ গান একমেবাদ্বিতীয়ম্। প্রত্যেক সংগীতধারার সম্বন্ধেই এ কথা সত্য। এ যেন আকাশের নক্ষত্র জগৎ। প্রত্যেকটি বাইরে স্বতন্ত্র অথচ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে অলক্ষ্যে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সেই অলক্ষ্য নিয়ম থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত করে যে-কোনো একটির অস্তিত্ব এক মুহূর্তের জন্যে রক্ষা করা যেমন অসম্ভব, ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক গানেরও সেই অবস্থা। তারা এমন এক মূল আদর্শে এক জায়গায় বাঁধা যে, সেখান থেকে কারুরই স্বতন্ত্র হবার উপায় নেই, অথচ দৃশ্যত প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে স্বাধীন।

গুরুদেবের গানের আলোচনাকালে এই কথাটা সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, উচ্চাঙ্গ সংগীতের সঙ্গে মিল হল না বলে লজ্জা দুঃখ করবার কোনো হেতু নেই। হিন্দুস্থানী বা ভারতীয় সংগীতের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুদেবের গানকে বুঝতে চেষ্টা করব, তার নিজস্ব সত্তার, গুণাগুণের বিচার করব, এক মাপে সমান করে সাজাবার চেষ্টা করব না। সেইখানেই তার প্রকৃত পরিচয়, সেই পরিচয়টি ধরতে পারা ও ধরিয়ে দেওয়াই হল সব রকম গানেরই আসল বিচার। গুরুদেবের গানের আলোচনার সময়ও তাই হওয়া উচিত।

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতে বিচিত্র সুরগুলি যে আদর্শে নিয়মবদ্ধ হয়ে স্বতন্ত্র নাম ও রূপ নিয়ে রাগ-রাগিণী-জগৎ সৃষ্টি করল, গুরুদেবের সৃষ্ট গানের নানারূপ

নতুন সুরকে সেই পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে, তার মূল স্বরগঠন প্রণালীটিকে যদি বের করে নিতে পারি, তখন সেই বিশেষ সুরটির বিধিবদ্ধ রাগিণী রূপটিকে জানার দরুন পরে ঐ বিশেষ সুরে গান রচনা কঠিন হবে না, সাধারণ সুরকারদের। এর দ্বারা তাদের কাজ অনেক সহজ হবে। ভারতীয় রাগ-রাগিণী-জগৎ এইভাবেই এবং এই কারণেই সৃষ্ট হয়েছে এবং যুগ যুগ ধরে সুরকারদের এইভাবেই সুরযোজনায়ও সুরবিহারের পথ সুগম করেছে। তাই মনে করি, হিন্দী রাগ-রাগিণী নিয়ে যাঁরা এই ভাবের আলোচনা করেন তাঁরা গুরুদেবের গানের সুর নিয়ে ঐরূপ বিশ্লেষণে হাত দিন। তাতে রাগিণীজগতের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ভবিষ্যৎ রাগিণীজগতের সুর-বিহারীদের যথেষ্ট উপকার করবে। রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে সে সুযোগ আছে বলেই যে তাকে উচ্চাঙ্গ সংগীতের সমপর্যায়ে ফেলে অনাবশ্যক বা যে পদমর্যাদার দরকার নেই এবং যা হতে পারে না, তাই দেবার চেষ্টা করার কোনো প্রয়োজনই নেই। গ্রামের প্রচলিত সাধারণ গান থেকে উচ্চাঙ্গ সংগীতের গুণীরা বহু সুর সংগ্রহ করে, পরে তাকে বিশ্লেষণ দ্বারা রাগ-রাগিণীতে পরিণত করে সেই রাগরূপের উপর নানাভাবে বিহার করেছেন, তাই বলে কি মূল গানকে সেই উচ্চাঙ্গ সংগীতের সমপর্যায়ে ফেলতে চেষ্টা করেছে কেউ, কোথাও? সব সময় মনে রাখতে হবে আগে এসেছে সুরযুক্ত গান, তার পরে তাকে বিশ্লেষণ দ্বারা রাগ-রাগিণী। শেষে এসেছে কেবল কথাহীন রাগ-রাগিণীর নানা অলংকারবহুল সুরবিহার।

১৩৫৬

চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীত

গুরুদেবের মৃত্যুর বছর কয়েক আগে কলকাতার এক চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান তাদের সংগীত-পরিচালককে এক সারেঙ্গী বাদক-সহ শান্তিনিকেতনে পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য, তাঁদের পরিকল্পিত গল্পে তাঁরা গুরুদেবের কিছু গান ব্যবহার করবেন, আর সেই গানগুলি এখানকার গায়কদের মুখে শুনে সংগীত-পরিচালক নিজে বেছে গুরুদেবকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নেবেন। সংগীত-পরিচালকদের আরো ইচ্ছা, যে গল্পটির জন্যে তাঁরা গান সংগ্রহ করতে এসেছেন সেই গল্পটি গুরুদেবকে শোনান। কারণ গল্পটির নাকি একটি বিশেষত্ব আছে এবং তার সঙ্গে গুরুদেবের গানই একমাত্র খাপ খায়। গুরুদেবকে গল্পটি শুনতে তাঁরা রাজি করালেন। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সংক্ষেপে তাঁকে শোনানোও হল। গুরুদেব ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত শুনেছিলেন, কিন্তু বক্তার কাছে কোনো মতামত প্রকাশ করলেন না। তবে এটুকু তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে, এর জন্যে তাঁর গান সংগ্রহের কষ্ট করবার প্রয়োজন ছিল না। সেইদিনই সন্ধ্যায় গুরুদেবের কাছে গিয়েছিলাম। চলচ্চিত্রের গল্পটি তিনি নিজেই আমাকে শোনালেন এবং বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এই ধরনের গল্পই কি আজকাল বাঙালি চাইছে? এও বললেন যে, চলচ্চিত্রের গল্প বিষয়ে তাঁর কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু সেদিন ঐ গল্প শুনে সে সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হল। এবং এ ধরনের গল্প যদি বাংলাদেশের রুচিকে অধিকার করে থাকে তবে বাংলার গল্প-সাহিত্যের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি চিন্তিত।

পরে সেই সংগীত-পরিচালক ও তাঁর সহকর্মী সারেঙ্গীবাদক ৬।৭টি গান তাঁদের গল্পের উপযোগী হবে বলে নির্বাচন করলেন এবং শিখে নিলেন। কিন্তু তাঁরা যেভাবে গান নির্বাচন করেছিলেন আজও তার কথা মনে হলে অবাক হই। যে গান সুর ও ছন্দের মাধুর্যে সহজে মনোহরণ করে সেই গানকেই নির্বাচনে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন, এবং তাঁরা এমন ভাবও প্রকাশ করেছিলেন যে, এই-সব গানকে তাঁদের গল্পের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে তাঁরা সহজেই পারবেন।

কিছুদিন পরে, যখন সেই গল্পটি চলচ্চিত্রে তোলা হচ্ছিল, তখন একদিন তাঁদের স্টুডিওতে সেই গল্পটির একটি শুটিং দেখতে গিয়ে দেখি নায়িকা দেয়ালে টাঙানো নায়কের ফোটোর দিকে তাকিয়ে শান্তিনিকেতনে নির্বাচিত গুরুদেবের গানগুলির একটি গাইছেন। সবই বেশ সহজ মনে হল। ছবিকে সামনে রেখে আবেগ প্রকাশ করছে প্রেমিকা। গুরুদেবের ঐ গানটির ভিতরকার রস অনুভব করতে এতদিন এত চেষ্টা করেছি, তবুও মনে হয়েছে গানের ভাবটিকে যেন তেমন করে মনের মধ্যে ধরতে পারছি না। কিন্তু চলচ্চিত্রের নায়িকা যে অবস্থার মধ্যে সাজিয়ে নিয়ে তা গাইছেন তাতে গানের অর্থ তত কঠিন বলে মনে হচ্ছে না। দেখা মাত্রই মনে হল যেন এত সহজ ব্যাখ্যা থাকতে এতদিন ঐ দুরূহ পথে ঐ গান নিয়ে কেনই বা দুশ্চিন্তায় কাটাচ্ছিলাম। হয়তো একটা আনন্দও বোধ করেছিলাম চলচ্চিত্রের পরিচালকের সাহায্যে গানটির এত সহজ ব্যাখ্যা পেয়ে। কিন্তু পরে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। প্রশ্ন জাগতে লাগল সত্যিই কি গুরুদেব এই ব্যাখ্যাই

চেয়েছিলেন? তা হলে এতদিন গানটিকে যেভাবে ভেবেছিলাম, গুরুদেবকে যেভাবে সেই গানে বুঝতে শিখেছিলাম তা কি ঠিক নয়? মনে হতে লাগল তিনিও তো তাঁর অত্যন্ত প্রিয় পরলোকগত আত্মীয়ার ফোটো দেখে কবিতা ও গানে তার হৃদয়-বেদনা প্রকাশ করেছিলেন, জানা না থাকলে সেই গানে বা কবিতায় সেই তথ্যটি ধরাই পড়ে না। পড়বার সময় বা গাইবার সময় মূল ছবির কথা একেবারেই ভুলিয়ে দেয়। মনে হয় যেন সমস্ত বিশ্বের যেখানে যত মানুষ তাদের প্রিয়জনের বিচ্ছেদ-বেদনায় ব্যথিত তাঁদের সকলেরই মনের অব্যক্ত কথা তিনি বললেন। এইখানেই গুরুদেবের সৃষ্টির মহত্ত্ব। গানের মধ্যে যে বিশ্বজনীনতার প্রকাশ, এবং যা মানুষের জীবনকে ছোটো গণ্ডি থেকে আরো বড়োর দিকে ইশারা করে, আমাদের ক্ষুদ্র মন তার অনুকূলে তৈরি নয় বলে আমরা তাকে ঠিকভাবে বুঝতে পারি না। কিন্তু তাই বলে সেই-সব গানকে আমাদের ক্ষুদ্রতার উপযোগী করে সাজিয়ে নিয়ে তাকে যদি বুঝতে হয়, তা হলে এর দ্বারা আমাদের অনুভূতির প্রসারতার দিকে অগ্রসর হবার পথে আমরা অকৃতকার্য হব এ কথা প্রত্যেকের ভাবা উচিত।

চলচ্চিত্রে যাঁরা গুরুদেবের গান ব্যবহার করেন তাঁদের একমাত্র যুক্তি হল এই যে, তাঁরা গুরুদেবের গানকে জনসাধারণের মধ্যে কত সহজে প্রচার করতে পারছেন। এবং এজন্যে তাঁরা গৌরব বোধ করেন। তাতে আপত্তির কিছু নেই কিন্তু দুঃখ হয় এই কথা ভেবে যে, যেভাবে সাজিয়ে গুরুদেবের গানগুলিকে জনসাধারণের কাছে তাঁরা তুলে ধরেছেন, গানগুলির রূপ কি সত্যই সেই রকম? গানের নিজস্ব সত্যিকার রূপের দিকে জনসাধারণের দৃষ্টিকে যতক্ষণ না ফেরাতে পারছি ততক্ষণ ভিন্নরূপে সাজানোর দ্বারা জনসাধারণকে কি আমরা ভ্রান্তির মধ্যে নিয়ে যাচ্ছি না?

সাহিত্যে, কাব্যে, ধর্মে, চিত্রে, সমাজসেবায় দেশে এক-একজন স্রষ্টা আসেন, যাঁরা সর্বদাই তাঁদের পথে তাঁদের সমাজের আর সকলের চেয়ে অনেক এগিয়ে চলেন। সেই কারণেই সমাজ তাঁদের বা তাঁদের প্রচলিত পথ অনুসরণ করে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যায়। এই হল জগতের নিয়ম। ছোটো শিশু তার দাদাকে আদর্শ মনে করে। কী করে দাদার মতো হতে পারবে এই হল তার একমাত্র ভাবনা। তেমনি দাদা ভাবছে কবে বাবার মতো বড়ো হয়ে চাকরি করে অর্থোপার্জন করবে। আবার বাবার কাছে আদর্শ মানুষ হল, যাঁর উপদেশে, বা যাঁর কার্যকলাপে তিনি অনুপ্রাণিত হচ্ছেন বা তাঁর জীবন পরিচালিত হচ্ছে, তিনি। এর পরেও যাঁরা আরো বড়োকে অবলম্বন করতে চান তাঁরা 'ঈশ্বর' বা 'ভগবান' নামে নানা রূপগুণে ভূষিত এক কাল্পনিক শক্তির কাছে প্রেরণা সংগ্রহ করেন জীবনকে উন্নত করতে।

মানুষের অভিব্যক্তির এই সত্যকে স্বীকার না করে শিশু যদি বলে দাদাকে তাঁর চেয়ে অগ্রসর হতে দেওয়া হবে না, দাদাকে তার মতো হতে হবে—দাদা যদি বাবাকে সেই মতে তার দলে টানতে চায় আর বাবা যদি তাঁর চেয়ে বড়োদের বলেন যে, চিন্তায়, জ্ঞানে এত এগিয়ে থাকলে চলবে না, তাঁদের সামর্থ্যের কথা ভেবে মহাপুরুষদের ভাবতে হবে, সৃষ্টি করতে হবে, তা হলে মানুষের সমাজের কী দুর্গতি হবে তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। তাই অগ্রসরকে টেনে পিছিয়ে আনার কথা মানুষ ভাবতেই পারে না।

গুরুদেবের গানের রস গ্রহণে আমরা আমাদের অনুভূতির ক্ষমতাকে উন্নত করব, না, তাকে আমাদের অক্ষমতার সঙ্গে মিলিয়ে তবে বুঝতে চেষ্টা করব, এই হল আমার প্রশ্ন। তাই চলচ্চিত্র-পরিচালকরা যেভাবে গুরুদেবের গানের রসকে সহজ করে জনসাধারণের অনুভূতির মাপকাঠিতে সাজিয়ে গৌরব বোধ করছেন দেশের চিত্তোন্নতির পক্ষে তা ক্ষতিকর কি না ভেবে দেখতে বলি। যা-কিছু সহজে আয়ত্ত করা যায়, তাই কেবল কাম্য, এইরূপ মনোভাব মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশের পক্ষে যে বিঘ্নকর এ কথা মানতেই হবে।

হয়তো প্রশ্ন উঠবে যে তা হলে গুরুদেবের গান কি ব্যবহার করা হবে না? উত্তরে বলব, ব্যবহার নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু এমনভাবে তার রস বিস্তার করতে হবে, যাতে গুরুদেব যে রসের অনুভূতিতে গানগুলি রচনা করেছিলেন সেদিকে আমরা এগোতে পারি। সেই রকমের গল্পের মাধ্যমেই গানগুলিকে প্রচার করা হোক। তা জনসাধারণের প্রচলিত রুচির সঙ্গে খাপ না খেলেও গানের স্বভাবকে রক্ষা করতেই হবে। জনসাধারণের রুচি তৈরি নয়, শিশুর মত তাকে ধৈর্যের সঙ্গে তৈরি করে নিতে হবে। তার কাছে আত্মসমর্পণ করলে চলবে না। চলচ্চিত্রে গুরুদেবের বহু গান গীত হয়েছে, আজও হচ্ছে। গাওয়ার দিক থেকে অধিকাংশ গানে আমি ত্রুটি দেখি না, এবং গানগুলি ভালোভাবে গাওয়া হয়েছে বলেই আমি মনে করি। কোনো কোনো গান শুনে মুগ্ধও হয়েছি। চলচ্চিত্রে যাঁরা অন্য গান গেয়ে অভ্যস্ত তাঁদের মধ্যে অনেকে গাওয়ার দিক থেকে চলচ্চিত্রে গুরুদেবের গান অনেক উন্নত করেছেন, কিন্তু গল্পের সঙ্গে গানের সুষ্ঠু সামঞ্জস্য এখনো ঘটতে পারল না এটাই দুঃখের কথা।

১৩৬০

রবীন্দ্রসংগীতে তান

রবীন্দ্রসংগীতে তান ব্যবহার বিষয়ে গুরুদেব নিজে কী মনোভাব পোষণ করতেন সেই ভাবের কতকগুলি লিখিত অংশ নানা লেখা থেকে তুলে দেবার আগে দু-একটি কথা বলে নিই।

১৯১৫-১৬ সাল থেকে গুরুদেবের মৃত্যু পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় ২৫ বৎসর একটানা আমি গুরুদেবের গান অভিনয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম। তাঁর গলায় হিন্দীভাঙা বাংলা গান অনেক রকমেই শুনেছি, অনেক গান শিখেছি। কিন্তু একটা জিনিস বরাবরই লক্ষ্য করেছি যে তিনি নিজে গাইবার সময় কোনো কোনো হিন্দীভাঙা বাংলা গানে সামান্য সুরবিস্তার করেছেন বটে কিন্তু যাকে বলে আসল তান, সেরকমের কোনো সুরের অলংকারে কোনো গান গাইতে শুনি নি। জটিল ছন্দের বাঁটতান বা কেবল 'আ' শব্দ উচ্চারণের দ্বারা আরোহণ, অবরোহণ যুক্ত কোনোপ্রকার তান বাংলা গানে ব্যবহার করতেন না। ঢিমালয়ের হিন্দীভাঙা বাংলা গানেই সুরবিস্তার করতেন, কিন্তু সে বিস্তার ছিল অতি সামান্য। কিন্তু শেখাবার সময় সেই গানই সুরবিস্তার-সহ কাউকে শেখাতে দেখি নি। আমি নিজেও কখনো শিখি নি। দিনেন্দ্রনাথের কাছে গান শিখেছি, অন্যদের গান শেখাতে দেখেছি, কিন্তু তিনি নিজে তানের দ্বারা সুরবিস্তারের গান শিখিয়েছেন বা নিজে গেয়েছেন, এমন কখনো শুনি নি। দিনেন্দ্রনাথকে গুরুদেব নিজে তানবিস্তার-যোগে গান শিখিয়েছেন তা মনে পড়ে না। নানারূপ সুরের বিস্তার ও 'তান'-সমেত গুরুদেবকে নিজের গানে সুর যোজনা করতে দেখি নি। তাই শেখাবার বেলায় তার প্রয়োগ দেখা যেত না। কেবল নিজে গাইবার সময় কখনো কখনো খেয়াল অঙ্গের হিন্দীভাঙা বিশেষ কয়েকটি বাংলা গানের সুরবিস্তার করেছেন। তাঁর ধ্রুপদ-ভাঙা বাংলা গানগুলিতে কোনো দিনই দু গুণ, চৌগুণ বা ছন্দযুক্ত বাঁটতান ব্যবহার করতে শুনি নি।

আগের দিনের খ্যাতনামা গুণীরা গুরুদেবের গানে যা করেছেন তা সম্পূর্ণ তাঁদেরই ইচ্ছামত তাঁরা করেছেন। সংগীতাচার্য রাধিকাবাবুর দ্বারা গীত গুরুদেবের হিন্দীভাঙা দুটি বাংলা গানের রেকর্ড আছে। সে গান দুটি গুরুদেবের মুখেও বহুবার শুনেছি। কিন্তু রাধিকাবাবুর গাওয়া তানালংকার বহুলতার অনুরূপ কোনো পরিচয় গুরুদেবের কণ্ঠে একবারও শুনি নি। তাঁর গাইবার ঢঙ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের।

গুরুদেব যে তানের অলংকার তাঁর গানে পছন্দ করতেন না তার আর একটি বড় পরিচয় হল তাঁর হিন্দীভাঙা বাংলা গানের বাইরের গানগুলি। যদি তাঁর মনে হত যে তানের অলংকারে তাঁর গানের সৌন্দর্য আরো বাড়বে তবে তিনি নিশ্চয়ই গানগুলিকে সেইরূপ বিস্তারিত অলংকারে সাজাতে চেষ্টা করতেন। নিজে তা কোনো-দিনই করেন নি। কাউকে সেভাবে শেখাতে উৎসাহ পেলেন না। নিজে থেকে কাউকে ঐভাবে গাইতেও উৎসাহ দিলেন না। এর থেকেই বেশ ধরা যায় তাঁর মন কী চেয়েছিল।

এইবারে লিখিত ভাবে প্রকাশিত তাঁর মতামত তুলে দিচ্ছি। ১৩২৮ সালে

সংগীত-বিষয়ে এক বক্তৃতায় বলছেন—"আমার মনে যে সুর জমেছিল, সে সুর যখন প্রকাশিত হতে চাইলে, তখন কথার সঙ্গে গলাগলি ক'রে সে দেখা দিল। ছেলেবেলা থেকে গানের প্রতি আমার নিবিড় ভালোবাসা যখন আপনাকে ব্যক্ত করতে গেল, তখন অবিমিশ্র সংগীতের রূপ সে রচনা করলে না, সংগীতকে কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে, কোন্‌টা বড়ো কোন্‌টা ছোটো বোঝা গেল না।...

"মানুষের মধ্যে প্রকৃতিভেদ আছে, সেই ভেদ অনুসারে সংগীতের এই দুই রকমের অভিব্যক্তি হয়। তার প্রমাণ দেখা যায় পশ্চিম-হিন্দুস্থানে আর বাংলাদেশে। কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশে সংগীত কবিতার অনুচর না হোক সহচর বটে, কিন্তু পশ্চিম-হিন্দুস্থানে সে স্বরাজে প্রতিষ্ঠিত। বাণী তার 'ছায়েবানুগতা'।

"বাংলাদেশে হৃদয়ভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ সাহিত্যে। বাণীর প্রতি বাঙালির অন্তরের টান; এইজন্যেই ভারতের মধ্যে এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সবচেয়ে বেশি হয়েছে। কিন্তু একা বাণীর মধ্যেও তো মানুষের প্রকাশের পূর্ণতা হয় না—এইজন্যে বাংলাদেশে সংগীতের স্বতন্ত্র পঙ্‌ক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন।...

"বাংলাদেশে কাব্যের সহযোগে সংগীতের যে বিকাশ হচ্ছে, সে একটি অপরূপ জিনিস হয়ে উঠবে। তাতে রাগ-রাগিণীর প্রথাগত বিশুদ্ধতা থাকবে না,...অর্থাৎ গানের জাতরক্ষা হবে না, নিয়মের স্খলন হতে থাকবে, কেননা তাকে বাণীর দাবি মেনে চলতে হবে। কিন্তু এমনতর পরিণয়ে পরস্পরের মন জোগাবার জন্যে উভয়-পক্ষেরই নিজের জিদ্‌ কিছু কিছু না ছাড়লে মিলন সুন্দর হয় না। এইজন্যে গানে বাণীকেও সুরের খাতিরে কিছু আপোষ করতে হয়, তাকে সুরের উপযোগী হতে হয়। যাই হোক, বাংলাদেশে এই একজাতের কাব্যকলা ক্রমশ ব্যাপক হয়ে উঠবে বলে আমি মনে করি। অন্তত আমার নিজের কবিত্বের ইতিহাসে দেখতে পাই—গান রচনা, অর্থাৎ সংগীতের সঙ্গে বাণীর মিলন-সাধনই এখন আমার প্রধান সাধনা হয়ে উঠেছে। সংগীত যেখানে আপন স্বাতন্ত্র্যে বিরাজ করে, সেখানে তার নিয়ম সংযমের যে শুচিতা প্রকাশ পায়, বাণীর সহযোগে গানরূপে তার সেই শুচিতা তেমন করে বাঁচিয়ে চলা যায় না বটে, কিন্তু পরম্পরাগত সংগীতরীতিকে আয়ত্ত করলে তবেই নিয়মের ব্যত্যয় সাধনে যথার্থ অধিকার জন্মে।...স্বাতন্ত্র্য যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা, সেখানে কলাবিদ্যার স্থান নেই। এইজন্যে নিজের সৃজনশক্তিকে ছাড়া দিতে গেলেই, শিক্ষা ও সংযমশক্তির বেশি দরকার হয়।"

"রাগিণী যতদিন কুমারী ততদিন তিনি স্বতন্ত্রা, কাব্যরসের সঙ্গে পরিচয় ঘটলেই তখন ভাবের রসকেই পতিব্রতা মেনে চলে। উল্টে, রাগিণীর হুকুমে ভাব যদি পায়ে পায়ে নাকে খৎ দিয়ে চলতে থাকে সেই স্ত্রৈণতা অসহ্য। অন্তত আমাদের দেশের চাল এ রকম নয়।"

"আমাদের গানেও হিন্দুস্থানী যতই বাঙালী হয়ে উঠবে ততই মঙ্গল, অর্থাৎ সৃষ্টির দিকে।"

"পাঁচালীর যে গান তার কাছে (কিশোরী) শুনতুম তার রাগিণী ছিল সনাতন; হিন্দুস্থানী, কিন্তু তার সুর বাংলা কাব্যের সঙ্গে মৈত্রী করতে গিয়ে পশ্চিমী ঘাঘরার ঘূর্ণাবর্তকে বাঙালী শাড়ীর বাহুল্যবিহীন সহজ বেষ্টনে পরিণত করেছে।..."

"রাগিণী যেখানে শুদ্ধ মাত্র স্বররূপেই আমাদের চিত্তকে অপরূপ ভাবে জাগ্রত করিতে পারে সেইখানেই সংগীতের উৎকর্ষ। কিন্তু বাংলাদেশে বহুকাল হইতে কথারই আধিপত্য এত বেশি যে এখানে বিশুদ্ধ সংগীত নিজের স্বাধীন অধিকারটিকে লাভ করিতে পারে নাই। সেইজন্য এদেশে তাহাকে ভগিনী কাব্যকলার আশ্রয়েই বাস করিতে হয়। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী হইতে নিধুবাবুর গান পর্যন্ত সকলেরই অধীন থাকিয়া সে আপনার মাধুর্য বিকাশের চেষ্টা করিয়াছে।"

১৯২৫ সালে দিলীপ রায় মহাশয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে যে আলাপ হয়, তারই বিস্তারিত বিবরণ গুরুদেব-কর্তৃক সমর্থিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক পত্রে। গুরুদেব সেখানে দিলীপ রায় মহাশয়কে বলছেন—

"তুমি এটা কেন মানবে না যে, হিন্দুস্থানী সংগীতের ধারার বিকাশ যেভাবে হয়েছে আমাদের বাংলা সংগীতের ধারা সেভাবে বিকাশ লাভ করে নি? এ দুটোর মধ্যে প্রকৃতিভেদ আছে। বাংলার সংগীতের বিশেষত্বটি যে কী, তার দৃষ্টান্ত আমাদের কীর্তনে পাওয়া যায়। কীর্তনে আমরা যে আনন্দ পাই সে তো অবিমিশ্র সংগীতের আনন্দ নয়। তার সঙ্গে কাব্যরসের আনন্দ একাত্ম হয়ে মিলিত।

"আমি যে গান তৈরি করেছি তার ধারার সঙ্গে হিন্দুস্থানী সংগীতের ধারার একটা মূলগত প্রভেদ আছে—এ কথাটা কেন তুমি স্বীকার করতে চাও না? তুমি কেন স্বীকার করবে না যে, হিন্দুস্থানী সংগীতে সুর মুক্তপুরুষ ভাবে আপন মহিমা প্রকাশ করে, কথাকে শরিক বলে মানতে সে যে নারাজ। বাংলার সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমারব্রত তার নয়, সে যুগলমিলনের পক্ষপাতী।...আধুনিক বাংলা সংগীতের বিকাশ তো হিন্দুস্থানী সংগীতের ধারায় হয় নি। আমি তো সে দাবি করছিও না। আমার আধুনিক গানকে সংগীতের একটা বিশেষ মহলে বসিয়ে তাকে একটা বিশেষ নাম দাও না, আপত্তি কি। বটগাছের বিশেষত্ব তার ডাল আবডালের বহুল বিস্তারে, তালগাছের বিশেষত্ব তার সরলতায় ও শাখা পল্লবের বিরলতায়। বটগাছের আদর্শে তালগাছকে বিচার কোরো না। বস্তুতঃ তালগাছ হঠাৎ বটগাছের মতো ব্যবহার করতে গেলে কুশ্রী হয়ে ওঠে।...

"তুমি কি বলতে চাও যে, আমার গান যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনি ভাবে গাইবে? আমি তো নিজের রচনাকে সেরকম ভাবে খণ্ড বিখণ্ড করতে অনুমতি দিই নি। আমি যে এতে আগে থেকে প্রস্তুত নই। যে রূপসৃষ্টিতে বাইরের লোকের হাত চালাবার পথ আছে তার এক নিয়ম, আর যার পথ নেই তার অন্য নিয়ম।...

"হিন্দুস্থানী-সংগীতকার তাঁদের সুরের মধ্যকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে এটা যে চেয়েছিলেন। তাই কোনো দরবারী কানাড়ার খেয়াল সাদামাটা ভাবে গেয়ে গেলে সেটা নেড়া নেড়া না শুনিয়েই পারে না। কারণ দরবারী কানাড়া তানালাপের সঙ্গেই গেয়, সাদামাটাভাবে গেয় নয়। কিন্তু আমার গানে তো আমি সে রকম ফাঁক রাখি নি যে সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব।...

"আমার গানের বিকার প্রতিদিন আমি এত শুনেছি যে আমারও ভয় হয়েছে যে আমার গানকে তার স্বকীয় রসে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়তো সম্ভব হবে না। গান নানা লোকের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলেই গায়কের নিজের দোষগুণের

বিশেষত্ব গানকে নিয়তই কিছু-না কিছু রূপান্তরিত না করেই পারে না। ছবি ও কাব্যকে এই দুর্গতি থেকে বাঁচানো সহজ। ললিত কলার সৃষ্টির স্বকীয় বিশেষত্বের উপরেই তার রস নির্ভর করে। গানের বেলাতে তাকে রসিক হোক অরসিক হোক সকলেই আপন ইচ্ছামত উলট-পালট করতে সহজে পারে বলেই তার উপরে বেশি দরদ থাকা চাই। সে সম্বন্ধে ধর্মবুদ্ধি একেবারে খুইয়ে বসা উচিত নয়। নিজের গানের বিকৃতি নিয়ে প্রতিদিন দুঃখ পেয়েছি বলেই সে দুঃখকে চিরস্থায়ী করতে ইচ্ছা করে না।

"অবশ্য যারা সত্যকার গুণী, তাদের আমি অনেকটা বিশ্বাস করে এ স্বাধীনতা দিতে পারতাম। তবে একটা কথা—না দিলেই মানছে কে; দ্বারী নেই, শুধু দোহাই আছে, এমন অবস্থায় দস্যুকে ঠেকাতে কে পারে? কেবল আমি এ সম্পর্কে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি যে বাংলা-গানে হিন্দুস্থানী সংগীতের মতন অবাধ তানালাপের স্বাধীনতা দিলে তার বিশেষত্ব নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে এ কথা তুমি মান কি না?...

"আমি তো কখনো এ কথা বলি নি যে কোনো বাংলা গানেই তান দেওয়া চলে না। অনেক বাংলা গান আছে যা হিন্দুস্থানী কায়দাতেই তৈরি, তানের অলংকারের জন্য তার দাবি আছে। আমি এ রকম শ্রেণীর গান অনেক রচনা করেছি। সেগুলিকে আমি নিজের মনে কত সময়ে তান দিয়ে গাই।...

"আমি যদি ওস্তাদের কাছে গান শিক্ষা করে দক্ষতার সঙ্গে সেই-সকল দুরূহ গানের আলাপ করতে পারতুম তাতে নিশ্চয়ই সুখ পেতুম, কিন্তু আপন অন্তর থেকে প্রকাশের বেদনাকে গানে মূর্তি দেবার যে আনন্দ সে তার চেয়ে গভীর।"

১৩৬১

রবীন্দ্রসংগীতে জাতিবিচার

শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে গুরুদেবের গান গাইবার ঝোঁক যেমন বেড়েছে তেমনি তাঁদের মধ্যে সম্প্রতি একটা কথা উঠেছে যে, এ গান সকলের গলায় মানায় না, অর্থাৎ হিন্দী কিম্বা অন্যপ্রকার বাংলা গানের যাঁরা চর্চা করেন তাঁদের গানের গলা যেভাবে তৈরি তাতে গুরুদেবের গান ঠিকমত গাওয়া যায় না। ঠিক একই কারণ দেখিয়ে তাঁরা এ কথাও বলেছেন যে, যাঁরা কেবলমাত্র রবীন্দ্রসংগীত করেন তাঁদের পক্ষেও অন্য প্রকৃতির গান গাওয়ার চেষ্টা করা অনুচিত। এ চিন্তা আজ এমন প্রভাব বিস্তার করে চলেছে যে, যার জন্যে আজকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সংগীতের সিলেবাসে রবীন্দ্রসংগীতকে সম্পূর্ণ ভিন্নজাতের বলে আলাদা করা হয়েছে অন্যান্য বাংলা গান থেকে। যেন রবীন্দ্রসংগীত অন্যান্য বাংলা গানের সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে বসতে রাজী নয়। ভারতীয় বেতার প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে কলিকাতা কেন্দ্রে, অন্যান্য বাংলা গানের ভালো গাইয়েরা আজ গুরুদেবের গান গাইবার অধিকারী নয়। রেকর্ড কোম্পানি ভালো গলার অন্যান্য গাইয়েদের দিয়ে গুরুদেবের গান রেকর্ড করাতে সাহস করে না। এইভাবে বাংলা গানের মধ্যে দুটো দলের সৃষ্টি হতে চলেছে, এটা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। গুরুদেবের গানের মধ্যে এই ভেদাভেদের চিন্তা কতটা যুক্তিসম্মত এবারে তা বিবেচনা করে দেখা যাক।

গুরুদেব উচ্চাঙ্গের হিন্দী ধ্রুপদ, খ্যাল ও টপ্পা গানের হুবহু অনুকরণে যে-সব বাংলা গান রচনা করেছেন, তার সংখ্যা প্রচুর, রবীন্দ্রসংগীতানুরাগীরা তা সর্বদাই গেয়ে থাকেন। তা নিয়ে আলোচনাও করেন, সেগুলি উচ্চাঙ্গের হিন্দী গানের তুল্য বলে। কিন্তু হিন্দী গানের রাগিণী ও ছন্দের বিস্তারিত অলংকরণ পদ্ধতিটিকে বাদ দিয়েই এ গান গাইবার রীতি। এই গানগুলির তিনভাগের দু'ভাগের কৃতিত্ব হল মূল হিন্দী গানের রচয়িতাদের, একভাগ হল গুরুদেবের নিজের। অর্থাৎ গুরুদেব এই গানের বাংলা কথাগুলিকেই কেবল নিজের ইচ্ছামত রচনা করেছেন। তার রাগিণী ও ছন্দের কোনো পরিবর্তন তিনি করেন নি। গাইবার ঢঙটি হচ্ছে হিন্দীর মতো বাংলা কথার উচ্চারণ বাদে। হিন্দী গাইতে হলে যেভাবে গলার চর্চা করতে হয় এ গানের বেলায় গলার সেইরূপ চর্চা নিশ্চয়ই দরকার। তাই বাঙালির মধ্যে যারা অন্যের রচিত এ ধরনের বাংলা গানের চর্চা করেন তাঁদের গলার পক্ষে গুরুদেবের এ গানগুলি উপযুক্ত নয়, এমন কথা বলা ঠিক কিনা ভেবে দেখতে বলি।

গুরুদেবের সংগীতজীবনের ইতিহাস থেকে এ বিষয়ে কী উত্তর পাওয়া যায় এবারে তা দেখা যাক।

গুরুদেবের সংগীতের শিক্ষানবীশির যুগের যে ইতিহাস আমরা পাই তাতে দেখি তিনি শিশুবয়স থেকে বাড়িতে হিন্দী গানের আবহাওয়ায় তানপুরা কাঁধে গান গাইছেন, গলা সাধছেন। সে যুগে তাঁর গানের গুরুরা সকলেই ছিলেন হিন্দী গানের নামকরা ওস্তাদ। গুরুদেবের দাদারা যে গানের আবহাওয়ায় গুরুদেবের সংগীতজীবনের ভিতটাকে রচনা করতে সাহায্য করেছিলেন তাও হিন্দী সংগীত প্রভাবান্বিত নানাপ্রকার সহজ বাংলা গান। আত্মীয়েরা সকলেই হিন্দী বা ঐরকমের

বাংলা গানের চর্চা করেছেন। এইভাবে যৌবনের আরম্ভ পর্যন্ত গুরুদেবের সংগীত-জীবনটি কাটে হিন্দী বা হিন্দী প্রভাবে রচিত বাংলা গানের চর্চায়। যৌবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাচ্ছে যে উচ্চাঙ্গের হিন্দীগান ধ্রুপদ, খ্যাল, ইত্যাদির অনুকরণে বছরের পর বছর গান রচনা করছেন। বাড়ির নানাপ্রকার উৎসব-অনুষ্ঠানে নিজেরা সে গান গাইছেন, ওস্তাদদের দিয়ে সেগুলি গাওয়াচ্ছেন। সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি হিন্দী ভাঙা বাংলা গান রচনা করেছেন যৌবনের আরম্ভ থেকে ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত হিন্দী গানের ওস্তাদদের সাহায্যে। এর থেকে অনায়াসেই অনুমান করা যায় যে গুরুদেবের গানের গলা কোন্ গানের সাধনায় তৈরি ছিল। উপরোক্ত এই সময়ে নিজের স্বাধীন ইচ্ছামত গীতিনাট্য, সাধারণ নাটক, লৌকিক প্রেম, পূজো ও জাতীয় সংগীত ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে গানও রচনা করেছেন অনেক। সেগুলি যে নানা স্তরের হিন্দী গানের প্রভাব থেকে মুক্ত নয় রবীন্দ্রসংগীতজ্ঞরা তা ভালো করেই জানেন। এই অবস্থায় এ গানগুলি গাইতে হলেও যে হিন্দী গানের প্রথায় গলা তৈরির প্রয়োজন এ কথা মানতেই হবে।

রবীন্দ্রসংগীতজ্ঞরা হয়তো জিজ্ঞাসা করবেন যে, তা হলে ভিন্ন প্রকৃতির বাংলা গানের গীতিধারার সঙ্গে কি গুরুদেবের গানের পার্থক্য নেই। পার্থক্য যা-কিছু আছে তা আর-এক দিকে। সেটি হল গাইয়ের নিজস্ব গাইবার পদ্ধতি বা যাকে বলা যেতে পারে গায়কের নিজস্ব গায়কী। গুরুদেবের বেলায় সেটি যে কী, সে কথা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করি।

গুরুদেব গান রচনা করেছেন হিন্দী ধ্রুপদ, খ্যাল, টপ্পা, ঠুংরী, ভজন থেকে শুরু করে বাংলার নানা স্তরের গানের প্রভাবে। তাই গানগুলি গাইবার সময়ে মূল প্রথাকে অনুসরণ করেই তিনি তা গেয়েছেন। তবে তার সঙ্গে তিনি চেষ্টা করেছেন, গানের কথার দ্বারা যে হৃদয়াবেগটিকে তিনি বেঁধেছেন তাকে প্রকাশ করতে অনুকূল কণ্ঠস্বরের বিকাশে। কিন্তু সে কণ্ঠস্বর গানটির রাগিণীর উপর প্রতিষ্ঠিত। তাকে যদি বলি রাগিণী বা সুরমিশ্রিত আবৃত্তি বা গীত অভিনয়, তা হলে কথাটা হয়তো পরিষ্কার হবে। অন্যান্য রচয়িতাদের গানেও এই প্রথাটি বর্তমান। কীর্তন, নানাপ্রকার লোকসংগীত, বাংলা ধ্রুপদ, খ্যাল, টপ্পা ইত্যাদি ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সব-রকমের গাইয়েদের মধ্যে এই চেষ্টার প্রয়াস লক্ষ্য করি। গুরুদেব কিভাবে তাঁর গানকে কথার ভাবানুযায়ী গেয়ে প্রকাশ করতেন তার আদর্শ উদাহরণ হল, তাঁরই কণ্ঠে গাওয়া তাঁর নিজের গানের রেকর্ড ক'টি।

এখানে রবীন্দ্রসংগীতজ্ঞরা যদি বলেন যে, ভেদাভেদের যে কথা তাঁরা তুলেছেন তা গুরুদেবের নিজ কণ্ঠে গাওয়া ঐ গান কটিকে আদর্শ ভেবে, তখন এর উত্তরে যদি কথা ওঠে যে, তাঁরা নিজেরাই কি গুরুদেবের আদর্শে তাঁর নিজের গানের ভাবপ্রকাশ পদ্ধতিটি হুবহু গ্রহণ করতে পেরেছেন! গুরুদেবের নিজকণ্ঠে গাওয়া রেকর্ডের গানগুলিকে আদর্শরূপে খাড়া করে এ পর্যন্ত প্রকাশিত রবীন্দ্রসংগীতের বিচার করতে গেলে দেখতে পাব যে, গুরুদেবের পথে তাঁরা খুব বেশি অগ্রসর হতে পারেন নি। কারণ গলার স্বরের হুবহু সমতা কখনো ঘটে না। ভাবপ্রকাশের বেলায় গুরুদেবের গীতপদ্ধতি হুবহু অনুকরণ করাও সম্ভব নয়। গাইয়েরা গানের

ভাবরসের মধ্যে যতটুকু প্রবেশ করতে পারবে ততটুকুই গলায় তার প্রকাশ দেখা যাবে। রসের অনুভূতির এই তারতম্যের জন্যেই রবীন্দ্রসংগীত গাইয়েদের গানে একজনের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য। নির্ভুল সুরে ও মার্জিত কণ্ঠে গান গাওয়াকেই গায়কী বললে ভুল করা হবে।

গুরুদেব নিজে কিন্তু গলা চর্চার পার্থক্য বা গাইবার পদ্ধতির পার্থক্য নিয়ে কোনোদিনই কাউকে তাঁর গান গাইতে নিরুৎসাহ করেন নি। চেয়েছেন, এ গানের আনন্দ সকলেই ভোগ করবে। জীবিতকালে ভালোমন্দ নানা পদ্ধতির গায়কদের দ্বারা গীত তাঁরই গান তাঁকে শুনতে হয়েছে সামনা-সামনি বা রেকর্ডের সাহায্যে। গুরু-দেবের মতো নিখুঁত ঢঙে একজনও গাইতে পারেন নি। নির্ভুল সুরে তাঁর গান গাওয়া হোক এ তিনি নিশ্চয়ই চাইতেন, কিন্তু গানের ভাবরসটিকে বাদ দিয়ে নয়। এইটির অভাবে তাঁর গানের পূর্ণ বিকাশ যে সম্ভব নয় এদিকে গাইয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণের ইচ্ছাতেই বলেছিলেন, তাঁর গানে যেন স্টিম্ রোলার না চালানো হয়। অর্থাৎ গানের ভাবরসটিকে যেন পিষে মারা না হয়। তাঁর এ আবেদন কোনো দলবিশেষের জন্যে নয়, তাঁর গান গাইতে ইচ্ছুক সকলেরই জন্যে। তাই তিনি বলেছিলেন—

"যারা খেটে খায়, অফিসে যায়, তাদের পক্ষে এ-সব গান (ওস্তাদি) হয়ে ওঠে না; তাদের পক্ষে ওস্তাদের মতো গলা সাধা শক্ত। সেইজন্য এখনকার গান ব্যবসাদারির বাইরে থাকাই ভালো। গান হবে যাতে যারা আশেপাশে থাকে তারা খুশি হয়...বাইরের মধ্যে হাততালি পাবার জন্যে নয়। ওস্তাদ যাঁরা তাঁদের জন্যে ভাবনা নেই, ভাবনা হচ্ছে যারা গানকে সাদাসিধে রূপে মনের আনন্দের জন্য পেতে চায় তাদের জন্যে।...আমার গান যদি শিখতে চাও নিরালায়...গলা ছেড়ে গাবে।"

আবার বললেন—

"জীবনের আশি বছর অবধি চাষ করেছি অনেক। সব ফসলই যে মরাইতে জমা হবে তা বলতে পারি নে। কিছু ইঁদুরে খাবে, তবুও বাকি থাকবে কিছু। জোর করে বলা যায় না; যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সব-কিছুই তো বদলায়। তবে সবচেয়ে স্থায়ী আমার গান এটা জোর করে বলতে পারি। বিশেষ করে বাঙালিরা, শোকে দুঃখে, সুখে আনন্দে, আমার গান না গেয়ে তাদের উপায় নেই। যুগে যুগে এ গান তাদের গাইতেই হবে।"

গুরুদেবের সংগীতজীবন ও সংগীতচিন্তার কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রসংগীত-ভক্তদের কাছে আমাদের অনুরোধ এই যে, তাঁরা ভেদাভেদ ভুলে এ গানকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার কথা ভাবুন। সকলেই যাতে গাইতে পারে, গেয়ে আনন্দ দিতে পারে সেই পথেই নিজেদের চিন্তা ও কাজকে পরিচালিত করুন। এ গানের মধ্যে আভিজাত্যের গর্ব এনে, অন্যদের অস্পৃশ্য মনে করে তাদের ছায়া মাড়াবার দোষে যেন একে দোষী হতে না হয়।

১৩৬৬

রবীন্দ্রসংগীত কিভাবে গাইতে হয়

পূজনীয় গুরুদেবের গান রচনার কয়েকটি বিশেষ রীতি ছিল। গানের ভাবের প্রতি লক্ষ রেখে তিনি স্থির করতেন, কোন্ তালের ছন্দে গানটির সুর যোজনা করতে হবে। যেমন—শ্রদ্ধা, বন্দনা, ভক্তি, গম্ভীর ও শান্ত প্রকৃতির গানগুলিতে তিনি হিন্দী চৌতালের ধ্রুপদ-গানের রচনা-রীতি অনুযায়ী সরল ও নিরাভরণ সুর যোজনা করতেন। সহজ তালে, একই প্রকার গান রচনার সময়েও দেখা গেছে যে, সুরযোজনা এবং তার গীত-রীতিতে ধ্রুপদের রচনা-রীতির ছাপ। উদ্দীপক ও উল্লাসের কবিতায় যখন সুর বসাতেন, তখন, সুরগুলি প্রায়ই পরস্পরের সঙ্গে বেশ খানিকটা ব্যবধান রচনা করে ওঠানামা করত। এ-সব গান মধ্যলয়ের গতিতে গাইতে হয় বাণীর উপর নির্দিষ্ট ছন্দের ঝোঁক দিয়ে। আনন্দচঞ্চল আবেগের গানে তিনি সুর বসাতেন, দ্রুতলয়ের ঘন-সন্নিবিষ্ট ছন্দের ঝোঁকে। হতাশা, বিষণ্ণতা, বিরহবেদনা, দুঃখ বা কান্নার আবেগের কথায় সুর বসিয়েছেন গড়ানো বা ঢিমালয়ের তালে। কখনো কখনো ঢিমালয়ের তালের বাঁধন থেকে মুক্তি দিয়ে এ ধরনের গানকে ভাঙা বা অনিয়মিত ছন্দে গেয়েছেন। গানের এইরূপ বিচিত্র ভাবাবেগের প্রতি লক্ষ রেখে, অনুকূল তালের ছন্দে ও লয়ে শিল্পীরা তাকে যদি কণ্ঠে প্রকাশ করতে পারেন তবেই গানের রূপ ও রসটি ফুটে উঠবে, সহজে; গান গাইবার সময়, এই দিকটির প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রতিটি গায়ক ও গায়িকার অবশ্যকর্তব্য। ভাবের প্রতিকূল তালের ছন্দে পরিবেশিত গানকে বলব বিকৃত গান।

গুরুদেবের গানকে কণ্ঠে প্রকাশের সময় কণ্ঠস্বর প্রয়োগের কতগুলি ধরন আছে। যেমন—বন্দনা, শ্রদ্ধা, শান্ত, উল্লাস, উদ্দীপন, আনন্দচঞ্চল, দুঃখ, ক্রোধ, বিরহ-বেদনার ভাবযুক্ত কবিতার আবৃত্তিকালে নানাপ্রকার কণ্ঠস্বর প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। তেমনি গানের রসভেদে কণ্ঠস্বরের হ্রাসবৃদ্ধি অর্থাৎ কখনো মৃদু, কখনো মধ্যবল, কখনো প্রবল, কখনো ক্রমশ মৃদু থেকে ক্রমশ বৃদ্ধি বা ক্রমশ বৃদ্ধি থেকে ক্রমশ মৃদুস্বর কণ্ঠে প্রয়োগ করতে হয়। একটানা মৃদু স্বরে বা একটানা প্রবল স্বরে গুরুদেবের গান গাইবার রীতি নয়।

গুরুদেব, তাঁর উদ্দীপক ও গম্ভীর প্রকৃতির গানে তৎসম শব্দকে অধিক স্থান দিতেন। তৎসম শব্দযুক্ত কবিতার আবৃত্তিকালে শব্দগুলিকে গুরুদেব যে রূপে প্রস্বনের দ্বারা উচ্চারণ করতেন, তাঁর গানের সুরযুক্ত তৎসম শব্দগুলির ক্ষেত্রেও তাঁকে একই উচ্চারণ রীতি অবলম্বন করতে দেখেছি। তদ্ভব শব্দযুক্ত উদ্দীপক গানও তিনি রচনা করেছেন, কিন্তু, তার শব্দকে তিনি তালের ঝোঁকের সঙ্গে, কণ্ঠস্বরে বা বাচনভঙ্গিতে এমনভাবে জোর দিয়ে উচ্চারণ করতেন যে, তার দ্বারা সমগ্র গানের ভাবরূপটি সহজে প্রকাশিত হবার সুযোগ পেত।

আহা, অহো, আঃ, আয়, এস, ওগো, কী, কেন, চলো ছি, দে, ডেকো না, তুই থাক্, ধর, ধিক, না, যাও, যাক্ হা, হাগো, হারেরে রে, হাই, হাঁচ্ছো, হায়, হো. হে, প্রভৃতি বহু রকমের শব্দ গুরুদেবের নানাপ্রকার হৃদয়াবেগের গানে আমরা পাই। কিন্তু, এর যে-কোনো একটি শব্দকে তিনি যখন ক্রোধ, দুঃখ, বিস্ময়, আনন্দ, বেদনা

প্রভৃতি আবেগের গানে বসিয়েছেন, তখন সেটিকে কোন্ অর্থে ব্যবহার করেছেন তা ভালো করে বুঝে, সুর সহযোগে ভাবানুকূল স্বরভঙ্গির সাহায্যে উচ্চারিত হলে, শব্দযুক্ত পঙ্‌ক্তি বা সমগ্র গানের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা সহজ হয়। যে-সকল গায়ক-গায়িকা সুরযুক্ত স্বরভঙ্গিতে তা প্রকাশ করতে অক্ষম হবেন, তাঁদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

গুরুদেবের গীতনাট্য ও নৃত্যনাট্যের গান এবং সুরে আবৃত্তিমূলক কিছু গান আছে যা উপরোক্ত এই-সকল গীতরীতিতে গাইতে না পারলে তা যে ভাবানুযায়ী গাওয়া হল, সে কথা বলা চলবে না। গীতনাট্য ও নৃত্যনাট্যের ক্ষেত্রে চরিত্রানুযায়ী কথার ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন তাল ও লয়ের পরিবর্তন করতে হয়। এই কারণে, এই-সব নাটকের নানা প্রকৃতির গানগুলি সুরসহযোগে কী ধরনের স্বরভঙ্গিতে এবং ছন্দে ও লয়ে গাইতে হবে তার সুষ্ঠু অনুশীলন আবশ্যক।

রবীন্দ্রসংগীতের গীতরীতির এ কটিই হল মূল সূত্র এবং এর সঠিক অনুশীলন গায়ক-গায়িকাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। শিক্ষকদের কর্তব্য হবে, গান গেয়ে শিক্ষার্থীকে এই সূত্র কটিকে ভালো করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা। কেবল মুখের আলোচনায় বা গ্রন্থের ব্যাখ্যা পাঠের দ্বারা শিক্ষার্থীরা এই গীত-রীতিটিকে কখনোই কণ্ঠে ধরতে পারবে না। শিক্ষককে ক্রমান্বয়ে সব রকমের গান গেয়ে বোঝাতে হবে, গানের প্রকৃত রস বা ভাবটিকে কিভাবে কণ্ঠে প্রকাশ করতে হয়।

গুরুদেবের যে-কোনো গানের সুষ্ঠু পরিবেশনের প্রয়োজনে গায়কের অবশ্য-কর্তব্য হবে, লিরিক কাব্য হিসেবে সমগ্র গানটির মূল ভাবটিকে অন্তরে অনুভব করবার চেষ্টা করা এবং গানের প্রতিটি শব্দ ব্যবহারের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করা। এ ছাড়া আবশ্যক, উচ্চাঙ্গ সংগীতের রাগ-রাগিণী এবং দেশী সুরের মধ্যে নানাপ্রকার লিরিক আবেগ যেভাবে সঞ্চিত আছে তাকে হৃদয়ে গ্রহণ করবার শিক্ষা। আর-একটি শিক্ষণীয় বিষয় হল, উচ্চাঙ্গ এবং লোকপ্রচলিত গানের সঙ্গে যুক্ত বিচিত্র তালের ছন্দোজ্ঞান। গানের তালও ভাব-প্রকাশের একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ।

এইরূপ সর্বাঙ্গীণ শিক্ষায় পারদর্শী গায়ক ও গায়িকা হিসেবে যেদিন আমরা রবীন্দ্রসংগীতকে গেয়ে শোনাতে পারব সেদিনই রসিক শ্রোতাগণ জানতে পারবেন, রবীন্দ্রসংগীত কিভাবে গাইতে হয়।

১৩৮৪

রবীন্দ্রসংগীতে ধ্রুপদের প্রভাব

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের গানে ভারতীয় উচ্চাঙ্গের হিন্দী সংগীত, বাংলার নানা প্রকার দেশী সংগীত এবং ইয়োরোপীয় সংগীতের প্রভাবের কথা আমরা সর্বদাই বলে থাকি। কিন্তু, এর মধ্যে প্রকৃত কোন্ সংগীতধারা তাঁর মনে সর্বাপেক্ষা প্রভাব বা প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, তার বিশদ পরিচয় নেবার প্রতি তেমন মনোযোগ আমরা এখনো দিই নি। এ বিষয়ে সঠিক বুঝতে হলে প্রথমে গুরুদেবের গুটি-কয়েক সংক্ষিপ্ত উক্তির উপর নির্ভর করতে হবে।

গুরুদেব একস্থানে বলেছেন— "আমরা বাল্যকালে ধ্রুপদ গান শুনতে অভ্যস্ত, তার আভিজাত্য বৃহৎ সীমার মধ্যে আপন মর্যাদা রক্ষা করে। এই ধ্রুপদ গানে আমরা দুটো জিনিস পেয়েছি— একদিকে তার বিপুলতা, গভীরতা, আর-একদিকে তার আত্মদমন, সুসংগতির মধ্যে ওজন রক্ষা করা।" আর একস্থানে বলেছেন— "জনশ্রুতি আছে যে, আমি হিন্দুস্থানী সংগীত জানিনে, বুঝিনে। আমার আদিযুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুবপদ্ধতির রাগরাগিণীর সাক্ষীদল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণ সহ দূর ভাবী শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাদবিতণ্ডার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ইচ্ছা করলেও সেই সংগীতকে আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারিনে, সেই সংগীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি একথা যারা জানে না তারাই হিন্দুস্থানী সংগীত জানে না।"

গুরুদেবের এ-দুটি উক্তি থেকে তাঁর গান রচনা সম্পর্কে যে ইঙ্গিত আমরা পেলাম তাকে সঠিক বুঝতে হলে বিস্তারিতভাবে ভারতীয় ধ্রুপদ সংগীত নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে। গুরুদেবের জন্ম সাল হল ১৮৬১। এ যুগে উচ্চাংগ হিন্দী সংগীতের গুণীদের প্রায় সকলেরই সংগীত শিক্ষার ভিত্তি রচিত হত ধ্রুপদ গানকে কেন্দ্র করে। তখনকার বাংলা দেশে উচ্চাঙ্গের হিন্দী ধ্রুপদ গানের যে ক'টি উল্লেখ-যোগ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে কলকাতা, বিষ্ণুপুর, কৃষ্ণনগর ছিল প্রধান। এ ছাড়া আগরতলা ও কুচবিহার এবং পূর্ববাংলার কয়েকটি ধনী জমিদারও ধ্রুপদ গানের গুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কলকাতার ধনীদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ধ্রুপদ গানের পৃষ্ঠপোষকতার পরিচয় বাংলা গানের জগতে সর্বজনবিদিত। এই যুগে, তদানীন্তন ইংরাজ সরকার কর্তৃক অযোধ্যার রাজ্য-চ্যুত নবাব ওয়াজিদ আলি সাহেবের কলকাতার মেটিয়াবুরুজের দরবার ছিল ধ্রুপদ ও খেয়াল গানের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। গুরুদেবের জোড়াসাঁকোর বাড়ির উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চার ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে, সেখানেও, সে যুগে ধ্রুপদ গানের গুণীদের স্থান ছিল সবার উপরে। গুরুদেবের জন্মকালে, তাঁর দাদারা যাঁর কাছে হিন্দী ধ্রুপদ গান শিখতেন, তিনি ছিলেন কৃষ্ণনগরের রাজ দরবারের শিক্ষাপ্রাপ্ত বিষ্ণু চক্রবর্তী। ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে কৃষ্ণনগরের রাজ দরবারে, তানসেন ঘরানার ধ্রুপদীয়া একজন মুসলমান ওস্তাদ তাঁর দুই সংগীতজ্ঞ পুত্র সমেত, শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। এ'দের সাহচর্যে বিষ্ণু চক্রবর্তী ও তাঁর অগ্রজ কিষ্টু চক্রবর্তী উচ্চাঙ্গের হিন্দী গান শেখেন। শিক্ষা শেষ করে, দুই ভ্রাতা প্রথমে কলকাতায় এসে, রাজা রামমোহন রায় যখন ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রহ্মসভা স্থাপন করেন তখন এই সভার উপাসনার প্রয়োজনীয় গান গাইবার জন্যে নিযুক্ত হন। রাজা রামমোহন রায়ের এবং বিষ্ণুর অগ্রজের মৃত্যুর পর, গুরুদেবের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

ঠাকুর, তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক এবং নিজের বাড়ির ছেলে-মেয়েদের সংগীতের শিক্ষকরূপে বিষ্ণুকে নিযুক্ত করেন। গুরুদেব শিশু বয়সেই বিষ্ণুর সংস্পর্শে এসে কিভাবে তাঁর কাছে গান শিখতেন তার বর্ণনা আমরা পাই। কিন্তু ধ্রুপদী গানের গায়ক হিসেবে বিষ্ণু তাঁর মন কতখানি আকর্ষণ করেছিলেন তার বর্ণনা করতে গিয়ে, তিনি বলছেন— "বাঙালির স্বাভাবিক গীতমুগ্ধতা ও গীত-মুখরতা কোনো বাধা না পেয়ে আমাদের ঘরে যেন উৎসের মত উৎসারিত হয়েছিল। বিষ্ণু ছিলেন ধ্রুপদীগানের বিখ্যাত গায়ক। প্রত্যহ শুনেছি সকালসন্ধ্যায় উৎসবে আমোদে উপাসনা মন্দিরে তাঁর গান, ঘরে ঘরে আমার আত্মীয়েরা তম্বুরা কাঁধে নিয়ে তাঁর কাছে গানচর্চা করেছেন।"

গুরুদেবের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিষ্ণু সম্পর্কে বলেছেন— "অন্যান্য ওস্তাদের গানের চেয়ে বিষ্ণুর গানই সকলে বেশি পছন্দ করিত।... ওস্তাদরা যেমন তান-অলংকারে প্রাধান্য দেন, বিষ্ণু তেমন কিছু করিতেন না। তিনি অল্প তান দিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে রাগিণীর মূল রূপটি বেশ ফুটিয়া উঠিত, গানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত না। ইহা ছাড়া কথার যে মূল্য আছে, সেটিও বিষ্ণুর গানে পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইত। সকলেই গানের সুর এবং গৎ সহজে বুঝিতে পারিত। বিষ্ণু ধ্রুপদ খেয়ালই বেশি গাহিতেন।"

গুরুদেব তাঁর বাড়ির সংগীতের পরিবেশ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য অপর একটি বিবরণে বলেছেন— "বাল্যকালে স্বভাব দোষে আমি যথারীতি গান শিখিনি বটে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে গানের রসে আমার মন রসিয়ে উঠেছিল। তখন আমাদের বাড়িতে গানের চর্চার বিরাম ছিল না। বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন সংগীতের আচার্য, হিন্দুস্থানী সংগীত-কলায় তিনি ওস্তাদ ছিলেন। অতএব ছেলেবেলায় যে-সব গান সর্বদা শোনা আমার অভ্যাস ছিল, সে শখের দলের গান নয়, তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের ঠাট আপনা আপনিই জমে উঠেছিল।... কালোয়াতি সংগীতের রূপ এবং রস সম্বন্ধে একটা সাধারণ সংস্কার ভিতরে ভিতরে আমার মনের মধ্যে পাকা হয়ে উঠেছিল।"

বিষ্ণুর মৃত্যুর পর, গুরুদেব যখন সবে কৈশোরে পা দিয়েছেন, তখন তাঁর বাড়ির সংগীত শিক্ষকরূপে, কিছু কালের জন্যে নিযুক্ত হন, বিষ্ণুপুরের প্রখ্যাত ধ্রুপদীয়া যদুভট্ট। এঁ'র প্রতি গুরুদেবের শ্রদ্ধা ছিল গভীর। প্রতিভাদীপ্ত গুণী গায়ক হিসেবে তাঁর প্রতিভার প্রশংসা করতে গিয়ে গুরুদেব বলেছেন— "ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙালি গুণীকে দেখেছিলাম, গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজমর্যাদায় ছিল, কণ্ঠের দেউড়িতে ভোজপুরী দরোয়ানের মতো তাল ঠোকাঠুকি করত না। তাঁর নাম তোমরা শুনেছ নিশ্চয়ই। তিনিই ছিলেন বিখ্যাত যদুভট্ট।... যখন আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকতেন নানাবিধ লোক আসত তাঁর কাছে শিখতে ; কেউ শিখত মৃদঙ্গের বোল, কেউ শিখত রাগরাগিণীর আলাপ।... বাঙলাদেশে এরকম ওস্তাদ জন্মায় নি। তাঁর প্রত্যেক গানে Originality ছিল, যাকে আমি বলি স্বকীয়তা।" যদুভট্ট, হিন্দী ভাষায় বিসমছন্দের ধ্রুপদ রচনার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এইরূপ গানই আমরা তাঁর রচনার মধ্যে পেয়েছি। তিনি আনুমানিক বছর পাঁচ-এর মতো ছিলেন, জোড়া-সাঁকোর ঠাকুরবাড়ির শিক্ষক হিসেবে।

যদুভট্ট জোড়াসাঁকোর কাজ ত্যাগ করে ত্রিপুরা মহারাজের দরবারে চলে যাবার পর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে নিযুক্ত হন বিষ্ণুপুরের প্রখ্যাত ধ্রুপদীয়া রাধিকা-

প্রসাদ গোস্বামী। তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংগীত-সমাজে সংগীতাচার্যের পদে দীর্ঘকাল নিযুক্ত ছিলেন। রাধিকা গোস্বামী ছিলেন গুরুদেবের সমবয়সী। রাধিকাবাবু যখন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিযুক্ত হন, তখন গুরুদেবের আর নিয়মিত গান শেখবার বয়স ও সময় ছিল না, পারিবারিক ও নিজের নানাবিধ কাজের চাপে। কিন্তু, রাধিকা গোস্বামীর কণ্ঠে বহুরকমের হিন্দী ধ্রুপদ, ধামার ও খেয়াল গান শুনে বাড়ির উপাসনার জন্য অনেক ভাঙা গান যে রচনা করেছিলেন তা আমরা জানি। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তাঁর "পিতৃস্মৃতি" গ্রন্থে বাল্যজীবনের বাড়ির গানের পরিবেশের বিষয়ে লিখছেন— "আমাদের বাড়িতে সেকালে গান বাজনা সব সময়েই চলত। বৈঠকখানা ঘরে দাদা দ্বিপেন্দ্রনাথ (দিনেন্দ্রনাথের পিতা) ওস্তাদ নিয়ে আসর জমাতেন। তখনকার ওস্তাদরা তাঁর বৈঠকে সর্বদা গান গাইতে আসতেন। রাধিকা গোস্বামী বাঁধা গাইয়ে ছিলেন ধ্রুপদ গাইবার জন্য।"

এর পরে, নিযুক্ত হন বিষ্ণুপুরের প্রখ্যাত ধ্রুপদীয়া গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধ্রুপদ গায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়করূপে। এইভাবে, বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত, জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছিল ধ্রুপদ গানে মুখর। হিন্দীভাষার ধ্রুপদ গানের রচনারীতি এবং তার গীতপদ্ধতি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান না থাকলে গান রচনায় গুরুদেব কিভাবে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা বোঝা যাবে না। সেই কারণে হিন্দী ধ্রুপদ গানের গঠনরীতি ও তার গীতপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করে, তার পরিপ্রেক্ষিতে, গুরুদেবের গানকে, দাঁড় করাতে চেষ্টা করছি।

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "গীতসূত্রসার" গ্রন্থে সেযুগের অতি প্রচলিত ধ্রুপদ ও খেয়াল গান সম্পর্কে আলোচনাকালে লিখেছেন— "ধ্রুপদের রচনা বিস্তৃত, এবং চারি অংশে অর্থাৎ কলিতে বিভক্ত। ঐ কলিকে হিন্দুস্থানী গায়কেরা 'তুক' নামে কহিয়া থাকে। চারি তুকের চারিটি ভিন্ন ভিন্ন নাম ; যথা— আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ...। অনেক ধ্রুপদের কেবল দুই তুক মাত্র পাওয়া যায়, তাহা বিস্মৃতি অথবা শিক্ষার ত্রুটির ফল।

"গানের প্রথম ভাগের নাম আস্থায়ী, যাহাকে মহড়া কিম্বা ধুয়া (ধ্রুব) বলে ; ইহা আরম্ভ হবার কোন সুর নির্দিষ্ট নাই।

"গানের দ্বিতীয় কলির নাম অন্তরা, ইহাতে সুরের একটি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে এই যে, ইহা প্রায়ই মধ্য সপ্তকের মধ্য স্থান হইতে আরম্ভ হইয়া তার সপ্তকের সা-এ আরোহণ করতঃ তথায় কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লইয়া, তৎপরে রাগ বিশেষে কেহ আরো উপরে যাইয়া নামিয়া আইসে, কেহ বা ঐ সা হইতে নামিয়া আসিয়া আস্থায়ীর সুরের সহিত মিলিত হইয়া সমাপ্ত হয়।

"গানের তৃতীয় কলির নাম সঞ্চারী ; ইহার নিয়ম এই, গানের আস্থায়ী ভাগ যে মধ্য সপ্তকে সম্পাদিত হয়, তাহারই একাংশ হইতে অবরোহণ করিয়া গায়কের সাধ্যমত খাদ সপ্তকের কতক দূর পর্যন্ত নামিয়া আবার আরোহণ করতঃ সা-এ সমাপ্ত হয়। তৎপরে গানটি পুনর্ব্বার আরোহণ গতি অবলম্বন করতঃ তার সপ্তকের কতক স্থান পর্য্যন্ত বিচরণ পূর্ব্বক, পুনর্ব্বার অবরোহণ করিয়া, মধ্য সপ্তকের কোন স্থানে সমাপ্ত হয়,— এই প্রকার অবস্থাপন্ন কলিকে আভোগ বলে ; ইহা গানের শেষ কলি।...

"রচনা কৌশলাভাবে আভোগের সুর প্রায়ই অন্তরার ন্যায় দেখা যায়। এই চারি কলি গাওয়ার নিয়ম এই— আস্থায়ী বারম্বার গাইতে হয় ; তৎপরে অন্তরা গাইয়া আবার আস্থায়ী গাইতে হয় ; সঞ্চারী গাওয়ার পর আস্থায়ী গাওয়ার রীতি নাই ; সঞ্চারীর পরই আভোগ গাইতে হয়।

"খেয়ালের রচনা ধ্রুপদাপেক্ষা সংক্ষেপ ; ইহাতে দুই তুকের অধিক সচরাচর ব্যবহার হয় না, অর্থাৎ ইহাতে কেবল আস্থায়ী ও অন্তরা। কখন কখন ইহাতে তিন চারি কলিও থাকে ; কিন্তু তাহাদের সুর সবই অন্তরার ন্যায়।

"পাখোয়াজ যন্ত্রে যে সকল তাল বাদিত হয়, যথা,— চৌতাল, ধামার, সুরফাঁক, ঝাঁপতাল, তেওট, আড়াচৌতাল, রূপক, ঢিমাতেতালা, সওয়ারী। এই সকল তালেই ধ্রুপদ গাওয়া হয়। ঝাঁপতাল, সুরফাঁক ও তেওরা তালের ধ্রুপদ কেবল দ্রুত লয়ে গাওয়াই প্রসিদ্ধ।" ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে রচিত "সচিত্র বিশ্বসঙ্গীত" নামক অপর একটি গ্রন্থে ধ্রুপদ সম্পর্কে আছে :

"যে সকল গীত কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মে বদ্ধ এবং যাহা খেয়াল ও টপ্পার ন্যায় ইচ্ছামত নিয়মচ্যুত হয় না, তাহাই ধ্রুপদ। এতদ্ব্যতীত ধ্রুপদের পদ টপ্পা ও খেয়ালের অপেক্ষা বিলম্বিত।... সচরাচর ইহার চারটি চরণ থাকে। যথা— আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ। ধ্রুপদ অতি গম্ভীর গান। যে সকল তাল ধ্রুপদের তাল বলিয়া বিখ্যাত আছে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন তালে ধ্রুপদ গীত হয় না।

"ধ্রুপদের চারি পদ ছাড়া আর নড়িবার উপায় নাই।... ধ্রুপদের তাল সাধারণতঃ অতি বিলম্বে আইসে,... ধ্রুপদের সুর সকল আবার খেয়াল টপ্পার ন্যায় বহুপ্রকার করা যায় না।"

বাঙালি ওস্তাদগণ, বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ গান রচনা করে, তা গাইতে কুণ্ঠা বোধ করেন বলে, তাঁদের এই মনোভাবের প্রতিবাদ করে, আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার প্রয়োজনে রচিত বাংলা ভাষার ধ্রুপদ গান সম্পর্কে লেখক বলেছেন— "ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে সকল বাঙ্গালা-ভাষায় ধ্রুপদ রচিত হইয়াছে, তাহা কি কোন অংশে হিন্দী-ভাষায় রচিত ধ্রুপদ অপেক্ষা মন্দ?"

বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সঙ্গীত-চন্দ্রিকা' গ্রন্থের প্রথম ভাগে ধ্রুপদ গান সম্পর্কে লিখেছেন— "হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতে তিন প্রকার গান প্রধান, যথা— ধ্রুপদ (ধ্রুবপদ), খ্যাল ও টপ্পা। তন্মধ্যে ধ্রুপদই আদি গান। ইহাতে সুর রচনার গাম্ভীর্য বিশেষরূপে রক্ষিত হয়। মৃদঙ্গে যে সকল তাল ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ চৌতাল, ধামার, আড়াচৌতাল, তেওরা, রূপক, সুরফাক্তা, ঝাঁপতাল, সওয়ারী, ব্রহ্মতাল, ঢিমাতেতালা, এই সকল তালেই ধ্রুপদ গীত হইয়া থাকে। ধ্রুপদের গতি প্রায়ই ধীর এবং গতির প্রকৃতি-অনুসারে ইহা ঈশ্বরোপাসনা কার্যের বিশেষ উপযোগী। ধ্রুপদে চারিটি তুক (কলি) থাকে, যথা আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। প্রথম তুকের নাম 'আস্থায়ী', যাহাকে 'মহড়া' বা 'ধুআ' (ধ্রুব) কহে। দ্বিতীয় তুকের নাম 'অন্তরা', তৃতীয় তুকের নাম 'সঞ্চারী' ও চতুর্থ তুকের নাম 'আভোগ'। কোন কোন ধ্রুপদে কেবল আস্থায়ী ও অন্তরা এই দুইটি তুক দৃষ্ট হয়।

"যে ধ্রুপদে 'ছন্দ' এই কথাটির উল্লেখ থাকে এবং যাহা পদ্যে রচিত তাহাকে 'ছন্দ' কহে, এবং যে ধ্রুপদে 'ধারু' এই কথাটির উল্লেখ থাকে, তাহাকে 'ধারু-ধ্রুপদ'

কহে। 'ধারু-ধ্রুপদ' নায়ক গোপালের সৃষ্টি।

"খ্যাল। খ্যালের সুর ও রচনা ধ্রুপদাপেক্ষা অনেক সংক্ষিপ্ত। ধ্রুপদে সুরের গতি একপ্রকার খ্যালে অন্য প্রকার। ইহাতে যে সকল দ্রুত-তান ও গিটকারী ব্যবহৃত হয়, ধ্রুপদে তাহা হয় না ; এবং ধ্রুপদে যে সকল গমক ব্যবহৃত হয়, সে প্রকার গমক খ্যালে ব্যবহৃত হয় না। খ্যালে আস্থায়ী ও অন্তরা এই দুইটি মাত্র তুক ব্যবহৃত হয়। কোন কোন খ্যালে চারিটি তুকও দৃষ্ট হয় ; সে সকলকে হিন্দুস্থানে 'ওলাব' কহিয়া থাকেন। মধ্যমান, আড়াঠেকা, তেতালা, একতালা, তেওট ইত্যাদি তাল খ্যাল গানে ব্যবহৃত হয়।" গত চারশো বছর ধরে সমগ্র উত্তর ভারতের সংগীতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ এইরূপ ধ্রুপদ গানের যে বিশেষ গুণ ছিল, গুরুদেবের ভাষায় তা হল তার "বিপুলতা, গভীরতা, আর-এক দিকে তার আত্মদমন, সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করা।" এই আদর্শকে ধরে রাখতে গিয়ে ধ্রুপদকে কতগুলি কঠোর নিয়ম মেনে চলতে হয়েছে। যেমন, ধ্রুপদের রাগবিস্তারের দায়িত্ব ছিল একই রাগ বা রাগিণীর আলাপ গানের উপর। সেই কারণে ধ্রুপদীয়াগণ ধ্রুপদ গান গাইবার পূর্বে সেই রাগ বা রাগিণীর আলাপের ভূমিকা দিয়ে গান শুরু করতেন।

আলাপ-না-জানা ধ্রুপদীয়াদের কোনো স্থানই ছিল না সে যুগের গায়ক মহলে। আলাপ হল রাগরাগিণীর অলংকৃত চলমান বিকাশ। ধ্রুপদীয়ারা প্রাণপণ চেষ্টা করতেন শিখে নেওয়া গানগুলির সুর হুবহু বজায় রাখতে। ধ্রুপদে বিশুদ্ধ গমক ব্যতীত অন্য কোনো প্রকার অলংকার ব্যবহার ছিল নিষিদ্ধ। এমন-কি, শোনা যায়, ধ্রুপদের প্রথম যুগে দুন, চৌদুন ও বোলতান দেওয়ার রীতি ছিল না, কেবল-মাত্র, ধামার তালে রচিত ধ্রুপদ গান ছাড়া। ধ্রুপদী গানের গুণীরা স্বীকার করতেন যে, ধ্রুপদের মর্যাদা কেবলমাত্র কথার প্রাপ্য নয়, রাগিণীরও নয়, সুর, কথা ও ছন্দের মিলনে যে রস জন্মায় তাতেই তার প্রকৃত পরিচয়। এই ছিল ধ্রুপদ গানের মূলে কতগুলি লক্ষণ। চৌতাল, ধামার, আড়াচৌতালে রচিত হিন্দী ধ্রুপদ গানের গতি ধীর ও প্রকৃতি গম্ভীর, সুর যোজনার পদ্ধতি সহজ, সরল ও নিরাভরণ। এ গানে চাঞ্চল্য নেই। গানগুলি শান্ত, উদাত্ত ও ধর্মসাধনার অনুকূল। এ গানে অকম্পিত সুরই অধিক, কিন্তু গমক ও মীড় প্রধান। গাইবার সময় রাগরাগিণীর শুদ্ধতার প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখতেন গায়কেরা। সুরের পরিবর্তন করার স্বাধীনতা ছিল না। সুরকে কথার উপর সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করাই ছিল এ গানে প্রচলিত রীতি। ঢিমা তেতালার গান, পূর্বে ছিল ধ্রুপদেরই জ্ঞাতি।

গুরুদেবের জন্মের পূর্বেই হিন্দী ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা-ভাঙা বাংলা গান, তাঁর অগ্রজ ও আত্মীয়েরা, আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার প্রয়োজনে প্রায় অর্ধশতের উপর রচনা করেছিলেন। এ ধরনের ভাঙা গান রচনার সময়, সে যুগের যে-সব বড়ো বড়ো ধ্রুপদীয়াদের সাহায্য তাঁরা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিষ্ণু চক্রবর্তী, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিপুরের রাজচন্দ্র রায় ও যদুভট্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অত্যন্ত শিশু বয়স থেকেই গুরুদেব এই-সব ধ্রুপদ ও খেয়াল গান নিয়মিত শুনেছেন এবং গেয়েছেন, বাড়িতে ধ্রুপদের প্রাণবান একটি সাংগীতিক পরিবেশের মধ্যে বাস করে। আলোচনার প্রারম্ভে আমি ধ্রুপদ গান সম্বন্ধে গুরুদেবের যে দুটি উক্তি উদ্ধৃত করেছিলাম তাতে আছে তাঁদের বাড়ির ধ্রুপদ গানের যে প্রাণবান পরিবেশ এবং যে প্রভাবের মধ্যে তিনি বাস করতেন, তার কথা। তাঁর এই উক্তির ভিত্তিতেই

তাঁর গানকে বুঝতে হবে। যেমন হিন্দী ধ্রুপদ গানে তিনি যে বিপুলতা, গভীরতা আত্মদমন, সুসংগতির মধ্যে আপন ওজন রক্ষা করার মতো গুণগুলি লক্ষ্য করেছিলেন, তাঁর নিজের গানে এই গুণগুলি ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। ধ্রুপদ গান যেমন চার কলির ভাগে বিভক্ত, গুরুদেবের গানে চার কলিই সর্বাধিক এবং তাঁর গীতপদ্ধতিও সেইরূপ। গম্ভীর প্রকৃতির হিন্দী ধ্রুপদ গান যেমন চৌতাল, ধামার, আড়াচৌতাল প্রভৃতি ঢিমালয়ের ছন্দে রচিত হত, গুরুদেবও তাঁর সেই প্রকৃতির গানে চৌতাল প্রভৃতির মতো ঢিমালয়ের ছন্দকেই গ্রহণ করেছেন। আবার দ্রুতলয়ের ছন্দ-প্রধান বা জোরালো গানে ধ্রুপদের ঝাঁপতাল, সুরফাকতাল ও তেওড়া তালকে ব্যবহার করছেন। ধ্রুপদী গানে, দ্রুত খেয়াল বা টপ্পার মতো সুরালংকার যেমন নিষিদ্ধ ছিল, গুরুদেবের চার কলির যাবতীয় গান সেইরূপ সুরালংকারহীন। ধ্রুপদ গানে দ্রুত খেয়ালের মতো রাগিণীর বিস্তারকে গায়কেরা কখনো প্রাধান্য দেন নি। প্রাধান্য দিতেন রাগিণী, গানের ভাব এবং তালের সুষ্ঠু মিলনের প্রতি। গুরুদেব-কর্তৃক রচিত পূজা পর্যায়ের এমন কিছু গান আমরা পাই, যার তাল গুরুদেব-কর্তৃক সৃষ্ট বা হিন্দী ধ্রুপদ গানে অপ্রচলিত। যেমন, "রূপকড়া", "নবতাল", "নবপঞ্চতাল", "একাদশী" ও "ঝম্পক"। এই তালে যে ক'টি গান তিনি রচনা করেছেন তার গঠন ও গীতপদ্ধতি হুবহু চার কলির হিন্দী ধ্রুপদের মতো। সুরফাকতাল ও তেওড়া তালের মতো কেবল প্রস্বনই এতে আছে, ফাঁক ব্যবহারের স্থান এতে নেই।

ধ্রুপদ গানের মতো খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, বাংলা কীর্তন ও লোকসংগীতে চার-কলির ভাগে সুর যোজনার রীতি নেই। সুরের বিচারে এরা সবই দু কলির গান। আস্থায়ীর পর অন্তরাতে সুর যোজিত হয়। পরবর্তী কলি থাকলে সেগুলিতে অন্তরার ন্যায় সুরের পুনরাবৃত্তি ঘটে। গুরুদেব কিন্তু খেয়াল, ঠুংরি, কীর্তন ও অন্যান্য লোকসংগীতের ঢঙে স্বাধীনভাবে যখন গান রচনা করেছেন, তখন সেখানে দেখি ধ্রুপদের মতো চার কলি এবং ধ্রুপদের অনুসরণেই তার রাগরাগিণী বা সুর গ্রথিত। এই-সব গানের উল্লেখযোগ্য দিক হল সঞ্চারী কলির সুর। মধ্য ও দ্রুতলয়ের খেয়াল ভাঙা গানের তালে রচিত এমন কিছু গান তিনি রচনা করেছেন, যার সঞ্চারী অংশের সুরটি তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। কাওয়ালী বা ত্রিতাল, একতাল, দাদরা, খেমটা ও কাহারবা তালে প্রচুর গান রচনা করেছেন এইরূপ চার কলিতে। ধ্রুপদ-বহির্ভূত গুরুদেবের এই-সব তালের গানে গম্ভীর, করুণ, চঞ্চল ও উদ্দীপক প্রভৃতি নানা হৃদয়াবেগের পরিচয় সুস্পষ্ট। মূলত এভাবেই ধ্রুপদকে ভিত্তি করে গুরুদেবের সংগীত রচনার প্রতিভা বিকশিত। হিন্দী ধ্রুপদের গানকে তিনি তার বাঁধা-ধরা নিয়মের বাঁধন থেকে এইভাবে মুক্তির পথ দেখিয়ে গেছেন। গুরুদেব তাঁর অগ্রজগণের হিন্দীভাঙা বাংলা গান থেকে নিজের গান রচনায় যে পথের নির্দেশ পেয়েছিলেন, তাকে সেই পথে, নানাভাবে বিকশিত করে আরো বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন কিভাবে, কিছু গানের উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করে তুলে ধরবার চেষ্টা করছি।

গুরুদেব হুবহু ধ্রুপদের অনুসরণে চৌতালে রচনা করেছিলেম, "স্বামী তুমি এসো আজ", "কেমনে ফিরিয়া যাও না দেখি তাঁহারে", "প্রভাতে বিমল আনন্দে" এবং "তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন"। এই-সব গানের চার কলিতে যেভাবে সুর বসানো হয়েছে এবং গানের গতি বা লয় যেরূপ শ্লথ তা হুবহু হিন্দী ধ্রুপদের

চৌতালের গানেরই মতো। গীতপদ্ধতিও সেইরূপ। এইরূপ বাংলা গান, বোলতান এবং দুগুণ বা চৌগুণ ছন্দে গাওয়া হয় না, হিন্দী ধ্রুপদের মতো। এ গানেও কথা, সুর ও ছন্দ অংগাংগীভাবে এক হয়ে জড়িয়ে আছে। কেউ কাউকে ছাপিয়ে যাবার চেষ্টা করছে না। কোনো প্রকার সুরালংকারও এ গান কটিতে নেই, কারণ এতে তার প্রয়োগের কোনো সুযোগ নেই। গান কটি উপাসনারই প্রয়োজনে রচিত। এর সংগে আমি এমন দুটি উপাসনার গানের উল্লেখ করছি, যা শুনতে ধ্রুপদের মতো, কিন্তু ধ্রুপদের তালে রচিত নয়। যেমন, "নিশা অবসানে কে দিল গোপনে আনি" এবং "প্রথম আলোর চরণধ্বনি উঠল বেজে যেই"। এ দুটি ঢিমা লয়ের ছ মাত্রার দাদরা তালের গান। কিন্তু কথার সংগে মিলিয়ে সুর যোজনা করা হয়েছে হুবহু চৌতালের ধ্রুপদীয় রীতিতে। এর গীতপদ্ধতিও সেইরূপ। কথার সংগে সুর ও লয়ের মিলনে গান দুটি একাত্ম হয়ে গেছে। কোনো প্রকার সুরালংকারের প্রয়োগ করা হয় নি কোথাও। তিন মাত্রিক ছন্দের কোনো প্রকার তালে ধ্রুপদ গান গাওয়া কখনোই সম্ভব ছিল না ঊনবিংশ শতকে। কিন্তু বর্তমান যুগে তিনমাত্রা ভাগের মোট বারো মাত্রার ঢিমা একতালে নতুন এক প্রকার ধ্রুপদ গান গাইবার চলন হয়েছে বলে শোনা যায়।

যে-কোনো প্রকৃতির দাদরা তালের গান হল মোট দু-কলির সুরের। আস্থায়ী অন্তরার দুটি কলির জন্যই সুর রচিত হয়, পরবর্তী যত কলিই থাকুক, তাদের অন্তরার সুরেই গাইতে হয়। উপরোক্ত দুটি গানের সংগে ধ্রুপদের মতো সঞ্চারী ও আভোগের কলি দুটি যেমন আছে তেমনি তাতে সুর বসানো হয়েছে ধ্রুপদের আদর্শে। গুরুদেব এমন কিছু গান রচনা করে গেছেন, যার তালগুলিকে বলা হয়েছে, তাঁরই সৃষ্ট নূতন তাল। যথা—রূপকড়া—৩/২/৩ ভাগের মোট আট মাত্রার তাল। এই তালে রচিত হয়েছে "গভীর রজনী নামিল হৃদয়ে", "ঐ রে তরী দিল খুলে", "জীবনে যত পূজা হল না সারা", এবং "কত অজানারে জানাইলে তুমি" গান কটি।

নবতাল—৩/২/২/২ ভাগে বিভক্ত মোট নয় মাত্রার তালের গান হল, "নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা", এবং "প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে"।

একাদশী—৩/২/২/৪ ভাগে বিভক্ত মোট এগারো মাত্রার তালের গান হল— "দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া"। "জননী, তোমার করুণ চরণখানি", গানটি মোট আঠারো মাত্রার নবপঞ্চতালে রচিত। এই তালটিকে গুরুদেব-সৃষ্ট নূতন তাল বলা না হলেও, উচ্চাঙ্গের হিন্দী গানে এটির প্রয়োগ অপ্রচলিত। হিন্দীতে এ তালের গানের খবর এখনো পাই নি। হিন্দী গানে অপ্রচলিত আরো কয়েকটি তালে গুরুদেব কিছু গান রচনা করে গেছেন, যেমন—৩/২ ভাগের মোট পাঁচ মাত্রার ঝম্পক তালের গান, ও ৪/২ মাত্রার তালের গান। নূতন এবং অপ্রচলিত তালে রচিত গুরুদেবের মোট গানের সংখ্যা মন্দ নয়। এ দলের সব গানই চার কলিতে বিভক্ত। এর সুর-যোজনা, গীতপদ্ধতি, তালের গতি বা লয়, এবং এর সুর ও কথার মিলনের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, গানগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির ধ্রুপদ গানের আদর্শেই রচিত। এই-সব গানের একটি বৈশিষ্ট্য হল এর তালে কেবল সমপ্রম্বন বা ঝোঁক দেখানো হয়েছে ধ্রুপদের তেওড়া, আড়াচৌতাল ও সুরফাঁকতালের মতো। প্রত্যেক ভাগের মুখেই ঝোঁক। চৌতাল, ত্রিতাল, একতাল বা দাদরা ইত্যাদির মতো ফাঁকের কোনো স্থান গুরুদেব এতে রাখেন নি।

ঢিমা তেতালার হিন্দী গানকে পূর্ব যুগে ধ্রুপদ গানের দলে যে স্থান দেওয়া

হত তার উল্লেখ পূর্বে করেছি। গুরুদেবও রচনা করেছিলেন এইপ্রকার চিমা তেতালার কয়েকটি গান। "বেঁধেছ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময়" গানটি তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এটি মোট চার কলির গান। এটি গাইতে হয় হুবহু চৌতালের ধ্রুপদ গানের আদলে। কথা ও সুরের গঠনপদ্ধতি অবিকল সেইরূপ। আবার মধ্য-লয়ে বা দ্রুতলয়ের ত্রিতালের ছন্দে— "রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি" ও "ওই পোহাইল তিমিররাতি" যখন রচনা করলেন, তখন দেখি ধ্রুপদের মতো তার চার কলির গঠন, কিন্তু তার ভাব ও রস সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ধ্রুপদের "সুরফাঁকতাল", "ঝাঁপতাল", ও "তেওড়া" তালকে বলা হয়েছে দ্রুত-লয়ের তাল। গুরুদেব-কর্তৃক রচিত সুরফাকতালে যে দুটি গান পাই, যা দ্রুতলয়ের, যেমন— "প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একি দুর্দিন" এবং "আনন্দ তুমি স্বামী মঙ্গল তুমি"। এ দুটি জোরালো আবেগের গান। কিন্তু মধ্যলয়ে শান্ত প্রকৃতির কিছু গানও তিনি এই তালে রচনা করেছেন। ঝাঁপতাল এবং তেওরা তালের। দ্রুতলয়ের বেশ-কিছু চার কলির গান থাকলেও মধ্যলয়ের গানও অনেক আছে। এই কটি তালে, ধ্রুপদের চৌতাল বা আড়াচৌতালের মতো শ্লথ লয়ের গান একটিও পাওয়া যায় না। মধ্যলয়ে এইরূপ গান রচনার প্রতি তিনি উৎসাহিত হয়েছিলেন বিষ্ণুপুরের গুণী ধ্রুপদীরা-দের কণ্ঠে মধ্যলয়ের "সুরফাঁকতাল", "ঝাঁপতাল" ও "তেওড়া" তালের গান শুনে।

কীর্তন, বাউল, সারিগান ও হিন্দী ঠুংরী গান হল, প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী, দু কলির গান। বাকি কলিতে অন্তরার সুরই প্রযুক্ত হয়। গুরুদেব যখন ঐ-সব গানের সুর ও ছন্দের সাহায্যে নিজের ইচ্ছামত গান রচনা করেছেন তখন ধ্রুপদের মতো তাদেরও চার কলির সুরে সাজিয়ে নিয়েছেন। এতে মধ্যলয়ের গান আছে, কিন্তু দ্রুতলয়ের গানই বেশি। এ-সব গানেও সুরের বিশেষ অলংকৃত রূপ নেই। কথা, সুর ও ছন্দের স্বচ্ছন্দ মিলনে গানগুলি ভাবরসে সমুজ্জ্বল। নমুনা হিসেবে, প্রতিটি ঢঙের একটি করে গানের উল্লেখ করছি।

কীর্তনের সুর— "ওই আসনতলের মাটির 'পরে।"
বাউল সুর— "ওরে আগুন আমার ভাই আমি তোমারি জয় গাই।"
সারিগানের সুর— "আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা।"
হিন্দী ঠুংরী গানের সুর— "তুমি কিছু দিয়ে যাও।"

১৩৯১

—

নির্দেশিকা

গান ও কবিতা

গ্রন্থ পত্রিকা ও প্রবন্ধ

উল্লিখিত ব্যক্তিগণ

মূল্য ৭.০০ টাকা